পত্র - পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা
এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

দুর্গোৎসব

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে। ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, বিহগ কুলের কাকলি কূজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য-প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় বর লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি। অজস্র দুঃখসমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক!

●

কালপুরুষ।

প্রথম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। আশ্বিন। ১৩৬৮

সম্পাদক। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

চিত্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ
পাদে অঙ্কিত মেদিনীপুর
(আমদাবাদ) অঞ্চলের একটি
পটচিত্রের আংশিক প্রতিলিপি

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষে পরিমল চন্দ্র কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১৯বি, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত।

মঙ্গলচণ্ডী : মেদিনীপুরের পটচিত্র

আশুতোষ মিউজিয়ম সংগ্রহ

(শ্রীসুধাংশু কুমার রায়ের সৌজন্যে)

প্রথমবর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
কালপুরুষ
আশ্বিন ॥ ১৩৬৮

পিতৃ-যজ্ঞ

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সন্তান অত্রি। অত্রির সন্তান দত্তাত্রেয়। দত্তাত্রেয়ের সন্তান নিমি। নিমির পুত্র শ্রীমৎ। শ্রীমৎ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর কালগ্রাসে পতিত হন। দুঃখার্ত্ত নিমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া শ্রাদ্ধের কল্পনা করেন। তিনি নিজের মনোমত ফলমূলাদি ও শস্য ধ্যানবলে সংগ্রহ করেন। পরদিন অমাবস্যায় কতিপয় অর্চ্চনীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সাতজনকে লবণশূন্য শ্যামাক অন্ন প্রদান করিয়া ভোজনরত ঐ সকল ব্রাহ্মণের পাদদেশে দক্ষিণাগ্র কুশমুষ্টি বিস্তৃত করিলেন এবং মৃত পুত্রের নামগোত্র উল্লেখ করিয়া কুশোপরি পুত্রের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। এই কার্য্য করিয়া তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'হায়! ইহা আমি কি করিলাম! মুনিরা ইতিপূর্বে কখনও ইহার অনুষ্ঠান করেন নাই। অভিনব অবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণগণ যে আমাকে অভিসম্পাত দিবেন, তাহার হাত হইতে আমি কিরূপে রক্ষা পাইব!'

অতঃপর তিনি তাঁহার আদি বংশকর্ত্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। অত্রি চিন্তামাত্রই তপোবলে নিমির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমিকে পুত্রশোকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখিয়া নানারূপ সময়োচিত সদুপদেশ দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—'ওহে নিমি, তুমি যে অনুষ্ঠানের কল্পনা করিয়াছ তাহাই "পিতৃযজ্ঞ।" মা ভৈষীঃ। ব্রহ্মা নিজেই পুরাকালে ইহা বিহিত করিয়াছেন।' (মহাভারত অনুশাসনপর্ব ৯১ অধ্যায়)। কেহ কেহ মহাভারতের এই অংশপাঠ করিয়া শ্রাদ্ধকে পরবর্ত্তী কালের এবং নৈমিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি (১) পিতৃমেধ (২) পিতৃযজ্ঞ (৩) মহাপিতৃযজ্ঞ (৪) পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (৫) পিতৃঅর্চ্চনা প্রভৃতি বৈদিকযজ্ঞ পিতৃ পূজারই নামান্তর। এই সকল অনুষ্ঠান মৃতের উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং নিমি প্রবর্ত্তিত 'শ্রাদ্ধ'কে কখনই শ্রাদ্ধের আদি বলা যাইতে পারে না।

নিমি যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে অভিনব বলিয়াছেন তাহার কারণ, মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে পিতার কর্ম্মানুষ্ঠান ইহাই নূতন। শাস্ত্রান্তরে ইহা নিষিদ্ধই হইয়াছে—'নচ মাতা নচ পিতা কুর্য্যাৎ পুত্রস্য পৈতৃকম্। নাগ্রজশ্চ তথা কুর্য্যাৎ ভ্রাতৃণাম্ভ কনীয়সাম্। পিত্রা শ্রাদ্ধং ন কর্ত্তব্যং পুত্রণাস্তু কথঞ্চন। ভ্রাত্রাচৈব ন কর্ত্তব্যং ভ্রাতৃণাস্তু কনীয়সাম্' (ক্রিয়ানিবন্ধোদ্ধৃত কাত্যায়ন বচন)। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য স্নেহবশতঃ অথবা উৎসন্ন বান্ধবস্থলে পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃকও পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৈতৃক কার্যবিহিত হইয়াছে—'যদি স্নেহেন কুর্য্যাৎ তৎ সপিণ্ডীকরণং বিনা গয়ায়াস্তু বিশেষেণ জ্যায়ানপি সমাচরেৎ' (কাত্যায়ন)। উৎসন্ন বান্ধবং প্রেতং পিতা ভ্রাতা তথাগ্রজঃ জননীচাপি সংস্কুর্য্যাৎ মহদেনোন্যথা ভবেৎ (কমলাকরোদ্ধৃত সুমন্তু বচন)। অথবা, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি যাহা বিহিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরুষাত্মক অর্থাৎ তাহাতে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদানাদি দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। ইহাকে পার্বণশ্রাদ্ধ বলা হয়। নিমি যাহা করিলেন তাহা এক পুরুষাত্মক। অর্থাৎ কেবল তাঁহার পুত্রের উদ্দেশ্যে। ইহাকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয়। এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অভিনব এবং নিমি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা বলাই হয়ত ভারতকারের অভিপ্রায়। অথবা, প্রাচীন পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদিতে অগ্নৌকরণ বা পিণ্ডদানই প্রধান। নিমি প্রবর্ত্তিত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনই প্রধান। এই জন্যই ইহাকে অভিনব বলা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু অত্রির শেষ কথাটিও লক্ষণীয়—'শ্রুতিরেষা সনাতনী'। ব্রহ্মা এই পিতৃকার্য্য অতি প্রাচীন যুগেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং নিমিকে পৈতৃক কার্য্যের প্রবর্ত্তক বলা যায় না। বেদ যেইরূপ নিত্য বা সনাতন বৈদিক পৈতৃক অনুষ্ঠানও সেইরূপ নিত্য ও সনাতন।

'শ্রাদ্ধ' শব্দটি কোনও বৈদিক সংহিতা বা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম এই শব্দটি কঠোপনিষদে (অধ্যায় ১, বল্লী ৩, শ্লোক ১৭) দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই সকল পণ্ডিতের মত স্বীকার করিয়া লইলে আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে (৪,৭,১) ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। অস্থি সঞ্চয়ন উপলক্ষ্যে এই শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রেতের পিতৃত্ব প্রাপ্তি।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে শ্রাদ্ধ শব্দটি এবং ইহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণ ভোজন। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পালি সাহিত্যে সংস্কৃত শ্রাদ্ধ কথার অনুরূপ শব্দ 'সদ্ধ'। এই 'সদ্ধ' কথাটির অর্থ মৃত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু দানরূপ প্রেতকৃত্য। সুতরাং শ্রাদ্ধ শব্দটি এবং তাহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন বৌদ্ধগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। পণ্ডিতগণের এইমত গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৫, ২, ৮৫) 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল 'শ্রাদ্ধম্ অনেন ভুক্তম্ ইনি ঠনৌ'—ইহার অর্থ 'অনেন ভুক্তম্' এই অর্থে শ্রাদ্ধ শব্দের উত্তর ইনি এবং ঠন্ প্রত্যয় হয়। শ্রাদ্ধের অন্ন যে ভোজন করে তাহাকে শ্রাদ্ধী ও শ্রাদ্ধিক বলা হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পাণিনির সময়, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রধান অঙ্গ যাহার, এইরূপ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে পাণিনি বৌদ্ধ পূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেন। আরও, গৃহ্য সূত্রগুলিতেও বৌদ্ধ পূর্ব যুগের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত অষ্টকাশ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে গো হনন এবং গোমাংস ভক্ষণ গৃহ্য সূত্রে বিহিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রে, শ্রাদ্ধে নানাবিধ প্রাণীর মাংস প্রদানের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই মাংস পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করিতে হইবে। বৌদ্ধ প্রভাবে এই সকল অনুষ্ঠান বিহিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা যায় না; বৌদ্ধগণ অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলিয়া মনে করেন। সুতরাং গৃহ্যোক্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বৌদ্ধপূর্ব কোন প্রাচীন যুগেই প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মহাকবি ভাসকে পাণিনিরও পূর্ববর্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করা হয়। মহাকবি ভাসের প্রতিমা নাটকে (৫ম অঙ্ক) আমরা শ্রাদ্ধ শব্দটি দেখিতে পাই 'সর্বম্ শ্রদ্ধয়া দত্তম্ শ্রাদ্ধম্'। প্রচেতা রচিত 'শ্রাদ্ধ কল্প' নামক গ্রন্থের নামও এই নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে শ্রাদ্ধ শব্দটি দেখিতে পাওয়া না গেলেও ইহা যে বৌদ্ধ পূর্ব যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভাবের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও পিতৃকৃত্য যে বৈদিক ভাবধারার সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই বিষয়েও সন্দেহের কোন অবসর থাকেনা।

পিতৃযজ্ঞ এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। ইহারা পিতৃদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠিত। বৈদিক চিন্তাধারায় অন্ত্যেষ্টির অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেত এবং আতিবাহিক শরীরের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে প্রায় অপরিজ্ঞাত। সুতরাং মৃতব্যক্তি যথাযথ অন্ত্যেষ্টির পরই পিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পিতৃযজ্ঞ বা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের দেবতা রূপে প্রদত্ত পিণ্ডাদি গ্রহণে অধিকারী হন। কিন্তু পরবর্তী যুগে মৃতব্যক্তির পিতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধারণতঃ এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। অন্ত্যেষ্টির অব্যবহিত পরে সে 'আতিবাহিক শরীর' লাভ করে। পূরকপিণ্ড দান করিয়া তাহাকে এই আতিবাহিক শরীর হইতে উদ্ধার করিতে হয়। এই আতিবাহিক শরীর ধ্বংস হইলে মৃতব্যক্তি 'প্রেত শরীর' লাভ করে। প্রেত শরীর ধ্বংস করিবার জন্য মাসিক একোদ্দিষ্ট—এবং সপিণ্ডী-করণের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলে মৃতব্যক্তি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃত্ব লাভ করিলেই মৃতব্যক্তি পার্বণশ্রাদ্ধে অর্চিত হইবার অধিকার লাভ করে। এই পার্বণশ্রাদ্ধ হইল বৈদিক পিতৃ যজ্ঞ, মহাপিতৃ যজ্ঞ এবং পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞের অনুরূপ।

পিতৃযজ্ঞের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত 'আমি' কে বৃহত্তর 'আমি'তে পরিণত করা, ক্ষুদ্র 'আমি' কে বিরাট 'আমি'তে পরিণত করা। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষের

উদ্দেশ্যে তিনটি পিণ্ডদান করিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম পিণ্ডটি সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর প্রতীক, ইহাকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিতে হইবে এবং পিতাকে অগ্নিরূপে, ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে, চিন্তা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পিণ্ডটি অন্তরীক্ষ বা আকাশের প্রতীক। পিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাতা বায়ুরূপে কল্পনা করিতে হইবে। তৃতীয় পিণ্ডটি দ্যুলোকের প্রতীক। প্রপিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার পিতা হইলেন পৃথিবী ও তদধিষ্ঠাতা অগ্নি, পিতামহ হইলেন অন্তরীক্ষ লোক ও তদধিষ্ঠাতা বায়ুমণ্ডল এবং প্রপিতামহ হইলেন দ্যুলোক এবং তাহার অধিষ্ঠাতা সৌরমণ্ডল। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের সহিত, অগ্নি, বায়ু ও রবি মণ্ডলের সহিত, শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার 'জন্য জনক' সম্বন্ধ। বিরাট বিশ্বের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতা পরম আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ তাই এই তিন পিণ্ডদানরূপ অনুষ্ঠান।

ঋগ্বেদের দেবীসুক্তে দেখিতে পাই দেবী বাক্ বলিতেছেন—'আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আদিত্যগণেরও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রকে অশ্বিদ্বয়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি। আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি। আমি দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি। ঊর্দ্ধভাগে দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে, বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, দ্যুলোককে আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। বিশ্বভুবন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর পরে, দ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র, আমি আমার মহিমার দ্বারা সম্ভূত হই।' এইস্থলে দেবী বাক্ আপনাকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত একীভূত করিয়াছেন। এই মন্ত্রের উপাসকও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিণীদেবী বাকের সহিত উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র আমিকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় আমিতে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হন।

উক্ত ঋগ্বেদে পুরুষ সুক্তে ও 'পুরুষের' বিশ্বময় বিরাট দেহের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—'পুরুষের সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া তাহারও উর্দ্ধে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন।' এই মন্ত্রের উপাসকও দেবী সুক্তের উপাসকের ন্যায় আপনার ক্ষুদ্র আমি কে বিশ্বময় বিরাট আমিতে পরিণত করিতে চাহেন। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে যে বিশ্বরূপা মাতৃ মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে তাহারও উপসনার উদ্দেশ্য দেবীসুক্তের উপাসনা হইতে অভিন্ন।

আমরা দেখিলাম বৈদিক ভাবধারায় যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান বিরাট বাহ্য জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র আপন ব্যক্তিগত সত্তাকে বৃহত্তম সত্তায় পরিণত করা। বৈদিক পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত ও পৌরাণিক তর্পণাগুলি পর্য্যন্ত সকল পৈতৃক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যও কি তাহাই নহে? পিতৃকৃত্যের উদ্দেশ্যও তো মৈত্রী ভাবনার দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত পরম আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র সত্তাকে বৃহত্তর সত্তায় পরিণত করা।

মনু বলিয়াছেন—'পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্'—তর্পণই পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ, যেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে তর্পণের অনুষ্ঠানের দ্বারাও সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তর্পণানুষ্ঠানেও অনুষ্ঠাতা পিতৃগণের সহিত, দেবগণের সহিত, প্রাণিজগতের সহিত, মনুষ্যজগতের সহিত, বৃক্ষলতাগুল্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের সহিত, পুণ্যাত্মাও পাপীর সহিত, নিখিল বিশ্বের সহিত পরম আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্' বলিয়া জলগণ্ডূষ দান করেন। ক্ষুদ্র 'আমি'কে বিরাট 'আমি'তে পরিণত করা, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করাই পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

এই পিতৃযজ্ঞ আবার গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত একটি যজ্ঞ—'যৎ পিতৃভ্যঃস্বধা করোতি অপি অপঃ। তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) মনুষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটি ঋণে আবদ্ধ হয়। দেবগণ মানুষের ভাগ্য বিধাতা ; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন ; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে ; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে ; পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কোন না কোনও রূপে তাহার জীবন রক্ষার সাহায্য করিতেছে ; অতএব ইহাদের সকলের নিকটই মানুষের ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। এক একটা ঋণ শোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ব্যাপক অর্থে এই ত্যাগের নাম যাগ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন,—"যদগ্নৌজুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে" দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীগণের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং, দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথি কে কিছু অন্নদিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্তত একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই ; দ্রব্যের বাহুল্য নাই।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্তব্যকর্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থির প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না, তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি

যজ্ঞকে 'মহাযজ্ঞ' বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন,—"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে"—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনেদিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনেদিনে সমাপ্ত করিতে হইবে।

যেই উদ্দেশ্যে শতপথ ব্রাহ্মণও তৈত্তিরীয় আরণ্যকাদিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ এবং বেদোক্ত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি এবং তাহার বিকৃতি অন্বাহার্য্য পার্বণাদি অনুষ্ঠানেরও সেই উদ্দেশ্য। সুতরাং ভাব বিচারে শ্রাদ্ধকে বৈদিক ভাবধারার বাহকই বলিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে লৌকায়তিকগণ—পরলোক, জন্মান্তর, দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বর আত্মা, কর্মফল এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। সকল দেশেই মৃতের অর্চনা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকারের উপর নির্ভরশীল। আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত না হইলে মৃত পিতৃপুরুষাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। মৃত্যুর পর মৃত পিতৃপুরুষাদির কোনও অস্তিত্ব না থাকিলে কাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি অর্চনা করা হইবে? লৌকায়তিকগণের নিকট বেদাদিশাস্ত্র বা আপ্ত বাক্যও প্রমাণ নহে। সুতরাং তাহারা মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদিতে যে কোনও ফলের উদয় হয় তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলিয়া থাকেন—'মৃতানাম্ অপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তি কারণম্। নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েৎ শিখাম্॥ গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্। গেহস্থ কৃত শ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তি রবারিতা॥ স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ। প্রাসাদস্যোপরি স্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥ ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈ র্বিহিত স্তিহ। মৃতানাং প্রেত কার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।'—স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোক গামী আত্মা বলিয়া কিছু নাই। যে জন্তু মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহারও তৃপ্তি জন্মে তবে পর্যটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাণ প্রাপ্ত প্রদীপের ও শিখা তৈল দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইতে পারে। যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ দানে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূতলে অন্ন কেন না দাও? যতদিন জীবিত থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর, ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধু স্নেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া না আসে? সুতরাং মৃতদিগের প্রেতকার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র।

ভারতীয় দর্শনকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই যুক্তিবলে এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা না জানিয়াও আমরা বলিতে পারি—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যের মূল বিশ্বাস বা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা—'শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা যতো মূলম্'।

সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যজীবনের নিয়ামক। তর্ক বা বিচার বা প্রজ্ঞা ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া মানুষকে শাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে কৃতকার্য হয় না। কর্মপথে বাহির হইয়া মানুষ সহজে প্রজ্ঞার শাসন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিজ্ঞান বা দর্শনের সহিত ধর্মের যে একটা বিরোধ আছে তাহার মূল এইখানেই। বিজ্ঞান বা দর্শন যাহাই বলুক, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার

প্রকৃতির সহিত, সামঞ্জস্য করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং তদনুসারে কর্ম করিয়া থাকে। তাই চার্বাকের উক্তি মানুষকে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইতে কোনও যুক্তির দ্বারাই বিরত করিতে পারে না।

প্রথমে মানুষ বিশ্বাস করিতে শিখিল যে—যে মানুষ জন্মিয়াছে তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। কোথায়ও না কোথায়ও সে থাকিবেই। আমরা তাহাকে দেখিতে না পাইতে পারি। এই দেখিতে না পাওয়াদ্বারা তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। যে হইয়াছে সে থাকিবেই। অদৃশ্যভাবে বা দূরবর্ত্তী স্থানে হইলেও জাত মাত্রেরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বাসের পর মানুষের মনে স্বভাবতঃই আর একটি বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। সেই বিশ্বাস হইল মৃত লোকে বিশ্বাস। মৃতলোকে বিশ্বাস হইতেই পিতৃগণে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মৃত্যুভয়, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মৃতের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস এই তিনটি হইতেই পিতৃগণের ধারণা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য এই পিতৃ শব্দটি কেবল মৃত পিতৃ পুরুষগণকেই নহে—অদৃশ্য, দয়ালু, শক্তিমান, অবিনশ্বর, দিব্য সত্তা বিশেষকে বুঝাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়াছে।

মানব চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যও—ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি, দয়া—দাক্ষিণ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিতে হয়। কেবল যুক্তি তর্ক প্রভৃতি মনুষ্যের মস্তিষ্কসুলভ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনার দ্বারা মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকার্যে, বিশ্বাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাই মূল। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা। ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহার অনুশীলনও অপেক্ষিত।

মনের বাঘ

গৌরকিশোর ঘোষ

"দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ্ লাইং ইন্ হিজ্ বেড্। হি ওয়াজ্ ডাইং।" রঙ্গচারী বলেছিল, "তিনি যে মরবেন, একথা আমরা জানতাম। আমি জানতাম, আমার পাঁচ দাদারা জানতেন, আমার মা জানতেন, এমন কি ওল্ডম্যান নিজেও জানতেন। বাবা জানতেন, বাবার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে। তাঁকে যে তাঁর রক্ষিতার বিছানা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, আনতে পারা গিয়েছে, এ জন্যে আমার মাকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বাবা যে মরছেন, মার সেজন্য একটুও দুঃখ হচ্ছিল না। মা বরং খুশি। মা যেন দশ বছর ধরে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করার পর এই শেষ বছরে উইম্বলডন টেনিসের টুর্ণামেণ্টের সিঙ্গল্‌সে বিজয়িনী হয়েছেন। তিনি তেমনি খুশি। ট্রফিটা তাঁর চরম প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত ছাড়া হয়েছে। এখন তার হাতে এসেছে। তার অধিকারে। ঐ যে আমাদের পারিবারিক খাটে তা শুয়ে আছে। এ ভি এন কে রঙ্গচারী। ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, ছয় পুত্রের জনক, অসুস্থ, কোপনস্বভাবা এক ঈর্ষাকাতর নারীর স্বামী, প্রাক্তন এক দেবদাসীর জার। এ ডাইং গ্যাস্‌পিং ওল্ড ম্যান। এ ট্রফি।"

রঙ্গচারী বলেছিল, "আমার বয়স তখন মাত্র পনের। আই অ্যাম দি ইয়ংগেষ্ট সন্ অব্ দি ফ্যামিলি। পনের বছর কেটে গিয়েছে তারপর। কিন্তু ঘটনাটা যেন কালকের, এমন তাজা—আমার চোখে, আমার মনে। কোন ডিটেল্‌সই আমি মিস্ করিনি। আমার চোখ যেন মুভি ক্যামেরা। আমি যেন একখানা ডকুমেণ্টারী তুলছি। আমি পুবের জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। দক্ষিণের জানলার বাইরে সমুদ্র। সমুদ্র গর্জন করছিল। ঢেউগুলো বাহু বাড়িয়ে বাবাকে লুফে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। অ্যাণ্ড হি ওয়াজ লাইং ষ্টিল অন এ লার্জ বেড্। হোয়ার হি অক্‌ন্ রেপ্‌ড্ এ রিকেটি ক্যাট—মাই মাদার, এগেনষ্ট হার্ উইল্—নেভার হি ওয়াজ্ স্যাটিস্‌ফায়েড্ উইথ হার, নেভার হি ষ্টপড্ মেটিং হার—দেয়ার ওয়াজ্ নো লাভ—দি সিমেণ্ট দ্যাট ষ্টিক্‌স্ টু বডিজ্ অ্যাণ্ড টু সেলফ্ টুগেদার বিটুইন দেম্, দেয়ার ওয়াজ্ ওন্‌লি এ বণ্ডেজ্ অব্ এ লিগাল ফাংগসন অ্যাণ্ড অব্ এ সোস্যাল লাইসেন্স। যে বিছানা বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম ছটি পুত্রের জন্ম দিয়েছে, পরিমাপহীন ঘৃণার জন্ম দিয়েছে, যে ঘৃণা কোন ওজনেই —নাইদার ইন্ এ এপর্ডভয়েজ নর্ ইন এ মেট্রিক সিষ্টেম্, ডু ইউ ফলো—মাপা যায় না, সেই শয্যার অনাবশ্যক বিপুল বিস্তারে আজ শান্তি। আমার কাঁধের উপর দিয়ে, চুলের উপর দিয়ে, সূর্য থেকে বীম্‌স্ অব্ ইয়ং রেজ এসে বাবার মেদগ্রস্ত মুখে মাথায় গায়ে, কাঞ্চীপুরমে প্রস্তুত জরিদার অশ্লীল রেশমের আচ্ছাদনে একপাল গোঁয়ার ভেড়ার মত অব্যাহত গতিতে লাফিয়ে পড়ছিল। বাবার মুখখানাকে বিলাসী লম্পট গালের রোমক নৃপতির মেক্‌আপ বলে মনে হচ্ছিল! হি ওয়াজ্ ডাইং, হি ওয়াজ্ গ্যাস্‌পিং, হি ওয়াজ্ ওয়েটিং ভেরি পেসেণ্টলি। তাঁর এই শান্ত প্রতীক্ষা তাঁকে অসাধারণ এক মর্যাদার প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

"চারিত্র্যে তিনি অস্থির-তরঙ্গ। বরাবর তিনি চিতার মত ছটফটে। রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, আহারে, মৈথুনে তিনি কখনোই ধৈর্য রাখতে পারেন নি। তিনি লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন, অভ্যাগত আসতে দেরি করেছে, তিনি বিরক্ত হয়ে খেতে বসে গিয়েছেন। এই অস্থিরতা তাকে সাফল্য দিয়েছিল। তাঁর অনেক উচ্চাভিলাষ ব্যর্থও করে দিয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন নি, পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতিকে তিনি অপমান করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সমগ্র রাজনীতি তিনি মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন। এ রাজ্যের তিন চতুর্থাংশ শিল্পের উপর তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধূর্ত ব্রাহ্মণ। কট্টর আচারনিষ্ঠ। (তাঁর রক্ষিতাটি ছিল শূদ্রাণী) এখন, তিনি প্রশান্ত, অতিশয় শান্ত, নিস্তরঙ্গ চৌবাচ্চার জল।

"হি ওয়াজ ওয়েটিং—মুদিত নেত্রে, সমাহিত, প্রতীক্ষারত সেই ঘরে এখন অপরিসীম ব্যস্ততা। আমার মা, দাদারা, ডাক্তার, এটর্নী, কুল পুরোহিত—সবাই ব্যস্ত। আমার মা, বিজয়িনীর দর্পে, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাবাকে তার রক্ষিতার হাত থেকে ছিনিয়ে আপন কুক্ষিতে এনে ফেলেছেন। শূদ্রাণীর স্পর্শদোষ ঘুচাতে হবে, পুরোহিতের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ চলছে। বাবা তার উইলে তাঁর রক্ষিতাকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে গিয়েছেন—সে উইল বদলানো হয়েছে দাদাদের আর মার পরামর্শে—এখন তাতে বাবার "সজ্ঞান স্বাক্ষর" নিতে হবে, দাদারা এটর্নীর সঙ্গে, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত। প্রত্যেকেই ভাবিত, ব্যস্ত, ষড়যন্ত্ররত। একমাত্র তিনিই শুধু নিশ্চিন্ত। এসবে তাঁরই একমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তারই কিছু যায় আসে না। হি ওয়াজ্ ভেরি কাম্, ভেরি ভেরি পেসেণ্ট অ্যাণ্ড্ উইথ পয়েজ অ্যাণ্ড প্রোফাউণ্ড ডিগ্‌নিটি হি ওয়াজ লাইং, ডাইং অ্যাণ্ড্ ওয়েটিং অ্যাণ্ড্ পারহাপ্‌স্ এক্‌স্‌পেক্‌টিং......

"ফর হুম্ হি ওয়াজ্ ওয়েটিং? হুম্ হি ওয়াজ্ এক্‌স্‌পেক্‌টিং? কার জন্য, কিসের জন্য তাঁর এই প্রশান্ত প্রতীক্ষা? শেষ স্বাক্ষরের? শমনের? তার রক্ষিতার? আমার এই কৌতূহল কোনদিনই চরিতার্থ হবে না। হি লেফ্‌ট নো হিণ্ট্। আমি এ খবরটা জানতাম যে, বাবার রক্ষিতাকে বাবারই তৈরি এই বাড়ির পবিত্র চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হবে না। সে সদর ফটকে তখন মাথা ঠুকছিল। দারোয়ানের পা ধরে একেবার শেষ দেখার জন্য অনুনয় করছিল। দারোয়ান তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। আমার মার নির্দেশ। আমার দাদারা দুদিন থেকে এত ব্যস্ত ছিল, এই রকম একটা ঘটনার সম্ভাবনার কথা তাদের মনেই হয়নি। মার মনে ছিল। প্রখর দৃষ্টি ছিল মায়ের। উইলের কথাও মা-ই মনে করে দিয়েছিলেন। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এটর্নীকে ডাকিয়ে, কেঁদে, ভয় দেখিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকমেল করে, উইলের খবর ফাঁস করে ফেলেছিলেন এবং মার জেদেই উইল বদলাবার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। মা চাণক্যের মতই প্রতিহিংসাপরায়ণ। এবং মাকে দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, কৌটিল্য চাণক্য, আমার মাতৃকুলেরই কোনও পূর্বপুরুষ।

"আমার বড়দাদাকে বাবা একবার ত্যজ্য পুত্র করতে গিয়েছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে এই ব্রাহ্মণকুলতিলক সেই শূদ্রাণীর পা ধরে কেঁদেছিল, মা বলে ডেকেছিল এবং সন্তানের কাঙ্গাল সেই রমণীর পুত্র হবে বলে পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল। বাবা তাঁর রক্ষিতার অনুরোধ রেখেছিলেন। এবং দাদা, যতদিন বাবা খাড়া ছিলেন, মার আপত্তি সত্ত্বেও "নতুন মা"র পিছনে খুব ঘোরাঘুরি করেছে। এখন সে মার ক্ষমতার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। এই দারোয়ান একবার টাকা চুরি করেছিল। মা একে

তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাবার এই রক্ষিতার পায়ে ধরে সে চাকরি ফিরে পেয়েছিল। মা সেই দারোয়ানকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। অ্যাণ্ড ভেরি কেথ্‌ফুলি হি ডিস্‌চার্জড্‌ হিজ ডিউটিস্‌।

"অ্যাণ্ড্‌ ডু ইউ নো, হোয়াট্‌ আই ডিড্‌? দি ফ্যালিয়েন্ট থিং ইন্‌ মাই লাইফ্‌। আমি রাস্তা থেকে তার রক্তাক্ত দেহটি কুড়িয়ে নিই। তার কপালের গভীর ক্ষত থেকে একটা মোটা ঘন রক্তের ধারা গাল বেয়ে, থুতনি বেয়ে বুকের কাপড়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছিল। ঠিক যেন একটা অসমাপ্ত ইরিগেসান ক্যানাল! খিড়কির দরজা দিয়ে, অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুমের ভিতর দিয়ে তাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিই। হোয়াট্‌ এ ম্যন্‌, স্যান্‌, হোয়াট্‌ এ ক্লাইম্যাক্স্‌ অব্‌ দি হোল কেশ। মা, দাদারা, অ্যাটর্নী, ডাক্তার কুলোপুরোহিত—সবাই, সবাই যেন ভূত দেখল। মার বুক চিরে বিস্ময়, দাদাদের মুখে ফুটে বিমূঢ়তা, আর অন্যেরা যেন ক্লাউন। কোনও পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখে আমি এমন ভিভিড্‌ অভিব্যক্তি দেখিনি। ততক্ষণে সেই আহত রক্তাক্ত নারী বাবার বুকে গিয়ে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার রক্ত বাবার ফোলা ফোলা মুখের লালসাগ্রস্ত রোমক নৃপতির মেক আপে সুন্দর এক পবিত্রতা মাখিয়ে ছিল। অ্যাণ্ড হি ডায়েড উইথ এ ডিফ্‌ সাই। তার বুকের উপর থেকে এই প্রথম শোকের ক্রন্দন আমাদের বাড়ির বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ঘর ভরে যাবার আগেই সেই শোকের উৎসকে মার নির্দেশে দাদারা সবলে বাবার বুক থেকে উৎপাটিত করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এল—অ্যাজ দি বুচার্স রিমুভ দি লাংগস আউট অফ এ ডেড গোট অ্যাণ্ড থ্রো ইট।"

"আমি যে মেয়েলোকের সংসর্গ সহ্য করতে পারিনে," রঙ্গচারী বলেছিল, তার কারণ আমার মাদার কম্‌প্লেক্স্‌। অ্যাণ্ড আই থিংক্‌, মাই ফাদার'স্‌ টু উইমেন্‌—লিগ্যালি অ্যাণ্ড ইল্‌লিগ্যালি প্রোকিওরড, হ্যাড্‌ অ্যান ইকুয়াল হ্যাণ্ড অন্‌ ইট্‌। ফর দি ফরমার উওম্যান্‌ হুজ উমভ পার্সেল্‌ড্‌ মি টু দিস্‌ ওয়ার্ল্ড্‌, আই হ্যাড্‌ এ গ্রেট কন্‌টেম্‌পট্‌ ফর দি ল্যাটার, আই হ্যাড্‌ কম্‌প্যাশান্‌। বোথ্‌ আর ইন্‌জুরিয়াস্‌ টু লাভ্‌। কন্‌টেমপট্‌ অ্যাণ্ড কম্‌প্যাশান্‌—দিজ আর টু ব্র্যাণ্ডস্‌ অফ্‌ মোস্ট এফেক্‌টিভ ইন্‌সেকটিসাইডস্‌, বোথ্‌ কিল্‌ দি জারম্‌স্‌ অফ্‌ লাভ্‌।

"মেয়েদের দেখলে হয় আমার ঘৃণা হয়, নয় মনে করুণা জাগে। মনের এই দুটো বৃত্তিই প্রেম বা প্যাশন এর পক্ষে মারাত্মক। আমার জগৎ দুই মেরুতে বিভক্ত—ঘৃণা আর করুণা। আমার জীবনে দুইটি মাত্র ঋতু—ঘৃণা আর করুণা। আমার চোখে দুটো মাত্র রং—কাল আর ধূসর—ঘৃণা আর করুণা।

"মাতৃস্নেহ কাকে বলে, আমি জানিনা, মাতৃভক্তি কি, তাও না। বোথ্‌ অব্‌ আস্‌, মাই মাদার অ্যাণ্ড মাইসেল্‌ফ্‌—আর গিল্‌টি অব্‌ পারজুরি। (মনুষ্য ধর্মের নামে হলপ করিতেছি, অদ্য হইতে আমার গর্ভজ শিশুটিকে স্তন্যদানে লালন করিব, পরম স্নেহে পালন করিব, ভালবাসিব। মনুষ্যধর্মের নামে হলপ করিতেছি, আমার গর্ভধারিণীকে ভক্তি করিব স্বর্গাদপি গরিয়সী জ্ঞান করিব, ভালবাসিব।) আমরা দুজনেই মিথ্যে হলপ নিয়েছিলাম। মা আমাকে স্তন্যদানে পালন করেন নি, বেবীফুড্‌ আর ফিডিং বট্‌লের নিপল্‌ চুষে আমি মানুষ। মা আমাকে কখনোই স্নেহ করেন নি, ভালবাসেন নি। তাঁর হৃদয়ে ছিল ঘৃণা—বাবার প্রতি, দাদাদের প্রতি, আমার

প্রতি। আমি কখনোই আমার মাকে ভক্তি করিনি, ভালবাসিনি। দুজনেই হলপ ভেঙেছি। বাবার মৃত্যুর পর মার প্রবল কর্তৃত্বের পায়ে আমার পাঁচ দাদারা আত্মবিক্রয় করেছিল। বাবার রক্ষিতাকে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করার যে চক্রান্ত মার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে আমি একা সংগ্রাম করেছিলাম। মাই মাদার কিক্‌ড্ মি আউট অব মাই ইন্‌হেরিটেন্‌স্ উইদাউট এনি রিগ্রেট।

"আমার বাবার রক্ষিতা আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তার আশ্রয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দুজনের মধ্যে অপার করুণার এক নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠে। নানা মিস্‌অ্যাণ্ডভেঞ্চারে তার শেষ সম্বল আমি উড়িয়ে দিয়ে তাকে ভিখারি করে ছেড়ে দিয়েছে। ইন্ রিটার্ণ, হোয়াট শী ডিড্? প্রশ্রয় দিয়ে, করুণা দিয়ে আমাকে একটি গজভুক্ত কপিত্থ করে দিয়েছে। আই ওয়াজ্ হার ক্যাপ্‌টিভ ফর্ টেন ইয়ারস্। রঙ্গচারী, রঙ্গচারী ইউ আর মাই সন্, মাই সন্ মাই সন। এক বন্ধ্যা মরুভূমি কলিং এ স্যাপ্‌লিং হার সন্। (রঙ্গচারী, রঙ্গচারী, নী এন মহন মহন মহন।' রঙ্গচারী তার মাতৃভাষায় আবৃত্তি করল। 'মহন মহন, মহন…') মাই সন্, মাই সন্, মাই সন্। জাস্ট থিংক্ অব্ ইট্, ম্যান। অ্যাণ্ড্ আই প্লেড্ হার সন্ ফর্ টেন্ ইয়ারস্। দেন শী ডায়েড্ অ্যাণ্ড্ আই গট্ মাই ফ্রীডম্, গট্ ব্যাক মাই ওন্ সেল্‌ফ্ নাও—" রঙ্গচারী তার গেলাসে চুমুক দিল। তার ভারি গলায় বেজে উঠল "আই কেয়ার ফর নো বডি অ্যাণ্ড নো বডি কেয়ারস্ ফর মি। আমার হৃদয়ে আছে মাত্র করুণা আর ঘৃণা। আই ডোণ্ট্ লাভ্ উইমেন, আই কাণ্ট্।"

কিন্তু এই রঙ্গচারীই আমাকে দু মাস পরে চিঠি লিখেছিল:

জাস্ট ইম্যাজিন হোয়ার আই অ্যাম? কোথায় থাকতে পারি, ধরমকোট ছাড়া। অকস্মাৎ আমি আবিষ্কার করেছি পৃথিবীতে এই একটিমাত্র স্থান আছে, যেখানে আমি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারি, পৃথিবীতে একটি মাত্র মেয়ে আছে, যাকে আমি সহজে গ্রহণ করতে পারি। সুশীলা—এই একটি মাত্র নাম, আমার কাছে যা সাত রাজার ধন। তুমি কি হাসছ? আমি কি খুব ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছি? দুত্তোর ছাই, লুকিয়ে লাভ নেই, আর পায়তাড়া কষাই বা কেন? আমি ওকে ভালবেসেছি। সম্ভবত আমি মরেছি। আমার মনে, কবে তার সূত্রপাত জানিনে, এক নতুন অনুভূতির জন্ম হয়েছে, অ্যাজ্ ইফ্ এ নিউ টুথ্ ক্রপ্‌ড্ আপ্—সেই নতুন দাঁতের শুলুনিতে অস্থির হয়ে উঠেছি। ছুটে এখানে চলে এসেছি—কারণ আমার চলার গন্তব্য এইখানেই। অল্ রোড্‌স্ অব্ মাই ওয়ার্ল্‌ড্ টার্মিনেট্ হিয়ার। সুশীলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাকে বলেছি স্ট্রেট্ আমি তাকে ভালবাসি। সে আমাকে বলেছে, স্ট্রেট্ সে অন্য একজনকে ভালবাসে। আপাতত, প্রথম রাউণ্ডের এই খেলায় স্ট্রেট আমি হেরেছি এবং লাভ্ গেমে। বাট্ লাভ্ ইজ্ নট্ এ নক আউট্ টুর্ণামেণ্ট্। সো আই অ্যাম্ নট্ ডিফিটেড্। আই অ্যাম্ নট্ ফ্রাস্টেটেড্। কারণ এ পরাজয়েও আনন্দ আছে। আই অ্যাম হ্যাপি, মানে, ভেরি হ্যাপি। … … …

রঙ্গচারীর আরেকখানা চিঠি (এক সপ্তাহ পরে):

আশা করি আমার ঠিকানা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ। কি অবাক হচ্ছ তো? এত তাড়াতাড়ি

সুশীলার 'কেয়ার অব্' এ কি করে এলাম, সে কথা ভাবছ? এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। প্রকৃতপক্ষে মূল পরিবর্তনও কিছু হয় নি। সুশীলার কেয়ার অব্-এ আমার পোষ্টাল এড্রেসটাই আশ্রয় নিয়েছে। আর আমি? আই অ্যাম মেণ্টেনিং দি সেম্ ডিস্ট্যান্স। আমি আর সুশীলা অলিম্পিকের সুদীর্ঘ ম্যারাথন্ রেসে যেন নাম দিয়েছি। শী ইস্ রানিং জাষ্ট বিফোর মি। আমার প্রসারিত বাহুর নাগালের দু ইঞ্চি তফাতে মাত্র। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই সামান্যতম ব্যবধান আমি ঘুচাতে পারছিনে। শী ইস্ মেণ্টেনিং দি ডিস্ট্যান্স উইদাউট্ এনি ষ্ট্রেন্। উইথ্ হোয়াট ঈজ্ শীক্যান মেণ্টেন্ হার পেস্।

আমি আমার পোষ্টাল এড্রেস্‌কে এখন মাঝে মাঝে ঈর্ষা করতে শুরু করেছি। ওটা কত সহজে এগিয়ে যেতে পারে! এখানে ফিরে এসে সরকারী আতিথ্য বেসরকারীভাবে প্রথম দিন ক'ওক পেয়েছিলাম। অল্ অফ্ দেম্ রেড্ মাই ষ্টোরি—ছ্যাট্ আন্‌মিটিগেটেড্ স্ক্যাণ্ডাল্। আমার চীফের মতই এরা সেটা রেলিশ্ করেছে—অ্যাজ দি বার্মিজ্ রেলিশ্ ঙাপ্পি। ওরা তাই আমার উপর খুব খুশি। বাই দি বাই, আমার চীফও ফর দি ফাষ্ট টাইম্ আমার উপর খুশি হয়ে উঠেছেন। "রঙ্গচারী আই অল্‌ওয়েজ নিউ ইউ কুড্ ডু ওয়েল্, ইফ্ ইউ ওয়ান্ট্ টু।" তখন আমার কি মনে হয়েছিল জান? আই মোষ্ট সিনসিয়ারলি ফেল্ট ফর্ হিজ পুডল্। ও ছ্যাট পুওর্ শোল্, আই ডিপ্রাইভড্ অব হার ডিউ।

অ্যাণ্ড ছ্যাট আই ডিড্ অ্যাট দি কস্ট্ অব্ সুশীলা। জান, এই প্রথম আই গেভ্ মাই হার্ট অ্যাণ্ড মাই শোল্ টু মাই কম্‌পোজিশান্। আমার রচনার সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি সুশীলার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কলমের কালিতে, (প্রথমে আমি টাইপ রাইটারেই বসেছিলাম, কিন্তু 'আওয়ার ষ্টাফ রিপোর্টার'···আওয়ার স্পেশ্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ লেটুলি ইন্··· ···এর বেশি আর কিছুতেই এগুতে পারছিলাম না। দু-দুটো প্যাড লষ্ট করলাম একটিন সিগারেট, একটা দেশলাই··· ···দেন আই গট্ দি ষ্টার্ট, দি মোমেণ্ট আই পিক্‌ড্ আপ্ মাই পেন) সুশীলার গায়ে কলঙ্ক ছুঁড়তে আমার এমন প্রেরণা এসে গেল যে আমার রচনার মধ্যে আমি ডুবে গেলাম। সুশীলার সত্তার মধ্যেই আমি ডুব দিয়েছিলাম। আর সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, আমার সত্তার কত গভীরে সুশীলার অস্তিত্ব প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। একটা প্রবল উল্লাস, এ নিউ থ্রিং, এ নভেল সেন্‌সেশন্ অ্যান্ আননোন্ প্যাংগস্ অফ্ জয় আমার নার্ভাস্ ষ্টিম্যুলিকে নাড়া দিতে লাগল। মাই সেণ্টেন্সেস্ বিগ্যান্ টু উজ্ স্পণ্টেনিয়াস্‌লি লাইক্ ব্লাড ফ্রম্ এ গেপিং উণ্ড, অ্যাপট্ ইডিয়মস্, চয়েসেস্টস্ ফ্রেজেস্ পোর্‌ড ইন্ লাইক্ এ ভেটারান চাইনীজ কুক্ আই কুক্‌ড্ আপ্ দি মোস্ট্ ডিলিসাস্ স্টোরী—দি ফডার্ ফর্ এ মোস্ট সেন্‌সেশন্যাল্ হেড্ লাইন। এ ভিভিড্ স্পাইসি অর্ সসি,—হোয়াটেভার অ্যাডজেক্‌টিভ ইউ ক্যান্ অ্যাট্রিবিউট, আই ডোণ্ট্ মাইণ্ড—ষ্টোরি, হুইচ্ মাষ্ট হ্যাভ্ বিন্ ষ্টিম্যুলেটেড্ দি ইরিটেশন্‌স্ অব্ মাই চীফ্‌স্ ভাইটাল্ অর্গ্যান্। তার বিনিময়ে দুমাসের ছুটি নিয়ে—ফর্ এ চেঞ্জ টু রিকুপ মাই হেলথ্—সুশীলার কাছে এসেছি। আই লাভ্ হার্, আই লাভড্ হার্ ফ্রম দি বিগিনিং—ফ্রম্ দি ভেরি বিগিনিং অব্ মাই লাইফ্, ফ্রম্ দি ভেরি ভেরি বিগিনিং—অব্ দি ক্রিয়েশান্

অ্যাণ্ড গড্ ক্রিয়েটেড্ এ উওম্যান্ টু লাভ, টু বি লাভড—আই শ্যাল লাভ্ হার্ ফরেভার, টু দি লাষ্ট্ অফ্ মাই এক্‌জিস্‌টেন্স, ডু ইউ ফলো।

তাই আমি এখানে এসেছি। এখনও পর্যন্ত বাহির দুয়ারেই বসে আছি। না, বসে নেই ছুটছি, প্রাণপণে ছুটছি, সুশীলা ছুটছে আমার আগে আগে সামান্য আগে, আমার নাগালের দু ইঞ্চি মাত্র ব্যবধানে, কিন্তু হায়, এই সামান্য ফাঁকটুকুর মধ্যে বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর।

মর্ত্য ও অমৃতলোকের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান। রঙ্গচারী লিখেছিল, দু ইঞ্চি মাত্র। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক আজ পর্যন্ত এমন কোন মন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যা মর্ত্যলোকের সীমানা অতিক্রম করে, অমৃতলোকের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারে। যদি তা পারত তবে আই উড হ্যাভ্ বিন দি ফার্ষ্ট ভলেন্টিয়র টু পাইলট দ্যাট স্পেশ শিপ, তবে আমার কাজ সহজ হত, দৌড়বাজীর এই ইটারন্যাল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটত, আমি সুশীলার নাগাল পেতাম। আমার সব থেকে বড় হ্যাণ্ডিক্যাপ কি জান, আই অ্যাম এ মর্টাল বিয়িং। আর সুশীলা অমৃতলোকবাসিনী। হাউ ক্যান আই রিচ হার, ম্যান?

ভেবোনা আমি ফিলসফি কপচাচ্ছি। এই অরণ্যে বুঁদ হয়ে ফিলসফির চর্চা যে করে করুক। অ্যাট্ লিস্ট ইউ নো, আই অ্যাম নট্ দ্যাট্ সর্ট্। মংবিব বাড়ির গোয়ালের মাচায় আমি বাস করছি। এখানকার মশা মাছির উৎপাতে সতত অতিষ্ঠ। নাউ আই অ্যাম এ প্রবলেম্ চাইল্ড টু এভরিবডি। অফিসারেরা এখন সদা সশঙ্ক। দে আর এফ্রেড অব সী। আমার মতলব তারা টের পাচ্ছে না, এই অরণ্যে একটা আদিবাসীর বাড়িতে আমি রট্ করছি কেন, তার কারণ তারা বের করতে পারছে না। ইট্ সীম্‌স্ এণ্টায়ার অ্যাডমিনেস্ট্রেশন নিড্‌স্ অ্যাসপিরিন টু বি গেট রিড অব ইটস হেডেক! সুশীলা আমার মতলব জানে। সেও তার উৎকণ্ঠা লুকিয়ে রাখতে পারছে না। একথা তোমাকে জানালাম। এই বোঝাতে যে ফিলসফির ভূত আমার ঘাড়ে চাপেনি।

যতই দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি সুশীলা ইজ নট এ রিয়েল একজিসটেন্স। সী ইজ্ রিয়েল টু হার লাভার, সী ইজ্ রিয়েল টু দোজ্ হু সাপ্লাইয়েড মি দি ফল্‌স্ মেটিরিয়ালস এগেনষ্ট হার, গেভ মি দি রং অ্যাণ্ড প্রেজুডিসড ব্যাকগ্রাউণ্ড। সী ইজ রিয়েল, ভেরি রীয়েল টু দেম। বাট টু মি সী ইজ ইথেরিয়াল, টু মি সী বিলংস্ টু দি আদার ওয়ার্লড—দি ফিল্‌মি ওয়ার্লড অব্ ইমর্টাল্‌স্। বিটুইন সী অ্যাণ্ড্ মি দেয়ার লাইজ্ অ্যান্ ইরিমুভেব্‌ল্ গ্যাপ্, এ ভাস্ট্ শীট্ অব্ স্পেস্ উইথ্ নো বাউণ্ডারি, দি ইটারন্যাল টাইম্। হাউ ক্যান্ আই রিচ্ হার, ম্যান্?

কিন্তু আমি হার মানব না। দৌড় থামাব না। সাফল্য অসম্ভব জেনেও দৌড় থামাচ্ছি না! কে আমাকে এই বিষয় দৈবলে প্রতিনিবৃত করবে? রঙ্গচারীর হিজিবিজি হস্তাক্ষরের মধ্যে, কি আশ্চর্য, আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঋজু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম:

তার চেয়ে নিঃসঙ্গ সাঁতারে
ব্যয় ক'রে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
অগাধে সঙ্কল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত, নিশ্চয়॥

(জেসন্)

"আই উইল্ নট্ রেষ্ট, ম্যান," রঙ্গচারী লিখেছিল, "আই উইল্ নট্ রেষ্ট্।"

রঙ্গচারীর প্রেম ছিল অশান্ত, ঝঞ্ঝা। ধাক্কায় ধাক্কায় আমাকে গুঁড়িয়ে ফেলেছিল প্রায়। রঙ্গচারীর ডেথ্ সার্টিফিকেট্খানা ওর আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করে সুশীলা জানিয়েছিল, কিন্তু ও জানত না পাহাড়কে ঢুঁ মেরে টলানো যায় না! রঙ্গচারী নিজেকে নিঃশেষ করে আমাকে অধিকার করেছে। বলরাম জানে রঙ্গচারীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আমরা দুজনে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি আমার ডাক্তারি-বিদ্যা দিয়ে, বলরাম তার সেবা দিয়ে। কিন্তু রঙ্গচারী নিজের বলতে কিছুই রাখেনি। মরার আগে রঙ্গচারী বলেছিল, "কিস্ মি, সুশীলা, আই ওয়াণ্ট এ রিয়েল কিস্, নট্ এ ফ্যাণ্টম্।" আমি তার ইচ্ছে পুরিয়েছি। সে খুসি হয়ে বলেছিল, "অ্যাট্ লাস্ট্ আই ক্রস্ দি বেরিয়ার সুশীলা, দি লাস্ট্ টু ইঞ্চেস্ অব্ মাই লাইফ অ্যাণ্ড আই রিচ্ ইউ!" এই তার শেষ কথা। 'দুইঞ্চির' হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারিনি। আমি রঙ্গচারী আর বলরাম, এই তিনজনে মিলে আমরা দুজন হয়েছি!

সুশীলা তার সার্টিফিকেটে লিখেছিল: ক ভি কে রঙ্গচারী, হিন্দু মেল অব্ থার্টিওয়ান্ ডায়েড্ অব্ এস্টেরিক ফীভার।

আমি পুড়ছি। রঙ্গচারী লিখেছিল: আমি এখন পুড়ছি, সত্য বটে আমার ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, বাট্ ম্যান্, আমার আত্মাও পুড়ছে। আগুনের ধর্মই এই, সে পোড়ায়! ইট্ বার্নস্। অ্যাণ্ড্ ফায়ার ইজ্ নট্ এ মিউনিসিপ্যাল স্ক্যাভেঞ্জার। সে শুধু আবর্জনাই পোড়ায় না। ফায়ার বার্নস্ এভ্রিথিং। বাট্ লাভ্ বার্নস্ ওন্লি দি লাভার। তাই আমার প্রেম আমাকেই শুধু পোড়াচ্ছে। (আমি বন্ধুর প্রেমাগুণে পোড়া, সই আমি মইলে পোড়াস্ না লো তোরা)

হামজা বলেছিল, প্রেম কখনও পোড়ায় না। প্রেমের শিখা আছে তাপ নেই। প্রেম উজ্জ্বল করে। প্রেম দহন করে না। ঈর্ষাই পোড়ায়। আর প্রেম আর ঈর্ষা একই মুদ্রার দুটো পিঠ।

রথীন সরখেল কোন কিছুই বলত না। তবে অনেকদিন পরে আমার মনে হয়েছিল, সব কিছুই ও লক্ষ্য করত। আমার এমনও মনে হয়েছে এ যেন এক অন্য রথীন। গুরুদশার কালে রথীনের একমুখ দাড়ি গোঁফ রুক্ষ কেশভারে তাকে এক পৃথক ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ তার মুণ্ডিত মস্তক, তার কামানো গাল যেন কুমোরটুলির অসমাপ্ত মাটির মুণ্ড। তার দাড়ি গোঁফ চুলের সঙ্গে সঙ্গে তার পুরনো পরিচিত সত্তাটিরও যেন বিসর্জন হয়েছে। তার বদলে যে সত্তাটি রোপিত হয়েছে তা যেন দুপাটি নতুন বাঁধানো দাঁত। এখনও রপ্ত হয় নি।

আজকাল রথীন কি যেন ভাবে! ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার বউয়ের (তার নাম কি? তার নাম কি? কিছুতেই আমার মনে পড়ে না। ঘষা কাঁচের আবরণের অন্তরাল থেকে সে কিছুতেই আর স্বচ্ছতায় আসে না) প্রতি হঠাৎ সে মনোযোগ দিতে সুরু করেছে।

রথীন এখন আর আমাকে তার নাইট ডিউটির সময় তার বাড়িতে যেতে বলে না। কারণ সে জানে আমি যাবই। নিজের গরজেই যাব। সত্যি বলতে কি, এখন আমি রথীন বেরিয়ে যাবার আগেই সেখানে যাই। রথীনের সামনে আমি অনেক সহজ। আমি ওকে ওর বউয়ের চাইতেও

ভালবাসি। তখন আমাদের মধ্যে আড্ডা জমে ওঠে। হাসি, ঠাট্টা, গল্প। হো হো হাসিতে কোয়ার্টার ফেটে পড়ে। এক উদ্দীপনা আমাদের তিনজনকে দীপ্ত করে তোলে আমরা তিনজন তিনটি তারার উজ্জ্বল মোজাইকে গড়া একখণ্ড আকাশ হয়ে উঠি। আমাদর তিনটি সত্তার তিনটি জটিল কুটিল বক্ররেখা এখন অস্তিত্বের একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। আমি রথীনের খুব কাছে সরে যাই, রথীন তার বউয়ের খুব কাছে সরে যায়. রথীনের বউ (তার নাম কি? তার নাম কি? স্মৃতি তুমি জাহান্নামে যাও।) আমার ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় হয়ে আসে তিনটি পৃথক সত্তা তিনটি বিন্দু একই বিন্দুতে মিলিত হয়। একই বিন্দুতে পরিণত হয়।

এই আশ্চর্য পরিণতির ঘটক রথীন নিজেই। সেই আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে ওঠায়। ওর মাতৃ বিয়োগের পরের রাতে দুটি আটম একটি মলিকিউলে পরিণত হয়। রথীন তখনও নিজস্ব কক্ষপথে প্রবল বেগে ঘুরছে। আমার মনে আছে পাপবোধের প্রবল তাড়নায় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। আমায় মনে আছে, আত্মহননের অনিবার্য গন্তব্য থেকে আমার জীবনের ষ্টিয়ারিং-এর মোড় ঘুরাতে নিজেকে একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিলাম। আমার মনে আছে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সেপাইর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ইণ্ডিয়ান অফিসের দরজা খুলেছিলাম। তখন সকাল সাড়ে নটার বেশী হবে না, অতও হবে না। একটু আগেই আসাম মেল—আমার সম্ভাব্য আততায়ী বেরিয়ে গিয়েছিল। আমাব মনে আছে, ইউনিয়ন অফিসের চিরন্তন অন্ধকারে (ইউনিয়ন অফিস সর্বত্রই এমন অন্ধকার ঘরে করা হয় কেন, কে জানে?) প্রাচীর পত্র প্রচার পুস্তিকা আর পতাকা আর চিমসে গন্ধযুক্ত ফেষ্টুনের গাদায় নিজের দেহটিকে অবিক্রীত পার্টি লিটারেচারের মত ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, আর তৎক্ষণাৎ চৈতন্যের যেন স্যুইচ অফ করে দিয়ে গভীর ঘুমের অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মনে আছে রথীন পাকা ডুবুরির মত সেই ইউনিয়ন ঘরের অন্ধকারে ডুব দিয়ে দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছিল। আমার দেহ আর মনের যে সব জোড খুলে খুলে পড়েছিল, সেগুলো তাকে স্যালভেজ করতে হয়েছিল তারপর পাকা মিস্ত্রীর মত সেই সব অংশ জোড়া দিয়ে দিয়ে আবার আমাকে খাড়া করে তুলেছিল।

"এই, এই, কি রে?" প্রাণপণে আমার শরীরটাকে ঝাঁকানি দিচ্ছিল রথীন। "নেশা করেছিস্ নাকি? ওঠ ওঠ্। এ কি ঘুম রে বাবা।"

চোখ মেলে আমি রথীনকে দেখতে পাইনি। অন্ধকার ঘরে যে শুয়ে আছে বুঝতে পারিনি, অন্ধকার! এই ঘরের প্রবেশ প্রস্থান কোথায়, বুঝতে পারিনি। অন্ধকার। আমার দেহের খুব কাছেই অন্ধকারের একটা জমাট পিণ্ডের উপস্থিতি। সেই রথীন। তাঁর হাত দুটোর স্পর্শ অশরীরী। আমার গায়ে লাগছে। আমাকে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আমি কত হাল্কা। মাধ্যাকর্ষণ আমার উপর ক্রিয়া করছে না। আমি কত হাল্কা।

(বুলা গদীটার ওপাশে, এ পাশে আমি। ওর কাছে উঠে যাব? সরে যাব? বলব, বুলা তোমার ঐ কুৎসিৎ অভিব্যক্তি সম্বরণ কর। "অসভ্য বাঁদর, ফের যদি বাঁদরামি করার চেষ্টা কর, চেন টানব।" তোমার ভয় নেই বুলা, চেন তোমায় টানতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

এখান থেকে ওঠবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার দেহটা কত ভারি?—কত যে ভারি, বুলা, তুমি বুঝতেও পারবে না। হিমালয়ের সমস্ত ওজন আমার উপর চাপান। আমি এখান থেকে উঠি, এমন সাধ্য নেই। ট্রেণখানা আমাকে আর বুলাকে নিয়ে প্রাণপণ গতিতে ছুটছিল। অন্ধকারের জরায়ু বিদীর্ণ করে, উজ্জ্বল আলোক মণ্ডলে সে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছিল। বুলা বাথরুমে চলে গেল। অনেকক্ষণ সেখানে কাটাল। সম্ভবত কাঁদছে। সম্ভবত বাথরুমের আয়নার কাছে তার মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, আমার অতর্কিত চুম্বন তার মুখের ত্বককে চিরে ফেলেছে কি না। সম্ভবত কমোটে বসে হাল্কা হচ্ছে, নিজের বিপর্যস্ত স্নায়ুগুলোর জট ছাড়িয়ে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে। কেমন হাল্কা পায়ে বুলা বাথরুমে ঢুকে গেল। আমারও বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি অনড়। আমার নিশ্বাসে পক্ষাঘাত, তার উপর জগদ্দল পাথর চাপানো। অবশেষে ভোর হল, বেলা হল। গাড়ি ফেরিঘাটে গিয়ে ভিড়ল। অসংখ্য যাত্রী, অপরিচিত কুলির ভিড়ে দিশেহারা হয়ে বুলা ভাবতে লাগল, কি করবে, আমাকে এখান থেকে বিদায় দেবে, না আমাকে দিয়ে ঝামেলাটা উদ্ধার করিয়ে নেবে। কুলিরা এসে মাল টানাটানি করছে। একজন একটা টানে ত অন্যজন আরেকটা। এক সময় ত মাল নিয়ে দুটো কুলি দৌড়ই দিল। তখন আমি বাকি কুলিদের নিয়ে সে দুটোর পিছনে ছুটলাম। বুলা পিছনে পিছনে এল। আমি আর বাক্য ব্যয় না করে ওকে ওপারের ছোট গাড়িতে তুলে দিলাম। এবারে আর কুপ নয়, চার সীটওয়ালা কামরা। দরজায় কার্ড ঝুলছে, অধিকারীদের নাম—বুলার, আমার আর দুজন মিলিটারি অফিসারের। আমি স্টীমারেই বুলাকে বলেছিলাম, বুলার মুখের উপর আমার চোখ রেখে—রুক্ষ চুলের একগোছা হাল্কা জুলপি বুলার গাল আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে, আজ আর এ দৃশ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখলাম না, গঙ্গার বাতাসে বুলার আঁচল খসে খসে পড়ছে, বুলা তাঁর আঁচল নিয়ে বরাবরই বিব্রত, ব্লাউজের নিচে দুটো স্তনের রেখা ভুস্ করে ভেসে ওঠা শুশুকের মত জেগে জেগে উঠছে। কিন্তু আজ এ ঘটনায় কোন বিপর্যয় নেই। আমি মৃত, আমি শান্ত, কাল আমার মৃত্যু ঘটেছে, বুলার জগতে সজ্ঞানে আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। "মানুষ একবারেই মরে", হামজা বলছিল, "একথা মিথ্যে।" হামজা বলেছিল, আমরা প্রতি মুহূর্তে মরছি, প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছি। জন্ম আর মৃত্যু একটা কন্‌টিনিউয়াস্ প্রোসেস্। স্মৃতিই এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ইন্ এ সেন্স্, প্রত্যেক মানুষই জাতিস্মর।" আমি মৃত, তাই বুলার অস্তিত্ব এখন আর আমাকে একটু পীড়িত করছে না। আমার স্মৃতি জীবিত, তাই বুঝতে পারছি। এককালে আমি, আমার কক্ষপথ থেকে বুলার প্রবল আকর্ষণে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম। তাই এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার ফলে আমার মৃত্যু ঘটেছে —বুলার মুখের উপর আমার মৃত শান্ত—মৃত বলেই শান্ত—চোখ স্থাপন করে প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছিলাম "তোমাকে ট্রেণে বসিয়ে দিয়েই আমি ফিরে যাব, বুলা।" বুলা তার অবাধ্য আঁচল শাসন করতে করতে, অন্যদিকে চেয়ে প্রবল আবেগের কণ্ঠরোধ করে, শুধু বলল, "বেশ।"

আমি বুলার মালপত্র গোছগাছ করে দিয়ে অনায়াসে বললাম, "আমার ফিরে যাবার ভাড়া দাও বুলা।" বুলার মুখের দিকে চেয়ে দেখি আতঙ্কে, ভয়ে বুলার মুখ ব্লটিং কাগজের মত শুকিয়ে গিয়েছে। সে মুখে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ওর ভয়ের উৎসের সন্ধানে চোখ ফেরাতেই দেখি দুজন বিরাটদেহী পাঞ্জাবী অফিসার সেই কামরায় ঢুকে পড়েছেন। আমাদের দিকে চেয়ে নিজেদের মাল গুছিয়ে ফেলতে

লাগল তাঁরা। কী সাবলীল স্বাস্থ্য। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ভাস্কর্যের শক্তি ও সামর্থ্য যেন প্রাণ পেয়ে এখানে এসে গিয়েছে। আমি চকিতে মনে ঈর্ষার কামড় খেলাম। বুলা হতবাক। ওরা গোছ-গাছ শেষ করে নেমে গেলেন প্লাটফর্মে। বুলা মুহূর্তে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার হাত দুটো ধরে, ফাঁসীর আসামী যেন প্রাণভিক্ষা চাইছে, বুলা কাতরভাবে বলে উঠল, "না না না, আমি পারব না, আমি একা যেতে পারব না। তুমি চল, তুমি চল। আমাকে পৌছে দাও।")

"তুই যা, শিগ্‌গির আমার বাড়ি চলে যা," রথীন আমার সমস্ত শরীরটাকে নিপুণ দক্ষতায় জোড় লাগিয়ে বলল। "খালি বাড়িতে ও একা থাকতে পারবে না, বুঝলি, ভয়েই দাঁত কপাট লাগবে। বুঝলি। ওর বড় ভয়। তুই যা শিগগির।"

পাছে আবার ঘুমিয়ে পড়ি, আর ওর বউ খালি বাড়িতে ভয়ে মরে যায়, তাই রথীন কোন ঝুঁকি নিল না। আমাকে টেনে হিঁচড়ে ইউনিয়ন অফিস থেকে বের করে আনল, ওভারব্রিজের গোড়ায় এনে ঠেলে দিল গভীর অন্ধকারে, নিয়তির খপ্পরে, এক ভীত আতঙ্কিত নারীর আলিঙ্গনে।

আমরা তিনটি বিন্দু একই বিন্দুতে মিলিত হলাম। আমি প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। রথীন বুঝতে পারেনি, ওর বউ পেরেছিল। সম্ভবত সেও এক প্রলয়ংকর প্লাবন রোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় কাঁচা মাটির বাঁধ নির্মান করে তুলছিল। কিন্তু সে তরঙ্গ রোধিবে কে? দুটো দেহ প্রবল স্রোতের টানে উল্টে পাল্টে, দুমড়ে মুচড়ে প্রতি রাত্রে প্রবল নাকানি চুবানি খেতে লাগল। আমি অসহায়। সে অসহায়। আমি আত্মরক্ষায় ব্যর্থ, সেও ব্যর্থ। আমাদের দুজনের এই ব্যর্থতা দুজনকে সমবেদনায় এক সূত্রে গ্রথিত করে দিল। ক্রমাগত ফেল করা দুই ছাত্র হামদর্দির যে বাঁধনে বাঁধা পড়ে, আমরাও সেই বাঁধনে বাঁধা পড়লাম। প্রবল তাড়সে কাঁপতে কাঁপতে সে এক একদিন আমার বুকে মুখ গুঁজে ভুল বকত, "আমাদের বাঘে ধরেছে, জানো, আর নিস্তার নেই। বনের বাঘেই খায় না, জানো", সে বিড়বিড় করত, "মনের বাঘেও খায়।"

আমার চেষ্টায় রথীন কদিনের ছুটি পেল। এর জন্য ভি-টি-এস'এর কাছে আমাকে কদিন ধরে ক্রমাগত হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে। রথীন ছুটি পেয়ে খুশি হয় নি। তার ওভারটাইম কিছু মার গেল। মরে কাজ করবে কি ভাবে, তাই ভেবে সে অস্থির। সে এত আগে থেকে ছুটি নিতে চায় নি। প্রায়ই সে আমাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করত। বলত, "দ্যাখ, ছুটি নিলেই ত হল না, এতবড় একটা কাজ, খরচপত্র চাই তো।" আমি ওর কথায় বিরক্ত হতাম। "তুই কি জলপাইগুড়ির রাজার মত দান সাগর করবি নাকি? তোর যেমন হিম্মত তেমন করেই মার কাজ করিস। বুঝিস নে কেন, তোর এ সময় বাড়িতে থাকাই ভাল। তোর বউ আবার যে রকম ভয় তরাসে।" ওর বউ আমার উপর খুব চটে উঠত। "তোমার এত মাথাব্যাথা কিসের বল দেখি। বলে যার বিয়ে তার হুশ্ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।" রথীন বলত, "তুই তো রাতে থাকিস। তবে আর আমার বউএর ভয় কি?" যে কথাটা আমার বলবার ইচ্ছে ছিল না, যে-কথা বলতেও চাইনি, সেই কথাই ইউনিয়ন অফিসের নির্জনতায়, অন্ধকারে ওর কানে ঢেলে দিলাম: "তুই কি রে, আমি যদি রোজ রাত্রে তোর বাড়িতে শুই তো লোক বদনাম দেবে না।" রথীন লাফিয়ে উঠল, "কোন শালা কি বলেছে তোকে, বল তো।" আমি

বললাম, "কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু বলতে কতক্ষণ?" রথীন নিশ্চিন্ত হল। "তাই বল, আমার বাড়িতে যা খুসি হোক না, তাতে কোন—এর কি বলার আছে? কেউ একবার উঁকি মেরে খবর নেয়?" তারপর বললে, "তোর গা থেকে ভদ্দরলোকের গন্ধ এখনও কাটে নি। কলঙ্ক কেলেঙ্কারী, ও সব ভদ্দরলোকের এলাকায় থাকে। খেটে খাওয়া মজুরের খোয়া যাবার কিছুই নেই।"

"তুমি কি নিস্তার পেতে চাইছ?" রথীনের অনুপস্থিতির অবকাশে—রথীনের এখন ছুটি, সে রাত্রে বাড়িতেই থাকে, একই ঘরে দুই শয্যায় তারা স্বামী স্ত্রী শোয়, রথীনের অশৌচ—এক দিনের অন্ধকারে, প্রবল তাড়সে আচ্ছন্ন সেই নারী আমার দেহে চুঁ মারতে মারতে জিজ্ঞাসা করেছিল। "তুমি কি নিস্তার পেতে চাইছ? নিস্তার কি পাবে? বল না, পাবার কি কোন রাস্তা আছে? বল না, বল না।"

রথীন যে কথা বুঝতে পারেনি, ওর বউ সে কথা কেমন অনায়াসে বুঝে ফেলেছে!

হোয়ার ইজ্ মাই এস্কেপ্ ম্যান? রঙ্গচারী লিখেছিল। অজগর সাপের মত প্রবল নিঃশ্বাসে সে আমাকে টানছে। আঁকড়ে ধরে বাঁচি, এমন সম্বল আমার নেই। হোয়ার ইজ্ মাই এস্কেপ্?

মাকড়সার জালে ধরা মাছির মতন আমি তার আঁঠালো সত্তায় ধরা পড়েছি। পাখার দুরন্ত ধাক্কায় ধাক্কায় উদ্ধার পাবার বৃথা চেষ্টা করে করে ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। হোয়ার ইজ্ মাই এস্কেপ্ ম্যান?

সন্দেহ নেই, আমিও নিস্তার পাবার চেষ্টা করছিলাম। রথীন সেটা বোঝেনি, রথীনের বউ বুঝেছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে-ও আমার মত নিস্তার পাবার চেষ্টা করছিল। চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আমার মত, রঙ্গচারীর মত, লক্ষ কোটি মানুষের মত অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। নিয়তির প্রবল নিঃশ্বাস আমাদের দুজনকে একই দিকে টানছিল। আমরা ছটফট করছিলাম, কারণ দুজনেই একদিন আবিষ্কার করলাম, আবিষ্কার করে শিউরে উঠলাম, আমাদের আকর্ষণ আর মাত্র দেহের কেন্দ্রেই নিবদ্ধ নেই, এর স্থল গভীরে গভীরে, সত্তার অতলে নেমে গিয়েছে। "দেহের আকর্ষণ জলে ধুলেই চলে যায়", হামজা বলছিল। কিন্তু এ যে অন্তিম সর্বনাশ। এর হাত থেকে তো নিস্তার নেই।

রথীনের বউ জানত, রথীন তার অস্তিত্বে এত অভ্যস্ত যে তার প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে না। তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনে আবেগের উৎপাত প্রথম দুবছরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। রথীনের কাছে তার বউ, তার তক্তপোষ, বিছানার মতই এক সহজ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল। তার কোন ছাপ তার অন্তরে পড়েনি। চোখ বুঁজে যদি তাকে বউএর সুখ কল্পনা করতে বলা হত, তার চোখে ভেসে উঠত ইঞ্জিনের দাউ দাউ বয়লারের ফুকরটা। যে বিছানায় সে শোয়, যে তক্তপোষে বিছানা পাতা হয়, সেটা দেখতে কেমন, রথীনকে সেটা ভেবে দেখতে বললে, তার মগজে ইঞ্জিনের বয়লারের ফুকরটা দাউ দাউ করে উঠত। তার বয়েস এ সময় বিয়াল্লিশ। আমার একুশ। তার বউএর বয়স কত ছিল, জানিনা। (তার নাম কি? তার নাম কি? তার নাম কি? জানি না। বাড়িতে রথীনের বউএর নাম ধরে কেউ ডাকত না। রথীনের মা না, রথীন না। আমাদের

ইউনিয়নের খাতায় নাম লেখাবার দায়ও তার ছিল না। রেল ইস্কুলের গার্লস সেকসানের হেডমিস্ট্রেস্ মিসেস ক্যাথারিন মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার মিস সিউলী চাকি, মিস্ সুরেন্দ্রভামিনী দত্ত, নার্স মিসেস্ ভ্রমর টমাস্ আর ফতিমা ধাত্রীর নাম আমাদের ইউনিয়নের চাঁদার খাতায় ছিল। ডি টি এস সাহেবের ফিরিঙ্গী স্টেনো, যার কথা মনে পড়লেই কিউটিকিউরার প্রসাধন সামগ্রীর গন্ধ নাকের ডগায় ভুরভুর করে, আর বোলতার মত সুগঠিত নিতম্বের ব্যস্ততা আর সুঠাম দুখানি অনাবৃত পা চোখে ভাসে—তার নাম মিস অ্যানামেল ফিনলে—হ্যালো অ্যানা' আয় ই ফ্রি দিস ভলিং ছোকরা এ টি এস চোখ মারে। "সরি চার্লস". টাইপ রাইটারে মিস ফিনলের আঙুল চলে। "টু মরো দেন, অ্যানা?" "সরি চার্লস", সর্টহ্যাণ্ড খাতাটা নিয়ে। মিস অ্যানা উঠে পড়ে। "ডে আফটার—" মিস অ্যানাবেল ফিনলে সুর ছড়ায় "প্লী—জ চার্লস।" তারপর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়ে। "ইজ হি বিজি মিস ফিনলে?" মিস ফিনলে মধুর হেসে বলে, "ও ইউ হ্যাভ কাম। হি ইজ এক্সপেকটিং ইউ বাবু। গো ইনসাইড। আমাদের টিপ্স্ দেয়। "হি ইজ ইন গুড হিউমার।" রথীনের বউ এর কোনটার মধ্যেই পড়ে না। তাই তার নাম জানতে পারিনি। প্রসবের সময় হাসপাতালে ছিল। সেই খাতায় নিশ্চয়ই নাম আছে। পেসেন্টের টিকিটেও নিশ্চয়ই নাম ছিল। আমি হাসপাতালে যাই নি। ডেথ সার্টিফিকেটও নিশ্চয়ই নাম ছিল আমি তা দেখিনি।)

রথীনের কাছে রথীনের বউ তার বয়সের মতই একটা সহজ স্বাভাবিক অস্তিত্ব। এ নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় নি। ঈর্ষা রথীনকে তার স্ত্রী সম্পর্কে সচেতন করে তুলল। তাকে তার স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী করল। এতদিন পরে রথীন তার স্ত্রীর প্রেমে পড়ল। আমরা তিনটি বিন্দু এক বিন্দুতে এসে মিলিত হলাম। তবু আমি সুশীলার মত বলতে পারব না, " রঙ্গচারী, আমি, বলরাম, আমরা তিনজন দুজন হয়ে গেলাম।

কোন দেহই নতুন দেহ নয়, কোন মনই নতুন মন নয়। রঙ্গচারী লিখেছিল, লাভ্ ওনলি লাভ্ ইজ নিউ অ্যাণ্ড্ এভরি কিস্ ইজ এ নিউ কিস্। জগতে আর নতুন ডাঙা নেই, নতুন সমুদ্র নেই, ওনলি দি ডুয়েলিংস্ আর নিউ। আকাশ নতুন নয়, বাতাস নতুন নয়, ওনলি ব্রিদিং ইজ নিউ। দেয়ার ইজ নো নিউ ফায়ার, দেয়ার ইজ নো নিউ ফ্রেম্, ওনলি দি ডিজায়ার ইজ নিউ। অ্যাণ্ড দি নিউ ডিজায়ার বিগেট্স্ নিউ লাভ অ্যাণ্ড নিউ লাভ বিগেট্স্ নিউ কিসেস অ্যাণ্ড নিউ কিসেস ক্রিয়েট নিউ ব্রিদিংস্ অ্যাণ্ড নিউ লাভ অ্যাণ্ড নিউ কিসেস অ্যাণ্ড নিউ ব্রিদিংস ক্রিয়েট নিউ ডুয়েলিংস্ অ্যাণ্ড দি নিউ ডুয়েলিংস্ চেঞ্জ্ দি ওল্ড ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি ওল্ড সী ইনটু এ নিউ ওয়ান্, চেঞ্জ্ দি ওল্ড্ স্কাই অ্যাণ্ড্ দি ওল্ড উইণ্ড ইন্ টু এ নিউ ওয়ান, চেঞ্জ দি ওল্ড ফায়ার অ্যাণ্ড দি ওল্ড ফ্রেম্ ইন্ টু এ নিউ ওয়ান অ্যাণ্ড রিপেয়ার দি ওল্ড বডি অ্যাণ্ড রিপ্লেস দি ওল্ড মাইণ্ড।

আই ওয়াজ ওল্ড মাই বডি ওয়াজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ এ জরথুস্ত্র, মাই মাইণ্ড ওয়াজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ দি ডিপ সাইস অব বেবিলোনিয়ান ডেশপেয়ার, বাট্ আই অ্যাম্ এ রি-মেক্ নাউ; এ রি-মেক্ ম্যান, এ রি-মেক্ অব্ মাই ওন্ সেল্ফ্।

রথীনের কথা বলতে গিয়ে রঙ্গচারীর কথাই ধার করতে হল। এতদিনে রথীনের মনে কামনার

উদ্রেক হয়েছে। ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ ওর কামনাকে জাগ্রত করেছে। কামনা ওর স্ত্রীর প্রতি ওকে আকৃষ্ট করেছে। ওর স্ত্রীকে ও প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। তিনটি অণু একই ক্ষেত্রবৃত্তে তিনজনকে সমভাবে আকর্ষণ করছে। এতদিনে রথীনের দেহে, রথীনের মনে অস্থিরতা জেগে উঠেছে—যে অস্থিরতা আমাকে ভোগাচ্ছে, যে অস্থিরতা ওর স্ত্রীকে ভোগাচ্ছে, সেই অস্থিরতা। আমরা তিনজন এত অন্তরঙ্গ বোধ হয় আর কখনও হইনি। আমি রথীনের জন্য প্রাণ দিতে পারি. রথীন ওর স্ত্রীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, ওর স্ত্রী আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে। রথীন আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, আমি ওর স্ত্রীর জন্য প্রাণ দিতে পারি, রথীনের স্ত্রী রথীনের জন্য প্রাণ দিতে পারে। আমি রথীন আর ওর স্ত্রীর জন্য প্রাণ দিতে পারি; রথীন ওর স্ত্রীর আর আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, রথীনের স্ত্রী আমার আর রথীনের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

আমরা তিনজন যেন কোনো গোপন উপাসক সম্প্রদায়ের তিন মন্ত্রশিষ্য। আমরা এখন পরস্পরের গা ঘেঁষে বসি, পরস্পরের শরীরের তাপের বিকিরণে নিজ নিজ দেহে তাপ সংগ্রহ করি।

কিন্তু রথীন, আগে যেমন ডিউটিতে যাবার আগে, আমাকে ওর বাড়িতে যেতে বলত, এখন আর তা বলে না। এ যেন এক স্বতঃসিদ্ধ। এক স্ত্রীর অধিকারে রথীন যখন থাকবে না, আমি তখন থাকব, আমি যখন থাকব না, রথীন তখন থাকবে। যখন কাউকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস দিতে হয় তখনই তাকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানার কথা বলতে হয়। প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে এলে সে কথা আর বলতে হবে কেন ? আমি ভাবতেই পারিনি, আমি আর ওর বাসায় না আসি, এই ও চায়।

রথীন কখনও সে কথা আমায় বলেনি। আমি ওর সামনে ওর বউএর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতাম। ওর বউএর হাত নিয়ে খেলা করতাম, রথীন হাসত। এই মুহূর্ত্তগুলিই আমার সব থেকে আনন্দে কাটত। জ্বালাযন্ত্রনাহীন অপার আনন্দময় এক স্বর্গীয় অনুভূতি। এই সময় পৃথিবীকে আমার আনন্দ নিকেতন বলে মনে হত। হামজা বলেছিল প্রেম, পোড়ায় না। কথাটাকে এই মুহূর্ত্তগুলির জন্য আমার সত্য বলে মনে করতে ইচ্ছা হয়।

অনেক পরে জেনেছিলাম রথীন আসলে হাসত না। ওর মনের জ্বলুনি হাসির মুখোসে লুকিয়ে রাখত। এ আমার আন্দাজ নয়, রথীনেরই স্বীকারোক্তি। ও সন্দেহের বিষে জ্বলতে শুরু করেছিল। ওর প্রেম সে সময় ছিল লাল কেরোসিনের আলো। আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি।

রথীন যে সন্দেহের বিষে জ্বলছে, সে-কথা ওর বউ জানত, কিন্তু আশ্চর্য আমাকে কখনোই সে-কথা বলেনি। সেদিন—

অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধ্যে থেকে আমাদের আড্ডা বসেছিল। রথীনের ডিউটি পড়েছে। কল-বয় এসে জানিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে। দশটায় রথীনের ট্রেণ ছাড়বে। ব্যালাস্ট ট্রেণ। পরশু বিকেলে রথীনের ফিরে আসার কথা। বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারে। আমাদের আড্ডায় তিনজন নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বসে আছে। এক উষ্ণতার ডিমে তিনজন বসে তা দিচ্ছি। বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার। আমাদের ইউনিয়ন চাক্কা-বন্ধের প্রস্তুতিতে মেতেছে। কর্তৃপক্ষ সামান্যতম দাবীও মানতে রাজী নন। কমুনিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কমুনিষ্টরা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে। তারা শ্রমিকদের হাতে রাখতে

চায়। আমরা শ্রমিকদের হাতে রাখতে চাই। আমরা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছি। কমুনিষ্টরা উপরঅলার চরম নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা উপরের চরম নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। রথীনের বউ তেলের কুপিটাকে নিভিয়ে রেখেছে। আঝার ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির বিচ্ছিন্ন ধারাগুলো একটা ঘন কালো শেলেট—গোটা শেলেটটাই গলে পড়ছে। আমরা। বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি না। শব্দ শুনে বুঝছি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার অন্ধকার গলছে, ঝরে পড়ছে। আমরা গলছি, ঝরে পড়ছি। স্পর্শ পেয়ে বুঝছি, আমরা আছি।

রথীন এতক্ষণ কথা বলছিল। চুপ। ওর বউ মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন ছাড়ছিল। চুপ। আমি সায় দিচ্ছিলাম। চুপ। বৃষ্টি পড়ছে। রেলের ইঞ্জিন হুইস্‌ল্ দিল। চুপ। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। আবার মন কথা বলছিল। চুপ। আমাদের তিনটে শরীর ছোঁয়ায়, ছোঁয়ায় ভাব বিনিময় করছিল। চুপ। রথীন ডিউটিতে চলে যাবে। এই রাত্রি আমার হবে, এই বৃষ্টি আমার হবে, অন্ধকার আমার হবে। আমার আমার আমার··· ··· ···

"চল গো, খেয়ে নাও।" একটা কথার বুদ্‌বুদ্ গভীর স্তব্ধতার উপরে ভেসে উঠল। ফেটে গেল। আবার সব চুপ। বৃষ্টি পড়ছে।

"খাবে চল, তোমার ডিউটির সময় হল না।" আরেকটা বুদ্‌বুদ্ ভেসে উঠল। ফেটে গেল। বৃষ্টি পড়ছে।

"আমার চাইতে তোর তাড়াই তো বেশি দেখছি।" বুদ্‌বুদ্। খানিকক্ষণ থাকল। তারপর কাটল।

"না, আমার আবার কিসের তাড়া। তোমার দেরি না হলেই হল। "বুদ্‌বুদ্ ভেসে বেড়াতে লাগল।

"আমার দেরির জন্য তোর ভাবনা যে আজকাল বড় বাড়ছে দেখছি। একেবারে পাকা টাইমবাবু হু হু।" বুদ্‌বুদ্ দ্রুত উঠল। ভাসতে লাগল। আগেরটার গায়ে ধাক্কা লেগে দুটোই ফেটে গেল।

"বাঃ বেশ কথা, আমি যেন তোমাকে ভাগাবার জন্য গায়ে চিমটি কাটছি। বলি ওগো, ও বাবু, বন্ধুর কথা শুনছ?" বুদবুদ্ ভেসে এল।

"বাঃ, এই বৃষ্টিতে মানুষ বেরুতে পারে? আচ্ছা বউ তো তুমি।" বুদ্‌বুদ্ ভাসতে লাগল। দুটো বুদ্‌বুদ্ মিশে গেল। ফাটল না।

"কি রে হল? খুব তো সাক্ষী মান্‌ছিলি? হল তো?" বুদ্‌বুদ্ ভেসে এল। আগের দুটোর সঙ্গে মিশে গেল। একসঙ্গে সবকটা কেটে গেল।

"সব শেয়ালের এক রা।" রথীন ডিউটিতে যাবে। এই রাত্রি আমার হবে, এই বৃষ্টি আমার হবে, অন্ধকার আমার হবে, আমার, আমার, আমার··· ···

"দে, দে, আর গোঁসা করিসনি। ভাত দে, চলে যাই। সত্যিই দেরী হলে বড় খারাপ হবে।"

"আসল কথা কি জানিস, তোদের আড্ডায় বসলে, উঠতে বড় কষ্ট হয়। বড্ড একা একা লাগে।" খেতে খেতে রথীন বলল, "তাই উঠতে ইচ্ছে হয় না।" রথীন এক নতুন সুরে কথা বলছে এখন।

রথীনের স্বর ভারি। রথীনের স্বরে বৃষ্টির বিষণ্ণতা। "মনে হয় কি জানিস, তোরা যেন আমি চলে গেলেই বাঁচিস।"

"শোন কথা।" ওর বউ অবাক হয়ে চুপ করল। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে।

আকাশ প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, এমন বৃষ্টি। সীসে রং মেঘ গুলো ঝুলে ঝুলে আছে, ট্রামের তারের উপর, টাওয়ার লজের উপর, শিয়ালদা ষ্টেশনের পাঁচিলে টাঙানো সিনেমা পোষ্টারগুলোর উপর। বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারে। এই সকালটা যেন ঘষা কাঁচের শার্সি। ওপিঠ দিয়ে মোটা মোটা ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। ঠনঠনেয়, চীৎপুরে, চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে, ফায়ার ব্রিগেডের সামনে, ভবানীপুরের জগুবাজারে এতক্ষণে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সকালের ট্রামগুলো যদি বেরিয়ে থাকে, মাঝপথে দাঁড়িয়ে গিয়ে অসহায় কাকের মত ভিজছে। আধা আধা ঘুম আর বিরক্তি সর্বাঙ্গে মেখে ট্রামের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টার আর দু একটা প্যাসেঞ্জার অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেছে এক অচল ভবিতব্যের হাতে। সমস্ত জানলাগুলো তুলে দিয়ে, ভেজা ভেজা সীটে বসে হাই তুলছে, তুড়ি মারছে, হাই তুলছে, বিড়ি ফুঁকছে। বৃষ্টি ঝরছে, ভারি বৃষ্টি, নিঃশব্দে। এত নিঃশব্দে যে লেট্‌-রাইজার কলকাতার ঘুম যেন না ভাঙে। কয়েক বছর আগে, সুশীলা তখন মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে, বলেছিল, "বর্ষা-কালটায় কলকাতাকে দেখলে মনে হয়, তার পেরিটানাইটিস্ হয়েছে। ট্যাপ্ করে করে যতই জল বের করে, আবার জল জমে যাচ্ছে।"

শিয়ালদা ষ্টেশনের সামনের আশ্রয়ে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। স্কাইলাইটে কাঁচের গা বেয়ে অবিরাম বৃষ্টির ছায়া নামছে, যেন তাজা স্মৃতির ঢল। "আমরা আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকি। এই শহর, বাইরের মানুষ, আমরা, আমাদের জীবন, স্মৃতিতেই বেঁচে থাকবে। আমাদের প্রেম বিরহ, হাসি কান্না স্মৃতিতে পরিণত হলে তবেই জীবন্ত তবেই বাস্তব হয়ে উঠবে। মেমরি নেভার ডাইস।" রঙ্গচারী বলেছিল। "রিয়ালিটি হচ্ছে লাইনো মেশিনের কী-বোর্ডের স্ট্রোক্। প্রতি স্ট্রোকে একটা অক্ষর ঝরে, ওন্‌লি এ লেটার্ অ্যাণ্ড্ নো মীনিং। তারপরে কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টিতে এক বাক্যাংশ এ লাইন। এ রো অব্ লেটার্স্, সামটাইম্স্ ইট মে মীন্ সাম্থিং বাট্ ডাজ্ নট্ কন্‌ভে এনিথিং—কখনো পুরো কখনো বা ভাঙ্গাচোরা অর্থ একটা সৃষ্টি হয়, যাতে কিছু বোঝা যায় না তারপর লাইনগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে ম্যাট্রিক্‌সের উপর যখন ছাপ তোল,—দিজ্ ইম্প্রিন্টস্ আর নট দি লাইনো লেটারস্, দিজ আর দি মেমরিজ অব্ দোজ, দেন ইট কন্‌ভেস্ দি ফুল মীনিং ইট বকামস্ সিগনিফিক্যাণ্ট। রিয়ালিটি হাজ অ্যান এক্‌জিস্‌টেন্স বাট নো সিগ্‌নিফিক্যান্স। বাস্তবের অস্তিত্বই শুধু আছে, তাৎপর্য নেই। স্মৃতিই তাৎপর্যময়।"

রঙ্গচারীর মৃত্যু হয়েছে, রথীনের স্ত্রীর দেহ…আমি আর রথীন যার অংশীদার ছিলাম… লালমণিহাটের শ্মশানভস্মে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, সুশীলা আর বলরাম সংসারের বন্দরে নোঙর বেঁধেছে, ঢুলু কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, বুলা বুলার স্বামী, বুলার সন্তান, বুলার সংসার ডুবো পাহাড়ে গুঁতো-খাওয়া জীর্ণ পোতের বিদীর্ণ পাটাতনের মত চারিদিকে ছিটকে পড়েছে। শিয়ালদা স্টেশনের আদল বদলে যাচ্ছে, কলকাতার চারিত্র্য বদলাচ্ছে, আছে শুধু স্মৃতি। অজর, অমর, অব্যয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর। স্কাইলাইটের কাঁচের ওপর দিয়ে বৃষ্টিধারার অবিরল ছায়ার মত স্মৃতির স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে।

এই আমি এখানে, কেরোসিন কাঠের টেবিলে, শ্রাবণের বিরক্তিকর ঘামে, সাদা পাতলা ব্যাঙ্ক কাগজের উপর ঘাড় গুঁজে অবাধ্য কলমকে সায়েস্তা করার পণ্ডশ্রমে রত, এই আমি কলকাতায় আমার আমি শূন্য বাসায়, যেখানে আমার স্ত্রী, আমার মা, ভাই বন্ধুরা স্বল্প জলে লগি ঠেলে সংসারের অবাধ্য ভেলাটাকে কোনক্রমে পাড়ে ভেড়াতে ব্যস্ত, আমার ন্যাওটা মেয়েটা কয়েকটি কামরার অরণ্যে তার বাবাকে খুঁজতে সোনার হরিণের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, এই আমি, এখন আমার স্মৃতির অজস্র অধ্যায়ে।

কেউই মরে নি, কোন কিছুই ক্ষয় হয় নি। সব কিছুই আমাদের অগোছাল স্মৃতির গুদামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। "দি গোডাউন ইজ পার্টলি ডার্ক অ্যাণ্ড পার্টলি লাইটেড। ভিতরে ঢোকো, হাতড়াও, অ্যাণ্ড ইউ উইল ফাইণ্ড এভ্রিথিং। দেয়ার এভ্রি ডেড ইজ এ লিভিং বিয়িং এভ্রি করপস্ হ্যাজ ওয়ারমথ। গেট্ ইন্সাইড ম্যান্ অ্যাণ্ড ইউ উইল শী দেয়ার এভরি ওয়ান-আউট ইজ ফ্রেস অ্যাণ্ড নিউলি পেন্টেড।" রঙ্গচারীর তাগিদ আমি স্বপনে অনুভব করি: গেট ইন্সাইড ম্যান্ গেট ইনসাইড।"

সেদিন সেই মুষলধারা বৃষ্টিতে আমার ভিজতে ইচ্ছে করছিল। যে ট্রেণখানা আমার নিঃসঙ্গ সত্তাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এনে নামিয়ে দিল, বুলা তার কোথাও ছিল না। যে ট্রেণের কামরায় মিলিটারি সাহেব দেখে ভয়ে অস্থির বুলা আমাকে বাকি পথটুকু পৌঁছে দিতে বলেছিল—সেই ট্রেণেই আমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম—বুলা সে ট্রেণের কোথাও ছিল না। পিওন যে-মন নিয়ে রেজিষ্টার্ড পার্শেল মালিকের হাতে সমর্পন করে, তেমনি কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে আমি বুলার বাবার হাতে বুলাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বুলার বাবা আমাদের সম্পর্ক জানতেন না, তাই বুলার অস্বস্তি তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। বুলা স্পষ্টতই দোটানায় পড়েছিল। বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পড়ায় দুটো স্মৃতিই তার মনে জেগে উঠেছিল। দুটোই তার মনে অপমানের জ্বালা নতুন করে ধরিয়ে দিয়েছিল। আমার গালে চড় মেরে সে তার সম্মান বাঁচিয়েছিল, সে তবু এক সান্ত্বনা। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সে আত্মসম্মান খুইয়ে ওকে পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিল, তার কোন উপশম সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সে তাই প্রায় ছুটে গিয়েই তার বাড়ির বুইকে উঠল। গদিতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। বাবাকে বলল, "মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।" এই কথা শুনে তার বাবা এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে আমার পক্ষে অনেক সহজে ওদের বাড়ি যাবার অনুরোধ এড়ান সম্ভব হল। অনুরোধ ওর বাবাই করেছিলেন। বুলা একটা কথাও বলেনি। বুলার বাবা ব্যস্তভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। আবার ফিরে এলেন। আমার ফেরার টাকা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে ক্ষমাটমা চেয়ে অস্থির কাণ্ড করে অনেক বেশি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। পিওন যেভাবে বক্‌শিশ নেয়, আমি সেইভাবেই তার হাতে থেকে টাকা নিলাম। হাজার হোক, একটা দামী পার্শেল আমি যথাযথভাবে ডেলিভারি দিয়েছি তো।

আমার নিঃসঙ্গতা সেদিন আমাকে আদৌ পীড়িত করেনি। বরং পূর্ণই করে তুলেছিল। ফেরার পথে বুলার কথা প্রায় মনেই হয়নি। তার কারণ আমাকে থার্ডক্লাসের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরতে হয়েছিল। যদি ফার্স্ট ক্লাসেই আসতাম, তাতেও মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। সত্যি বলতে কি, বুলার চড় খাবার পর থেকেই আমার অস্থিরতার মৃত্যু হয়েছিল। বুলার থাপ্পড় খেয়ে আমি কিন্তু কোন রকম

আত্মগ্লানি বোধ করিনি। অঙ্ক ভুল করেছি, মাস্টারমশাই থাপ্পড় মেরেছেন—ঠিক এই রকমই মনে হয়েছিল।

এখন আমার মনে হচ্ছে, এই এখানে, মুষলধারা বৃষ্টির সামনে শেডের তলায় দাঁড়িয়ে, আমার মনে হতে লাগল, কোথায় যেন আমার একটা বাঁধন ছিল, সেটা কেটে গিয়েছে। আমি এখন মুক্ত। এই বৃষ্টির প্রবল ধারার মতই আমি যেন মুক্তি পেয়েছি। এই সীসে-রং সকালটা, বৃষ্টির আবরণে ঢাকা শহরটা, এই কাগজের বাণ্ডিল হাতেকরা হকার, আটকে পড়া তিতবিরক্ত যাত্রী, ভেজা কাক, ভিখারি, সব আমার ভাল লাগছিল। "নুইসেন্স্, এই বৃষ্টির কোন মানে হয়। কলকাতা একটা নরককুণ্ড।" আমার হাত দুটো, হঠাৎ রাগে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল, আচমকা কেউ মা তুলে গালাগালি দিলে যেমন হয়, ধাঁই করে সেই নেকটাই এর বিরক্ত নাকে একটা ঘুষি ঝেড়ে দিলাম। তারপর সর্বশরীরে উল্লাসের ঢেউ তুলে বৃষ্টির উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঠাণ্ডা জলধারা আমার চুল বেয়ে নোংরা পোষাকে পড়তে লাগল। রোমকূপে শীতল জলের স্পর্শ পেতে লাগলাম। ট্রামের লাইনের উপর দিয়ে, ফুটপাথ দিয়ে যদৃচ্ছ হাঁটতে লাগলাম। বুক পকেটে অনেক টাকার ছাপমারা কাগজগুলো ভিজে ভিজে নেতিয়ে এল। ঘাড় বেয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের শীতল ধারা ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে লাগল। ল্যাংটো শিশুকে স্নান করাতে বসলে শিশু যেমন শিহরিত হয়, মা যেমন পুলকিত হয়, এই সকালে আমাকে ধারাস্নান করিয়ে আমি অনুভব করতে লাগলাম, কলকাতা সেই পুলক গায়ে মাখছে।

চেয়ে দেখলাম, লক্ষ পুত্রের জননী কলকাতা দারিদ্র্যের পীড়নে পিষ্ট, পুরনো বনেদিয়ানা ভেঙে পড়েছে তবু তারই স্মৃতি সম্বল, বুকে দুধ নেই, সংসারে তিল ধারণের জায়গা নেই, কারো পুষ্টি নেই, পরণে লাল পেড়ে ছেঁড়া শাড়ি, হাতে শাঁখা মাত্র সার—তবু কী অসাধারণ স্নেহ! কাউকে ফেরায় না, কাউকে তাড়ায় না।···কাছে এগিয়ে গেলে সস্নেহে স্নান করায়···

ভিজে ভিজে মেসে এসে উঠলাম যখন, তখন আঙুলের চামড়া চুপসে গিয়েছে, চোখে জ্বালা, গায়ে জ্বর···" জ্বর, কামনার জ্বর, " হামজা বলত "বীর্যকে জাগ্রত করে। জ্বর মাত্রেই কামনার বাহন।"

মাঝে মাঝে কলকাতায় মৌশুমী পাখীর মত এমন দু একটা দিন ছিটকে এসে পড়ে, যখন কোন কোন কিছুতেই আর মন লাগতে চায় না। এই সময়টা বড় মারাত্মক। কাফি হাউসে, রেস্তারায়, বারে—কোন আড্ডাতেই আঠা থাকে না। পলিটিক্স, সঙ্গীত, সাহিত্য—আলোচনা, তর্কাতর্কি, এমন কি জুয়াতেও মন বসে না। এটা কলকাতার নিজস্ব আকর্ষন। "কলকাতা গ্রীক পুরাণের সেই সাইরেণ। তার আহ্বান কানে গেলে নিস্তার নেই " (হামজা)—।

এমনি এক দিনে, আমার মনে আছে, কাগজপত্র বিছিয়ে নিয়ে বসে আছি—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মুণ্ডপাত করতে হবে—একটা আঁচড়ও কাটিনি, কাটতে পারছি নে, এমন সময় হামজা এল। একেবারে আস্ত একটি ছন্নছাড়া। " এই, পঁচিশটে টাকা দাও তো।" বললাম, "আমার পকেটে টাকা নেই।"

" তবে ধার করে এক্ষুনি চলে এস, কফি হাউসে, হাউস অব লর্ডস-এ। দশ মিনিটের মধ্যে এস।"

সেইখানেই হামজ্জা মেয়েটার পরিচয় দিলে, " এ মুকুল, " তারপর আমি মুকুলকে দেখি একটা নতুন অফিসে—এক কনট্রাকটারি ফারম—ভাল করে অফিস তখনও বসে নি। "হামজ্জা বলল, আমি এখানে কাজ পেয়েছি। সেক্রেটারী। মুকুল টাইপিষ্ট।"

মুকুল বলল, " চাকরি থাকবে না।"

"কেন ?"

ঠোঁট উল্টে মুকুল বলল, "এ এস্ ডি এফ জি এই আমার বিদ্যে। "

হামজ্জা বলল , " আমি একমাসে তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

" সেই যা ভরসা।"

তারপর মুকুলকে দুদিন স্বপ্নে দেখলাম। এবং স্বপ্নেই আমি লক্ষ্য করলাম, সমস্ত অবয়বের মধ্যে ওর চোখ দুটোই প্রধান। তারপর একদিন আমি ওর অফিসে গেলাম। মিলিয়ে দেখলাম, ঠিকই। ডাগর দুটো চোখেই ওর অস্তিত্ব। তারপর থেকে একটি কবিতার লাইন— "ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য ?"—(অরুণকুমার সরকার)—মনে হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠতে লাগল।

আমি ওর অফিসে গিয়েছি : " ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য ?"

কলকাতার বাইরে গিয়েছি : "ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য ?"

আমি ওকে ভালবাসিনি। ওর বড় দম্ভ। ওর বড় গর্ব। ওর রোগা লিকলিকে শরীর। হাত দিতে ভয় করে। মট করে ভেঙ্গে যাবে। ওর কিছু নেই, কিছু নেই। কিছু দেবার নেই। কিছু নেবার নেই। শুধু দুটি চোখ। (ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য ?) এই কবিতাটা আসল না ওর চোখ দুটো আসল এই কবিতাটাই ওর চোখ সম্পর্কে আমাকে সচেতন করেছে না কি চোখ দুটোই কবিতাটিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে ? জানি না। তবে একটাকে অন্যটার থেকে আলাদা করে ফেলা যায় না।

অনেক অনেকদিন পরে ও হারিয়ে গেল। হামজ্জা হারিয়ে গেল। হামজ্জা হেরে গেল। আমার যৌবনের অফুরন্ত শক্তির কাছে ওর প্রৌঢ়ত্ব পরাভূত হল। সেই দিন আমি ওর চোখে জল দেখেছিলাম। বেহালার এক দেশি মদের দোকানে ঢুকে মদ খেলো। তারপর কাঁদল। কেঁদেই ফেলল।

বলল, "আমি ওকে ভালবাসি না। তুমিও ওকে ভালবাস না। ও আমাদের কাউকে ভালবাসে না। ভালবাসার কোন কথা নয়। আমার দুঃখ এই, আমার পাশে, ট্যাক্সিতে বসে, তুমি ওকে আলিঙ্গন করলে, ওর মুখে চুমু খেলে, আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে ! আমি আমি আমি হামজ্জা, একটা সাইফার বনে গেলাম ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। বৃদ্ধ হয়ে গেছি। অতি অথর্ব এক ষাঁড়। এবার পিঁজরাপোলে যেতে হবে !"

অথচ এ কাজের জন্য আমি একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। যখন মুকুলের সঙ্গে দেখা হল, তখনও না। বরং আজ ওর প্রতি আমি চটেই ছিলাম। ওর প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আমার জেগে উঠেছিল। একেবারে খেলো মেয়ে। ফাঁপা মেয়ে। হামজ্জার উপরও আমার রাগ হচ্ছিল। একটা

বুড়ো ছাগল কোথাকার। মেয়েমানুষ দেখলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ব্রহ্মচারী এ রোগের নাম দিয়েছিল, "স্কার্টরাইটিস্"। হাম্‌জাই আমাকে বলেছিল, মুকুল খুব একমপ্লিসড্ মেয়ে। সাহিত্যে সঙ্গীতে চিত্রকলায় কলেজী পারদর্শিতা কিছু দেখিয়েছিল। ওর কপ্‌চানির চাকচিক্য আমি রুচি বলে ভুল করেছিলাম। তাই যখন হাম্‌জা এসে বলল, ও আমার লেখার অনুরাগিনী, তখন সত্যি বলতে কি, আমি বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। সারাদিন পরিশ্রম করে, প্রকাশকদের তেলিয়ে আমার সব কখানা বই এনে ওকে উপহার দিয়েছিলাম। সেই দিনই আমি বুঝলাম, মেয়েটির মধ্যে কিছু নেই। একখানা বইও সে পড়েনি।

(কিছুদিন পরে, আমার এক বন্ধু ফুটপাথ থেকে ওর নাম লেখা—আমার হস্তাক্ষরে—আমার একখানা বই আমার বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিল। খুব উচ্চশ্রেণীর রসিকতা সন্দেহ নেই। আমার স্ত্রী বইখানা পেয়ে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। "এ জিনিষের যে মর্যাদা দেয় না, সে কেমন মেয়ে"!)

মুকুলের হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি না, আমার সন্দেহ হত। "সে আমাকেও ভালবাসেনি, তোমাকে ভালবাসেনি" হামজা বলেছিল, "সে ছিল আত্মকামী। নিজেকেই ভালবাসত"। কত যে ফটো তুলেছে, উগ্র, অভব্য সব পোজে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রতি শনিবার ওকে নিয়ে আমি আর হামজা কোন না কোন নামকরা স্টুডিওতে হাজির হতাম। ও প্রসাধন করত, পোজ মারত, এই সব সময় আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। ওকে আমার স্থূল, দেহসর্বস্ব— যে দেহে কিছু নেই, শতকরা পঞ্চাশ ভাগই যার রাত্রে শোবার সময় হুকে টাঙিয়ে রাখতে হয়—বলে মনে হত। ওর চোখ দুটো ছিল আসল। এ চোখ যার সে তো সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী হতে পারে। ওর চোখ দুটো যেন ভাসত।

সেদিনও শনিবার। আমি ওর মনের চেহারা দেখে ফেলেছি। স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণা, সে ছিল আত্মরতিতে মগ্ন। আমি বিরক্ত, বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। ওর সঙ্গ, হাম্‌জার সঙ্গ, আমার একটুও ভাল লাগছে না। এবারে উঠব, পালাব। বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। অফিস পাড়ার মৌচাকগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে। মৌমাছিরা ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটবলের চ্যারিটি ম্যাচ, রেস, সিনেমা-থিয়েটার, বাড়ি যাবার ট্রেন। কলকাতার হৃদস্পন্দন অতি দ্রুত লয়ে চলেছে। আমিও উঠেছি। "এই," দুটো চোখ আমাকে ডাকল, "আমাকে পৌছে দেবে না, দিদির বাড়িতে"।

"সে আবার কোথায়"?

"বাঃ"? দুটো চোখ অবাক হল। "সেদিন কথা হল না?"

মনে করতে পারলাম না। দুটো চোখ অভিমানে ভারি হয়ে এল। আমার মুখের উপর ভেসে বেড়াতে লাখল। সম্ভবত আমি জেগে নেই। সুখস্বপ্নে বিভোর।

"হাম্‌জা, তুমিই তবে চল,। আমাকে টালিগঞ্জে পৌছে দিয়ে আসবে"।

এই প্রথম, আমি হাম্‌জার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলাম। এই প্রথম আমার মনে হল, হামজা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার সভ্য পোষাকের নীচে প্রস্তর যুগের সেই পুরুষটি সহসা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। সন্দেহের কুটিল ছায়ায় তার বন্য চোখ, কালো হয়ে এল। চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল। সম্ভবত হামজার মনেও এই প্রস্তর যুগের হিংস্র মানবটি জাগ্রত হয়ে থাকবে। গর্জন করে থাকবে।

এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর সামর্থ্য পরিমাপ করে কিছুটা ত্রস্ত হয়ে থাকবে। কারণ প্রথম দিকে সে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায়নি। সে এই নারীকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইছিল। আমার পুরুষটি পথ আগলে দাঁড়াল। সেই নারী এই যুযুধান দুই পুরুষের মধ্যবর্তী হয়ে বেছে নিতে পারছিল না। কাকে ফেলে কাকে রাখবে। ছলনা শুরু করল। একবার আমার গা শুঁকে হামজাকে উত্তেজিত করল। পরমুহূর্তে হামজার গা শুঁকে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। আমরা পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে হিংস্র দাঁত বের করে গর্জন করে উঠলাম।

[হাম্‌জা : তবে চল ট্রামেই যাই। বেশ ভালই লাগবে।

মুকুল : বেশ, সেই ভাল। (হামজার দিকে চেয়ে হাসল।)

আমি : দূর, এখন ট্রামে বাসে অফিসের ভিড়। চল ট্যাক্সি নিই।

মুকুল : ট্যাক্সি, হাঁ, ট্যাক্সিই ভাল। (আমার দিকে চেয়ে হাসল)]

আমি খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলাম।

[আমি : তবে চল আর দেরি নয়। বরং ময়দানে একটু ঘুরব।

মুকুল : বেশ, সেই ভাল। (হাসল)

হামজা : না, না, আগে স্টুডিওতে চল।

মুকুল : স্টুডিওতে, আগে স্টুডিওতে। (হাসল)]

হাম্‌জা খ্যাক খ্যাক করে হাসল। আমাদের দুজনের হাসিই দস্তুর। আমাদের দেহ লোমশ। আমাদের নখরগুলি তীক্ষ্ণধার। দুটি পুরুষই বুঝল, অন্তিম সময় সমাগত। গুহার সংকীর্ণ পরিসর ছেড়ে আমরা—দুই আদিম পুরুষ আর এক আদিম ছলনা—উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে নামলাম। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে তখন মানুষের স্রোত তীব্রগতিতে বহে চলেছে।

ট্যাক্সিতে ওরা দুজনে কি কথা বলছিল আমি খেয়াল করিনি। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মাঝখানে ছিল মুকুল, ওপাশে হামজা, এপাশে আমি। আমার সামনে এক বুড়ো শিখ ড্রাইভার। একটা ছোট্ট আয়না। পিছনের রাস্তা আয়নাটার মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে। দু একটা লাইটপোস্ট, ময়দানের ঘাস, গাছ, রেলিং, দু একটা মোটর গাড়ি। মোটর সাইকেলের আরোহী—ফিরিঙ্গি সাহেব তার পিছনে মেম, ভুজাওলা, পথচারী, গোরু, কুকুর, রেসের ভিড আয়নায় ঢুকছে, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা—মুকুল আর হামজা—কথা বলছে, হাসছে। আমার মধ্যে প্রস্তর যুগের লোমশ পুরুষটা গজরাচ্ছে, হামজাকে ঠেলে ট্যাক্সি থেকে ফেলে দিতে চাইছে।

হঠাৎ আমি চমকে গেলাম। সচেতন হয়ে চেয়ে দেখি আমার চোখের নিচে পৃথিবীর সুন্দরতম দুটো চোখ ভাসছে। পদ্ম পত্রে মুক্তার মত দু বিন্দু ডাগর নীর টলটল করছে। আমার মস্তিষ্কের সব থেকে সেনসিটিভ্ স্নায়ুগুলোতে মৃদু স্পন্দন শুরু হল। ঠোঁট দুটো নড়তে লাগল। গুণগুণ করে আবৃত্তি করলাম, "ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য?"

মুহূর্তে আমার ভিতরের সেই বন্য পুরুষটি আমাকে, কবিতাকে এক ঝটকায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রোমশ দুটো হাত বাড়িয়ে চিরকালের চতুরালিকে তীক্ষ্ণ থাবায় আঁকড়ে ধরল। আমি দেখলাম তার এই আরণ্যক আক্রমণে, তার শৌর্য্যের এই ভয়ংকর আত্মপ্রকাশে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েছে। গলিত নখ দন্ত স্থবির সংহ বিবরে মুখ লুকিয়েছে। কোথাও কোন প্রতিরোধ নেই। সম্ভবত এই হঠাৎ আক্রমণে হতচকিত হয়ে একতাল নরম ছলনা তার বুকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। তার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দূর থেকেও শোনা যায়।

তার চুলের গন্ধ আমার নাকের ঘনিষ্ঠতায় আসা মাত্র আমি যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলাম। আমার ওষ্ঠপুটে তখনও পর্যন্ত বহিরাগত একটা অনুভূতির স্পর্শ লেগে রয়েছে। আমি মুকুলের দিকে চাইলাম। সেই সুন্দর চোখ দুটো কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। তার বদলে সাধারণ, আত্ম-সৌন্দর্য্যপিয়াসী-একটা মেয়ের চোখ-বোঁজা একটা সাদামাটা মুখ আমার চোখে এসে ধাক্কা গেল। এ মুখের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা প্রবল। ওকে হামজার দিকে সরিয়ে দিলাম।

"ওহে, ভালকথা," মানুষ ও সমাজের সম্পর্কের ভিত্তি বিষয়ক আলোচনা ক্ষণকালের জন্য মুলতুবি রেখে হামজা আচমকা আমাকে বলল, "তোমার সেই বান্ধবীটিকে এখানে ক'দিন ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি, ক'দিন স্বামীর সঙ্গে, একদিন একা। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে তার চোখ টেবিলগুলোর উপর দিয়ে চলে যেত, তারপর দরজার দিকে সারাক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে থাকত, তাতে মনে হয় কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।" পরমুহূর্তেই হামজার কণ্ঠস্বর মানুষ আর তার সামাজিক সত্তার জটিল সমস্যার মধ্যে বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। বুলার (এ বুলা না হয়ে যায় না) চোখ দুটোর চেহারা কেমন মনে করতে পারলাম না। ও আমার স্মৃতির গুদামে বুলার চোখ দুটো নেই, ওর সম্পূর্ণ মুখটাও নেই, আছে শুধু একটা প্রোফাইল, একটা ফোলা ফোলা গাল, পাতলা চুলের জুলপির আবরণে গালের খানিকটা আলতোভাবে ঢাকা। এইটুকু মাত্র উপকরণ দিয়ে আমি একদিন আমার কল্পনায় বুলার একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করেছিলাম। রথীনের বউ অন্ধকারে ঢাকা। অনেকদিন পরে এক এক্‌জিবিশনে রবীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি প্রতিকৃতি দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার রথীনের বউএর কথা মনে পড়েছিল। সেই থেকে আমার স্মৃতিতে রথীনের বউ রবীন্দ্রনাথের ছায়াচ্ছন্ন প্রতিকৃতির মধ্যে ঝুলে আছে। "স্মৃতি কখনও মরে না"—রঙ্গচারী বেঁচে আছে তার এই রকম অজস্র উক্তিতে। সুশীলা প্রশান্তিতে, ডুলু বিষণ্ণতায়, সরস্বতী তার দেহের মাদকতায়, মুংরি স্বচ্ছতায়, বলরাম আরণ্যক স্বভাবে, মুকুল কবিতার একটি লাইনে।

আর রথীন বেঁচে আছে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার মধ্যে যে যন্ত্রণা আমার সৃষ্টি, যে যন্ত্রণার মূলাধার আমি। অথচ একথা বুঝতে আমার যথেষ্ট দেরি হয়েছিল। রথীন ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, ক্রমশ আমাকে আঁকড়ে ধরছিল, আমাকে আশ্রয় করে ও উঠে দাঁড়াতে চাইছিল—এগুলোই যে লক্ষণ আমার তখনকার কাঁচা মন সেটা ধরতে পারেনি। আমি এটাও বুঝতে পারিনি, সুদক্ষ হাফ-ব্যাক যেমন চতুর ফরোয়ার্ডকে গার্ড দিয়ে রাখে, রথীন সর্বক্ষণ আমাকে সেইভাবেই আগলে আগলে রাখছে। পেনাল্টি লাইনের মধ্যে সে আর আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দিতে চায় না। আমি যে একথা বুঝতে পারিনি, তার আরেকটা কারণও ছিল। তার কারণ রথীনের সঙ্গ, তার সাহচর্য যে অকপট তা আমি আজও বিশ্বাস করি—আমাকে আনন্দের একটা প্রবল উল্লাসে ডুবিয়ে রেখেছিল। আমি এই সময় রথীনের সান্নিধ্যেই বেশি সুখ পেতাম। আমি ওকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। আমাদের সখ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবু কেন জানিনা, রথীন যদি ওর স্ত্রীর প্রতি

বেশি মনোযোগ দিত, আমি ঈর্ষিত হয়ে উঠতাম। আমার মনে হ'ত রথীনের স্ত্রী বুঝি রথীনকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। রথীনের স্ত্রী যদি রথীনের প্রতি বেশি নজর দিত, তবে আমি ঈর্ষার দংশন অনুভব করতাম। মনে হত, রথীন বুঝি আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করছে। আমি তখন বাচ্চা ছেলের মতন কখনো রথীনের দিকে, কখনো তার স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যেতাম। দুজনকেই অধিকার করতে চাইতাম। এ যে এক অসম্ভব প্রয়াস, সে কথা তখন একবারও আমার মনে হয় নি। এমন কি একথাও মনে হয় নি, আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, রথীনের পক্ষেও সেটা স্বাভাবিক হতে পারে। সম্ভবত, একথা রথীনেরও কখনও মনে হয় নি।

এটা কি নিতান্তই দৈব নয়, যে কয়েক বছর আগে রথীনের সঙ্গে তার বউএর যোগাযোগ হয়েছে? ওদের বিয়ে হয়েছে? এই নিতান্ত একটি দৈব দুর্ঘটনার—যে ব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ছিল না—সেজন্য আমি কেন রথীনের সখ্য থেকে ওর স্ত্রীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব?

কিন্তু সাধারণত এসব প্রশ্ন আমার মনে উঠত না, ঈর্ষা আমাকে দংশন করত না। আমার সুখ রথীনের সান্নিধ্যের উষ্ণতায়, ওর স্ত্রীর সংসর্গের তাপে উথলে উঠত।

আরেক কারণ, আমরা দুজনেই কাজে ব্যস্ত হয়েছিলাম। ধর্মঘট ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার সূত্রগুলি একের পর এক কর্তৃপক্ষের বাজে কাগজের ঝুড়িতে গিয়ে জমছে। কর্তৃপক্ষ ধারণা করে রেখেছিলেন এ ধর্মঘট হবে না। আমরা করতে পারব না। তাঁরা জানতেন শ্রমিকশক্তি দুই শিবিরে বিভক্ত। তাঁরা জানতেন, আমরা আর কমুনিষ্টরা—যুদ্ধের দুই প্রবল সমর্থক—পরস্পরের প্রবল শত্রু। তাই আলাপ আলোচনার নামে আমাদের আলাদা করে ডেকে, দুজনের গালেই চুমু খেতেন। তাঁরা এ-ও জানতেন, আমরা আখেরি সিদ্ধান্ত নেবার কেউ নই। আমরা একটা বড় যন্ত্রের ছোট একটা অংশমাত্র। তাঁরা শুধু এটা জানতেন না, আমরা আমাদের প্রচারের ফলে সমস্ত পরিস্থিতিকে এমন যায়গায় নিয়ে গিয়েছি, যেখান থেকে ফিরবার পথ নেই। তাঁরা এটাও জানতেন না, এখন আর আমরা ঘটনার চালক নই। ঘটনার দ্বারাই আমরা চালিত হচ্ছি। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি, মনে মনে ঘাবড়ে গিয়েছি। আমার উপরওয়ালারা নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে আছেন। কমুনিষ্টরা ঘটনাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। ওরা উপর থেকে চতুর সব রণনীতিবিশারদ আমদানী করেছে। আমরা সেখানে মুষ্টিমেয় কজন। তার মধ্যে সব থেকে কর্মঠ রথীন। আমি সর্বতোভাবে রথীনকেই আঁকড়ে ধরেছি। রথীন আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

ইউনিয়ন অফিসে, বাড়িতে সর্বক্ষণ আমাদের আসন্ন সংগ্রামের আলোচনা, সব সময়ই তারই পরামর্শ। রথীনের বউ দিনকতক কৌতুহলবশত এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। তারপর বিরক্ত হয়ে উঠল। "ধর্মঘট আর ধর্মঘট, এ ছাড়া তোমাদের মুখে আর রা নেই গা? রাতদিন এই কচকচি ভাললাগে মানুষের"? শেষে এমন হল যে, এই প্রসঙ্গ ওঠামাত্র সে মারমুখো হয়ে উঠত। আমরা হাসতাম। ওর বউ রাগ করে ঘরে উঠে যেত। আমরা হাসতাম। রথীন হাসতে হাসতে ওর বউকে ডাকত। কোন কোন দিন ওর বউ ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসত। কখনও গুম মেরে শুয়ে থাকত। তখন রথীন আমাকে বলত, "যা তুলে নিয়ে আয়।" আমি ওকে আচমকা পাঁজাকোলা

করে তুলে আনতাম। রথীনের গায়ের উপর ফেলে দিতাম। হাসির দমকে আবহাওয়া হাল্কা হয়ে যেত। আমি একটুও সন্দেহ করিনি, রথীন এতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

রথীন জানত, ওর মনের কথার আঁচ পেলে আমি ভয়ানক কষ্ট পাব। আমাদের এই সম্পর্কের বুনিয়াদ তখনই ধসে পড়বে। এটা তার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। সে আমাকে তীব্রভাবে ভালবাসত। "তোকে আমি আর একদম সহ্য করতে পারতাম না"। রথীন, রথীনের অনুশোচনা, আমাকে জানিয়েছিল। "সে সময় আমার মনে হত, তুই, তুই আমার শনি। এমনও মনে হয়েছে, তোকে আমি সরিয়ে দেব। পৃথিবী থেকে তোর নাম অমি মুছে ফেলব। কিন্তু তোকে দেখলে আর সে কথা মনে থাকত না। সব বিদ্বেষ জল হয়ে যেত"। মৃত স্ত্রীর শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে রথীন বলেছিল, "কার উপব আমার বেশি মায়া—তোর না ওর ওপর—তা কখনোও ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি"।

"আক্রোশে অস্থির হয়ে বউকে অনেকদিন ঠেঙ্গিয়েছি। তোকে খুন করব বলে ছোরা পকেটে করে ঘুরেছি, তোর গায়ে আঁচড় কাটতে পারিনি"। রথীনের শোকার্ত চোখ দিয়ে জলের মোটা ধারা গড়িয়ে পড়েছিল। "আমার বউ এসেছে আগে, তুই এসেছিলে পরে, অনেক পরে। কিন্তু তোকে ভালবেসেছি আগে, বউকে তার পরে, অনেক পরে। তুই না এলে, না থাকলে, বুঝতেই পারতাম না আমার বউ আছে, বউএর মায়া কি তাও জানতাম না।"

এখন আমি আগেকার একটা ঘটনার মানে বুঝতে পারলাম। রথীন ডিউটিতে যাবে, ভিতরে জামা কাপড় পরছে। আমি বাইরে বসে প্রহর গুনছি। হঠাৎ রথীনের বউ আঁৎকে উঠল, "আরে বাপ, এটা কি গো ছো—"

"চুপ!" আমার মনে হল রথীন ওর বউএর মুখ চেপে ধরল। আমি আপন খেয়ালে প্রহর গুনছি: এই রাত আমার হবে, এই ঘর আমার হবে। এই অন্ধকার আমার হবে......

রথীন ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। কোনদিকে চাইল না: রাত্রে ওর বউ প্রবল তড়াসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওর পকেটে ছোরা, ছোরা কেন? ছোরা কেন? আমার ভয় করছে। ভয় করছে"।

"তোমার সব তাতেই ভয়। ভূতের ভয়, ছোরার ভয়।" ঠাট্টা করেছিলাম। "ভয়ের ঘায়ে মূর্ছাই যাও খালি।"

"তোমার ভয় করছে না?"

"না।"

"তোমার পকেটেও ছোরা আছে নাকি?"

"আমার আবার ছোরা দিয়ে কি হবে? এক বাড়িতে একটা ছোরাই যথেষ্ট।"

একথার পর দেখলাম ওর হৃদস্পন্দন শান্ত হয়ে এল। রথীনের বউ তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছিল। ও অনেক কিছুই বুঝত!

আসলে রথীন আগাগোড়া অভিনয় করে গিয়েছে। ওর মনের ভাব আমাকে একবারও জানতে দেয় নি। রথীনের বউও আমাকে কিছু বুঝতে দেয় নি। সেও সুন্দর অভিনয় করেছে।

"সত্যিকারের প্রেমিক যে, পাকা অভিনেতাও সে।" হামজা একদিন বলেছিল।

আমি কি সত্যি সত্যিই কিছু বুঝতে পারিনি? আমিও কি, না-বোঝার অভিনয় করিনি? না কি আমার ভালবাসায় খামতি ছিল? এতদিন পরে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া কঠিন।

দাসদাসী

বিমল কর

'তোমার সংসারে আমি বাজার-সরকারি করব, ঘর পাহারা দেব···সে জন্যে আমি এখানে আসিনি।' শশাঙ্ক রূঢ় নির্দয় স্বরে বলল।

মালতী আশা করেনি স্বামীকে এতটা উগ্র কদর্য রূপে তাকে দেখতে হ'বে। শশাঙ্কর কর্কশ কণ্ঠস্বর সকালের তৃপ্তিটুকু বিস্বাদ করে দিল। ভাল লাগছিল না মালতীর। অল্পক্ষণ আর কোন কথা বলল না। স্বামীর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না মালতীর। নিতান্ত স্বার্থপর ইতর একটা মানুষের দিকে তাকালে যতটা ঘৃণা হওয়া সম্ভব স্বামীর দিকে না তাকিয়ে মালতীর তার চেয়ে কিছু কম ঘৃণা হচ্ছিল না।

তুমি বাজার-সরকার নও, আমিও তোমার ক্রীতদাসী নই। মালতী মনে মনে বলল। হঠাৎ বিরক্ত ঘৃণিত চোখে স্বামীর দিকে পলকের জন্যে তাকাল। আর আত্মবশে না থেকে প্রায় শানিত গলায় বলল, 'তবে কেন এসেছ?'

কি স্পর্দ্ধা! স্পর্দ্ধা কোথায় উঠেছে। রাগে শশাঙ্ক কাঁপছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল মালতীর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিল শশাঙ্ক; গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি তোমার বাজার-সরকারি করতে আসি নি। বা তোমার সঙ্গে খগেনের যে বৈঠক বসবে তার ব্যবস্থা করতেও নয়।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না শশাঙ্ক। চলে গেল।

বাড়ির বাইরে এসে শশাঙ্ক চাপা গলায় স্ত্রীকে এমন একটা সম্বোধন করল যা আগে কখনও করে নি। টুলু রোদে খেলা করছিল, ঝিটা বাসন ধুয়ে তুলে নিচ্ছে, শশাঙ্কর চোখে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু পড়ল না, দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

তখনও চোখ জ্বালা করছিল, মাথা কপাল ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান গরম, হাত ঈষৎ কাঁপছিল। শশাঙ্ক তার রাগের ও ঘৃণার মাত্রা অনুভব করতে পারছিল। এতটা রাগ তার কদাচিৎ হয়েছে। মালতীকে এতখানি ঘৃণা সে কদাচিৎ করতে পেরেছে।

সামনে খগেনবাবুর বাড়ি। বাড়িটা চোখে পড়তে শশাঙ্ক অ-জ্ঞানে তার গতি মন্থর করল, এবং খুব সতর্ক চোখে দেখতে লাগল খগেন এসেছে কি না! বোঝা দুঃসাধ্য। বারান্দায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝের ঘরের পরদা দুলছে। বোধ হয় কেউ গ্রামোফোন বাজাচ্ছে, গান শুনতে পেল শশাঙ্ক।

হাঁটতে হাঁটতে শশাঙ্কর হঠাৎ মনে হল, খগেন এবং মালতীর মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে? থাকা অসম্ভব নয়। এ রকম ক্ষেত্রে হামেশাই এ-সব হয়ে থাকে।

চিন্তাটা অবশ্য ছড়াতে বা লতিয়ে উঠতে পারল না। কারণ শশাঙ্কর ধারণা হল, মালতীর যা বয়েস, যেমন দেখতে এবং যার বছর তিনেকের ছেলে, তাতে খগেন এ-পথে পা দেবে না। পুরুষ মানুষ, খগেনদের মতন মানুষরা অন্তত এতখানি বোকা হতে পারে না।

যদি এরকম একটা ঘটনা থাকত, কলঙ্ক যাকে বলে, শশাঙ্কর পক্ষে ভাল হত। সে স্ত্রী ত্যাগ করত। হ্যাঁ, ত্যাগ। হয়ত আদালত করতে হত ; তাতেও রাজী ছিল শশাঙ্ক।

আদালত টাদালত খুবই নোঙরা ব্যাপার। মানুষ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিলে এ-সব নোঙরামির প্রয়োজন হয় না। শশাঙ্ক সহজ মনেই ভাবছিল, মালতী এবং সে আলাদা ভাবে থাকতে পারে। ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিল এটা যদি ভুলতে না চায় মালতী—সে স্বামীর পদবী, টুলু আর সিঁথির সিঁদূর নিয়ে থাকুক, শশাঙ্ক কোন রকম আপত্তি করবে না, শশাঙ্ক অন্যত্র স্বাধীনভাবে থাকবে।

আজ এই প্রস্তাবটা মালতীর কাছে করে ফেলবে শশাঙ্ক। তার কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। যে-বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সুখ-শান্তি-ভালবাসা বলে কিছুই নেই, নিতান্ত একটি পুরুষ ও নারী এক শয্যায় শুয়ে থাকে এবং এক রান্নাঘরের হাঁড়িতে ভাত খায়, সে-বাড়িকে স্বর্গ বলে ভুল করে কোন লাভ নেই। বা তেমন বাড়িতে আসবাব পত্র ট্রাংক স্যুটকেস বাড়িয়ে মনে করার কারণ নেই এখানে কিছু রচনা করা হয়েছে।

শশাঙ্কর অনুশোচনা হচ্ছিল, তার চরিত্র তেমন মজবুত নয় ; সে কঠিন একরোখা নয়, সমস্যার সঙ্গে সে যুঝতে পারে না—কোন রকমে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে যায়। যদি শক্ত জেদী সবল হতে পারত, তবে মালতীকে অনেক আগেই শশাঙ্ক বলতে পারত, অযথা এই শখের স্বামী-স্ত্রী সেজে থেকে কি লাভ। আমার পোষাচ্ছে না, ভাল লাগছে না ; তোমারও নয়। আমরা আলাদা হয়ে যাই।

দিবাস্বপ্নের মতন শশাঙ্ক আরও স্বপ্ন দেখে নিল, শশাঙ্ক পৃথক হয়ে গেছে, মেসে থাকে, এবং কোন কোনো দিন অফিস থেকে মালতীকে স্কুলে ফোন করে :

'কে, মালতী' ?

'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

'আমি শশাঙ্ক।···টুলু কেমন আছে ?

'ভাল।'

'অসুখ বিসুখ আর করে না ?

'করে, তবে তেমন কিছু নয়, ওই পেটের গোলমাল কি সর্দি।'

'কাকে দেখাচ্ছ ?'

'যে দেখে বরাবর—ভুবন রায়।'

'রাবিশ, ওটা একটা রাবিশ,······তুমি কোনো বাচ্চাদের স্পেশালিস্টকে দেখাও।'

'দেখি।'

'দেখি নয়, এটা জরুরী। নেগলেক্ট করো না।'

'তোমার শরীর কেমন ?'

'ভাল'।

'ওটা এখন সেরেছে, কোন ফারদার ট্রাবল···'

'তুমি কেমন আছ বল ? ভাল আছ !'

'ভালই !···মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মতন হয়েছিল।'

'ছুটি নিয়ে ক'দিন রেষ্ট নাও।'

'তাই ভাবছি।···ও ভাল কথা, সেদিন তোমার সঙ্গে পারিজাতের দেখা হয়েছিল বুঝি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছিল। তোমায় বুঝি বলেছেন ?'

'বলেছে। আমি একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম।—মানে, ও এ-সব ঠিক জানে না কি না। আমায় আজেবাজে কথা বলতে হল।'

'আমাকেও বলতে হয়েছে।'

দিবাস্বপ্ন ভাঙল। এতক্ষণ যেন সত্যি সত্যি শশাঙ্ক ফোনে কান পেতে মালতীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এবং মন ক্রমশ কেমন খিতিয়ে আসছিল। হঠাৎ টেলিফোনের তার কেটে যাবার মতন স্বপ্ন কেটে গেল। বাজারের মুখে পৌঁছে গেছে সে, একটা সাইকেল ঘাড়ে পড়তে পড়তে সামলে পাশের নর্দমায় গিয়ে পড়ল। লোকটা গালাগাল দিচ্ছিল শশাঙ্ককে। অপ্রস্তুত বোধ করল শশাঙ্ক, মাথা নিচু করে বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁটতে লাগল।

সামনেই চায়ের দোকান। বাঙালী চায়ের দোকানটা বেশ গোছানো। ভিড় থাকে না। দোকানের মালিক প্রবীণ ব্যক্তি। বসেছিলেন। শশাঙ্ক দোকানে পা দিতেই ডাকলেন, 'আসুন।'

শশাঙ্ক বসতে যাচ্ছে, ও-পাশ থেকে মেয়েলি গলায় চাপা একটু হাসি উঠল, শশাঙ্ক আড় চোখে তাকাল। কারা যেন বসে আছে।

'চায়ের সঙ্গে গরম সিঙ্গাড়া দেব নাকি বলুন ?' মালিক বললেন, 'একেবারে গরম। কপির সিঙ্গাড়া। আজই প্রথম তৈরী করলুম।'

'দিন।' শশাঙ্ক সামনের দিকে খোলা জায়গায় বসল।

মালিক খবরের কাগজটা শশাঙ্কর টেবিলে দিতে বলে অন্য কাজে মন দিলেন। দোকানের বাচ্চাটা ভাঁজ করা কাগজ শশাঙ্কর টেবিলে রেখে দিল।

কাগজ সম্পর্কে শশাঙ্ক কোনো উৎসাহ বোধ করছিল না। বাসি কাগজ। তা ছাড়া জগতে কোথায় কি ঘটছে তা নিয়ে শশাঙ্কর আপাতত মাথাব্যথা নেই। তার নিজের জগতে কি ঘটছে এ-খবর কে রাখে !

কাজটা বোধ হয় ভাল হয় নি। ভোর বেলায় ঠিক এইভাবে মালতীর সঙ্গে ঝগড়া করে আসা ঠিক ভদ্রজনোচিত হল না; মালতীর তেমন দোষ কোথায় ? শশাঙ্ক যদি বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, আর মালতী যদি স্বাস্থ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকে, তাকে সকাল-বিকেল খানিকটা বেড়াতে হবে বই কি। মালতী কোনো অন্যায় করে নি। সে ভোরে উঠে চা খেয়ে ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে বেড়াতে চলে গেছে। ফেরার পথে সংসারের কাজ কিছু সেরে এসেছে। এর মধ্যে দোষ বা ত্রুটি কোথায়, শশাঙ্ক এখন ঠাণ্ডা মেজাজে আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গরম সিঙ্গাড়া আর চা এল। শশাঙ্ক অন্যমনস্ক মনে সিঙ্গাড়া খেতে লাগল।

সামনে রাস্তা। দু ধারে ঘন গাছ। পোষ্টঅফিসের পিয়ন যাচ্ছে। কতক চেঞ্জার ঘুরে বেড়িয়ে

সওদা করছে। ঝাঁকা মাথায় একটা মুটে চলেছে। ঝাঁকাটায় কি আছে শশাঙ্ক জানে। মুরগী। দড়ির জালের মধ্যে কয়েকটা মুরগী মরার মত পড়ে আছে। নিজেকে শশাঙ্কর ওই রকম মুরগী বলে মনে হচ্ছিল। স্ত্রীকে অপছন্দ করুক কি ঘৃণা করুক, মালতীকে যেমনই মনে হোক তবু এই স্ত্রী, এই সন্তান, এই সংসার, সমস্ত পারিবারিক এক সম্পর্কের মধ্যে সে ফাঁদে ধরা জন্তু হয়ে আছে। তার করার কিছু নেই। বাস্তবিক, স্ত্রীকে সে ত্যাগ করতে পারবে না, ছেলেটাকে হটিয়ে দিতে পারবে না।

গরম চা পর পর কয়েক চুমুক খেয়ে শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধরাল, সিগারেট ধরিয়ে শূন্য চোখে সামনের দিকে চেয়ে থাকল। বেলা বেড়ে ওঠায় রোদ মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে দোকানটার কাছে চলে এসেছে। ঘাস-প্রজাপতি উড়ছিল···

'ও মা—!'

শশাঙ্ক ঘাড় তুলে তাকাল।

'তুমি? তুমি কোত্থেকে?'

'আরে রেণু—' শশাঙ্ক চোখের পলক ফেলতে পারছিল না। এটা সম্ভব কি সম্ভব নয়, হতে পারে অথবা হয় নি কিম্বা—নিতান্ত আর-এক দিবাস্বপ্ন কিনা শশাঙ্ক হুঁশ করতে পারছিল না।

রেণুরা ওই দূরের টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল। রেণু, আর একটি মেয়ে এবং একটি তরুণ গোছের ছেলে।

রেণুর ঘোমটা মাথা থেকে খসে ঘাড়ে লুটোচ্ছিল। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। সত্যি, তুমি ত?'

'তুমি কি ভূত ভাবছ।' শশাঙ্ক ভূত শব্দটা বলার পর মনে মনে অর্থ বিস্তার করছিল। এখন, বাস্তবিক আমি তোমার কাছে ভূত বই আর কি।

'এ আমার ননদ, চন্দ্রা; আর এ আমার ছোট দেওর মলয়।' রেণু তার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, চন্দ্রা এবং মলয়ের দিকে প্রচণ্ড খুশীর চোখে চেয়ে বলল, 'আর এই যে ভদ্রলোক—এঁর নাম শশাঙ্ক, আসলে একটা কলঙ্ক—'বলে রেণু এই কথায় শশাঙ্কর মুখের ভাব লক্ষ্য করে নিয়ে আরও হেসে বলল, 'আমরা এক শহরের ছেলে-মেয়ে, খুব ভাব ছিল পরিবারে পরিবারে। একবার আমাদের ওখানে পূজোর সময় একটা থিয়েটার করা হচ্ছিল, ছেলেদের থিয়েটার, উনি পার্ট নিয়েছিলেন।—স্টেজে ঢুকে আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, সিন ফেলে দিতে হয়েছিল। সেই থেকে, নন্দদুলালদা বলতেন, ও একটা কলঙ্ক আমাদের। সেই কলঙ্ক।' রেণু হাসতে হাসতে মুখোমুখি আসনে বসে পড়ল।

শশাঙ্ক বুঝতে পারল, এই কাহিনীর ওপরটা যত সরল ভেতরটা তত সরল নয়।

'তারপর, তুমি হঠাৎ এখানে কোত্থেকে?' রেণু শুধালো।

'এলাম।' বলে শশাঙ্ক চন্দ্রা এবং মলয়ের দিকে তাকাল, হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'দেখছ তো ভাই, তোমাদের বউদির এই রাজত্বে যেন আমার অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে।'

'না—না বাবা, আমার রাজত্ব ফাজত্ব নয়—' রেণু হাত নাড়ল মুখের সামনে। 'তুই বসবি চন্দ্রা, বোস।···ছোট্ঠাকুরপো, তুমি বাপু ওই ঝামেলাটা সেরে এস।'

'কোনটা আনব বল?' মলয় শুধালো, 'যদি বদলে দেয়, তা হলে সেই ফুল ফুল ছিট দেওয়া কাপড়টা আনব?'

'ওমা, সেকি! ফুল ফুল ছিট দিয়ে কি আমার কাজ হবে নাকি। তুমি তা হলে এতক্ষণে শুনলে কি ঘোড়ার ডিম।'

'বাঃ, ছিটের কথাই ত বলছিলে তুমি।'

'বয়ে গেছে আমার—।' রেণু একেবারে টানা ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে দিল, 'আমি ছিট বলি নি, বলেছি ছিটের মতন—সেই যে ভায়োলেট মতন কাপড়ের একটা প্রিন্ট ডিজাইন ছিল—'

'বউদি—'মলয় যেন সব গোলমাল করে ফেলেছে এমন ভাবে বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই। তুমি চল।'

'আহা, যদি দোকানদারটা না দেয়, অপমানের একশেষ।'

'বেশ আছ। এই, তুই চল।' মলয় চন্দ্রাকে ডাকল।

চন্দ্রা বউদির দিকে তাকাল। যাবে না কি? তার যাবার ইচ্ছেই যেন বেশী।

'যাবি তুই?'

'যাই না।'

'তবে যা। ওই ভায়োলেটটাই নিস—'

চন্দ্রা মলয় চলে গেল। যাবার সময় মলয় বলে গেল শশাঙ্ককে, 'ঝামেলাটা মিটিয়ে আসি। যত মেয়েলি কাণ্ড—'

শশাঙ্ক চায়ের কাপ শেষ করে, আরও এক কাপ আনতে বলল।

'আমার জন্যে—, আমি আর খাব না' রেণু মাথা নাড়ল।

'আমার জন্যে।'

'পর পর দু কাপ! আমায় দেখে কি তোমার মাথা ঘুরে গেছে নাকি?' রেণু হাসল।

'প্রায়।......তার পর তুমি এখানে?'

'আমরা পরিবারসুদ্ধ চেঞ্জে এসেছি।......এখানে আমার মামাশ্বশুরের বাড়ি আছে একটা। ওই নদীর দিকটায়।'

'তোমার প্রভু কই?'

'কে?'

'প্রভু—'

'উ, প্রভু। অমন প্রভু আমার থাকে না। বরং বলো আমিই......' রেণু থেমে গেল। কিন্তু রেণুর মুখ-চোখ, কথার হালকা ভঙ্গি সবই অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

'তুমিই তা হলে প্রভুনী।'

'আমি জানি না, তোমার যা খুশি বল।' রেণু হাতের বালা ঠেলে পিছিয়ে দিল, গা কাঁপালো একটু, 'এখানে বেশ শীত, না? তোমার খবর কি? এখানে এলে হঠাৎ?'

'বেড়াতে। তোমাদেরই মতন।'

'একা?'

'বিয়ে করলে একা কোথাও যাওয়া যায় নাকি? এক স্বর্গ ছাড়া!' শশাঙ্ক বেঁকা করে হাসবার চেষ্টা করল। অথচ গলার স্বর, হাসির চেষ্টা অত্যন্ত করুণ দেখাল।

'যাঃ, কি বলো যে!······তোমার বউ এসেছে? সঙ্গে করে নিয়ে বেরোয় নি কেন, আলাপ হয়ে যেত।'

'হবে, পরে হবে?······তা তোমার কর্তা কই? তাকে বেড়াতে নিয়ে বেরোও না?' শশাঙ্ক ঠাট্টা করবার চেষ্টা করল।

'না। যদি কেউ চুরি করে নেয়।' লাল চোখের ঝাপটা দিয়ে রেণু এমন করে হাসল যে শশাঙ্ক মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

দ্বিতীয় কাপ চা এসেছে। শশাঙ্ক আরও একটা সিগারেট ধরাল।

'ও এখানে নেই। আমেরিকায়।'

'আমেরিকায়?'

'ওমা, ছ' মাসের বেশী হতে চলল, জানো না? কাগজে বেরিয়েছিল?' রেণু এমন মুখ করল যেন এ-খবরটা না জানা রীতিমত বিস্ময়ের।

শশাঙ্ক মুখ নিচু করে নিল। মনে হল বলে, আজকাল কারুর বাড়িতে সকাল বেলায় ডাকতে গিয়ে শোনা যায়, সে আমেরিকা কি লণ্ডন, না হোক জাপান চলে গেছে। আগের দিন এক সঙ্গে থলি হাতে বাজার করলাম, পরের দিন একেবারে লণ্ডন। মুখে কিছু বলল না শশাঙ্ক, রেণুকে আঘাত দিতে তার ইচ্ছে করছিল না।

'কতদিন থাকবে?' শশাঙ্ক শুধালো স্বাভাবিক গলা করে।

'আরও এক বছর। অফিস থেকে পাঠিয়েছে কিনা! ইচ্ছে থাকলেও পালিয়ে আসার উপায় নেই।' রেণু পিঠ থেকে গায়ের পাতলা চাদর সামনে টেনে নিল। চাদরটা খুব বাহারী। রেণুকে বেশ মানিয়েছে। পাতা সবুজের ওপর মেটে লালের ফুটকি। এমন সবুজ—সুন্দর চোখ জুড়োনো সবুজ শশাঙ্ক কদাচিত দেখেছে।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে যেন পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচেন—' শশাঙ্ক ঠাট্টা করল।

'তা এক রকম সত্যি।' রেণু ঠোঁট ঝুলিয়ে হাসল।

'ভয়ঙ্কর টান।'

'আহা—।' রেণু পলকের জন্যে শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

রেণু আরও ফর্সা হয়েছে। গায়ে বেশ লেগেছে। অথচ মালতীর মতন মোটা নয়। এখনও রেণুর চোখে মুখে সেই সুশ্রী ভাবটা আছে। অথচ কত তরল হয়ে গেছে! না একে তরল বলে না, বলে খুশী। রেণু এখন খুশীতে ভরে আছে, সুখে আছে। শশাঙ্ক রেণুর বিবাহিত জীবনের কিরণ-ছটা যেন দেখতে পাচ্ছিল।

'তোমার কথা বল। কোথায় উঠেছ এখানে?' রেণু জিজ্ঞেস করল। 'কি নাম বাড়িটার?'

'বাড়ির নাম নেই। খগেনবাবুর বাড়ির কাছে।'

'খ-গেন বাবু! কি জানি! আমি কিছু চিনি না।......তোমার বউকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'দেখার মতন কিছু নয়।' শশাঙ্ক আবার সিগারেট ধরাল।

'ঠাট্টা?—আমি শুনেছি তোমার বউ খুব লেখাপড়া জানা।'

'আর কি শুনেছ?'

'মাস্টারি করে যেন কোন মেয়ে স্কুলে।'

'স্কুলে শুধু নয়, আমার ওপরেও।'

রেণু খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে মাথা তুলে ঘাড় হেলিয়ে দম ফেলছিল। আর শশাঙ্ক রেণুর গলার সেই নীল শিরা দেখছিল। আগে যেমন শিরাটা নীল হত, ফুলত, এখন তেমনি ফুলে উঠেছে।

'বাব্বা, কথা বলতে শিখেছ খুব।' রেণু হাসি থামাল।

'মাস্টারনীর সঙ্গে ঘর করতে হয়, না শিখে উপায় আছে।'

সামান্য চুপচাপ। রেণু যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। তাকে খুব খুশী আর আনন্দিত মনে হচ্ছিল। শশাঙ্ক অন্যমনস্ক, ধোঁয়া টেনে গলার মধ্যে যেন জ্বালাটা আরও উগ্র করে তুলছিল। কেন যেন ভাল লাগছে না শশাঙ্কর, রেণুকে তার ভাল লাগছে না। নালার কাছে কাঁটা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক বুঝতে পারছিল, রেণুর ওপর তার ঈর্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। এই ঈর্ষা অনুচিত, এই ঈর্ষা ইতরজনের। শশাঙ্ক বুঝতে পারছিল, তবু ঈর্ষাকে সরিয়ে রাখতে পারছিল না।

'তোমার ছেলেমেয়ে...?' রেণু আগ্রহ জানাল।

'একটি ছেলে।' বলে শশাঙ্ক একটু থামল, তার পরই যেন কি ভেবে বলল 'এখন বোধ হয় তার মার মাথা খারাপ করে তুলছে।' কথাটা বলার পর শশাঙ্ক ভাল করে লক্ষ্য করল। সে কি রেণুর মতন তার গলায় পারিবারিক সুখের তাপ ফোটাতে পারল। সন্তান এবং স্ত্রীর সম্পর্কে এই ধরণের কথাগুলো কি বেশ গাঢ় অন্তরঙ্গ শোনায় না!

'ছেলের কি নাম রেখেছ?' রেণু শুধালো।

'টুলু।'

'টুলু!' বা বেশ নাম! আমাদের বুলুর সঙ্গে বুঝি মানিয়ে রেখেছ।' রেণু হাসিমুখে বলল, বলতে বলতে কয়েকবার চোখের পলক ফেলে নিল।

রেণুর এই পুরোনো দোষটা এখনও আছে। শশাঙ্ক মনে করতে পারল একটু বেশী রকম খুশী হলেই রেণু ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলত। এখনও ফেলে। তবে...তবে এখন রেণু সতত খুশী, তার চোখের পাতা সব সময় কাঁপছে, পড়ছে—এমন হওয়া উচিত ছিল।

'তোমার কথা বলছ না যে!' শশাঙ্ক ভদ্র ভাষায় বক্তব্য ইঙ্গিত করল। পুরুষের পক্ষে কোন মেয়েকে একথা বলা মুশকিল, তোমার কটা বাচ্ছা কাচ্ছা। অথচ মেয়েরা কী অক্লেশে কথাটা শুধোয়!

'একটি মেয়ে...'রেণু গলার হারে আঙুল রাখল, 'তিনি এখন দাদুর কাছে যত রাজ্যের গজর গজর করছেন। মেয়েটা এত বকবকও করতে পারে। একেবারে বকবকম পায়রা।' রেণু মেয়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা কাটাতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৃত্রিম বিরক্তি এবং অকৃত্রিম পরিতৃপ্তি ফোটাল!

'আমার মেয়ের নাম রাণী।...ওর বাবা রেখেছে। কী পুরোনো সেকেলে নাম।' রেণু আঙুলটাকে আঁকশি করে হারটা বুকের ওপর টানছে, ঘষছে। চোখ ভরা উচ্ছ্বাস, হাসি।

'রেণুর মেয়ে রাণী। বেশ ত নাম রেখেছেন তোমার কর্তা। মানিয়ে রেখেছেন।' শশাঙ্ক হাসবার চেষ্টা করে বলল।

'মানিয়ে না আর কিছু!' রেণু ছেলেমানুষের মতন ঠোঁটের আগা উল্টে চমৎকার ভঙ্গি করল, 'আমি বলেছিলাম অতসী নাম দিতে।'

'ভাল নাম।'

'শুধু ভাল, কি চমৎকার।...মেয়েটা যাই বল বাপু, নিজের মেয়ে বলে বলছি না, মায়ের চেয়ে অনেক সুন্দর।' রেণু কন্যা-গর্বে স্মিত মুখ করল।

শশাঙ্ক রেণুর পূর্ব রূপ মনে করবার চেষ্টা করল। রেণু সুন্দরী ছিল না, সুশ্রী ছিল। আজ রেণু সুন্দরী হয়ে উঠেছে। পুরোনো রেণু, শান্ত স্বল্পবাক সুস্থির ছিল। তার হৃদয়ে কোথাও বেদনা এবং হতাশা ছিল। আজ রেণুর সর্বত্র সুখ, তৃপ্তি; তার বেদনা নেই, ক্ষোভ নেই। শশাঙ্ক অসন্তুষ্ট হচ্ছিল যেন। ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার জিজ্ঞেস করে, রেণু তুমি এত সুখী হলে কি করে।

মলয় এবং চন্দ্রা আসছিল। অনেকটা দূরে। শশাঙ্কর চোখে পড়ল।

'ওরা আসছে।' শশাঙ্ক বলল।

রেণু ঘাড় ফেরাল। দেখল। মুখ ফিরিয়ে শশাঙ্ককে বলল, 'তুমি উঠবে না?'

'উঠব একটু পরে।'

'আবার পরে কেন, আর কত চা খাবে। ওঠো। চল না আমাদের সঙ্গে। বাড়িটা দেখে যাবে বউকে নিয়ে বিকেলে এস।'

'তোমার সবই যে তাড়াতাড়ি। হবে একদিন।'

'আজই হোক।'

'আজ নয়। আমায় কিছু সংসারের জিনিষপত্র কিনতে হবে।'

রেণু দু পলক চোখে চোখে চেয়ে থাকল শশাঙ্কর দিকে। কেমন ঠাট্টাচ্ছলে শব্দ করল একটু। বলল, 'তুমি বউয়ের পাল্লায় পড়ে কাজের লোক হয়ে গেছ।'

শশাঙ্ক জবাব দিল না। কিন্তু অনায়াসে ভাবতে পারল, রেণু তার স্ত্রী হলে—ঠিক উল্টো কথা বলত, তখন শশাঙ্ক অকেজো অথর্ব অপদার্থ মোটামুটি এই রকম একটা মনোভাব থাকত রেণুর।

'আমি তবে উঠলাম—'রেণু উঠল। গায়ের সুন্দর শালটা গলার দিকে টানল একটু। বাঁ হাত মুঠো করে মুখের কাছে খুক্ খুক্ করে সামান্য কাশল। 'আমাদের বাড়ির নাম 'পূর্ণিমা লজ', নদীর দিকে বাড়ি। তুমি বউ নিয়ে এস। এমনিও সকাল বিকেল বেড়াতে বেরুলে দেখা হয়ে যাবে—' বলে হাসল রেণু, হেসে আঁচল টেনে এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে রেণুকে এখনও অবিবাহিত মেয়ের মতন লাগছিল। স্থূলতা নেই, বাহুল্যের ফলে যে বিকৃত লালসা জাগা সম্ভব সে বাহুল্য নেই। সুরুচিসম্মত ভাবে হাঁটতে পারে রেণু। যে কোনো পুরুষ দু মুহূর্ত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে পারে।

রেণুর পরিবর্তে ওখানে মালতী হেঁটে গেলে কেমন দেখাত, শশাঙ্ক একবার ভাববার চেষ্টা করল। তারপর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে চায়ের দোকানের মালিকের দিকে তাকাল, 'পয়সাটা নিন।'

রেণুরা চলে যাচ্ছে। কিছু চেঙ্গার ছোকরা রাস্তা দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গলা জড়াজড়ি করে চলেছে। দেহাতি সব্জিঅলা দু-একজন ওদিকে কাঁঠালতলায় ঝুড়ি নামিয়ে বসে পড়েছে।

শশাঙ্ক অমনোযোগে দৃশ্যগুলো দেখল, উঠল। চায়ের পয়সা ফেলে দিয়ে, নতুন সিগারেটে আগুন ছুঁইয়ে নিয়ে বাইরে মাঠে পা দিল।

দুপুরটা এখানে, এই প্রথম শীতে, বেশ আমেজ মেশানো। শীত সামান্য পড়েছে; রোদ উজ্জ্বল ছিল বেলা পর্যন্ত, তারপর ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে, পর্যাপ্ত রোদ খেয়ে খেয়ে এখন ঘাস তার সবুজে পালংক পেয়েছে, হরিতকীগাছের পাতা কদাচিত বাতাসে খসে পড়েছে, আর যত টিকরি পাখি কিচমিচ করে দুপুরটা ভরিয়ে রেখেছে।

তিন দিন হল এখানে আসা, গত দুটো দিন শশাঙ্ক টানা ঘুমিয়েছে। আজ ঘুম নেই। ঘরে মালতী গায়ের ওপর চাদর টেনে নিয়ে বালিসের পাশ দিয়ে এলো চুল ছড়িয়ে উপন্যাস পড়ছে। অন্তত পড়ার ভান করছে। টুলু মায়ের পাশে ঘুমিয়ে। শশাঙ্ক খানিকক্ষণ স্ত্রীর পাশে তার আলাদা ঝোলা খাটটায় পাশ ফিরে জানালার দিকে মুখ করে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ক্রমশ অস্বস্তি এত বাড়তে লাগল যে, এক সময় বাইরে চলে এল। বাইরে মানুষ কতক্ষণ অকাজে দাঁড়িয়ে থাকতে বা ঘুরতে পারে, কাজেই আবার ঘরে আসতে হল।

মালতী দুপুরে ঘুমোতে পারে না। স্কুলের টিচার হয়ে এবং ক্রমাগত আট বচ্ছর চেয়ারে পিঠ রেখে মেয়েদের সঙ্গে চেঁচিয়ে এই অভ্যাসটা হয়ে গেছে। দুপুরে ঘুমোবে না। ঘুমোলে রাত্রে ছটফট করবে। আর মালতী জেগে থাকলে শশাঙ্কর পক্ষে ঘুমোনোও মুশকিল।

তবু, এখানে, এই নতুন জলে মাটিতে হাওয়ায় মালতী দিবানিদ্রার চেষ্টা করে দেখতে পারত।

শশাঙ্ক আবার ঘরে ঢুকে মালতীকে অবিকল আগের মতন শুয়ে থাকতে দেখল। তফাত এই, চাদরের তলা দিয়ে মালতীর মোটা একটি পা বেরিয়ে রয়েছে, পায়ের অনেকখানি আবরণহীন। বেরিবেরি হলে মানুষ ফোলে, সেই রকম ফোলা পা। অন্য তফাত এই, বালিশের ওপর মাথা আরও খানিকটা উঠিয়ে দিয়েছে মালতী।

নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল শশাঙ্ক। মালতী ঘুমোলে সে একটু স্বস্তিতে দুপুরটা কাটাতে পারত।

আজ স্বামী-স্ত্রীতে আর কথা হয় নি। কোনো রকম বাক্য বিনিময় নয়। অনেকটা বেলা করে শশাঙ্ক কিছু অপ্রয়োজনীয় বাজার সেরে ফিরেছে। যার মধ্যে সকালের ঘটনার একটা প্রতিশোধ-স্পৃহা ছিল। কনডেনস্‌ড মিল্ক দু টিন, বিস্কুট দু টিন, পুরো এক পাউণ্ড চা। আর যা বাজার তার মধ্যে অবশ্য শশাঙ্কর এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না: সকালে তোমার বাড়িতে আমার চা খাওয়ার জন্যে আজ মিল্ক, বিস্কুট কিছু ছিল না।

মালতী জিনিসগুলো ছোঁয় নি। ও-ঘরে যেমন রাখা হয়েছে, তেমনি পড়ে আছে। শশাঙ্ক দেখেছে, কোনো কথা বলে নি। নিত্যকার মতন স্নান করেছে শশাঙ্ক, খেয়েছে, বিছানায় এসে বসেছে।

মালতী স্বামীর সঙ্গে খেতে বসে নি। পরে খেয়েছে। পরে ঘরে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়েছে উপন্যাস নিয়ে।

আপাতত, বিছানায় শুয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শশাঙ্কর মনে হল, এই নীরবতা—পরস্পরকে বিন্দুমাত্র শান্তি দিচ্ছে না। যদিচ কলহ, কথা-কাটাকাটি কিংবা স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব কোথাও প্রকাশ্য ভাবে নেই, তবু মনে মনে নিদারুণ অশান্তি। শশাঙ্ক কি মালতীকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে? পারছে না। রেণুর কথা কতবার ভাববার চেষ্টা করল, মন অন্যমনস্ক হল না। রেণুকে এ-ঘরে প্রবেশ করানো তার পক্ষে অসাধ্য হল।

মালতী উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পড়তে পারছে—এমন কথা শশাঙ্ক স্বীকার করল না। ও ভান করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভান করা কি সম্ভব? কেন নয়—, কেন সম্ভব নয়, শশাঙ্ক নিজেকে বলল, যদি আজ পাঁচ বছর স্ত্রী হবার ভান করে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে—তবে একটা বাংলা উপন্যাস চোখের সামনে মেলে ধরে দুপুর কাটানো যায় না!

এখানে না এলেই ভাল হত। শশাঙ্ক ভাবছিল, সে একটা ছুঁতো করে কলকাতায় যদি ফিরে যায়—, মালতী আর টুলু এখানে থাকে তবে কেমন হয়! মালতী রাজী হবে না। কেন হবে না, তার খগেন ত এসে পড়েছে, দশ-বিশ হাত দূরেই থাকবে, তবে আর ভয় কিসের!

খগেন এখন মালতীর দাস হতে পারে। মালতী খগেনের দাসী। উভয়ের স্বার্থ উভয়কে রক্ষা করতে হবে। নয়ত খগেন সেক্রেটারী থাকবে না, মালতী হেড্‌মিসট্রেসের চেয়ার থেকে ভূতলে পড়বে।

মানুষ কত স্বার্থপর, তার পায়ে পায়ে কত হিসেব, এ বোঝার জন্যে অত দূরে গিয়েও শশাঙ্ক শান্তি পেল না। কারন নিজের কথাটাও তার মনে আঁচড় কাটতে লাগল। স্বার্থপর ত তুমিও। তুমি কোন ঔদার্যে মালতীকে বিয়ে করেছিলে? মালতী কেন আবার তোমার গলায় বরমাল্য দুলিয়েছিল?

চোরা চোখে, বালিশে ডান পাশে মাথা ঘুরিয়ে স্ত্রীকে একবার দেখে নিল শশাঙ্ক। হাতের বইটা নিয়ে মালতী ছেলের দিকে পাশ ফিরেছে। মালতীর মোটা, প্রায় ছোলার বস্তার মতন পিঠ—চওড়া হ্রস্ব কাঁধ এবং ঘাড় দেখা যাচ্ছে। শশাঙ্কর ভাল লাগল না দেখতে।

নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিল শশাঙ্ক। বিবাহিত জীবনে—কিছুতেই এ অন্তর্ক্ষোভের অবসান তার হল না। কতবার মনে করেছে, আর নয়, এবার শেষ করব, স্বীকার করে নেব, আমি স্ত্রী-পালিতা, আমার ক্ষমতা ছিল না বলে বিয়ে করেছি, মা-বোনের প্রবাসী সংসারকে বউ দিয়ে টানাচ্ছি, নিজে বউকে টানছি বা যুগ্মভাবে আমরা যা টানছি—আমার একার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমি ঠিক সে-রকম যোগ্য পাত্র নয় যার জন্যে পাত্রী অঢেল। অথচ ঈশ্বরের কৃপায়, আমাকে সংসার, শরীর ও মন—এই তিনের দায় বইতে হয়। মালতী আমার দায় বয়ে দিচ্ছে।

শশাঙ্ক এই রকম চিন্তা যতবার করেছে ততবার আরও অবসন্ন অসহায় বোধ করেছে। এ-ভাবে স্ত্রীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা যায় নাকি? যেত, বা যাওয়া সম্ভব ছিল, যদি শশাঙ্ক তার রুচি ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাল মন্দের জ্ঞান, কর্তব্য অকর্তব্য বোধ বুদ্ধি নিয়ে তার মতন করে গড়ে না উঠত। এখন, যখন কি না—প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সে শশাঙ্ক হয়ে উঠেছে—তখন আর রাতারাতি কি করে এই অদৃশ্য অথচ নির্মিত সত্তাকে সে বিসর্জন দেবে।

শশাঙ্কর গ্লানি তাকে পীড়িত করছিল। বেদনা প্রায় কান্নার উচ্ছ্বাসের মতন গলার কাছে এসে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আর বাইরে ফিকে রোদ মাঠ ঘাস গাছ থেকে ক্রমশ মলিন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছিল। যেতে যেতে এক সময় রোদ কোথায় যাবে, কোন প্রান্তে, শশাঙ্ক দেখতে পাবে না, পরিবর্তে ছায়া নামবে, ছায়া থাকবে, ঘন এবং অন্ধকার হবে। শশাঙ্কর মনে হল, একদিন তারা—সে আর মালতী ওই রকম বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন দূরান্তের দুই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হয়ে উঠবে। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের মাঠের দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক বেলা পড়ে আসার চিহ্ন দেখতে পেল।

অথচ, এই দুই বিচ্ছিন্ন নিঃসম্পর্ক যুবক-যুবতী স্বামী স্ত্রী হিসেবে এক ঘরের শয্যায় একত্রিত থেকে প্রমাণ করবে তারা অবিচ্ছিন্ন, একাত্ম।

শশাঙ্ক রেণুকে মনে করবার চেষ্টা করল। রেণু এবং তার স্বামী এই দ্বৈত বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত কি না ভাববার চেষ্টা করল। মনে হল, মুক্ত নয়। কে বলবে, রেণু তার (শশাঙ্কর) মতন পর-মুখ নিয়ে বেঁচে আছে কিনা। শশাঙ্ক যতবার নিজের মুখ প্রকাশ করতে গেছে ততবার ধিক্কৃত হয়েছে। সংসার তোমার মুখ দেখতে চায় না, তার ছকের সাজঘরে অনেক মুখ আছে যা সযত্নে তৈরী করা। তোমার কাজ ওই সাজঘর থেকে একটি মুখ ভাড়া করে রঙ্গমঞ্চে নেমে যাওয়া।

শশাঙ্ক পাঁচ বছর এ ক্ষেত্রে যা করেছে এখন সেই রকমই করবে মনস্থ করে বিছানা থেকে উঠে বসল। আপাতত তার ভদ্র প্রেমিক অনুতপ্ত মার্জনাপ্রার্থী এক স্বামীর মুখ চাই।

সামান্য কষ্ট হল, কিন্তু শশাঙ্ক তার প্রয়োজনীয় মুখ পেয়ে গেল। গলা পরিষ্কার করে স্ত্রীকে বলল, 'বিকেল হয়ে গেছে, একটু চা খাওয়াও।'

মালতী জবাব দিল না। শশাঙ্ক জানত, মালতীকে একটু সময় দিতে হবে। সময় নিয়েই মালতী যোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

কবিতাগুচ্ছ

হরপ্রসাদ মিত্র

আলো

ছোটো মেয়েটিকে দেখো, দেখো—সকালের আলোতে দেখো।
রোদ এলিয়ে পড়েছে ও-বাড়ির দেয়ালে,
সবুজ রঙ্ জ্বল্‌ছে জানলায়,
দরজায় হলুদের সঙ্গে শাদা,
সিঁড়ির রেলিঙে কালোতে-শাদাতে খানিকটা ছোপ।

আমাদের চোখে আলোর ঢেউ লাগে,
চৈতন্যে তারই নাম সুখ দুঃখ;
অথচ এ জগৎ সুখও নয়, দুঃখও নয়।
ঘড়ি দেখলুম। ঘড়িতে সাড়ে-দশটা বেলা।
সময়ের কোন কূলে উঠেছি জানিনা।
জগতের কোন প্রান্তে?
থাক্ থাক্ ছোটো মেয়েটির ফ্রকের জাফরাণী রঙ দেখো।

মাঝে মাঝে জীবনের মানে জিজ্ঞেস করে কেউ,
কেউ বা গভীরভাবে তাকিয়ে থাকে,
—যেন প্রশ্ন করে।
মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যুদ্ধবাজ জুয়াড়ীরা জুয়া খেলে।
যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা প্রশান্ত হাসি হাসেন।
আর, প্রাণের গভীর, সতেজ অব্যর্থতা
জ্বলছে দেখো
সকালের জাফরানী ফ্রকে, সবুজ জানলায়, প্রত্যেকটি সিঁড়িতে।

বেঁচে থাকা যার নাম

অগ্নিশিখার মতো নয়,
নয় তলোয়ারের মতন।
উপমা খুঁজতে গিয়ে মন মুষড়ে যায়
জবরদস্ত অদৃষ্টের স্তম্ভ উঠেছে যেন
সর্বংসহা মাটির বুকে।
আকৃতিহীন পিণ্ডবিস্তার এই আসক্তি—
বেঁচে থাকা যার নাম।

এই ওঠা বসা হাঁটা,
হাঁটার তালে তালে বিঁধতে বিঁধতে
নিজেকে চিনিয়ে দেয় এই কাঁটা
বেঁচে থাকা যার নাম।

প্রতিভা

তুমিও নির্লজ্জ হও—হবে তুমি তীর্থপতি, নেতা
প্রবেশ সহজ যার সংসারের সকল সভাতে
বুদ্ধ গান্ধী অরবিন্দ রবীন্দ্র ও তাঁদেরই সারিতে
তুমিও বসবে ভোজে—বহুদীর্ঘ চর্বণে লেহনে
আহারে ও পানসুখে হবে তুমি অভিজাত গুণী
এ দেশে তোমার কেল্লা হবে জেনো সমুচ্চ, দুর্জয়
তুমিও চতুর হও—যেমন জেনেছে যদু-মধু
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় যাক্—প্রতিভা তো নয় কুলবধূ।

সংযম সন্ধান

আজ এই মেঘলা দিনে আমগাছটা
হাওয়ায় দুলছে—
তাই মনে পড়লো আর একটা আমগাছ।
তার রাস্তায় বেগুনী ঝুরি,
তার ওপরদিকের ডালে কবুতরের বাসা।

প্রাণ আমার—হায় রে হায়,
সেখান থেকে চলে এসেছো,—
আর ফেরা যাবে না সেখানে
যেখানে ছিলুম একদিন—সেও পরমাশ্চর্য,
সেই বেগুনী ফুল, আর গাঢ় সবুজ পাতা
কবুতরের পাখার পৎ পৎ
সেই অন্য কালে,—
অন্য জগতে, অন্য এক প্রাণলোকে বাস !

—আর, আজ আর এক গাছের
এই চোখের সামনে—
সেদিনের সঙ্গে এ দিন মিলিয়ে
মনে হোলো এও পরমাশ্চর্য !
বিশাল আকাশের নিচে
পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে
একই চেতনার প্রকাশ !

তবু তো ট্রাম থেকে রাস্তায় নামা চাই,
রাস্তা পার হয়ে—চাই
বিবেচনা, সামঞ্জস্যবোধ, সৌজন্যের ঘরে ওঠা।
প্রেম থেকে ব্যর্থতায়,
ব্যাধি থেকে আরোগ্যে,
জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে
কিংবা মৃত্যু ভোলবার আয়োজনে
চঞ্চল বালকের মতো নানাখান
হয়ে ছড়িয়ে পড়ার এই খেলা
—এরই নাম মানবজীবন।

এরা একদিকে মসৃণ সংযম,

অন্যদিকে দুরারোগ্য সন্ধান

তবু বিরোধ নেই,—কোনো বিরোধ নেই

দুয়ের মধ্যে।

যেন একই দৃশ্য ছড়িয়ে আছে

সেকালে, একালে

মেঘলা দিনের এই আমগাছের দোলায়!

বাংলার লোক-নৃত্যের ভুমিকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রথমতঃ তুর্কী আক্রমণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পর বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন হইতে ইহার যে সকল জাতীয় উপকরণ বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, নৃত্যশিল্প তাহাদের অন্যতম। বিজেতা তুর্কী কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম কিংবা ইংরেজ জাতি প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা উভয়ই বাঙ্গালীর জাতীয় এই একটি রস-সংস্কারের অনুশীলনের বিরোধী ছিল। তাহার ফলেই আজ জাতির রস-চেতনার মধ্য হইতে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ ইহাকে আশ্রয় করিয়াও যে কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধানের ফলে আজও আমরা জানিতে পারি। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নৃত্যশিল্পের দুইটি ধারা আছে—একটি সুনির্দিষ্ট কোন রীতিকে অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠে তাহাই ক্রমে প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি বা ক্লাসিক্যাল ড্যান্স বলিয়া পরিচয় লাভ করে। সমগ্রভাবে সমাজের পরিবর্তে সমাজের বিশিষ্ট কোন অংশ কর্তৃক অনুশীলনের ফলে ইহা কালক্রমে একটি বিশিষ্ট বা 'রিজিড' আদর্শ গড়িয়া তুলে; বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে তাহার কোন যোগ না থাকিলেও সমাজের যে অংশ চিন্তায় কিংবা কর্মে নানা বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তাহার ভিতর হইতেই ইহা বিকাশ লাভ করে। যেমন দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতি ভরত-নাট্যম, সে দেশের মন্দির ও দেবারাধনাকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিবার ফলে কেবলমাত্র সমাজের উচ্চতর একটি অংশকেই অবলম্বন করিয়া ছিল, ইহা কালক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট বিধির অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহার স্বাধীন বিকাশের ধারাটি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইহাই প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য বা ক্লাসিক্যাল ড্যান্স বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু সমস্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাপিয়া নিম্নতর সাধারণ গোষ্ঠীর মধ্যে উৎসবে-পার্বণে যে নৃত্যধারা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তাহার সুনির্দিষ্ট কিংবা অনমনীয় কোন পদ্ধতি কোন কালেই বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ইহার ধারা কোন কালেই লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই, সুতরাং ইহা কখনও প্রাচীন বা ক্লাসিক হইয়া উঠিবার বিকাশ পায় নাই। ইহাই লোক-নৃত্য। লোকসাহিত্যের যেমন কোন রূপ নাই, লোক-নৃত্যেরও প্রাচীন কোন রূপ নাই, ইহার ধারা প্রবহমান, ইহা লুপ্ত হয় কিন্তু প্রাচীন হয় না।

লোক-নৃত্যেই প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যের ভিত্তি; প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে লোক-নৃত্যের উপকরণ পাওয়া যায়। লোক-নৃত্যেরই বিশেষ এক একটি রূপ সুদীর্ঘ কাল অনুশীলনের ফলে সুনির্দিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করে; সুনির্দিষ্ট রীতিগুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন নূতন আঙ্গিক গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপদান করে। তাহার ফলেই লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা পৃথক হইয়া যায়। মণিপুরের রাস-নৃত্যের কথাই যদি ধরা যায় তাহা হইলেও দেখা যায় ইহারও একটি প্রাচীনতর লোকনৃত্যগত পরিচয় ছিল, এখন ইহা উচ্চতর নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে, ইহার

আদর্শটি ক্রমে অনমনীয় বা 'রিজিড' হইয়া পড়িয়া ইহাই একটি প্রাচীন বা 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্য পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে, ইহার সেই অবস্থা আসন্ন হইয়াছে। যে আঙ্গিকগুলি কালক্রমে মণিপুরী রাসনৃত্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে লোক-নৃত্য হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত ইহার সুনির্দিষ্ট পোষাক পরিধানের রীতি। লোক নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে ইহা কোন রীতিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না। সেইজন্য লোকনৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। জাতির যাহা সর্বজনীন পোষাক, নৃত্যকালীন পোষাকও তাহাই। কারণ লোকনৃত্যে নৃত্যের ভাবটি জাতির জীবন হইতে আপনা হইতে বিকাশ লাভ করে, সেখানে জীবনের অন্তর্মুখী আচরণের মধ্যে নৃত্যের অনুভূতি প্রকাশ পায়। কিন্তু মণিপুরী নৃত্যই হোক কিংবা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক নৃত্যই হউক, তাহা জাতির বহির্মুখী প্রয়োজনের দিক পূর্ণ করে মাত্র। যেমন দেবদাসী কিংবা রাজনর্তকী, ইহারা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আনন্দ-প্রেরণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মণিপুরী নৃত্যও তাহাই—মণিপুরী জাতির বৃহত্তর সমাজ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহা একান্তভাবে রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। সমগ্রভাবে সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিবার অর্থ কি তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন—ইহাদ্বারা একদিকে ব্যক্তিরুচি ও অপরদিকে ধর্মীয় লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই এই যে ইহা কদাচ ব্যক্তি-রুচির কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুগামী নহে, বরং ইহা সমাজের সামগ্রিক রস-চেতনার অভিব্যক্তি।

মণিপুরী নৃত্যের পোষাক পদ্ধতি যেমন সুনির্দিষ্ট তেমনই ইহার অঙ্গচালনাতেও একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। এক বা 'সোলো' হউক কিংবা গোষ্ঠীভাবেই হউক নৃত্যের মধ্যে একটি, সুনির্দিষ্ট অঙ্গচালনার রীতি না থাকিলে তাহা বিসদৃশ হয়, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুনির্দিষ্টতা যখন অন্ধ আনুগত্য হইয়া উঠে তখনই তাহার প্রাণশক্তি বা 'ভাইটালিটি' বিনষ্ট হয়। লোক-নৃত্যের তুলনায় প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি দৃশ্যতঃ যত আকর্ষনীয়ই হইয়া উঠুক না কেন, তাহা যে প্রাণহীন তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে। মণিপুরী নৃত্যের বহির্মুখী আঙ্গিক বিষয়ে বর্তমানে যে অন্ধ-আনুগত্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই ইহাকে প্রাচীন বা 'ক্লাসিক' নৃত্যের পর্যায়ে স্থান দিয়াছে। সহজ স্ফূর্তির মধ্যে লোক-নৃত্যের আনন্দ বিকাশ লাভ করে। আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টায় উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপ প্রকাশ পায়। মণিপুরী নৃত্য একদিন যত সহজ আনন্দের সরস অভিব্যক্তি রূপেই প্রকাশ পাক না কেন, আজ ইহা যে পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে ইহা বাহিরের আড়ম্বর দিয়া অন্তরের সুগভীর ভাবটি ঢাকিয়া দিয়াছে।

বাংলাদেশেও প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য একদিন প্রচলিত ছিল—প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকীর্তিতে তাহার পরিচয় আমরা সর্বদাই পাইয়া থাকি। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলার প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে লোক-নৃত্যের প্রভাব সর্বাধিক ছিল। বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে রচিত মন্দিরগুলি যেমন সাধারণ বাঙ্গালীর বাস-গৃহের অনুযায়ী পরিকল্পিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতিও ইহার লোক-নৃত্য হইতে সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বাংলাদেশের সঙ্গে উড়িষ্যা ও আসামেরও কতকটা তুলনা করা যাইতে

পারে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র কোন কারণ নাই। ইহা প্রতিবেশী প্রদেশের উপর স্বাভাবিক প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লোক-নৃত্যের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যের কি সম্পর্ক তাহাও এখানে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, বাংলার লোক-নৃত্য যে ইহার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্য দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বরং একদিক দিয়া এই কথাও বলা যায় যে বাংলার লোক-নৃত্য ইহার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্যের ভিত্তির উপরই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং আদিবাসী সমাজ এবং লোক-সমাজ উভয়ের পরস্পর সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আদিবাসী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ গৃহীত ও স্বাঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু লোক-সমাজ বা 'ফোক সোসাইটি'তে তাহা সর্বদাই হইয়া থাকে। একদিক দিয়া বরং বলা যায় যে বহিরাগত উপকরণ গ্রহণ ও তাহার স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়াই লোক-সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের পুষ্টি হইয়া থাকে। বাংলার লোক-নৃত্য বহিরাগত বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা কেবলমাত্র যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাই নহে—বরং তাহার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে। বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ও বাংলার লোক-সমাজ এক নহে। সুতরাং আদিবাসী সমাজের উপকরণ অপরিবর্তিতরূপে কোথাও বাংলার লোক-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন রূপান্তরের ভিতর দিয়া বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের নৃত্যই বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়া প্রবেশ করিলেও ইহাদের মধ্যদিয়া কালক্রমে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাঙ্গীকরণের ইহাই ধর্ম—মৌলিক উপকরণ অন্যত্র হইতে গ্রহণ করিয়াও নিজস্ব অন্তঃপ্রকৃতি অনুযায়ী আপন বিশিষ্ট রূপ সম্ভব হইয়া থাকে। জাতির অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষত্বই ইহাকে জাতীয় বিশেষত্ব দিয়া থাকে। বাংলার লোক-সমাজের বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সঙ্গে ইহার আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণেরও সেই সম্পর্ক বর্তমান।

আদিবাসীর সমাজ অন্ধ আসক্তি বশতঃ নিজের সমাজ জীবনের উপকরণগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। একদিকে দিয়া প্রাচীনপদ্ধতির 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যের মত ইহারও প্রতিটি খুঁটিনাটি রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহাও কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু লোক-সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপকরণের মত লোক-নৃত্যও একদিক দিয়া নূতন নূতন প্রেরণা ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়া ইহার প্রাণশক্তি বা 'ভাইটালিটি' অব্যাহত রাখিয়া অগ্রসর হয়। আজ যে ভারতব্যাপী আদিবাসী সমাজের নৃত্য এত বৈচিত্র্যহীন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার প্রধান কারণ বহুকাল যাবৎ ইহাদের মধ্যে বাহিরের কোন সাংস্কৃতিক উপকরণ যেমন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই প্রতিবেশী সমাজকেও ইহা আর নূতন নূতন বিষয়ের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু একদিন আদিবাসী সমাজের উপকরণই লোক-সমাজের অবলম্বন ছিল, সেদিন ইহার জীবনীশক্তি ছিল বলিয়াই অন্যকে যেমন ইহা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, নিজেও নিজের মধ্যে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়াছে।

আদিবাসী সমাজের সান্নিধ্যের জন্যই বাংলার লোক-নৃত্যেও এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষতঃ বাংলা দেশের প্রতিবেশীরূপে যে সকল আদিবাসী সমাজ বাস করে, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক সময়ই ঐক্য নাই। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে আদি-অস্ত্রাল শ্রেণীর আদিবাসীর বাস হইলেও বাংলার উত্তর কিংবা পূর্ব সীমান্তে আর এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির আদিবাসীর বাস। ইহাদের একটি প্রধান অংশ বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসিয়া বাস করিতে থাকিলেও হিন্দু ধর্ম ও সমাজ দ্বারা ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক পরিচয় একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। ইহারা প্রধানতঃ ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ বা কিরাত বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শাখা আছে তাহাও বিভিন্ন দিক হইতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের লোক-নৃত্য ইহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির যে শাখা বাংলার পূর্ব সীমায় বাস করে, তাহাদের নৃত্য বৈচিত্র্যহীন, সেইজন্য মূলতঃ ইহারই প্রভাবজাত অঞ্চলেও লোকনৃত্য বৈচিত্র্যহীন ছিল বলিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু কালক্রমে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে আরও দুইটি দিক হইতে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা একদিকে হিন্দুধর্ম ও আর একদিকে মুসলমানধর্মের প্রভাব। বাংলার পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বৈচিত্র্যহীন লোক-সংস্কৃতির উপর যখন হিন্দু ও মুসলমানধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিল এবং তাহা এই অঞ্চলের লোক-সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গেল, তখনই ইহাতে বৈচিত্র্যও দেখা দিল। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির অংশ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বোড়ো জাতির বৈচিত্র্যহীন নৃত্যধারার উপর একদিক দিয়া হিন্দু সমাজের রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অপর দিক দিয়া মুসলমান সমাজের কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের লোক-সমাজের নৃত্য নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এই ভাবেই একদিকে এই অঞ্চলের গোপিনী খেলা, খাটু ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অন্যান্য লোকনৃত্য বিকাশ লাভ করিল এবং অন্যদিকে জারি নৃত্যও এক অভিনব প্রাণশক্তি লাভ করিয়া সমাজের সকল কৌতূহল আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রভাব দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি দিক হইতে আসিলেও একই সমাজের মানসক্ষেত্রে ইহারা নিজেদের অধিকার স্থাপন করিয়াছে এবং একই জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহারা একই সূত্র দ্বারা বিধৃত হইয়াছে। এইভাবে বাংলার লোক সংস্কৃতির মধ্যে ভাগবত পুরাণ ও কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত একাকার হইয়াছে। আদি সমাজ জীবন হইতে বাংলার লোক সংস্কৃতির মৌলিক উপকরণসমূহ আসিয়া পরবর্তী কালের হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কোন উপাদান ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া বাংলার সংস্কৃতির নূতন রূপ দান করিয়াছে। বাংলার লোক-সমাজের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রবেশ করিবার পূর্বেও কিংবা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলেও বাংলার লোক-নৃত্য যে বৈচিত্র্যহীন তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, দেখা যায় যে বাংলার নাথ-ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যেও নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পরিচয় আছে। এই নৃত্য লোক-নৃত্যেরই কোন কোন রূপ, প্রাচীন পদ্ধতির কোন নৃত্য নহে। নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায় গোরক্ষনাথ নৃত্যদ্বারা যোগভ্রষ্ট মীননাথের চৈতন্যের উদয় করিয়াছিলেন। নাথধর্ম সর্বভারতীয় ধর্ম বলিলেও হয়, কিন্তু তাহা সত্বেও প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে গোরক্ষনাথের মধ্যে এই নৃত্যগুণের অস্তিত্বের কোন নির্দেশ দেওয়া হয় না, তাহার

অর্থ এই যে বাঙ্গালীর যে মৌলিক জন-গোষ্ঠীর উপর নাথধর্ম নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, সেই জন-সমাজেরই মধ্যে নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সুতরাং বাংলার লোক-নৃত্যের প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যায় ইহার মূলে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহা কেবল বিচিত্র প্রকৃতির আদিবাসীর সমাজ-জীবনের প্রভাবের ফল।

প্রত্যেক দেশের সমাজেই আচারজীবনের অন্তর্ভুক্ত একশ্রেণীর নৃত্য আছে, তাহাকে ইংরেজিতে 'রিচ্যুয়ল ডান্স' বলে। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য হইতেই ইহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহা সমাজের ওঝা কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর আদিম ধর্মাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর নৃত্যের অস্তিত্ব আছে। ইহা অলোক বা 'মিষ্টিক' ধর্মীয় আচার মাত্র। ইংরেজিতে ইহাকে ম্যাজিক বা মিষ্টিক ডান্সও বলা হয়। ইহা লোক-নৃত্য নহে, কিন্তু ইহার সঙ্গে লোক-নৃত্যের সম্পর্ক আছে। অনেক সময় ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজ কর্তৃক বিস্মৃত হইয়া যাইবার ফলে, ইহা সাধারণ লোক-নৃত্যের পরিচয় লাভ করে। তখন ইহার আচারগত বা রিচ্যুয়ল মূল্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ধর্ম ও ঐন্দ্রজালিকতা নিরপেক্ষ লোক মনোরঞ্জনের গুণটিই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়। চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিব-দুর্গা সাজিয়া যে গাজন-নৃত্য এই দেশের সমাজে এখনও প্রচলিত আছে, তাহার একদিন আচারগত মূল্য ব্যতীত আর কোন মূল্য ছিল না; কিন্তু ইহা এখন অনেক ক্ষেত্রেই আচার-নিরপেক্ষ 'সেকুলা'র আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। পনের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবার পর একদা সন্ন্যাসী কিংবা ভক্তগণ পরম নিষ্ঠাভরে দেবতার নিকট পূর্ব হইতে মানত করিয়া এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত। কোন প্রকার নিয়মভঙ্গ করিত না। কিন্তু বর্তমানে ইহা অনেক ক্ষেত্রেই কৌতুককর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহাই অবনতির আর একটি সোপান অগ্রসর হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় জেলে পাড়ার সং-এ পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, আচারের বন্ধন অতিক্রম করিয়া একবার বাহির হইলে স্বেচ্ছাচারিতা যে ইহাকে ব্যাভিচারের কোন স্তরে লইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আধুনিক যুগের গাজন নৃত্যের তাহাই হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সং গাজন-নৃত্যের অধঃপতনের পথ ধরিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় আচার-নৃত্য লোক-নৃত্যে অবনমিত হইয়া ক্রমে ইহার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

হারীতকৃষ্ণ দেব

বন্ধুবর জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস যে আমায় অতুলবাবুর জীবনী লিখ্‌তে সহায়তা করেছেন, একথা কালপুরুষ-এর প্রথম সংখ্যায় জানিয়েছি। তিনি শান্তিনিকেতনস্থ অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে অতুলচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পত্র পেয়েছেন (তাং ৯।৮।১৯৬১) যার মধ্যে মূল্যবান্‌ স্মৃতিমূলক তথ্য আছে, কেননা মোহিনীবাবু অতুলবাবুর মতন রংপুরের লোক, এবং দুজনেরি মনে আমি দেখেছি সাহিত্যের রং পুরো মাত্রায়।

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমস্থ নলিনীকান্ত গুপ্ত গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে তাঁর 'স্মৃতি-তর্পণ' প্রবন্ধে বলেছেন: "সবুজপত্রের লেখকদের মধ্যে রংপুর-গোষ্ঠী প্রমথবাবুকে চমৎকৃত করেছিল, আনন্দিত করেছিল। এক জায়গা থেকে একই সময়ে এতগুলি গুণী লেখকের উদ্ভব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৈ কি! লেখকদের নাম তবে করি, অনেকটা বয়সানুক্রমে: (১) অতুলচন্দ্র গুপ্ত, (২) নলিনীকান্ত গুপ্ত, (৩) বরদাচরণ গুপ্ত, (৪) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং (৫) আমি যোগ করতে চাই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ইনিও এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত, যদিও সবুজপত্রের লেখক হিসাবে ইনি দেখা দিতে পারেন নি—ঠিক সময়মত ও সুযোগমত সেখানে এসে পৌঁছিতে পারেন নি।"

নলিনীবাবু আরো বলেছেন: "শচীন্দ্রনাথ সারাজীবনই প্রায় কাটিয়েছেন দৈন্যের দুঃস্থতার দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে—কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরের আলো এতটুকু ম্লান হয় নি······পক্ষান্তরে অতুল গুপ্ত চিরকাল ছিলেন সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বরপুত্র, সচ্ছলতা ও সম্পদের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত ও পরিণত হয়েছেন—কিন্তু বিত্ত তাকে কখন মোহিত বা প্রলুব্ধ করে নি। সত্যকার অন্তঃপুরুষ আত্মা সব রকম বাহ্য অবস্থার দ্বৈতের দ্বৈধের উর্দ্ধে।" নলিনীবাবুর এই অভিমত সমর্থন করি। বাহ্য অবস্থার পরিবর্তনে মনের রং বদ্‌লাতে পারে, ঢং বদ্‌লায় না। সেদিক দিয়ে দেখ্‌লে চিত্তকে অনেকটা বহুরূপীর মতন দেখা যায়। স্থল-পদ্মের সঙ্গে হৃৎ-পদ্মের তুলনা যদি করি একটু মিল পাওয়া যাবে। ঐ ফুলের কুঁড়ি হয় শরৎ কালে; প্রথমে ফুলটি সাদা থাকে পরে রং ধরে। রক্ত-কমলের কথাও চিন্তা করতে পারি, নলিনীকান্তের উক্তি শুনে। তিনি বলেছেন, "পূর্বোক্ত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যে-যুগে সে-যুগ ছিল রক্ত-যুগ—উষার আরক্ত যুগ।"

শ্রীসুশীল রায়ের মনোজ্ঞ জীবনী-সংগ্রহ-গ্রন্থ "স্মরণীয়" ছাপা হয়েছিল তিন বৎসর পূর্বে, ইং ১৯৫৮ সালে যখন অতুলবাবু জীবিত। সে-বইয়ের যে-কপি গ্রন্থকার অতুলচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন ২৯।১১।৫৮ তারিখে স্বাক্ষর-সংযুক্ত করে,' সে কপিটি শ্রীমান্‌ শোভন বসুর সৌজন্যে এখন আমার চোখের সামনে রাখ্‌তে পেরেছি। তার মধ্যে অতুলবাবুর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে একটু ভুল থাক্‌লেও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনায় কোনো ভুল আমার চোখে পড়ে নি। এই বর্ণনার সঙ্গে মোহিনীবাবুর পূর্বোক্ত পত্রে সন্নিবিষ্ট তথ্যের মিলন-সাধনের ফলে রংপুর-সম্ভব অতুলচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন কাহিনী মোহিনী মূর্তি

ধারণ করা উচিত। তবে, যেহেতু আমি শিল্পী নই, সব্যসাচীও নই, আমার দুহাতে দুটি রং-এর তুলি নিয়ে যে-ছবি আঁকতে চাইছি সে-চিত্রে স্থূলহস্তাবলেপ থাকার সম্ভাবনা বেশি। মোহিনীবাবু রংপুরের লোক; অতুলবাবুর মতন তিনিও রংপুর থেকে এনট্রান্স পাশ করেছিলেন, জলপানি পেয়েছিলেন, এবং দুজনেই সুশীল-বালক-রূপে সুপরিচিত। সুতরাং এই দু-রঙা ছবিতে যদি অতুলচন্দ্রের সুশীলত্ব কিছু ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি, আমার শ্রম সার্থক হবে।

শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে অতুলচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী। ভাগ্যান্বেষণে তিনি রংপুরে গিয়ে ওকালতি সুরু করেন। সরস্বতীর কৃপায় তাঁর লক্ষ্মীলাভ হয়। তিনি স্বনামধন্য ও সর্বজনমান্য হওয়ায় তাঁর নাম-পদবী অনুসারে রংপুরের একটি পাড়ার নাম হয়েছে— গুপ্তপাড়া।

এই নাম-করণ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এল, বলে ফেলি। 'কালপুরুষের' গত সংখ্যায় অতুলবাবুর নাম ছাপা হয়েছে: অতুল চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদক মশায় বল্‌লেন, তাঁর প্রুফ্-সংশোধনে কোনো গাফিলতি ছিল না; বার-বার শোধন সত্ত্বেও 'চন্দ্র' এবং 'গুপ্ত' এই দুই অংশের মধ্যে ফাঁক রাখ্‌তে পারেন নি। বোধ হয়, ছাপাখানার ভূত (Printer's devil) কোনো গতিকে টের পেয়েছিল যে, আমি প্রেতলোকে গমনাগমন করি এবং সন্দেহ করেছিল আমি ঐতিহাসিক গবেষণায় মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের ভূত নামাই, (যদিও নাচাই না) সুতরাং ঐ চন্দ্রগুপ্ত-ই আমার অভিপ্রেত। ভূতের ভুলকে ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিলে অতুলবাবুর পিতার নামকেও ছাপা যায়—উমেশ চন্দ্রগুপ্ত। অর্থাৎ 'চন্দ্রগুপ্ত' হয়ে দাঁড়ায় একটা বংশগত পদবী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর সমর্থন মেলে। সাম্রাজ্যবাদী মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রায় সাতশো বছর পরে সাক্ষাৎ পাই আরো দুটি চন্দ্রগুপ্তের, যাঁদের একজন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আর একজন তাঁর নাতি— সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। এই পদবী-গ্রহণে ইঙ্গিত রয়েছে যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আদর্শ ছিল মৌর্য-সাম্রাজ্য। সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব নাম ছিল 'কাচ'; সম্রাট হয়ে 'সমুদ্রগুপ্ত' হলেন। যেমন মোগল সম্রাট্ 'জাহাঙ্গীর', যাঁর আগেকার নাম 'সেলিম'। সমুদ্রগুপ্ত হয়তো নিজেকে সমুদ্র-সমান মনে করে-ছিলেন সেই পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে', যার মধ্যে সাগর-জন্ম-কথা আছে। কিন্তু ব্রজেন দাশের মতন সাগর সন্তরণে পটুত্ব আমার নেই। তাই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করে' গুপ্ত-ভারতীর আরতির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। জাহাজ ভাসুক্ সাগর জলে, আমি বাড়ি থেকে ছেড়ে আসি ভিজে কাপড়টা।

দেখছি, মনটাও গেছে ভিজে। পুরাতত্ত্বে যে-রস আছে সেই রসে। বিশেষ করে মনে পড়ছে, আমারই পূর্বপুরুষ নবকৃষ্ণ ছিলেন গুপ্ত-মুদ্রার আবিষ্কারক। বৃটিশ মিউজিয়মের গুপ্ত-মুদ্রাগুলির ক্যাটালগ থেকে এ সংবাদ পেয়েছি। তাতে স্বর্গত অ্যালান সাহেব লিখছেন: The first recorded hoard of Gupta coins is that found at Kalighat; its importance has not previously been fully appreciated. Marsden's account of the hoard is as follows: A number of these gold coins with figures amounting, it is said, to upwards of two hundred, were accidentally discoverd about the year 1783 at a place named Kalighat on the eastern bank of Hugli river, ten miles above

Calcutta. They were contained in a brass pot, and were carried by the finder (*Nab Kishen*) to Mr. Hastings, then governor of Bengal. By him the greater part were transmitted to the court of Directors of the East India Company with his request that they might be distributed among the most eminent public and private collections. Twenty-four were accordingly sent to the British Museum.

যাক্ তো। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভূতকে ঘাড় থেকে নাবিয়ে দিই। সে বাড়ি চলে যাক্ না—বাড়িতো কাছেই, আলিপুরে, যেখানকার ভূতের গল্প প্রসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও সেখানে সুশিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষা দিতে যায়, যাদের ভূতের ভয় নেই এবং বিশ্বাস আছে বর্তমানে। ভবিষ্যতের জন্যও তারা ভাবে। উচ্চশিক্ষিত সেরা ইংরেজ ভূত তাদের অভিনন্দন জানাবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভূত ছাড়াতে গেলে একটা ফুস্-মন্তর তো চাই? ঋগ্বেদের মন্ত্রশক্তিকে লেখার বেড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না। তবে অথর্ববেদের ফুস্-মন্তরকে অন্তরের অনুলেখা দিয়ে হয়তো বাঁধানো যায়। যে-মন্ত্র এখন আমার জপমালায় ধারণ করে আছি তার প্রকাশ কালী-কলমে সম্ভব। এ-কালীর নাম সুলেখা, আর এ-কলম এসেছে হিমাদ্রি থেকে, ভোলানাথের প্রসাদে। শব্দ-ব্রহ্মে বিশ্বাসী আমি যদি অতিবৃদ্ধপিতামহের নাম স্মরণ করে কালীঘাটে যাই এবং আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলের পিণ্ডদানে অধিকার নিয়ে তর্পন-কার্যে ব্রতী হই, তাহলে অতুলচন্দ্রের পিতৃদেব উমেশচন্দ্রের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পন করতে পারি, গুপ্ত-নাম গোপন রেখে। এত সংক্ষেপে শিব-দুর্গার আরাধনায় যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, এ-বছরের জন্যে অন্তত আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি নিশ্চয়।

এইবার 'কালপুরুষে'র পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বল্‌ছি, উমেশবাবুর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র রংপুরে কিরূপ পরিবেশ পেয়েছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী। সে-পূজার প্রধান উপচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল উমেশবাবুর গৃহেই একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরি ও তৎসংযুক্ত একটি হাতে-লেখা পত্রিকা, যার নামছিল "ফুল"। সরস্বতীর নিত্যপূজায় মত্ত থাকৃতেন বালক অতুলচন্দ্র, যোড়করে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে। তিনিই ছিলেন লাইব্রেরিয়ান ও এডিটর—যুগপৎ পাঠাগারের অধ্যক্ষ ও পত্রিকার সম্পাদক। নিয়ম মাফিক বই নিয়ে যেতে পারতেন বাইরের উৎসাহী পাঠক। রংপুরের বালকদের কাছে এইটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ, কেননা তখন মফঃস্বলে ভালো পাব্লিক বা প্রাইভেট লাইব্রেরী বড় একটা দেখা যেত না। তরুণ পাঠকদের রচনা দিয়ে 'ফুল' পত্রিকার মালা গাঁথার ভার ছিল অতুলচন্দ্রের উপর। তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন, স্বকীয় রচনাও প্রকাশ করতেন, প্রবন্ধই বেশি, কবিতা কম। সুশীল রায় তাঁর 'স্মরণীয়' পুস্তকে অতুলচন্দ্রের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। এটি রচিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে, যখন অতুলচন্দ্রের বয়স পনেরো কি ষোলো। হস্তলিখিত "ফুল" পত্রিকা থেকে উদ্ধার করেছেন সুশীলবাবু:

কোকিল

হে কোকিল, নিতি নিতি শুনি লোকমুখে
শীত নাই বর্ষে তব, দুঃখ নাই সুখে।

মাঝে-মাঝে তিক্ত হাসি, সিক্ত নাহি ক'রে
দেয় তোমার অমৃত নব মধুভারে।
ফুল, ফল, রৌদ্রঢাকা অনন্ত বসন্ত
তব, কভু নাহি ঢাকি দারুণ হেমন্ত
শিশিরের আবরণে, তারে চিরদিন
ক'রে রাখে সুনির্মল অনন্ত নবীন।
আহা, তবে তুমি পৃথিবীর অভিশপ্ত
জীব। দুর্দিনের অবসানে কি যে তপ্ত
সুখ, হেমন্তের শেষে কি তীব্র মদিরা
বয়ে যায় বসন্তের শিরা উপশিরা
ভেদ করি, তার তুমি পাওনি আস্বাদ ;
সুখ তব সুখ নয়, শুধু অবসাদ।

এই কবিতাটির উপর মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব আছে, তা লক্ষ্য করেছেন সুশীলবাবু। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে আমিও কোকিলের ডাক শুনে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু সেই কুহুর কুহকীকে ডেকে বলতে পারি নি, 'সুখ তব সুখ নয়, শুধু অবসাদ' কেননা আমি তার আগে থেকেই সুরের কাঙাল। আজও আমার শিরা-উপশিরায় বয়ে যায় 'বসন্তের মাতাল বাতাস,' যখন কানে শুনি কোকিলের বাণী।

"ফুল" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে অতুলবাবু যা লিখতেন তার একটি কথা মোহিনীবাবুর মনে আছে: "সরল ভাষায় সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করা একটা মহৎ গুণ।" এই প্রসাদ-গুণকে তিনি নিজস্ব করেছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। আমায় একবার তিনি প্রশ্ন করেন: আচ্ছা, প্রমথবাবুর ("বীরবল") লেখা আপনার ভাল লাগে বিশেষতঃ কি জন্যে?—আমি উত্তরে বলি: প্রসাদ-গুণের জন্যে। শুনে উনি কি খুশী?

রংপুর জিলা ইস্কুলে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় বালক অতুলচন্দ্র প্রাইজ পেতেন ও আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি শেখাতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন ঐ ইস্কুলের শিক্ষক নগেনবাবু—অতুলবাবুরই একজন আত্মীয়। ফুটবল খেলাতেও অতুলচন্দ্র অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু অন্য ছেলেদের মতন খেলার পরে আড্ডা দিতে যেতেন না। সটান বাড়ী চলে আসতেন, সম্ভবত গৃহস্থ লাইব্রেরীর টানে। তাঁর এই পুস্তক-প্রীতি সমস্ত জীবনভোর সাথী হয়ে রইল। হাইকোর্টে বার লাইব্রেরীতে বসে বৃথা সময় নষ্ট না করে প্রায়ই তাঁকে পাঠরত দেখা যেত।

কর্ম ও কল্পনা

অসীম রায়

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯

একটা আশ্চর্য লেখা পড়া গেল। এখন বেশীর ভাগ লেখাই এমন যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ কি বয়সের দোষ? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কি মনের ওপর কঠিন আবরণ পড়ে, যা ভেদ করে নতুন আলো আসে না? তবে পুরনো লেখা পড়ে তেতে ওঠা কেন? এতদিন পর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পড়তে মনে হচ্ছে চারপাশের অপরিচ্ছন্ন জগৎ আবার আলো হয়ে উঠেছে। থ্যাকারের পাশে সাম্প্রতিক অনেক লেখা নিরক্ত, বিবর্ণ। খবরের কাগজে প্রায় দশ বছর কাজ করার পরও ভাবতে চমক লাগে এত খুঁটিনাটি এমন উল্লেখযোগ্য হয় কি করে। এই খুঁটিনাটির উপর আশ্চর্য দখল ও তার ভিত্তিতে এক জগচ্ছবি গড়ে তোলার প্রয়াসেই না তলস্তয়ের 'চাইল্ডহুড, বয়হুড এ্যাণ্ড ইউথ্' গঠিত। বইটি পড়ে তলস্তয়ের শ্বশুর তরুণ জামাইকে লিখেছিলেন, 'তুমি আমাদের থ্যাকারে। আর বোঝা যায় শ্বশুর মশায়ের অব্যর্থ সাহিত্যবিচার, কারণ 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' বা 'আনা কারেনিনা'র ভিতই গড়া হয়েছে তলস্তয়ের প্রথম উপন্যাসে। তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে কোন মায়াবী প্রেমের পেছনে ধাওয়া করেন নি তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর প্রথম উপন্যাসে, বা সিভাস্তোপোলের কাহিনীতে তিনি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির মাধ্যমে এক জগচ্ছবি গড়ার প্রয়াসী হয়েছেন। মেজাজের দিক থেকে আলাদা হলেও টমাসমানও তাঁর প্রথম উপন্যাসে প্রত্যহের এই ধরা-ছোঁওয়া-দেওয়া জীবন প্রবল ধৈর্যে রূপ দিয়েছেন। শিল্পকর্মের প্রথম অধ্যায়ে খুঁটিনাটির ওপর এই দখল জীবনের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের ফলেই বোধহয় সম্ভব।

থ্যাকারে পড়তে পড়তে আর একটা প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষ জগৎ সম্পর্কে এমন সম্পূর্ণ আগ্রহ কি বর্তমান সর্বগ্রাসী খবরের কাগজের যুগে সম্ভব? গত একশো বছরে সংবাদ-পত্র যত দক্ষ হচ্ছে, প্রত্যক্ষকে দর্পনের মত ধরবার জন্যে যত আয়োজন বাড়ছে তত বাস্তবের চেহারা যাচ্ছে ঘোলা হয়ে। এলিয়ট সাংবাদিকতার স্বপক্ষে নিপুণ ওকালতি করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সাংবাদিক ড্যানিয়েল ডেফোর সঙ্গে আধুনিক আমেরিকান 'টাইম' কাগজের লেখকদের মৌলিক তফাৎ আছে বৈ কি। এলিয়ট ঠিকই বলেছেন যে কাল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আজ যাকে সাংবাদিক মূল্য দেওয়া হয় কাল তাকেই ফেলা হয় সাহিত্যের পংক্তিতে। কিন্তু আধুনিক কালে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সাংবাদিকতা, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'টাইম' কিংবা' ডেইলী মিরর' এর লেখা সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হলেও সাহিত্য হিসেবে গণ্য হবে না, একথাও অকাট্য।

বর্তমান ইয়োরোপ-আমেরিকাতে সীরিয়াস লেখকদের কাছে সংবাদপত্র টেলিভিসান সিনেমা এক মারাত্মক ত্রাস। তাঁরা তাঁদের চৈতন্যের শুদ্ধির জন্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে উৎসাহ বিপজ্জনক ভাবছেন। কাজেই তাঁদের জগচ্ছবি প্রায় উদ্ভট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কামু-র 'আউটসাইডার' পড়তে পড়তে বোধ হয়

লেখক এক ধরনের প্রতিহিংসা নিয়েছেন। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অতীতের সেই হৃদয়বান প্রবল আগ্রহ যখন ক্রমশই কোনঠাসা, প্রায় অচল, তখন ঠিক নাকের সামনে যে কটা জিনিস দেখা যাচ্ছে 'স্টীল লাইফে'র দক্ষতায় তাকেই ধরা ছাড়া শিল্পীর কোন কর্তব্য নেই। এই যান্ত্রিক জগতে যে হত্যাকারী তার খুনের পেছনেও কোন কার্যকারণ নেই, হঠাৎ এক ঝলক রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় রিভলভারের ঘোড়ায় আঙুলের চাপ বেড়ে গিয়ে ঘটনাটা ঘটে। এমন কি একেবারে ভিন্ন মেজাজের লেখক উইনহাম লিউসের 'রেড প্রিস্ট'-এর নায়ক প্রায় অকারণেই খুন করে বসে তার সহধর্মীকে, অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক শক্তি সত্ত্বেও মৃত সহকর্মীর মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি মেরে তাকে অপমান করে। ঘটনার সাহিত্যিক কোন কার্যকারণ নেই। মনের কতগুলো আত্মকেন্দ্রিক ঝোঁকের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অতীতের প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে সেই অতল আগ্রহ যেন কোথায় ভয়ে দৌড় দিয়েছে।

এবার আশ্চর্য লেখার কথায় ফেরা যাক। লেখাটা হল কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা।' প্রথমত ভাষার পরীক্ষার দিক থেকে লেখাটা আশ্চর্য। দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। গঙ্গার তীরে শ্মশানে এক ঘাটের মড়ার সঙ্গে কুলীনের ঘরের অরক্ষণীয়া মেয়ের বিয়ে আর সেই মৃত্যুর নাটকীয় পরিবেশে চিতার আগুন আর গঙ্গার জলের পাশে বৃদ্ধের চৈতন্য ফিরে আসা এবং তার কামের সঞ্চার ('উদ্ভিন্ন যৌবনার হেমদেহ স্পর্শে বৃদ্ধের গায়ে যেন মাংস লাগিল।') গল্পের এই অধ্যায়টুকু প্রথম শ্রেণীর। সতীদাহ প্রথার আনুষঙ্গিক বিবরণ এবং মেয়েটির নিজেকে সতী হিসেবে কল্পনা—দুশো বছর আগে কোম্পানীর প্রথম যুগে সতীদাহের প্রস্তুতির অপূর্ব চিত্র। অবশ্য সমস্তটা মিলে লেখা দাঁড়ায় নি। যুবক চাঁড়ালকে নায়ক করে যুবতীটির সঙ্গে এক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা প্রায় আজগুবি সিনেমা হয়ে যায়। লেখক 'নাটকের' তৃষ্ণায় মরেছেন। বৃদ্ধকে নায়ক করে গল্পের প্লট প্রথম দিকে যেরকম নিরাড়ম্বর ছিল সেরকম থাকলেই ভাল হত।

তবে ভাষা খুব জবরদস্ত সংস্কৃত শব্দ ও চলতি কথার দখলে, যদিও কোন কোন জায়গায় সংস্কৃত অলঙ্কারের ভারে একটু বেশী অবনত। আরম্ভেই লেখকের পরিচয়—"আমাদের স্নেহের এ জগৎ নশ্বর, তথা চৈত্ররুক্ষ অগণন অন্ধকার সকলই, মৃন্ময় এবং অনিত্য; তথাপি ইহার চতুর্বিংশতিতত্ত্বে, মানুষের দুঃখে, কোমলে নিখাদে—সর্বত্রে; এরূপ কোন তন্মাত্রা নাই যেখানে যাহাতে—হাসি নাই, কারণ সর্বভূতে, বহুতে, তিনি বিরাজমান।" এ 'কবিতার' লাইন কোন দিনই হয়ত গদ্যে বহুল ব্যবহৃত হবে না, কিন্তু বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে এ ভাবে ভাষা ব্যবহারের সার্থকতা থাকতে পারে। মুস্কিল হল বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় যে শুদ্ধির প্রয়োজন তা লেখকের নাগালের বাইরে। লেখার মধ্যে কোথাও কোথাও চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ঘোরানর প্রবৃত্তি খুব স্পষ্ট। তারপর চাঁড়ালের যৌবন নিয়ে লেখক এত বেশী লুটোপুটি খেয়েছেন যে গল্প লক্ষ্যভ্রষ্ট। যা আপতিক তা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

২রা মার্চ, ১৯৬০

কাল রাজভবনে একেবারে পাশে-বসা অবস্থায় নেহেরুকে অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল। বয়স যত বাড়ছে ইতিহাসের এই সব 'লায়ন টেমার'দের সম্পর্কে অনাস্থা ততই বাড়ছে। তবুও এই বয়সী নটের ব্যঞ্জনাময় চেহারা, চোখের চাউনি দেখে মন অভিভূত না হলেও চোখের তৃপ্তি হয়।

ভদ্রলোক কোনার দিকে পড়ে গিয়েছিলেন যা অধুনা ভারতবর্ষে এক মহা আশ্চর্য ঘটনা। নেহেরু কোনায় বসে আছে এ ছবি আজ দুর্লভ, প্রায় অ-দৃষ্ট। মামুলি দেখতে, মোটা, টেকো, কিঞ্চিৎ থপথপে এক ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা সভা বলে' আমাদের গোলাপশোভিত, আয়তচোখ, সুদর্শন প্রধানমন্ত্রী কয়েক মুহূর্তের জন্যে গৌণ ছিলেন।

'গান্ধিজী যদি মারা যান, পৃথিবী হবে না খান্ খান্,' অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার লাইনটা মনের মধ্যে ঘুরছিল। ক্রুশ্চেভ-নেহেরু যদি মারা যান তবে কি রাশিয়া ভারতবর্ষ খান্ খান হয়ে ভেঙে পড়বে?

টাঁটের মাথায় ক্রুশ্চেভ সাম্যবাদের স্বপক্ষে ওকালতির শেষে বললেন, 'প্রত্যেক দেশের কি সমাজব্যবস্থা হবে তা সেখানকার লোকের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। ইতিহাস শ্রেষ্ঠ বিচারক।' উত্তম কথা, কিন্তু এটা কি এমনই কথা যা শোনবার জন্যে সভার আয়োজন করা প্রয়োজন!

সভ্যতার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এ ভাবনা হয়ত আজ নিরর্থক নয় যে নেহেরু-ক্রুশ্চেভদের মত 'ভগবানের দূতে'র জন্মগ্রহণ ঐতিহাসিক কারণেই অবাঞ্ছনীয়! সভ্যতা কি কিছু পরিমাণে এই কয়েক-হাজার বছরে সাবালকত্ব অর্জন করেনি? 'ভগবানের দূতে'রা এখন তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেও পারেন। অবশ্য তাঁদের অবর্তমানে অসুবিধে যে হবে না তা নয়, যেমন হবে খবরের কাগজে লাগসই হেডলাইনের দুর্ভিক্ষ অথবা ফাঁকা মাঠ কাঁদবে জনসাধারণের হিতের জন্যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী বক্তৃতার অভাবে। তবে সভ্যতার পক্ষে এগুলো ঘোর বিপদ নয়। বরং তাঁদের জাজ্জ্বল্যমান উপস্থিতির দরুণ সভ্যতার আলো দিনে দিনে ফিকে হতে চলেছে। সভ্যতার মূল কথা মানবের অগ্রগতি, মহামানবের দিগ্বিজয় নয়। গান্ধিজী নেহেরু না থাকলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হত; সাধারণ মানুষের জীবনের কাঠামো খুব আলাদা হত না।

১৪ই মার্চ, ১৯৬০

আমার এ সন্দেহ প্রবল হচ্ছে এ লেখা সম্পূর্ণ নিরর্থক কিনা! লেখা সম্পর্কে তলস্তয়ের উক্তি—যতবারই লেখক কালিতে কলম ডোবাবেন ততবারই তিনি তাঁর শরীর থেকে এক খণ্ড মাংস ছিঁড়ে দেবার জন্যে তৈরী থাকবেন—কানে লাগলেও মূলত সত্য। বেশীর ভাগ লেখার পেছনে তাগিদ নেই, যা লেখকের সত্তাকে অবিরত ঝাঁকি দিচ্ছে, তার কিছুটা লেখাতে এলেও লাভ। সেক্ষেত্রে সাহিত্যের কর্মপদ্ধতি অনায়ত্ত রইলেও সত্যের চেহারা কিছুপরিমাণ স্পষ্ট হতে পারে। যেখানে ঝাঁকি নেই, বোধের আলোড়ন নেই, সেখানে সাহিত্যকর্ম দৈনিক খবরের কাগজের পাতা ভরানো ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে এ প্রসঙ্গে আলোচ্য—ঝাঁকি, আলোড়ন কিংবা নিজের দেহ থেকে মাংসখণ্ড উপড়ে দেবার অনুপ্রেরণা তা কি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য টানপোড়েনের মাঝখানে সর্বদা জাগ্রত এমনভাবে যার ফলে লেখক এক পায়ে খাড়া? তাতানিয়া কুজমিনিস্কায়ার লেখা পড়ে এ ধারণা হয় তাঁর জামাই-বাবু ছিলেন একপায়ে খাড়া। সে লোকটির জমিদারি দেখা, ক্ষেতখামারে কাজ, সাধুসন্তদের সঙ্গে আলাপ, মস্কোয় সাহিত্যিক আড্ডা এবং পারিবারিক জীবন (তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের চিঠি—'তুমি

আমাদের থ্যাকারে') এ সবের পেছনে সেই অবিরত প্রস্তুতির ইঙ্গিত। হয়ত এটা সম্পূর্ণ ছবি নয়। আরও একটা ছবি আছে যা একজন বিমুখ বিরূপ বিপর্যস্ত লোকের, যার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তলস্তয়ের ডায়েরীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও একেবারে হাহাকারের মাঝখানেও নিজেকে এবং চারপাশের লোককে হাতড়ে হাতড়ে আবিষ্কার করার সঙ্গে সাহিত্যকর্মের এক গভীর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আমার এ জর্ণালের পেছনে কী তাগিদ আছে? একটা খুব মোটা কথা থাকা স্বাভাবিক—কি কি বই পড়েছি তার ফিরিস্তি অথবা পেশার সুযোগে যে সব লোকের সঙ্গে চকিত পরিচয় ঘটে তাদের বর্ণনা। সরকারী দপ্তর, কর্পোরেশন্ বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের অলিতে গলিতে ঘুরবার সময় থ্যাকারের বইয়ের নামটা বারে বারে মাথায় ঘোরে। কিন্তু মুস্কিল হল ছুনিয়াটা 'ভ্যানিটি ফেয়ার' ভেবেও লেখকের যে স্থৈর্য তা আমার নেই। 'ছুনিয়াটা যেন ভাই ঠগেদের মেলা', কিন্তু তার মানে সবাই ঠগ, আমিও ঠগ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস মূলত ঠগেদের ইতিহাস এ ধরণের হয়ত অপ্রাসঙ্গিক চিন্তায় স্থৈর্য চুরমার, মেলা দেখবার মজা উবে যায়। তখন এই ইতিহাসকে লালন করার জন্যে কলম ওঠে না। আর কেবল সাহিত্য পড়ে কিংবা চর্চা করে মানুষ সৎ থাকবে, বিপথে যাবে না, একথা প্রায় ঠাট্টার মত শোনায়। যেখানে অনেক হাতী তল পায় না সেখানে লেখকও তল পান না। কাজেই থ্যাকারের জন্মানোর প্রায় দেড়শো বছর পর তাঁর প্রিয় বিশেষণ 'সারকাস্টিক' হতে গিয়ে কারুর কান্না পেয়ে যায় আবার কান্নার নিষ্ফলতায় বিশ্বাসী বলে শেষ পর্যন্ত হৃদয় হিম হয়ে পড়ে পড়ে।

এ লেখার কোন মানে থাকে যদি কিছু পরিমাণে একজন সাধারণ লোকের বিহ্বলতার সৎ পরিচয় দেয়। লোকটা বিহ্বল কিন্তু চায় কিঞ্চিৎ বিহ্বলতা কাটাতে। তার পা থেকে মাটি সরে যায়, বুদ্ধি অচল হয় কিন্তু চেষ্টা করে সে দাঁড়াতে। হয়ত সব সময় পারে না, কিন্তু চেষ্টা করে।

১৫ই মার্চ, ১৯৬০

সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে গায়ে জ্বালা ধরেছিল। তিনি আমাদের শিক্ষাদপ্তরের এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। এমন এমন লোক আছেন যাদের সঙ্গে আলাপে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কতগুলো প্রিয় ফরম্যুলায় এসে কথা থামে। ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে ভদ্রলোকের ফরম্যুলায় এসে আমাদের আলাপের ছেদ। অকাট্য যুক্তি যেন ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "ইংরেজী ভাষাটাতো আর আমাদের নাকের জলে চোখের জলে শিখতে হচ্ছে না।" তারপর পাবনায় আমার দেশ শুনে বললেন, "আপনার দেশ-গাঁয়ে খাল পেরোতে নৌকো, কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিতে জাহাজ।" ইংরেজী ভাষার স্বপক্ষে ওকালতির আসল কারণ জানিয়ে দিলেন, "আমার আপনার ছেলেকে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ইংরেজের ছেলের সঙ্গে।" মনে হল থপাস করে খুব চেনা নোংরা চিন্তার পাঁকে পড়ে গেলাম। ইংরেজী শিক্ষার দুশো বছরের এই স্বপ্ন অথবা অভিশাপ শুধু এ ভদ্রলোক কেন ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অধিকাংশ লোকেরই বক্তব্য।

তবে ইংরেজী আমাদের নাকের জলে চোখের জলে শিখতে হয় কিনা তা যদি কেউ একবার আমাদের

মত অফিসে এসে দেখে যায়। ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্তের জন্যে ('advocate' লিখব না 'urge' লিখব, to হবে না for) যে কি মর্মান্তিক গর্ভযন্ত্রণা, আর খালাস হবার পর কি হাঁপছাড়া ! অবশ্য বিদেশী ভাষা আয়ত্তের জন্যে প্রসবযন্ত্রণা অবান্তর হতে পারে যদি ভাষা হয় বিদেশী ভাষাটা যেহেতু পেট থেকে পড়েই শিখে ফেলেছি এতএব তা নিয়ে যথেচ্ছাচার চলে। আমাদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে এমন প্রবল উৎসাহ তার প্রধান কারণ শুদ্ধ ইংরেজী লেখা কিম্বা হুড়মুড় করে বলার গুঁতো আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই ভোগ করতে হয় না।

অবশ্য ভদ্রলোক বাংলা ভাষার এক সুদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দিলেন। বললেন, "বাংলা ভাষার উন্নতি তো সব মহাপুরুষদের জন্যে। সেইরকম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র…রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী …তারাশঙ্কর (একটু ভেবে)…এইরকম মহাপুরুষেরা যদি আরও জন্মান তাহলে হবে।" বাংলা ভাষার জাহাজে চড়ে বাধার সমুদ্র ডিঙিয়ে আমরা বড় বড় চাকরীর সাজানো দ্বীপে শীঘ্র পৌঁছে যাবো।

আমার চাটার্ড ব্যাঙ্কের এক কেরানীর অসহায়তার কথা মনে এল। ছেলেটির মা মরণাপন্ন, কিন্তু তার ছুটির দরখাস্তে ইংরেজী ভুলের আধিক্য থাকায় তা গভীর অবজ্ঞায় নামঞ্জুর হয়েছিল। আর ইংরেজী ভাষার অধুনা প্রসার উইলিয়ম সেক্সপীয়রের মত গুটিকয়েক মহাপুরুষের কীর্তি নয়। তার কারণ ইংরেজদের দুনিয়া-জোড়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবিস্তার—একথা আমাদের দেশের লোকেরা তাদের নিজেদের জীবনের গ্লানির শিক্ষায় যত তাড়াতাড়ি শেখেন ততই ভাল। ভাষা মানুষের নিঃশ্বাসের মত, ভাল চাকরী পাওয়ার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। আমাদের বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে ইংরেজী ভাষাকে সমূলে উৎপাটিত করার ওপর।

২৫শে মার্চ, ১৯৮০

চোখে জ্বালা, চোখের পাতা ভার। ফ্যালফ্যাল করে এমন ভাবে চেয়ে থাকার ইচ্ছে যাতে সামনের চলমান জগৎটা কী টের পাওয়া দায়। ঘাড়ে ব্যথা, পায়ের পাতায় চিন্‌চিন্, বেস্বাদ জিভ। শরীরের ও মনের এই একান্ত ওলোটপালটের লগ্নে টমাস হার্ডি, টি. এস. এলিয়ট ও টয়েনবী—এদের সম্পর্কে কেবল একটি ধারণাই অসাড় মনে প্রবেশ করে—সকলের নামের গোড়ায় 'ট'।

তরশু দিন নাইট ডিউটি, পরশু কর্পোরেশনে এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা বাজেট মিটিং, গতকাল এ্যাসেমব্লি রঙ্গমঞ্চে মন্ত্রী ও বিরোধী সদস্যদের ক্লান্তিকর দীর্ঘ অভিনয়। তিনদিনই রাত বারোটায় অরুচি দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা ভাত। বিপরীত থাকার ইচ্ছে সত্ত্বেও করুণ। বাড়িতে অস্বোয়াস্তি। পরের দিন সকালে শরীরের অসহনীয় অবস্থা, মনও তদ্রূপ। …হায় শিল্পীর অখণ্ড সত্তা, কোন গভীর অরণ্যের মায়াবী হরিণ !

২৮শে মার্চ, ১৯৬০

কবিতার আর্তনাদ

(ডাঃ রোহীন্দ্র চক্রবর্তী-কে)

কবিতার আর্তনাদ আসামের দুরন্ত জঙ্গলে ;
হাওয়ায় হরিণখুর, গিরিপথে বেগবান বাঁকে
চাঁদিনীর প্রবঞ্চনা মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু ডাকে,
কিম্বা ম্লান অপরাহ্নে পলাশের ছায়াফেলা জলে
ছায়া ফেলে ক্লান্ত জীপ, অচঞ্চল আরোহী হুইলে
অবিকম্প অবসাদে চায় মৌন সৌন্দর্যের দিকে,
বনের মাথায়, আরও দূরে, আরও স্তব্ধ দূরলোকে ;
কবিতা কোথায় কোন শূন্যে অবলুপ্ত কোন কালে ?

তোমার জীপের ঠিক পিছনেই আমার হৃদয়
ধাবমান, আমাদের অনেকেরই দীর্ঘ কুশিক্ষায়
কবিতাও লজ্জাস্থান, পাছে কেউ দেখে ফেলে ভয় ;
সবজান্তা সাম্রাজ্যে সর্বগ্রাসী সুবিশাল ছায়া
আমাদের কণ্ঠে নামে, রক্তে শুধু রুদ্ধ কথা-কওয়া
কবিতা কি ভোলা যায়, ভোলা যায় আজন্মের হাওয়া ?

ন বছর আগে অফিসে নাইট ডিউটিতে কালবৈশাখির ঝড়ে একটা কবিতা লেখা হয়েছিল—'বাতাসে জলের গন্ধ'। আজ লালবাজার থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট দিয়ে ফেরার পথে প্রচণ্ড রোদ্দুরে কবিতার প্রথম লাইনটা মনে আসে। অফিসে এবং চায়ের দোকানে প্রথম আট লাইন আর বাড়ি ফিরে ছ'লাইন, মাঝখানে একটা ফাঁক লাগছে চোদ্দটা লাইন যেন একসঙ্গে একটা দীর্ঘ গোটা নিঃশ্বাস ফেলার মত লিখে ফেলা উচিত ছিল।

৩রা এপ্রিল, ১৯৬০

'সব জানা মানুষের সর্বগ্রাসী সান্নিধ্যের ছায়া'—বোধ হচ্ছে সনেটটার দ্বাদশ লাইন হিসেবে ভাল। আগের লাইনটা ঠিক মেঠো বক্তৃতা না হলেও বড় জোর এ্যাসেমব্লির জোরাল ভাষণ, যে ভাষা (মেহেরুসাহেবের হলেও) আসলে প্রাণহীন, যত তা প্রাণহীন হবে, তার অলঙ্কার-বহুলতা বাড়বে, 'এফেকটিভ' হবার জন্যে প্যাঁচের পর প্যাঁচ বাড়বে, তত তা মুমূর্ষু হয়ে পড়বে। ভাষার এই ব্যাপারটা ভারি মজার। বোধহয় শেষপর্যন্ত এর উজ্জীবনের জন্যে কবিরাই দায়ী। পুরনো শব্দ যাকে সহস্রবার মেজে-ঘষে ধুয়ে-পাকলে একেবারে নির্জীব পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। তাতে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

করার ক্ষমতার জন্তেই কবিতা বেঁচে যাবে। কবিতার ভাষা চমকপ্রদ, উচ্চকণ্ঠ, ধ্বনিতে আবৃত ভাষা নয়। 'প্যারাডাইস্ লস্ট' সম্পর্কে এলিয়টের আপত্তি—দি এমফাসিস ইজ্ অন্ দি সাউণ্ড, নট্ দি ভিশন্। তাই আমল না দেওয়া কঠিন। সামান্য কয়েকটা লাইনে কবিরা যে ওলোটপালট কাণ্ড করেন তা শিল্পের অন্য কোন মাধ্যমে অসম্ভব। উপন্যাসেও সেই একই সাধনা কিন্তু অনেক ছড়ানো পরিবেশে সে কাণ্ড ঘটে। একটা মামুলী কথা যা প্রত্যেক দিনের উচ্চারণে প্রায় অসাড় তা একটু রকম ফেরে নড়ে চড়ে নেচে ওঠে। উপন্যাসে এ 'ভেল্কি' আসে মূলত চরিত্রগড়ার পদ্ধতিতে। সাধারণ আচরণ জুড়ে জুড়ে অসাধারণ তৈরী হয়, যাকে ইংরেজীতে কেউ বলবে 'ক্যারেক্টার' 'ভিশনে' দাঁড়াল। উপন্যাসিক যে 'ভিশন' বা জগচ্ছবির কারবারী তা যত বস্তুগ্রাহ্য সমস্যাকণ্টকিত, সাধারণভাবে বলতে গেলে 'অসাহিত্যিক', তা তত সমৃদ্ধ ও জীবন্ত। অবশ্য এখানেও সরল রেখা টানা ভুল হবে। এডুইন মুয়িরের উপন্যাসের কাঠামো সম্পর্কে বক্তব্য যখন খুবই গ্রাহ্য তখন বিষয়ের বিভিন্নতায় জগচ্ছবির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যও যে অনিবার্য তা না-মানবার কোন কারণ নেই। তবে একথাটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে আপাত দৃষ্টিতে কবিতা থেকে যত সুদূর উপন্যাসের বিষয়বস্তু তত তা বাস্তবিক কবিতার কাছে। অনেক সময় উপন্যাসিকদের মতিভ্রম হয় (ছোটগল্পে এ প্রমাদ আখছার)। হঠাৎ বিশেষ একটা ঘটনা কিম্বা রংদার কোন কথোপকথনের লেঁজ ধরে উপন্যাসের নির্বিকার স্বর্গে আরোহণের অভিলাষ জাগে। আর স্বর্গ থেকে বিদায়ের রাস্তা তত পাকা হয়।

বাংলার পাঁচালিকার

অতীন্দ্র মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির মধ্যে ছোটো বড় নানা ঘটনার সরস বর্ণনার মধ্যে একটি ছোট ঘটনা, জানি না, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি না। সেটি তাঁর 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে'র অধীনে থাকার সময়ের ব্যাপার। ছেলেবেলায় যে সমস্ত ভৃত্য তাঁকে শাসন করে রাখত তাদের মধ্যে একজনের কথা তিনি একটু বেশি করে বলেছেন। সে ঈশ্বর, বা ব্রজেশ্বর। ঠাকুরবাড়াতে চাকরি করতে আসার আগে সে গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশাইগিরি করতো। স্বভাবত এই কারণে তার আচরণ ছিল গম্ভীর, মুখের ভাষা শুদ্ধ, 'বাবুরা বসে আছেন' না বলে, সে বলতো 'বাবুরা অপেক্ষা করছেন'। এই ঈশ্বর বা ব্রজেশ্বরই সেই ছোট ঘটনাটির প্রযোজক। মূল অভিনেতা শেষের দিকে আর একজন। কবিগুরুর নিজের কথাতেই তার একটু বিবরণ দিই—

> "এই ভূতপূর্ব গুরু মহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত, ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মত ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশ লবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সঙ্কটের সময়ে হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল ;—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

এই কিশোরী চাটুজ্যে সম্বন্ধে 'ছেলেবেলা' বইতেও কবিগুরু উল্লেখ করেছেন—"সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। 'ওরে রে লক্ষ্মণ, একী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের সুর বাজিয়ে চলেছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ।" এই কিশোরী চাটুজ্যের ছিল পাঁচালির দল, এবং তার সবচেয়ে বড়

আপসোস ছিল এমন গলা নিয়ে তার দাদাভাই, কিনা রবীন্দ্রনাথ, পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলেন না। পারলে দেশে যা হয় একটা নাম থাকত!

জীবনস্মৃতির এই অংশটুকু পাঠ করে কৌতূহলী পাঠকের নিশ্চয় পাঁচালি জিনিসটা সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জাগবে। কী এমন সে জিনিস যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করে রাখত! সেই কৌতূহলকে কেন্দ্র করেই এই আলোচনা।

পাঁচালি গান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বা পাঁচালি-রচয়িতা কবিদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার আগে, 'পাঁচালি' কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটো কথা সেরে নেওয়া ভাল। কেউ কেউ বলেন সংস্কৃত পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা যা একধরনের গীতিকাব্য—সেই পঞ্চালী কথাটি থেকেই পাঁচালি শব্দটি এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পায়চারি করে আসরে এই গান গাওয়া হত, তাই 'পায়চারী' বা 'পাচারি' কথাটি থেকে 'পাঁচালি' শব্দটি এসেছে। ঠিক কোথা থেকে পাঁচালি শব্দটি এসেছে, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, এই পাঁচালি জিনিসটি বাংলা গীতিকাব্যেরই একটি শাখা, এবং তা সুর করে গান গেয়ে আবৃত্তি করা হত। তাই শুধু পাঁচালি না বলে একে পাঁচালি গান বললে এই জিনিসটার বিশেষত্ব অনেকটা বোঝানো যেতে পারে।

পাঁচালি গান লৌকিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন অবশেষ। প্রথম প্রথম লৌকিক সাহিত্যের মোটা-মুটি তিনটি ধারা ছিল, প্রথম ধারা-গান, দ্বিতীয় ধারা—ছড়া, তৃতীয় ধারা—গেয় বা বাচনীয় আখ্যান। ছোট বড় দুই রকমেরই গান ছিল এবং তা মেয়েলি ব্রতে, গ্রাম্য কিংবা গার্হস্থ্য উৎসবে বা দেবপূজাতেও গাওয়া হত। এই সব মেয়েলি ব্রতের গানে সাহিত্যরসের কোন বালাই ছিল না। সোজা সরল কথায় নিজেদের মনের প্রার্থনা জানাবার জন্যেই এর ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। গ্রাম্য উৎসবের উপলক্ষ ছিল ফসল বোনা ও ফসল তোলা, ঋতু উৎসব, গ্রাম্য দেব বা দেবীর বাৎসরিক পূজাপার্বণ, আর গার্হস্থ্য উৎসবের উপলক্ষ ছিল পুত্রকন্যার জন্ম, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, বাড়ীর ঠাকুরের নিয়মিত বা বিশেষ পূজা। গার্হস্থ্য উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলকামনা, তাই তাকে মঙ্গলগানও বলা হত। অশোকের সময় পর্যন্ত এই মঙ্গলগানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অশোকের ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসনে আরও দুটি গ্রাম্য উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়—সেই উৎসব দুটির আধুনিক নাম ভাদু বা ভাদো ও তুষু বা তোষলা। অশোক বলছেন—"আমার এই অনুশাসন চারমাস ধরে তিষ্য নক্ষত্রে সকলে অবশ্যই শুনবে, উপলক্ষ হলে অন্যসময়ে একজনেও শুনতে পারে।" তিষ্য নক্ষত্রে শোনার অর্থ, এই নক্ষত্রে নিশ্চয় কোন সামাজিক বা সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হত। তিষ্য নক্ষত্রের অন্য নাম পুষ্যা। পৌষমাস ফসল তোলার কাল—ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসও তাই। ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্রপূজার সঙ্গে কিংবা বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলে গিয়ে পশ্চিম বাংলায় হয় ভাদু পূজো। কোন কোন অঞ্চলে আবার ইন্দ্রপূজা অগ্রহায়ণ মাসের শস্য-উৎসবের সঙ্গে মিলে গিয়ে হয়েছে অবিবাহিতা বালিকাদের ইতুপূজা। মানভূমে পৌষমাসের উৎসব তুষু (টুসু) বীরভূমের ভাদু পরবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পৌষলা নামে যে বনভোজন উৎসব নদীয়া আর মুর্শিদাবাদে হয়ে থাকে তারও উৎস পৌষমাসের শস্য-উৎসব।

বসন্ত উৎসবের নাম ছিল ফাল্গু বা ফল্গু-উৎসব। এই উৎসবের সময় যে বিশেষ ধরনের নাচগান হত, সেই গানের নামও ছিল ফল্গু, অবহট্‌ঠে 'ফগ্‌গু', প্রাচীন গুজরাটিতে, 'ফাগু' 'হিন্দীতে' ফাগুয়া।

তেমনি রাসনৃত্য থেকে অবহট্‌ঠে রাসউ, প্রাচীন গুজরাটিতে রাসৌ, রাজস্থানী ভাষায় রাসা, হিন্দীতে রাস। মেয়েলি নাচগানের নাম ছিল চর্চরী। বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ গানের সঙ্গে যে নাচের বা অঙ্গভঙ্গীর নির্দেশ দেওয়া আছে তার মধ্যে 'চর্চরী' এবং 'জম্ভলিকা' কথা দুটি লক্ষণীয়। তার থেকে বাংলায় এসেছে 'চাঁচরী', লুপ্ত একটি গ্রাম্য উৎসব। 'জম্ভলিকা' বাংলায় হয়েছে 'ঝমাল' তার থেকে 'ঝুমুর', পুতুল নাচের সঙ্গে নৃত্যগীত অভিনয় হলে তাকে বলা হত 'পাঞ্চালিকা'। দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লিখে গিয়েছেন যে, এই পাঞ্চালিকা বা পুত্তলিকা—বস্ত্র, গজদন্ত, শৃঙ্গ বা কাষ্ঠনির্মিত হত। যিনি অধিকারী তিনিই মূল গায়েন বা 'ওঝা'। তাঁর হাতে থাকত চামর, এক পায়ে নূপুর। তাঁর সহকারীরা দোহার বা 'পালি'। তাঁদের কাজ ছিল মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজানো। পাঁচালি গান এই 'পাঞ্চালিকা' উৎসব থেকেই এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই পাঁচালি গান কিভাবে গাওয়া হত তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে একখানি চটি বইয়ে। বইখানির নাম "৺কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ"—সংগ্রাহক হরিশচন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ ঢাকা থেকে ১৮৭০ সালের মে মাসে। হরিশচন্দ্র মিত্র তাঁর বিবরণে বলছেন—

> …এই সকল কাব্যের (রামায়ণ, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল) গায়কগণ ৭।৮ জনে সম্প্রদায় বাঁধিয়া গানের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। এই ৭।৮ জনের মধ্যে একজন মূল গায়েন বা গায়ক উপাধিক, অবশিষ্ট সকলে দোয়ার। দোয়ারেরা তান লয় স্বর সংশ্লিষ্ট ধুয়া গাহিতে থাকেন, মূল গায়ক মূল কাব্যের কবিতা সকল সেই সকলে যোগ করিয়া বলিয়া যান। কখনও কখনও বা মূল গায়ক কথকতার ধরনে গদ্যে প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা করিয়া লইয়া থাকেন। দোয়ারেরা মন্দিরা বা খোল বাজাইয়া তাল দিতে থাকেন। মূল গায়কের হস্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ চামর থাকে। তিনি সময়ে সময়ে তাহা সঞ্চালন করিয়া কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ভাবভঙ্গী দর্শাইয়া থাকেন। এই সকল সম্প্রদায় রাঢ় অংশেই সুলভ।…

এখানে একটি জিনিসের তির্যক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। রামায়ণ গান করতেন বলেই কি কৃত্তিবাসকে 'কৃত্তিবাস ওঝা' বলা হত?

॥ ২ ॥

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যযুগে মৌখিক সাহিত্য ধারার অন্তর্গত গদ্য ব্রতকথাগুলি যখন কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল তখন তাদের গদ্যরূপ ছেড়ে দিয়ে বৈচিত্র্যহীন পয়ার ত্রিপদী বা লাচাড়ী ছন্দে পদ্যের আকারে সেগুলি লিখে দেওয়ার প্রবৃত্তি দেখা দিল। এর কারণ সেকালের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের কোন লিখিত রূপ ছিল না; যা কিছু লিখিত হত সব পদ্যের আকারেই লেখা। পুরুষ পুরোহিতের হাতে পড়ে কোন কোন ব্রতকথা পদ্যে লিখিত হয়ে পাঁচালির রূপ নেয়। এককথায় ব্রতকথার পদ্যের রূপান্তর পাঁচালি। অবশ্য পাঁচালি কথাটি একমাত্র এই অর্থেই আমরা মেনে নিই নি, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচালি কথাটি আরও নানা অর্থে

বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সে সমস্ত বিচার বিতর্ক বাদ দিয়ে এখানে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, আখ্যায়িকা মূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালি বলত। এই মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে পাঁচালিগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে—সেগুলি হচ্ছে সত্যনারায়ণের পাঁচালি, শনির পাঁচালি এবং ত্রিনাথের পাঁচালি। ব্রতকথা ও মঙ্গল কাব্যের দেব চরিত্রের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, এই সমস্ত দেবতারা সবাই পুরুষ। অবশ্য লক্ষ্মীর পাঁচালির লক্ষ্মী দেবী একান্তই নারী-সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির দেবী। কিন্তু সত্যনারায়ণ, শনি ও ত্রিনাথ—এই তিনজন দেবতার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে নারী-সমাজের কোন যোগ নেই। ব্রতকথার দেব চরিত্রের সঙ্গে একমাত্র নারীরই সম্পর্ক, কিন্তু এই তিনটি দেবচরিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে নারীর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে নি। এই পাঁচালিগুলির সঙ্গে আমাদের মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু মৌলিক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে লৌকিক দেবদেবী নিয়ে যত পাঁচালি আছে তাদের মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালিই হয় সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এই পাঁচালিও যে খুব প্রাচীন তা বলা যায় না, কারণ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর আগের কোন পুথি দেখা যায় না; কিংবা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে সত্যনারায়ণের কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। স্কন্দপুরাণের এক জায়গায় অবশ্য সত্যনারায়ণের উল্লেখ দেখি, কিন্তু সেটা যে পরবর্তী যোজনা, তা সবাই স্বীকার করেন। এর থেকেই মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা তার সামান্য পূর্ববর্তীকালের কোন অলৌকিকতা-সিদ্ধ পীর বা মুসলমান ফকীরকে অবলম্বন করে তাঁর সমসাময়িক কালে কিংবা তাঁর তিরোধানের অল্প পরে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচিত হয়।

মুসলমানদের দ্বারা বাংলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত থেকে মুসলমান ফকীররা বাংলাদেশে এসে হাজির হন এবং রাজশক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে বাংলা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। এঁদের প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও, তাঁরা এই ফকীরদের প্রতি যতটা না শ্রদ্ধা বা ভক্তি পোষণ করতেন, তার চেয়ে বেশী পোষণ করতেন ভয়ের ভাব; কারণ, মুসলমান রাজশক্তি কর্তৃক শাসিত সেদিনের বাংলার হিন্দুসমাজ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে একান্ত ভাবেই দৈবনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া থেকে সেদিন যেমন রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য, তেমনি হয়েছিল পাঁচালির সৃষ্টি। সেই জন্যই সেই সময়কার মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে পাঁচালিগুলির মৌলিক সাদৃশ্য আছে।

পরবর্তী কালে চৈতন্যধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে হিন্দুসমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের উপাসনা একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করল। মুসলমান ধর্মের বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদ যখন এদেশে প্রসার লাভ করেছিল, তখন চৈতন্যধর্মও শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ দেবতাকে আশ্রয় করে এদেশের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়ে তুলল, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বাইরে তৎকালীন হিন্দুসমাজের ওপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই যুগেই সত্যপীর হিন্দুর ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণ রূপে পুজো পেতে লাগলেন। এই সত্যপীরের বিজাতীয় সমস্ত উপকরণ নারায়ণের নামে শোধিত হয়ে হিন্দুর দেবমন্দিরে নিঃসংকোচে প্রবেশাধিকার লাভ করল। সত্যনারায়ণের উপাসনার মধ্যে বাঙালীর, যা সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, অর্থাৎ ধর্ম সমন্বয়—তার আদর্শ খুব স্পষ্ট। এই উপাসনার আদি উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ক্রমে

ক্রমে এই দেবতা আমাদের নিজস্ব ধর্মাচারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছেন। সত্যনারায়ণের নামে ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভই আজ এই পূজার লক্ষ্য।

সত্যনারায়ণের পাঁচালি সত্যনারায়ণের পুজোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত গানের সুরে আবৃত্তি করে শোনান। এই আবৃত্তি বা সুরসহযোগে পাঠ পূজাচারেরই অঙ্গ। সেইজন্যে এই পাঁচালিতে যে মৌলিক কাহিনী আছে তার কোন পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় ২৫০ বছর ধরে শত শত কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং ভারতচন্দ্রের মত প্রসিদ্ধ কবিও সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছেন। এই দুজন শক্তিশালী কবির রচনাও দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কবির সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনার স্রোত বন্ধ করে দিতে পারে নি।

শনির পাঁচালিও এই একই ধারায় পুরাণের শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী অনুসরণে রচিত। তবে এর নায়ক কোন রাজা বা বণিক নন; এর নায়ক, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও ভিক্ষুক। শনির পাঁচালি রচনার দিক থেকে ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। শনির পাঁচালির প্রচার প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ। তেমনি দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের নাথসম্প্রদায়ের পুরুষসমাজে ত্রিনাথের পাঁচালি সীমাবদ্ধ। নাথসম্প্রদায়ের তিনজন গুরু—মীননাথ, গোরক্ষনাথ এবং জালন্ধরীনাথ, হিন্দু trinity ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মতই তাঁদের সমাজে সমান শ্রদ্ধার পাত্র। ত্রিনাথ অবশ্য কালক্রমে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন। এই পাঁচালির কাহিনী অংশ দুর্বল আর যাঁরা এই পাঁচালি রচনা করেছেন, সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবিদের কাব্য রচনাশক্তিও উল্লেখযোগ্য নয়।

পাঁচালি কাব্যের এই হচ্ছে আদিস্তরের কথা। এর পর আমরা পাঁচালিকাব্যের পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই নতুন ধরণের পাঁচালিগুলি রচনার পিছনেও মধ্যযুগের পাঁচালি রচনার মত সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম। ভারতচন্দ্রই নাগরজীবনপুষ্ট বাংলা কাব্যের প্রথম দিক্‌দর্শক। তাঁর কাব্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যত বাদানুবাদই হোক না কেন, একথায় সবাই একমত যে, তিনিই প্রথম বাংলা কাব্যে আঙ্গিকের দিক থেকে অপরিমেয় পরিবর্তনের দ্বারটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও দেশী-বিদেশী ভাষার নানা শব্দ তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বাংলা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। আর সংস্কৃত ও বাংলার হরগৌরী মিলন ত তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি বলে স্বীকৃত। এই মিলনের চেষ্টায় কোথাও তিনি গলদঘর্ম হন নি, শিশুর হাসি ও পাখির গানের মত তা আয়াস ও আড়ম্বর শূন্য। ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনার মাধুর্য ও সরসতা বাদ দিলেও বহু জায়গায় শুধু শব্দ ও ছন্দের ঐশ্বর্যে তিনি যে কাব্যরস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পূর্বে আর কোন কবি তা পারেন নি। "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।" প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে শব্দের সাহায্যে অনুপ্রাসের ঐশ্বর্যে যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা এক কথায় অপূর্ব। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে তিনি যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। "ছলচ্ছল, টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা"—এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ—'ছলচ্ছল' জলের প্রবাহ বোঝাতে, 'টলট্টল' জলের

নির্মলতা বোঝাতে এবং কলকল জলের নিক্কণ বোঝাতে—গঙ্গাতরঙ্গের এমন সুন্দর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর কোন কবি বোধ হয় দিতে পারেন নি। তাঁর বিদ্যাসুন্দর অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু সে প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে সেই সময়ে উচ্ছৃঙ্খল নাগরজীবনের রুচি এই ধরনের কাব্যামদকে আশ্রয় করেই মত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র সেই সামাজিক চাহিদার জোগান দিয়ে গিয়েছেন মাত্র—তা না করলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে সভাকবির স্থান তিনি কিছুতেই পেতেন না। রামপ্রসাদের মত সাধক কবিকেও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সমান রুচি বিকৃতির চাহিদায় লিখতে হয়েছিল। এই সামাজিক বিকৃতরুচি এবং শব্দ ও ছন্দের প্রতি পাঠক সাধারণের আগ্রহ পরবর্তী কালের গীতি-সাহিত্য তথা পাঁচালির আদর্শ হয়ে দাঁড়ালো। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর অনুকরণে অনেকগুলি পাঁচালির সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে, কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' এবং রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' লোকরুচির ওপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করেছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জিত এবং চতুর, কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে তা পাঠ করলে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বোধ হয় লজ্জিত হতেন।

পাঁচালি এই সময়ে লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে রচিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বা কাশীরামের রামায়ণ বা মহাভারত প্রচুর ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি করলেও, যুগের চাহিদা বিকৃতরুচি এবং পদলালিত্যের যোগান দিতে পারে নি। অথচ রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব সমাজের গভীরতম অংশে নিজের প্রভাবের মূল বিস্তার করে দিয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলের মত ভাষা, শব্দ, ছন্দের ঐশ্বর্যে মহীয়ান্ কাব্য দিয়েও সে প্রভাব ঠেকাতে পারেন নি। পাঁচালি কবিদেরও তাকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নাই। ছন্দোবদ্ধ কাহিনীই পাঁচালির প্রাণ—হাতের কাছেই রামায়ণ-মহাভারতের, বিদ্যাসুন্দরের, কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-লীলার কাহিনীর অভাব নাই। তাই পাঁচালি কবিদের প্রথম ঝোঁক পড়ল, এই সব কাহিনীগুলিকে পাঁচালির মাধ্যমে পুনর্বিবৃত করা। প্রাচীন ধারার এইটুকুই ক্ষীণ অবশেষ থাকল যে, একালের পাঁচালিতেও দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা—কিন্তু তাতে ভক্তির ভাব যতটা প্রকাশ পেল তার চেয়ে বেশী প্রকাশ পেল ভারতচন্দ্র প্রদর্শিত পথে শব্দ ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রতি কবিদের মোহ এবং মনোযোগ।

এই যুগের পাঁচালি-রচয়িতা কবিদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কাব্য-রচনার নমুনা দেবার সময় এসেছে। এই সময়ের এই নতুন ধারার কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে দুজনের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীদের সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচিত হওয়ার ২০ বছর পরে আনুমানিক ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জয়নারায়ণ সেন ও তাঁর বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী দুজনে রচনা করেন 'হরিলীলা'। জয়নারায়ণ সেনের বংশ খুব বিদ্বান বংশ ছিল এবং আনন্দময়ীও সেকালের বিচারে খুব বিদুষী ছিলেন। আনন্দময়ীর বিবাহ হয় পয়গ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ সালে। তখন আনন্দময়ীর নয় বছর বয়েস। কথিত আছে স্বামীর অজ্ঞাত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় নানা বিতর্কের সমাধান তিনি অন্তঃপুরে বসেই ঠিক করে দিতেন। ইনি এবং এঁর কাকা দুজনে যে হরির পাঁচালি লেখেন তাতে আনন্দময়ীর ভণিতা দেওয়া কোন পদ নাই, কারণ সেকালে স্ত্রীলোকের নামের ভণিতা দেওয়ার রীতি

ছিল না। তবে হরির পাঁচালিতে দুজনের রচনাভঙ্গীর বিশিষ্টতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। জয়নারায়ণের রচনার নমুনা :

সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি শিরে শ্বেতছত্র
ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি ॥ ধবক্ ধবক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব
ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে ॥ টলটল
মুকুতা কুণ্ডল কানে দোলে। ঢলঢল গজমতি মালা
দোলে গলে ॥ কস্ কস্ কসাতা সটুকা
কটিতে। ঝল্‌মল্ ঝক্‌মকে স্বর্ণ ঝালরেতে ॥ ডগমগ
সপ্তকন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে
রহিয়া রহিয়া ॥ ঝন ঝন্ লাগে কানে কঙ্কণের
ধ্বনি। ঝক্‌মক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলে মনি ॥

—রাজসভাবর্ণনা ॥

আনন্দময়ীর রচনার নিদর্শন :

হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরোক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥
কত চারু বক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥
কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা, ॥

ইত্যাদি।

আবার সরল ভাষায় রচিত পদও আছে :—

যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে ॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী ॥
শীতভয়ে যে বুকে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত ॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট-মনে।
সে কঙ্কণ কুন্দল করিয়া দিব কানে ॥
আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন ॥ —বিরহিনী সুনেত্রার খেদ ॥

এই রকম শব্দবিন্যাসের কৌশলে সমকালীন দুজন কবি গীতগোবিন্দের কাহিনী অবলম্বনে পাঁচালি রচনা করেছিলেন—রসময় দাস ও গিরিধর। গিরিধরের রচনায় সংস্কৃত শব্দের নিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার স্থূল অনুবাদ করে গিরিধর যে পাঁচালি রচনা করেন তার একটু নিদর্শন :

তব দন্ত অগ্রে ধরণীর রয় যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়
জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত শূকররূপধরী।
হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে
জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরিরূপধারী॥

ভাষায় এবং শব্দ ব্যবহারে ও ছন্দ অনুসরণে এখানে এবং আগের উদ্ধৃতিগুলিতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত অবলম্বনে একজন কবি একটি কাব্য রচনা করেন। কবির নাম দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম কৃষ্ণনগরের উলা-গ্রামে। দুর্গাপ্রসাদের পিতার নাম আত্মারাম, মার নাম অরুন্ধতী। সেই সময়ে পাঁচালি কাব্যের মাধ্যমে প্রায় সব পৌরাণিক এবং লৌকিক দেবদেবীই বাঙালীর ঘরে ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন, বাকী ছিলেন গঙ্গাদেবী। বহু দেরীতে তাঁর ধারণা হল "ভাষায় আমার গান নাই"—তখন তিনি দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রীকে স্বপ্ন দিলেন, তোমার স্বামীকে বলে আমার জন্য কাব্য লেখাও। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী' নামে যে কাব্য দুর্গাপ্রসাদ লেখেন, তার রচনার পরিপাট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই গঙ্গার পাঁচালিটি ঐতিহাসিক দিক থেকেও মূল্যবান। আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীরা যখন যুবতী ছিলেন তখন তাঁরা কি কি অলঙ্কার পরে আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের মন চুরি করতেন তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এই কাব্যে পাই—

ঢেঁড়ি, চাঁপি, মাকড়ী, কর্ণেতে কর্ণফুল।
কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুনী ভালো।
লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার।
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুক্‌ধুকি জড়াও পদক পরে সুখে।
সোনার কঙ্কন কারো সোনার সম্মুখে॥

ভারতচন্দ্রের অনুকরণে পরবর্তী ৫০।৬০ বছরের মধ্যেই বাংলাকাব্যের গীতিশাখায় আরেক ধরনের লঘু চপলতা দেখা দিল। চটুল ছন্দবহুল শব্দকে আশ্রয় করে যাত্রায় ও কবিগানে ব্যবহারের জন্য একধরনের গান সে সময় রচনা করেন গোপাল উড়ে, কৈলাস মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল বারুই। এই দোলনপ্রধান ছন্দে আরো জানা অজানা বহু কবি লঘুভাবের যে-সমস্ত গান লিখেছিলেন তার প্রভাব

থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের রুচিশীল আবহাওয়াও মুক্ত থাকতে পারে নি। বাল্যকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে গান শিখেছিলেন—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে এল পাড়াতে
সাধের উল্‌কি পরাতে
আবার উল্‌কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্‌কি
ঠাকুরঝি
উল্‌কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি!

কিংবা

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিও না
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা

এই সব গানগুলিকে ঠাকুর বাড়ির সিংহ দরজার দারোয়ানও ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।

॥ ৪ ॥

এই শ্রুতি সুখকর কিন্তু কুরুচি-দুষ্ট গীতিরচকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয় দাশরথি রায়। দাশরথির জন্ম ১৮০৪ সনে, মৃত্যু ১৮৫৭-তে। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, পৈতৃক বাসস্থান বর্ধমানের বাঁদমুড়া গ্রামে। কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছিলেন পাটুলীর কাছে তাঁর মামার-বাড়ি পিলাই গ্রামে। বড় হয়ে যুবক বয়সে তিনি শাঁকাইতে একটি নীলকুঠির কেরানীগিরি করার সময়, শোনা যায়, আকাবাই নাম্নী একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি চাকরী-বাকরি সব ছেড়ে দিয়ে আকাবাইয়ের কবির দলে গান বাঁধার কাজ নেন। একদিন হয় কি, দাশুর প্রতিপক্ষ ছড়া বেঁধে দাশুকে খুব গালাগাল দেন— দাশু ঠিকমত জবাব না দিতে পেরে চলে আসেন। এতে দাশুর মা নাকি তাকে খুব বকাঝকা করায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন আর কবির দলে গান বাঁধবেন না। তিনি পাঁচালির দল তৈরী করে নতুন অস্ত্র হাতে নিয়ে বাংলাদেশে দিগ্‌বিজয়ী হন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, লবকুশের যুদ্ধ, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন এমন কি সমকালীন সামাজিক ঘটনা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টার ওপরেও তিনি পাঁচালি গান রচনা করেন। যত পাঁচালি কবি ইতিপূর্বে জন্ম দিয়েছেন দাশুরায়ের মত খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা আর কোন কবি পান নি। বিদ্রূপে, শ্লেষে, অনুপ্রাস ও যমক অলঙ্কারে, সুঠাম শব্দযোজনায়, আশ্চর্য ছন্দকৌশলে দাশু রায়ের ক্ষমতার কাছে সে যুগের কোন কবি দাঁড়াতে পারেন নি। তাঁর বৈষ্ণব-নিন্দা প্রসঙ্গে বিদ্রূপের একটু নমুনা উদ্ধৃত করি—

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া
কী আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি,
বলে গৌর ডাক রসনা গৌরমন্ত্রে উপাসনা
নিতাই বলে নৃত্য করে ধূলায় গড়াগড়ি।

গৌর বলে আনন্দে মেতে একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে

বাগ্‌দি কোটাল ধোপা কলুতে একত্রে সমস্ত

বিল্বপত্র জবার ফুল দেখতে নারেন চক্ষুশূল

কালি নাম শুনলে কানে হস্ত।

কিবা ভক্তি কি তপস্বী জপের মালা সেবাদাসা

ভজন কুঠরী আহিরি কাঠের বেড়া

গোঁসাইকে পাঁচ সিকে দিয়ে ছেলেশুদ্ধ করেন বিয়ে

জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া।

ভজহরি শ্রীনিবাস বিদ্যাপতি নিতাই দাস

শাস্ত্র ইহাদের অগোচব নাই কিছু

এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত করেন কিবা সিদ্ধান্ত

বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু!

যমক অলঙ্কার ও অনুপ্রাস রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ কবি। এই রকম রচনার কিছু নমুনা দিই—

শয়ন করিয়া সে কুসুম শেযে

হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে

কত না কৌতুকে জেগে সারানিশি পোহাত!

* * *

বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর, সব,

অবসর হয় না সর দিতে

সর সর করে ত্রিভঙ্গ হয় বাছার স্বরভঙ্গ

বাক্যশর হানে আবার তাতে!

* * *

(আমার) কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে

কাজ কেবল সেই পীতবাসে

যে-যার হৃদয়ে বাসে

সে কি বাসে বাস করে?

দাশরথি রায়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ—তিনি শুধু শাব্দিক কবি, তাঁর পাঁচালিগুলিতে দেবদেবীর নিতান্ত মানবরূপ; ছন্দের চাতুর্য যতটা, ভাবগাম্ভীর্য ততটা নেই—ইত্যাদি। কিন্তু আগেই বলেছি, একথা ভুললে চলবে না বাংলা সাহিত্য-সরস্বতী তখন সামাজিক চাহিদায় দেবমন্দির ছেড়ে জনসাধারণের পদধূলি চিহ্নিত রাজপথে নেমে এসেছেন। দাশরথি রায় সেই লোক-সরস্বতীর পায়েই অঞ্জলি দিয়েছেন। যে-গুণে হোরেস, বোকাসিও, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আজও এক শ্রেণীর লোকের কাছে আদর, সেই গুণে দাশরথি রায়েরও সেই যুগে আদর ছিল। তবে দাশরথি রায়ের পাঁচালিগুলিতে উপাখ্যানভাগে অপটুতা, লঘুভাব এবং নিতান্তই শব্দ চাতুর্যের সমারোহ থাকলেও তাঁর

শ্যামাসঙ্গীত এবং আগমনী-গানগুলি কিন্তু ভাবগভীরতায় সত্যই অনবদ্য। জর্মন কবি স্থবার্ডের মত দাশরথি রায়ের মধ্যেও বোধ হয় সত্যিকার একটা কবিসত্ত্বা সুপ্ত ছিল। জীবনের শেষভাগে চরম ভক্তিরসে তা বিকশিত। তিনি যখন বলছেন—

দুর্গে, করো মা এ দীনের উপায়
যেন পায়ে স্থান পায়।
আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে তব প্রিয় পঞ্চস্থলে
আমার পঞ্চভূতে যেন মিশায়॥

শ্রীমন্দিরে অন্তর আকাশ যেন যায়
এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎপ্রতিমায়
মা, মোর পবন তব চামর ব্যজনে যায়
হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়॥

আমার জল যেন যায় পাদ্যজলে
যেন ভবে যায় বিমলে
দাশরথির জীবন মরণ দায়

কিংবা—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল!
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার!
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হোল॥

তখন বোঝা যায় শব্দ-কৌশল আর অনুপ্রাস যমকের ঘনঘটা সৃষ্টি করবার জন্যেই দাশরথির জন্ম নয়, সেখানে সত্যিকার একটি ভক্ত হৃদয় আত্ম নিবেদনের জন্য অশ্রুজল ব্যাকুলতায় উদ্বেল। তাঁর পাঁচালি কাব্যগুলি কালস্রোতে মিলিয়ে গেলেও তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি ভক্ত সাধকদের কণ্ঠে যুগ যুগ ধরে পিপাসিত ভক্ত আত্মার হৃদয়ে শান্তির অমৃত বর্ষণ করবে।

গ্রন্থসমীক্ষা

বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্রনাথ সেন। প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স; যাদবপুর, ক'লকাতা বত্রিশ। প্রথম খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, সাড়ে দশ টাকা; দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা, বার টাকা॥

প্রকৃতিকে না জেনে তাকে বশ করার চেষ্টা জাদুবিদ্যায়, প্রকৃতিকে জেনে তাকে জয় করার নাম বিজ্ঞান। একদা মনে করা হত, ধ্রুপদী যুগ থেকেই ভারতে ও গ্রীসে বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলনের সূত্রপাত। কিন্তু গত শতক থেকে ব্রেস্টেড, গর্ডন চাইল্‌ড, হ্যাডন, লাবক, মায়ার্স, অসবোর্ন প্রভৃতির গবেষণায় যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, আদিম তথা প্রস্তর যুগ থেকেই বিজ্ঞান মানুষের বিশ্বস্ত অনুচর। বলা বাহুল্য, আজকের বুদ্ধিজীবিত বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি আদিম মানুষের অধিগত ছিল না; কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব কর্মতৎপরতার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রাথমিক অস্ফুট আকারগুলি সে যুগে বিদ্যমান ছিল। খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের নিশ্চয়তা এবং প্রাচুর্যের কামনায় সেকালের মানুষ চারপাশের প্রকৃতিকে, তার নিয়ম-স্বভাবকে জানবার চেষ্টা করেছে, এবং এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন উপকরণকে নিজ প্রয়োজনমতো পরিবর্তনও করে নিয়েছে। সে হাতিয়ার তৈরি করেছে। যথাসময়ে শিকারে ও ফলসংগ্রহে গেছে, চাষে নেমেছে, জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছে। ঋতুর আসা-যাওয়া পশুপাখীর চরিত্র, মাটির গুণাগুণ, আবহাওয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—পরিপার্শ্ব প্রসঙ্গে ইত্যাকার জ্ঞান এবং তার সুবিহিত প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও মননশীলতা তথা বৈজ্ঞানিকতা। বাঁচবার দুরন্ত তাগিদে প্রস্তর যুগের মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে শিখেছিল আপন অজ্ঞাতসারেই। অজ্ঞাতসারে, কারণ যথার্থ বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব ছিল, এবং এই অভাবের জন্যেই চারপাশের প্রকৃতি ও স্বগত সমস্ত কর্মতৎপরতার ওপর আরোপ করেছিল কল্পিত দৈবশক্তিকে; তারই ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল মানস-সম্ভব বিবিধ যাদুবিদ্যা ও অনুষ্ঠান, যেগুলি 'কৃত্য' বা ব্রত নামে পরিচিত এবং যা থেকে কালপ্রবাহে শিল্পের সাহিত্যের ধর্মের জন্ম হয়েছিল। আদিম মানুষের আচরণে তাই দেখি এক বিচিত্র দ্বৈত সত্তার অভিব্যক্তি: এক পক্ষে জীবনের-সংগ্রামের দৈব তথা অতিলৌকিক ভাষ্য ও তন্নিষ্ঠ জাদুকৃত্য; অন্যপক্ষে সেই জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনেই বস্তুমুখী কর্মতৎপরতা—প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, তন্নিষ্ঠ চিন্তা ও জ্ঞানের উদ্বোধন এবং শিকারে-চাষে-যুদ্ধে তার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ। দ্বৈত সত্তার প্রশ্রয়ে একই বৃন্তে জন্ম নিয়েছে শিল্প সাহিত্য ধর্ম (তথা তার আদি-রূপ কৃত্য) এবং বিজ্ঞান তথা উদ্ভিদ-জীব-প্রাণী-শল্য-জ্যোতিষ-পদার্থ-ভূ-রসায়ন ইত্যাদি বিদ্যা। পরবর্তীকালের জীবন ও মনীষা এই আদিম বিজ্ঞানেরই উত্তরাধিকারী। পরিপার্শ্ব ও মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রয়োগপদ্ধতি অপসৃত হয়েছে, যুগের আঁকাবাঁকা সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে এসেছে আধুনিকের ময়ূরকণ্ঠি মোহনায়।

আমাদের জীবন ও মনন আধুনিক হয়ে উঠেছে। তবু সেই আদিম দৈত বৃত্তিকে আমরা অনেকেই

এখনও লালন করে চলেছি কোন-না-কোন আকারে। এটা ইতিহাসের স্থিতির দিক। গতির দিক থেকে দেখা যায় সংস্কৃতির নিয়ত পরিবর্তন তথা বিবর্তন। কালে কালে বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ-পদ্ধতির রূপ বদলে গেছে, মানুষের জীবনের রূপ ও মনের স্বরূপও তার সমতালে কেবলই পালা বদল করেছে। প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের ধ্রুপদী যুগীয় বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণকে অস্বীকার না করলেও তা ছিল মুখ্যত ঈশ্বরমুখী ও তত্ত্বীয়। ধ্রুপদী দর্শন এবং সাহিত্যও এই দৃষ্টি ও ভাবনায় বিধৃত ছিল। মধ্যযুগের মাঝামাঝি এসে ভারতীয় বিজ্ঞানের অনুশীলনে ছেদ পড়ল, মধ্যপ্রাচ্যে তা ফুটে উঠল নবভাবে ইউরোপেও একেবারে নিভে গেল না। এর পাশেই রূপ নিয়েছে মরমীয়া সাধনা, পাশ্চাত্ত্যে ও মধ্য প্রাচ্যে, যেখানে বিজ্ঞানের নানাতত্ত্ব ও পরীক্ষার ফলকে গ্রহণ করা হয়েছে ধর্মীয় সাধন প্রণালীতে এবং তন্নিষ্ঠ সাহিত্যের চিত্রকল্পে। ভারতীয় তন্ত্রসাধনায় হঠযোগ এবং রসায়ন-সাধকদের দার্শনিকতা ও সাধনার মধ্যেও বেদোত্তর বিজ্ঞানচর্চার ফলশ্রুতি স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে। অতঃপর রেনেশাঁস, এবং তার ফলে বিবিধ কারিগরি আবিষ্কার, ক্লাসিক্যাল তথা 'বিমুগ্ধ' বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের রাজত্ব—এই তত্ত্বকে সামনে রেখে ঈশ্বরকে সরিয়ে এল 'নিয়ম'-এর একাধিপত্য। দর্শনের ক্ষেত্রে এল যুক্তিবাদ, গাণিতিক শৃঙ্খলার চেতনা, বেকন ও দেকার্ত যার প্রধান প্রবক্তা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বক্তব্য নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করল—মিলটন, অ্যাডিসন বিশেষত জনের কবিতা তার সাক্ষ্য। কিন্তু এই যোগাযোগ খুব দৃঢ় হয়নি, বিশেষ করে সাহিত্যের জগতের বিজ্ঞানের তথ্যসত্য এবং আর্টের কাব্যসত্যের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠেছে। কবিরা বিজ্ঞানবিমুখ হয়ে উঠেছেন নিউটনীয় নিয়ন্ত্রণবাদের অভিভবে। অন্যপক্ষে বিজ্ঞানকে এড়িয়ে অনেকক্ষেত্রে তাকে আশ্রয় করেও এক শিল্পসুন্দর সুসমঞ্জস কল্পজগৎ গড়ে তোলা হয়েছে। শিল্পীর সৃজনী প্রতিভাকে বিজ্ঞানীর সৃষ্টি-প্রতিভার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনেক দার্শনিক এই প্রচেষ্টা তথা ভাবনাকে সমর্থনও করেছেন। ফলে বিরোধে পরিণত হয়েছে এক ধরনের পৃথগীকরণের ফলে। এলিঅট এই বিচ্ছেদকে বলেছেন 'সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ'। তবু এই বিচ্ছেদ ও ব্যবচ্ছেদে অন্তত শান্তি ছিল শিল্পীচিত্তে। সেই শান্তি বিপর্যস্ত হল ঊনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে, শিল্পের সুষম মায়াবী জগৎ আবার আলোড়িত হয়ে উঠল। বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার পূর্বতন নিয়মের যান্ত্রিক তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করল, বিশ্বের সব রহস্যও যেন নিঙড়ে নিতে চাইল। বিজ্ঞান ও চিন্তা-কল্পনার, বাস্তব ও মনের বিচ্ছেদ তথা 'সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ' অসীম পাথার হয়ে উঠল। উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছে দার্শনিক শৈল্পিক উভয় জগতেই; কিন্তু বিয়োগটাই বড়ো হয়ে উঠেছে এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আজকের বিপ্রতীপ দর্শনে, শিল্পীর হতাশা-বিষাদ অবসন্নতা, আত্মরতিতে, শিল্পের দুর্বোধ্যতা, প্রতীক এবং বিমূর্ততায়।

বিজ্ঞানকে আজকের সাধারণ মানুষও পাচ্ছে নিকটতম সান্নিধ্যে, তার বুদ্ধি বিজ্ঞান-সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই চেতনা যতটা কারিগরি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ততটা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়। বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে; তার যতটুকু বোধগম্য হচ্ছে, তাকেও হৃদয়ের-আবেগের সঙ্গে প্রায়শই মেলানো যাচ্ছে না। ফলে মনের আকাশে জমছে কেবলই জটিলতা। বলা বাহুল্য, ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চার যে আবহাওয়া, ভারতবর্ষে তা অনেকটাই অনুপস্থিত। তবু আমরা বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে খুব দূরেও নেই। আবার পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থ মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের যে সংবাদ এখানে এসে পৌঁছেছে, তার পরোক্ষ প্রভাবও স্বতঃ। এই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পটভূমিকার আলোয় আধুনিক ভারতীয় জীবন যেমন, তেমনি মানসের পর্যালোচনা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে অনেক নতুন তথ্য এবং তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাস যে মানবসভ্যতারও ইতিহাস, ডঃ সার্‌টর এই সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীতভাবে সত্য।

ইতিহাসের পালা বদলে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক এবং মানসিক কার্যকারণের যে বহুমুখী ভূমিকা আছে, তার কথা অস্বীকার করা বাতুলতা। পূর্ব পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ করিনি। কারণ সে ভূমিকা অনেকটাই সুপরিজ্ঞাত। এগুলির সঙ্গে, পৃথিবী-প্রকৃতি-জীবন-মন-সমাজ-রাষ্ট্র-চিন্তা-চেতনা-কর্মতৎপরতা ইত্যাদি নিয়ে যে মানবসভ্যতা তার সঙ্গে, বিজ্ঞানের যে ঘনিষ্ঠতম নিবিড়তম যোগ, সেই অপরিজ্ঞাত যোগ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। আজকের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রতিষ্ঠা, মুখ্যত কারিগরি আবিষ্কারগুলিই তার মাধ্যম ; এই প্রায়োগিক দিক ছাড়াও তার আরও দুটি দিক আছে—পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের এবং তত্ত্বগত দিক। এই পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বগুলি বিশ্বজগৎ ও তার নিয়ম-রহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও বক্তব্যের, রূপ ও সংজ্ঞার নিয়ত পরিবর্তন হয়েছে, বিস্তার ঘটেছে, বিশিষ্টতা এসেছে, ক্রমে আন্তর্জাতিক স্বরূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু আত্মীয় গণ্ডীর মধ্যেও বিজ্ঞান সীমিত থাকেনি, নিজ এলাকা ছাড়িয়ে যেমন মানব-জীবনে তেমনি তার মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে, তার চিন্তা-কল্পনা-দর্শনকে বদলে দিয়েছে, তার জীবনলীলা ও জীবনলীলার সকল দিকেই বাহু বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান মানব-সংস্কৃতির বলিষ্ঠতম অঙ্গ, তার রূপকার এবং ভাষাকারও।

এই ভাষ্য যে দৃষ্টিকোণ থেকে, কালপ্রবাহে তা ক্রমেই ব্যাপকতর স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান মানুষকে নিয়োজিত করেছে বর্তমানকে অতীতকে জানবার আগ্রহে ও প্রয়াসে, সভ্যতার পদচিহ্ন ও পদধ্বনির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন তথ্যনিষ্ঠ সংস্কৃতিবিদগণ। এই সূত্রেই এসেছে বিজ্ঞানের ইতিহাস উদ্ধার ও সভ্যতার সংগতিতে তার পর্যালোচনার প্রেরণা ও প্রয়াস। শুধু প্রেরণা নয়, প্রয়োজনও, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর স্বকীয় কারণেই। পুরনো পর্যবেক্ষণ-গবেষণা-তত্ত্বের পটভূমিতেই নতুনতর আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। পুরনো অনেক কিছুর মধ্যে নতুনকে পাওয়া যায়। তাই আজকের অনেক বিজ্ঞান-মনস্ক দেশ গ্রীসের তো বটেই, ভারত ও আরবের প্রাচীন বিজ্ঞান-শাস্ত্র নিয়েও গবেষণারত। কে বলতে পারে, কোথায় কোন হারানো রত্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে পর্যবেক্ষণের সেতুপথে ও প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ইতিহাস স্বতঃ গড়ে ওঠে। তাছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাস যেহেতু মানবসভ্যতার ইতিহাস সেইহেতু জীবন ও মানসেরও ইতিহাস। নোবেল বক্তৃতার এক জায়গায় ম্যাক্স বর্ন বলেছিলেন নতুন উপাদান আবিষ্কার নয়, প্রাকৃতিক উপাদানের নতুনতর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মৌল উদ্দেশ্য এবং 'দি এভলুসন অফ ফিজিক্স'-এর ভূমিকায় আইনস্টাইন ও ইনফেল্ড বলেছিলেন, বস্তুজগৎ ও মনোজগতের আত্মীয়তার অনুসন্ধিৎসাই তাঁদের লক্ষ্য। এই নবতর ব্যাখ্যার ও সন্ধিৎসার বৃদ্ধিই বিজ্ঞানবৃদ্ধি। বিজ্ঞানের কারিগরি অবদান, তার বিবিধ পর্যবেক্ষণ, আবিষ্কার এবং এই তাত্ত্বিক বৃদ্ধি সমস্তকে একত্রিত করেই ইতিহাসের পটে বিজ্ঞানের ভূমিকা। সেই ভূমিকাকে না জানলে মানব সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করে জানা যায় না, এবং আজকের দিনে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই বিজ্ঞান-

চেতনা তথা বস্তুচেতনাকেও অধিকার করা যায় না। মানুষের আত্মপরিচয় ও আত্মবিকাশ, দ্বিবিধ করণেই বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সে-জ্ঞান বস্তুমুখী তথ্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ, তাই অগ্রগতির সহায়ক।

বিজ্ঞানীর নিরীক্ষা তত্ত্বসিদ্ধান্ত এবং এর প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যে ইতিবৃত্ত স্বতঃ গড়ে উঠছে, তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উল্লেখ ও সংকলন বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রথমতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন বোধ হয় হুইওয়েল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ একুশ বছরের পরিশ্রমে তিনি পর্যালোচনা ও নির্ণয় করেছিলেন বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ নাম-সংজ্ঞা-পরিধি-পরিভাষা এবং তার দর্শন ও ইতিহাস। অতঃপর বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহের বিস্তার ঘটে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম থেকে ঈসিস পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে, সম্পাদক ছিলেন ডঃ সার্তঁ। কিছুদিন পরে স্থাপিত হল হিস্ট্রি অব সায়েন্স সোসাইটির মূল কেন্দ্র আমেরিকায়, শাখা-প্রশাখা আন্তর্জাতিক। ১৯২৭ খ্রীঃ প্রকাশিত ডঃ সার্তঁর 'ইনট্রোডাকশন টু দ্য হিস্ট্রি অব সায়েন্স' একটি দিগদর্শনরূপে দেখা দিল। এই ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এলেন আরও অনেক লেখক, রিঙ্গার থর্নডইক, এডিংটন, হাক্স্লী, লিবি প্রমুখ।

বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক নিয়ে যে চিন্তাধারার উদ্বোধন করেছিলেন বেকন ও দেকার্ত (কিছুটা গ্যালিলিও), সেই চিন্তাও ক্রমশ বিবর্তিত-বিবর্ধিত হয়েছে, সমাজ ও মানসের সকল দিককে স্পর্শ করেছে। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ড্রেপার, কিউবার, শাফ, সাইমণ্ডস, সেলিজম্যান, মরগ্যান, হোয়াইটহেড, জীন্স্, রাসেল, হলডেন প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদের নাম স্মরণীয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবোধ, শিল্পচেতনা ইত্যাদির যোগ-বিয়োগ এঁদের আলোচ্য বিষয়। যার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি, স্রষ্টা, মন এবং জীবনের মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও উত্তর, নতুন মূল্যায়নের আন্তরিকতা। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সাহিত্য-শিল্পের এলাকায়ও পদার্পণ করেছে। রিচার্ডস ও হারবার্ট রীড ছাড়া এ ক্ষেত্রে যারা উল্লেখনীয় কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আইফোর ইভান্স ও হারবার্ট ডিঙ্গলের নাম করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের সামগ্রিক ইতিবৃত্ত বহন করে যেসব বই লেখা হয়েছে, সেগুলি দুই শ্রেণীর পপুলার ও সিরিয়াস, লোকপ্রিয় ও বুদ্ধিজীবিত। শেষোক্ত শ্রেণীর বইগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। ১৯১৮ খ্রীঃ সেজউইক ও টাইলার লেখেন 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব সায়েন্স,' একটি নিরপেক্ষ বিবৃতি, সেই সঙ্গে সহযোগী সাহিত্য দর্শনের উল্লেখ-আলোচনাও পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে : বিভিন্ন কারিগরি আবিষ্কারের সংক্ষেপিত ইতিবৃত্ত, সাধারণ ও শ্রেণীবিন্যস্ত গ্রন্থ-তালিকা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি-ঘটনা-গ্রন্থ-তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাশাপাশি কালানুক্রমিক সূচী। সূচীটি একটি মূল্যবান সম্পদ। ১৯২৯ খ্রীঃ প্রকাশিত উইলিঅম ডাম্পিয়েরের 'এ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স' বইটি বিস্তৃততর, উদ্দেশ্যমূলকও—বিজ্ঞানের অন্তরস্বরূপ এবং দর্শনে-ধর্মে তার প্রতিলিপির বিবরণী। আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মনে হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর-চেতনায় রঞ্জিত। ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের অস্তিমে নব্য বিজ্ঞানের যে নবীন পন্থা, জীন্স্ যাকে বলেছেন নতুন পটভূমিকা, তার আলোকে বিজ্ঞানের ইতিহাস-পর্যালোচনাও নতুনতর রূপ নিল। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য জে ডি বার্নলে'র 'দি সোস্যাল ফাঙসন অব সায়েন্স' এবং 'সায়েন্স অব হিস্ট্রি'। বার্নল মার্কসবাদী ঐতিহাসিক, সংস্কৃতির সকল দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত

করেছেন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যোগাযোগ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানী বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে আর অভ্রান্ত মনে করেন না। অথচ 'দি স্লিপওয়াকার্স্' এর লেখক আর্থার কোয়েসলার আধুনিক বিজ্ঞানকে অপরিণত মনে করেন, তাই তাঁর ইতিবৃত্তের সীমানা পীথাগোরস থেকে নিউটন। অপিচ তাঁর মতে, বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা বিজ্ঞানীর মানসগঠন এবং যুগ-পরিবেশ নয়, আসলে বিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক তন্ময়তা ও অনিকেত কল্পনালোক থেকেই আবিষ্কারগুলির স্বয়ম্ভব জন্ম। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'ইম্প্যাক্ট্ অব সায়েন্স অন সোসাইটি' মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা—বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিকথা ঠিক নয়, সমাজজীবনে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং তার ফলে যে দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন, তার বিশ্লেষণ, সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও।

উনবিংশ শতকের বাংলা (তথা ভারতে) আধুনিকতার আবির্ভাবে বিজ্ঞানও তার সহযাত্রী। পর্যবেক্ষণ-চর্চা-আবিষ্কার-আলোচনা (যদিও মুষ্টিমেয়ের মধ্যে, তবু) ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে, পরাধীন উপনিবেশের পক্ষে যতটা সম্ভব। জগদীশচন্দ্র বসু এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কৃতিত্ব এক্ষেত্রে সমধিক। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' এবং তাঁর প্রবর্তিত লোকশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত বইগুলিও অগ্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থটিই দিগ্‌দর্শন হিসেবে গণনীয়। ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পর্যালোচনা উল্লেখ্য। আমাদের বিজ্ঞানচর্চার সাগ্রহ দৃষ্টান্ত হিসেবে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, বসু বিজ্ঞান মন্দির, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং সম্প্রতিকালের সরকারী কেন্দ্রগুলি উল্লেখযোগ্য। পত্রিকার ক্ষেত্রে, সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। এছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা সুপাঠ্য বাংলা বইয়ের সংখ্যাও কম নয়, সুললিত বা সুকঠিন প্রবন্ধও। অভাব ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের। সেই অভাব পূরণের জন্যে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' লেখক সমরেন্দ্র নাথ সেন নিঃসন্দেহে আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ত্রয়ী প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সমরেন্দ্রনাথ সেন পরলোকগত মেঘনাদ সাহার কৃতী ছাত্র, বিজ্ঞানের সিদ্ধকাম অধ্যাপক, বর্তমানে উক্ত সংস্থার রেজিস্ট্রার। দুখণ্ডে প্রকাশিত বইটির কাগজ মুদ্রণ, প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই সব দিক থেকেই প্রথম শ্রেণীর। তুলনায় সুলভ দামও। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যতগুলি সুফল আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাদের সংখ্যা বেশী নয়; সেই সংখ্যালঘুদের অন্যতম এই বইটি।

যে কোন বিষয়ের ইতিবৃত্ত রচনায় ইতিহাস-চেতনা প্রথম দাবি। সেই চেতনার নিষ্ঠাবান লেখক বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সভ্যতার ইতিহাসকে একই বৃত্তের অন্তর্গত করেছেন এবং আদিম যুগ থেকে সুরু করে সপ্তদশ শতকের শুরুরেখায় এসে গ্রন্থশেষ করেছেন। খণ্ড দুটি সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত।

প্রথম খণ্ড। মানুষের আবির্ভাব, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্পষ্ট জীবন ও কর্মতৎপরতা, ক্রমে বিভিন্ন ধাতু, চাকা, নৌকা ও পাল, সেচ ও নদীশাসনরীতির আবিষ্কার হল। জীবনের পালাবদল হল, বিকশিত হয়ে উঠল সভ্যতা ব্যাবিলনে, মিশরে, ভারতবর্ষে, মহাচীনে। মানুষ আবিষ্কার করল লিপি ও বর্ণমালা, জন্ম নিল সংখ্যা ও গণিত এবং সেই সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা। কিন্তু

নানাবিধ বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘাতে এই প্রাথমিক সভ্যতার মৃত্যু হল। নতুন সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে দেখা দিল গ্রীক বিজ্ঞান। এতদিন বিজ্ঞানীদের কাজ ছিল বিক্ষিপ্ত ও ব্যবহারিক; গ্রীক বিজ্ঞান সুবিহিত সচেতন ও তত্ত্বীয়, প্রকৃতির ব্যবহারের পশ্চাতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা সক্রিয়, তার রহস্যভেদে স্থিরলক্ষ্য। এই তত্ত্বদৃষ্টি গ্রীসের যাবতীয় চর্চায়, জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনে সতত বিদ্যমান। অনুশীলনকে অগ্রগতি দিলেন পিথাগোরস ও তাঁর 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ' এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী। আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের পতন-ভূমির ওপর এথেন্স নিজ স্বাক্ষর রাখল। গণিত ও জ্যোতিষ ছাড়াও জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ ও রসায়ন বিদ্যার সমৃদ্ধি ঘটল। এথেন্সের সমৃদ্ধির মূলে প্লেতো ও আরিসততল এবং উভয়ের স্থাপিত আকাদেমী ও লাইসিয়াম। গ্রীক বিজ্ঞানের সময়-সীমা তিনশ বছর; এই তিন শতাব্দী গ্রীক সভ্যতার সুবর্ণযুগ। তদন্তে বিবদমান গ্রীস থেকে পলাতকা বিজ্ঞানলক্ষ্মী এলেন ইউক্লিডের আলেকজান্দ্রিয়ায়, টলেমী শাসনশক্তির ছত্রছায়ায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় দুটি বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী ধারা এসে মিলিত হল মিশরীয় বিজ্ঞানের কারিগরি তথা ব্যবহারিক ধারা (ধাতুনিষ্কাশন, রঞ্জন, কাঁচ তৈরী ইত্যাদি) এবং গ্রীক বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় ও দার্শনিক মতবাদ। অতঃপর লক্ষ্মী এলেন রোমে। জাতি হিসেবে রোমকরা আদর্শ বিজ্ঞানমনস্ক ছিল না। বিজ্ঞানের (এবং দর্শনেরও) ব্যবহারিক দিকের প্রতি তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম, তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে নয়। গণিতে ও জ্যোতিষে তারা উদাসীন, বলবিদ্যায় ও যন্ত্রবিদ্যায়, স্থাপত্য ও নগরগঠনে সকল কারিগর, রাষ্ট্র-আইন-ইতিহাসরচনা-শিল্পকলার সৃষ্টিতে সার্থক রূপকার (অবশ্য এক্ষেত্রেও গ্রীকদের অবদান ছিল)। খ্রীষ্টপূব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এই এক হাজার বছর প্রাচীন বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিযুগ। তারপর সূত্রপাত 'অন্ধকার যুগের।' এই অন্ধকার যুগের উদ্ভবের কার্যকারণ, বিস্তার, এবং এই সময়কার প্রচলিত অধ্যাত্ম দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে প্রসারিত আলোচনা দিয়ে লেখক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূত্রপাত ভারতীয় বিজ্ঞানের পরিচায়িকা দিয়ে (লেখক প্রথম খণ্ডে বেদ, বেদান্ত ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানের সন্ধান করেছিলেন এবং ঋক্ সংহিতার মধ্যেই এর অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করেছিলেন)। অতঃপর বৈদিক সাহিত্য যে পরিমাণে দর্শনের দিকে ঝুঁকেছিল, সেই পরিমাণে মুখ ফিরিয়েছিল বিজ্ঞানের দিক থেকে। মগধের অভ্যুত্থানের পর, বিশেষত মৌর্য আমল থেকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা উর্ধ্বগামী হতে থাকে। ভাষা-বিজ্ঞানে পাণিনি ও পতঞ্জলি, গণিতে ও জ্যোতিষে আযভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, চিকিৎসা বিদ্যায় ও কিমিয়াশাস্ত্রে নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট দিকপালদের আবির্ভাব হয়। এই সময়ের ভারতীয় বিজ্ঞান যেমন গ্রীস, আরব, চীন, পার্থিয়ান প্রভৃতির অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রকেও তার অর্জিত জ্ঞান সরবরাহ করেছিল। নালন্দা প্রভৃতি শিক্ষায়তন এবং চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত কারিগরি বিদ্যাগুলির উল্লেখও এই অংশে পাওয়া যায়। এই যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানকলার অঙ্গ ছিল—জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, পরমাণুতত্ত্ব ও বলবিদ্যা, এবং ধাতুশিল্প। আরব্য বিজ্ঞানের সূচনায় লেখক বলেছেন: 'মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয় এক বৈপ্লবিক ঘটনা……মানব সভ্যতার উন্নয়নে এই জাতির অবদান রীতিমত বিস্ময়কর।' আরব্য বিজ্ঞানের প্রাধান্যের একাধিক কারণ আছে। প্রথমত,

ইসলামের সভ্যতা ও সাম্যমূখী ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন জাতির অবদান এই বিজ্ঞান, ফলে এর একটি আন্তর্জাতিক রূপ বিদ্যমান হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, ইসলামের দ্বারা এক বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, জরাজীর্ণ ও মুমূর্ষু সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে যে স্বাধীন ও সুস্থ জীবন ও সমাজ ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে রূপ নিয়েছিল, আরবদের এবং আরবীয় বিজ্ঞানের প্রাধান্যের তাই-ই মূল কারণ। তৃতীয়ত, আরবীয় মনীষার উদ্বোধন হয়েছিল পারস্য, ভারত, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং গ্রীসের জ্ঞান বিজ্ঞানের কাছে দীক্ষা গ্রহণে, পুরাতন শাস্ত্রের বিস্তৃত অনুবাদে। চতুর্থত, আরবীয় বিজ্ঞান ব্যবহার ও তত্ত্ব উভয় দিককে সার্থক ভাবে সমন্বিত করতে পেরেছিল, যার অভাব ছিল তৎকালীন অন্য সভ্য দেশগুলিতে। খলিফাদের উৎসাহে এবং বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় আরব্য বিজ্ঞান অনুবাদের স্তর পেরিয়ে ক্রমে মৌলিক পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের স্তরে চলে আসে। বাগদাদ, টলেডো এবং করডোভা এথেন্স—আলেকজান্দ্রিয়ার যোগ্য উত্তরাধিকার লাভ করে, বিশেষত করডোভা দশম শতাব্দীতে যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছিল, পাঁচশো বছর পরে অক্সফোর্ড বা পারীও তা পায়নি। কেবলমাত্র তত্ত্ব-দর্শন এবং গণিত-জ্যোতিষ-রসায়ন-উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদির নব নব আবিষ্কার নয়, কারিগরিবিদ্যায়ও মুসলমান মনীষার অবদান অসামান্য। অবশেষে ইউরোপের কাছে উত্তরাধিকার সঁপে দিয়ে যুক্তিবাদী আরব্য বিজ্ঞান আত্মসমর্পণ করল মায়াবাদী রক্ষণশীলতার কাছে।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে বিদ্যোৎসাহিতার লক্ষণ দেখা দেয়। শিক্ষা সংস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়। আরবীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান-গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে চিন্তাজগতে আলোড়ন জাগতে থাকে, বিজ্ঞানের অনুশীলনও হতে থাকে। কিন্তু এ-পর্ব পাদ্রী ও পণ্ডিতদের; তাই ইউরোপ আরবীয় বিজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি এই মুহূর্তে দেখা গেল না। আরও কয়েক শতাব্দী পরে তার বিকাশ ঘটল অভিনব রূপে ও রীতিতে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে রেনেশাঁসের তথা নবজাগরণের নতুনতর দিগন্ত এবং সেই দিগন্তের অন্যতম দিশারী ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এই আধুনিকতার পর্যালোচনা অন্তে সপ্তদশ শতকের সীমানা রেখা ছুঁয়ে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

'বিজ্ঞানের ইতিহাস'-লেখক বিষয়-বাস্তব উপস্থাপনে ও তথ্য আহরণে স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণ-রীতি এবং বিশেষত ইংরেজি ভাষায় লেখা ইতি-গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। তবু লেখকের স্বগত দৃষ্টি ও বাগভঙ্গি অনস্বীকার্য, যা বইটিকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র দান করেছে। ইতিপূর্বে আলোচিত তথ্য ছাড়াও নতুনতর তথ্যের সংগ্রহ ও বিচার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসে সমুজ্জ্বল 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' কেবলমাত্র লেখকের বৈদগ্ধ্য নয়, একটি স্বতন্ত্র স্টাইলেরও সাক্ষ্য, যাকে পাউলি বলেছেন: 'স্টাইল অফ থট, স্টাইল নট ওন্‌লি ইন আর্টস বাট্ অল্‌সো ইন সায়েন্স।' বইটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, অনাবিল ও ভারসম নিরপেক্ষতা। এমনকি প্রথম খণ্ডের উপোদ্ঘাতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, রূপ ও পরিধি নির্ণয়েও তিনি বিস্ময়কর সংযম প্রকাশ করেছেন; কালে কালে পরিবর্তিত বিজ্ঞানের রূপসংজ্ঞা ইত্যাদির উল্লেখসহ তার সর্বাধুনিক অভিধায় এসে উপনীত হয়েছেন। বিষয়কে সরিয়ে বিষয়ী কখনোই সামনে এসে দাঁড়ায় নি। পড়তে পড়তে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই উজ্জ্বল সিদ্ধান্তটি: 'নিরপেক্ষতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।' যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইতিবৃত্তের প্রতিলিখন লেখক করেন নি, প্রতি পদে নিজস্ব প্রত্যয়নিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করার প্রয়াস করেছেন। বক্তব্য কোথাও উগ্র হয়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞানের ইতিহাস মানবসভ্যতার অঙ্গীভূত, একথা মনে রেখেই সমরেন্দ্রনাথ সেন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও আবিষ্কারের পাশেপাশে ধর্ম-সাধনা ও দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণও যথারীতি করেছেন। সাহিত্যের উল্লেখ-আলোচনাও। এবং তারও পশ্চাৎপটে সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক পরিপার্শ্বের উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর বক্তব্য ঈশ্বরচেতনায় অনুপ্রাণিত তো নয়ই, কোন বিশিষ্ট দার্শনিকতার ছকেও বাঁধা নয়, বার্ণলের মত মার্কসবাদী দৃষ্টিক্ষেপের পরিচয়ও নয়। তবু বিজ্ঞানের তথা মানুষের সভ্যতায় শ্রেণী-সংগ্রাম এবং জনগণের ভূমিকার যথাস্থানে উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। তিনি দেখিয়েছেন : বিভিন্ন দেশে ও কালে বিজ্ঞানের যে বারেবারে পতন হয়েছে, তার মূলে ছিল একমুঠো মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতা এবং সংখ্যাগুরু 'দুঃসাহসী বলিষ্ঠ কৃষক, পশুপালক, কারিগর ও মজুর' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের সমূহ বিচ্ছেদ। ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি তিনি দেখেছেন সভ্যযুগের অবসানকালে, দাসপ্রথার কুটিল প্রভাবে, আরব্য বিজ্ঞানের অন্তিম নিঃশ্বাসে। এবং ইউরোপের অন্ধকার যুগের ছেঁড়া পাতাগুলির মধ্যে। আবার, এর উল্টো ছবি দেখেছেন রেনেশাঁসে, যেখানে 'সভ্যতা ঘর্মাক্ত-কলেবর ক্রীতদাসের বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার ভিত্তি ছিল অমানবীয় শক্তি।' নিরপেক্ষতার অর্থ যে যান্ত্রিকতা নয়, মানবতাও যে তার অন্যতম বাহন হতে পারে, তার স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির সঙ্গে তাঁর কর্ম ও শিল্প-জীবনের সংযোগ করলে পাওয়া যায়। সমরেন্দ্রনাথ সেনের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর মনোভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। এবং এই 'নিরপেক্ষ মানবতার' উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত গ্রন্থটির আদ্যন্ত ওতঃপ্রোত, যার ফলে প্রচলিত ও সংকীর্ণ সংস্কারকে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, তাকে আঘাত করেছেন এবং তথ্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন, যা তাঁর নির্ভুল ইতিহাস-দৃষ্টির অন্যতম পরিচায়িকা : 'ইসলাম সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ইহার দ্বারা এক বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক বিপ্লব সূচিত হইয়াছিল। সংকীর্ণ দৃষ্টি, জরাজীর্ণ, অচল ও মুমূর্ষু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে মানবাধিকারের ভিত্তিতে যে স্বাধীন ও সুস্থ জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনীয়তা ইসলাম তুলিয়া ধরিয়াছিল, আরবদের জয়যাত্রার ইহাই ছিল মূল কারণ। কেবল তরবারির জোরে আরবদের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শুধু আরব সৈন্যের ভয়ে স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বীর জাতিরা আরবদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার মত ভুল আর কিছুতে হইতে পারে না।'

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ, তবু উদ্ধার না করে পারলাম না। এর প্রয়োজন ছিল। 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, তত্ত্ব এবং মানব সভ্যতায় তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারাবিবরণী মাত্র নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি, সভ্যতার পালাবদলের, তার বিচিত্র উত্থান-পতনের বস্তুমুখী বিশ্লেষণ। ইতিহাসের পটরচনায় সাধারণ জনসমাজের যুগে-যুগে যে অপরিহার্য ভূমিকা তা আমাদের আজকের জীবন ও মনকে সতর্ক করে তোলে, পৃথিবীর অনেক জাতি এবং গোষ্ঠি-বর্ণ সম্পর্কে আমাদের তথ্যবিরহী ভ্রান্ত ধারণা ও অচলিত কুসংস্কারকে মার্জনা-সংশোধন করে, ভারতীয় দর্শন, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মরমীয়াবাদ এবং রেনেশাঁস সম্পর্কে নতুনভাবে অবহিত করে। ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিছু ঐতিহাসিক

ঘটনা ও ব্যক্তির তালিকায় সীমাবদ্ধ; ভাব্যের ক্ষেত্রে আমরা ঐসব ঘটনা ও চরিত্রের প্রয়োজনা ছাড়া মুখ্যত নির্ভর করি দর্শন ও আর্টের বক্তব্যের ওপর।

বিজ্ঞানের ইতিহাস জীবনকে আরও বড়ো করে, আরও ব্যাপকতর দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়। সত্যের নিকটতম সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। মন ভরে ওঠে বিস্ময়ে। তখন জীবনকে মনে হয় আশ্চর্য সুন্দর, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও চারপাশের অশ্লীল দীনতা সত্ত্বেও মানুষকে অনুভব করা যায় বুকের মধ্যে। সমরেন্দ্রনাথ সেনের কৃতিত্ব এইখানে, পাঠকচিত্তে অলক্ষিত অথচ নিশ্চিত অনুপ্রবেশে এবং ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক চেতনা, ও মানবিক মমতা জাগিয়ে দেওয়ায় মাটি ও মানুষের সঙ্গে সত্যতম সাযুজ্যে উত্তীরণে।

এই সর্বতোমুখী পরিধি ও গভীরতার মধ্যে লেখকের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ভাষা সহজ, বাগভঙ্গি সরল, মাঝেমধ্যে আকর্ষণীয় কাহিনী, বর্ণনাও মনোহারী। মনোযোগী ও আগ্রহী পাঠক অনুভব করবেন অক্লান্ত তন্ময়তা, আনন্দ পাবেন জ্ঞান আহরণের বিচিত্র পথে। বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অক্ষরের সহযাত্রী প্রচুর ছবি ও স্কেচ দুরূহ অংশকে যারা সুবোধ্য করে তুলেছে। বিদেশী ইতিহাস-গ্রন্থে, এগুলি প্রায়শ অনুপস্থিত। অপিচ, বাংলা ভাষায় সহজে বিজ্ঞান চর্চা অসম্ভব প্রয়াস, একথা এখনও যারা বলেন বা বিশ্বাস করেন, বইটি তাঁদের কাছে উপহারযোগ্য।

'বিজ্ঞানের ইতিহাস' প্রয়োজনীয় ও আনান্দদায়ক। অস্বীকার করব না, বইটি আমার আত্মীয়। ফলে বিজ্ঞান-অসম্মত ভাবগত দুর্বলতা এটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তা যে অকারণ নয়, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। তবু কোন-কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিও উল্লেখযোগ্য। তথ্যের দিক থেকে কোন বক্তব্য রাখার অধিকার আমার নেই। একথা সবিনয়ে স্বীকার্য। বিদেশী বইগুলির সঙ্গে তুলনায় তথ্যের হের-ফের অনেকগুলি চোখে পড়েছে; কিন্তু সেগুলিও যাচাই করে নেওয়ার দুঃসাহস করিনি। সাগরের ওপার থেকে যেসব মুদ্রিত অক্ষরগুলি আসে, তার সবই অভ্রান্ত, এমন ভক্তি-গদগদ সংস্কারও গড়ে তুলতে পারিনি [বিশেষত, যখন দেখি: সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এমন কি বিজ্ঞানের পর্যালোচনায়ও অনেক বিদেশী আন্তর্জাতিক পণ্ডিত ধর্মের ও ঈশ্বরের সঙ্গে আপোষ করেছেন এবং সমস্ত পরিশ্রমের ফল অর্ঘ্য দিয়েছেন উভয়ের শ্রীচরণেষু; যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ফল ও চেতনার প্রায় সবটুকুই ওদেশ থেকেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, এ তথ্যও সমভাবে স্বীকার্য]।

লেখক মানব-সভ্যতাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে গ্রন্থারম্ভ করেছিলেন। পরিধির বৃত্তরেখা পরবর্তী-কালের আলোচনায় ছিন্ন হয়নি, কিন্তু ক্রম-সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে দ্বিতীয়খণ্ডে। অবশ্য বিজ্ঞানের ও সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধিই তার অন্যতম কারণ। তবু সমাজ-ভূমিষ্ঠ সেই জটিল অরণ্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটনই তো ইতিহাসকারের কর্তব্য। তাই আদিম যুগে ও সভ্যতার বিকাশকালে সংস্কৃতির সমস্ত দিক যেভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, পর-কালে তা আর অনুভব করি না। রেনেশাঁসের বিশ্লেষণ নবতম তথ্যের ও তত্ত্বে বিস্ময়কর, তবু মনে হয়েছে বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ভালো হত। বিজ্ঞানের ইতিহাসকারদের অনেকেই তা করেছেন। এখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের যোগাযোগ নিয়ে যতোটা আলোচনা হয়েছে, সাহিত্য ও শিল্পের প্রসঙ্গে ততোটা হয়নি। ফলে সভ্যতার চলমান ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ ছবি ভেসে ওঠে না, জীবনের সহযোগে মানবমনেও

যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব সূচিত হয়েছে, সেগুলি স্পষ্টতর হয় না। সাহিত্য-শিল্পাদির ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব তথা পালাবদলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গভীর ও ব্যাপক, সেগুলির বিস্তৃত আলোচনায় মাটি ও আকাশের রঙ ফেরাবে—আরো বড় করে ধরা যেত। প্রস্তর যুগ এবং মধ্যযুগ অন্তে রেনেশাঁসের এলাকায় এসে এই অভাববোধ বেশি করে অনুভব করা যায়। অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে এই অভাববোধের কথা কেন? কিন্তু এই বোধ এবং দাবির অধিকার দিয়েছে স্বয়ং গ্রন্থটি। প্রথম খণ্ডের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যে উল্লাস, দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তিতে এসে স্তিমিত কখনোই হয় না, ব্যথিত হয়। কয়েকটি প্রসঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্তও আমাদের মতো সাধারন পাঠকের কাছে অসহযোগী, অস্বস্তিকর মনে হয়েছে।

এই বাই। যে দেশে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুলপাঠ্য কেতাব ও তাদের লেখক শিক্ষক-, সমাজ ক্ষীণকায় নয়, অথচ তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের বিয়োগ হেতু নেই বিজ্ঞানের আবহাওয়া-তত্ত্ব-চেতনা সে দেশে এমন বই অপ্রত্যাশিত ও অভিনব। লেখকের কাছে আমরা নিরঙ্কুশভাবে কৃতজ্ঞ। দুরারোহ দুঃসাধ্যের বৃন্তে তিনি সহজের ফুল ফুটিয়েছেন। পরবর্তী খণ্ডের জন্যে, সতেরো শতক উত্তর অগ্রগত বিজ্ঞান, যাকে তিনি বলেছেন 'দুস্তর সমুদ্র'; তার সাক্ষাৎলাভের জন্যে আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব।

দুটি সম্ভাব্য প্রস্তাব লেখকের কাছে। এক, ভারতীয় ও আরবীয় বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বিস্তৃত ইতিহাস; দুই, আলোচ্য বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অল্পবয়স্ক ও অল্পশিক্ষিতদের জন্যে।

উপসংহারে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' কেবলমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের নয়, সর্বস্তরের শিক্ষিত মানুষের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, জীবনসংগ্রাম ও বিজ্ঞানবুদ্ধির ঘনিষ্ঠতা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন; সে কাজ শুধু বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেও হওয়া দরকার। এই অনুভব রবীন্দ্রনাথের। কখনও কখনও এলিঅটেরও এবং এই প্রয়োজনের ভূমিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস অনন্য গ্রন্থ, উপকারী ও উপাদেয়।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

সংকটের মুখে বাংলা খেয়াল

ধ্রুপদের তুলনায় খেয়াল বাঙলা দেশে নবাগত। শোরী মিঞার টপ্পাকে বাঙলা দেশ যত নির্বিবাদে আত্মসাৎ করেছিল খেয়ালের বেলায় তা ঘটেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের গায়কেরা অবশ্য ধ্রুপদের পরে অধুনাতন খেয়াল পরবর্তী ঠুংরী-ভজনের মত ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল গেয়ে শ্রোতৃসমাজের মুখ বদলাতেন। কিন্তু তৎকালীন গায়ক এবং রসিকসমাজে খেয়ালের প্রতি এক প্রকারের সানুকম্প প্রশ্রয় অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য ঘটনা। বিগত শতকের শেষযামে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয় ওস্তাদদের অভিযানের ফলশ্রুতি এই যে, বাঙলা দেশ অতঃপর খেয়ালের নিষ্ক্রিয় সমঝদারিত্ব থেকে সক্রিয় চর্চায় উন্নীত হল। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়েরা ধ্রুপদের পরে বৈচিত্র্য সাধন এবং রুচি পরিবর্তনের জন্য ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল গাইতেন বটে কিন্তু ধ্রুপদের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ পক্ষপাত সর্বজনবিদিত। তবে একথা সত্য যে, সর্বভারতীয় সম্মেলনে শ্রদ্ধায় স্বীকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রাধিকাবাবুই প্রথম যিনি খেয়ালের দরবারে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন।

বাঙলা দেশের গানের দরবারে ধ্রুপদের অভিভাবকত্বমুক্ত খেয়ালের প্রচলন বর্তমান শতকারম্ভের পূর্বে তেমন সহজ হয়নি। সেই হিসেবে মনে হয় ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কোলকাতা আগমনের লগ্নে বৃহস্পতির দশা। বস্তুতঃ এই নিরক্ষর সারেঙ্গীবাদক বাঙলা দেশের খেয়ালগানকে বিপ্লবাত্মক আত্মনির্ভরতায় স্পর্ধিত করে তুলবেন একথা তখন কে ভাবতে পেরেছিল? বর্তমান শতকের প্রথমেই গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর মধ্যে দিয়ে বাঙলা দেশের খেয়াল গানে পালা বদলের সুর লেগেছে। বাঙলা দেশের খেয়াল তখন সাবালকত্বের পথে। গিরিজাবাবুর সাধনায় খেয়াল গান যখন জনগণেশের করতালির দ্বারা সংবর্ধিত, তখনো ফৈয়াজ অথবা করীম সাহেব কোলকাতায় আসেননি। অবশ্য খেয়ালের এই জনপ্রিয়তার পশ্চাদ্‌বর্তী অন্যতম কারণ সাংগীতিক সামাজিকমণ্ডলীর রাজসভা ছেড়ে জনসভায় পদার্পণ। বলা বাহুল্য, বাঙলা দেশে বিশেষত কোলকাতা সহরে খেয়াল গানের এই আকস্মিক জনপ্রিয়তাকে জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া গেলেও তাতে তার পুরো ব্যাখ্যা হয় না। জনপ্রিয়তার প্রকৃত কারণ ধ্রুপদের নিবদ্ধ নিগড় থেকে খেয়ালের অবাধ কল্পনার বিচিত্র ব্যাপ্তিতে মুক্তি লাভ। রাধিকাবাবু উত্তর ভারতের সংগীত সম্মেলনে বাঙলা দেশের খেয়াল গানের যে মর্যাদার সূত্রপাত করেছিলেন গিরিজাবাবু তাকে আরো সুদৃঢ় এবং বর্ধিত করেছেন। গিরিজাবাবুর শেষ বয়সেও বাদল খাঁ সাহেব কর্মক্ষম। দ্বিতীয় দশকের শেষে উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতের যজ্ঞভূমি এলাহাবাদ-বেনারস থেকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কোলকাতার সংগীত সম্মেলনগুলি তখন সমগ্র উত্তর ভারতের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই সময়ে তিন জন গায়কের প্রায়

সমকালীন অভ্যুদয় বাঙলা দেশের খেয়াল গানের পক্ষে এক যুগান্তকর ঘটনা। গায়কত্রয় জ্ঞানেন্দ্র : প্রসাদ গোস্বামী, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ অগ্রচর। তারাপদবাবুর প্রথম আগমন কোলকাতা বেতারের তবলাবাদক হিসেবে এবং জ্ঞানবাবুর সংগেও তিনি সংগত করেছেন। ভীষ্মবাবু বালকপ্রতিভা হিসেবে একটু কাঁচা বয়সেই নাম করেছিলেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে বেতার, গ্রামোফোন এবং চলচ্চিত্রে সংগীতপরিচালকের পদপ্রাপ্তি ততটা বিস্ময়কর নয়, যতটা অবিশ্বাস্য বয়োজ্যেষ্ঠ শচীনদেব বর্মণের শিক্ষকপদ গ্রহণ। ত্রিশে পৌছোনোর আগেই পণ্ডিচেরীর প্রব্রজ্যা বাঙলা খেয়ালের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে যে আঘাত দিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ অদ্যাপি হয়নি, কোনো দিনই হবে কিনা সন্দেহ।

কণ্ঠসম্পদে জ্ঞানবাবু, ভীষ্মবাবু এবং তারাপদবাবুর চেয়ে ভাগ্যবান। এমনকি তারাপদবাবুও কণ্ঠের দিক দিয়ে ভীষ্মবাবুর তুলনায় কিঞ্চিৎ সুবিধাভোগী। জ্ঞানবাবুর দরাজ সুগোল সুরেলা কণ্ঠ যে কোনো গায়কের ঈর্ষার বস্তু। তারাপদবাবুর কণ্ঠ ততটা মেঘমন্দ্র অথবা সুরেলা না হলেও মোটামুটি দরাজ। ভীষ্মবাবুর কণ্ঠ উদাত্ত সপ্তকে একটু খাটো ছিল বলা যায়, যার পরিপূরণ তিনি করতেন তার সপ্তকের বিহঙ্গ বিহারে। বস্তুতঃ খোলা গলায় তার সপ্তকের পঞ্চমে (কখনো কখনো ধৈবতে পর্যন্ত) গলা লাগানোর দুঃসাহস ভারতবর্ষে আর কারো হয়েছে বলে আমার শোনা নেই। মন্দ্রসপ্তকের উত্তরাঙ্গ থেকেই যেন ভীষ্মবাবুর কণ্ঠ সুরের আবেগে গম গম করতে থাকে।

জ্ঞানবাবু এবং তারাপদবাবু হিন্দুস্তানী খেয়ালের অনুসরণের বাইরে বিশেষ চেষ্টা করেন নি। তারাপদবাবুর সম্বন্ধে স্বকীয় শিক্ষার কাহিনী কতখানি সত্য জানি না, কিন্তু তাঁর গায়নরীতিতে আগ্রা, কিরাণা এবং ইন্দোর ঘরাণার যদৃচ্ছ মিশ্রণ সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ আটচল্লিশ মাত্রার ঢিমে একতাল এবং আকারমাত্রিক বিস্তারের প্রতি তাঁর নৈষ্ঠিক আনুগত্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ পুনরাবির্ভাবের পরেও ভীষ্মবাবুকে চব্বিশমাত্রার বিলম্বিত-তেই তুষ্ট দেখি। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একতাল বারো মাত্রারই—চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ মাত্রার এক তাল বলে কিছু নেই ; বারোর এক একটি মাত্রাকে দ্বিগুণ অথবা চতুর্গুণ বিলম্বিত করলেও তা বারো মাত্রাই থাকে, চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ বলা এক প্রকারের গাণিতিক বিভ্রম মাত্র।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কোলকাতা আগমন এই শিল্পীত্রয়ের জীবনে বিপ্লবাত্মক তাৎপর্যের কারণ। তিনজনেই ফৈয়াজী খেয়ালের শুদ্ধ এবং পৌরুষপূর্ণ ভঙ্গির দ্বারা আকৃষ্ট হলেন। জ্ঞানবাবু খাঁ সাহেবের নাড়া-বাঁধা শিষ্য হলেন। ভীষ্মবাবু বাদল খাঁ সাহেবের কথা চিন্তা করে দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন বোধ হয়, তবে শেষ পর্যন্ত শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন শুনেছি। আবদুল করিম সাহেবকে কোলকাতায় আনেন শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রথমবারে করিম সাহেব কোলকাতার রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। তাঁর দ্বিতীয় আগমন বোধ হয় ১৯৩৭ সনে। ইনৃষ্টিটিউটের অনুষ্ঠান করিম সাহেবের জন্য স্বীকৃতির জয়মাল্য অর্জন করল। করিম সাহেবকে সাধুবাদ দিলেও, আশ্চর্য এই যে, বাঙলা দেশ তাঁর রীতি গ্রহণে উৎসাহ দেখাল না। একমাত্র তারাপদবাবুর গায়নে তাঁর কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষণীয়।

ফৈয়াজ প্রভাবিত এই তিন জনের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ এবং তারাপদবাবুর দৃষ্টি নিবদ্ধ বহিরঙ্গের

প্রতি ; ভীষ্মবাবু অন্তরঙ্গের প্রতি ধ্যান দিয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু এবং তারাপদবাবু ফৈয়াজের স্বরক্ষেপ, পুকার বুলন্দ এবং গমকী তানের প্রতি একান্তভাবে মনোযোগী ; ভীষ্মবাবু পুকার এবং বুলন্দ আত্মীকরণ করলেও ফৈয়াজের তানের ঢঙ গ্রহণ করলেন না। ফৈয়াজের মননপ্রধান স্বরবিন্যাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল—স্বরকে নতুন অর্থদ্যোতনায় তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার দিকে চেষ্টিত হলেন। সার্গমের স্টাইল যে তাঁর নিজস্ব এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই এবং করীম সাহেবের সার্গমের ঢঙে মৌলিকতা থাকলেও ভীষ্মবাবুর সার্গম যে খেয়ালের পক্ষে কড়িমী সার্গমের চেয়ে সার্থক, এ বিষয়ও সন্দেহাতীত। শিল্পের পক্ষে যে জিনিসটা সবচেয়ে অত্যাবশ্যক তার উদ্বোধন ভীষ্মবাবুর মধ্যে তরুণ বয়সেই ঘটেছিল—স্বকীয়তা, মনন এবং বিশিষ্ট শিল্পবোধ। তবু পরিতাপ এই যে, এই বিরাট সম্ভাবনা পূর্ণ পরিণতি লাভের পূর্বেই ভীষ্মবাবুর গায়ক জীবনে যতি পড়ল এবং এই ঘটনা বাঙলা দেশের খেয়ালের ইতিহাসে অশ্রুসিক্ত হয়ে থাকবে।

জ্ঞানবাবু তৈরীর দিকে ভীষ্মদেবের চেয়ে খাটো হলেও সুরের মায়াজালে তার ক্ষতি পূরণ করতে পারতেন। নিজস্বতার অন্বেষণে জ্ঞানবাবু আগ্রহী ছিলেন না। তারাপদবাবু তৈরীর দিকে ভীষ্মবাবুর সমকক্ষ। বহু ধারার সংগ্রহ তাঁর মধ্যে, কিন্তু মৌলিকতা অথবা নিজস্বতা সৃষ্টিতে তিনিও সফলকাম হননি। প্রথম যৌবনে গায়কজীবনে খণ্ডিত হলেও ভীষ্মদেবীয় স্টাইল বলতে আমরা যা বুঝি জ্ঞানবাবু অথবা তারাপদবাবুর বেলায় তেমন কিছু বুঝি না। তবে একথা সত্য যে, ভীষ্মবাবুর অন্তর্ধান এবং জ্ঞানবাবুর লোকান্তরের পরে একমাত্র তারাপদবাবুই কোলকাতায় হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের মহড়া নিয়েছেন এবং তাঁদের আগ্রহী শ্রুতি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর প্রস্তুতির দৌলতে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের বাঙালী খেয়ালের (বাঙালীর গাওয়া খেয়াল, বাঙলা খেয়াল নয়) সেই গৌরবরবি আজ অস্তমিত। তারাপদবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গের পর সর্বভারতীয় খেয়ালিয়াদের মহড়া নেওয়ার মত গায়কের অভাব অধুনাতন বাঙলা দেশে শোচনীয় ভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভীষ্মবাবু আবার গাইতে আরম্ভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর পূর্বতন মানে তিনি আবার স্থিত হতে পারেন কিনা তা দেখবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙলা দেশের খেয়ালরসিকগণ সাগ্রহে অপেক্ষমান। আপাততঃ বাঙলা দেশের খেয়াল-জগতে মাঝারির রাজত্ব। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে যে বাঙলা দেশ উত্তর ভারতের কাছে শুধু শুনেই ঋণী হয়নি, কিছু শুনিয়ে ঋণ পরিশোধের পুঁজিও সঞ্চয় করেছিল, তার আজ বড়ই দৈন্যদশা। স্বকীয়তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কারণ শিল্পবোধের দুর্লভ আবির্ভাব কোনো যুগেই ঝাঁকে ঝাঁকে ঘটে না ; কিন্তু তৈরীর দিক দিয়ে অধুনাতন বাঙলা দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তর ভারতীয় খেয়ালিয়াদের সমকক্ষ গায়কের অভাব বাস্তবিক শোকাবহ। উত্তর ভারতে গোলাম আলী সাহেব, এবং কেশরবাঈ কেরকরকে বাদ দিলেও নির্দিষ্ট মানের গায়কের দেখা আজও পাওয়া যাচ্ছে। ভীমসেন যোশী, মাণিক বর্মা, গিরিজা দেবী—তৈরীর দিকে এঁরা কেউ খাটো নন। খাঁ সাহেব না'হলে বাঙলা দেশে আসর জমানো যায় না, এই অনুযোগ অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। সুনন্দা পট্টনায়ক যে পরিমাণ আগ্রহে শ্রুত, মালবিকা কানন তার অর্ধেকও নন।

অথচ চতুর্থ দশকে ঢাকা সহরের দুইজন তরুণ গায়ক বাঙালী খেয়ালরসিকদের আশান্বিত করেছিলেন। লখনউ ম্যরিস কলেজের সংগীত বিশারদ (এবং বোধ হয় উক্ত শিক্ষায়তনের সৃষ্ট একমাত্র গায়ক) শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠবর্গের ছাত্র সুধীরলাল চক্রবর্তী।

যে দক্ষতা এবং স্পর্দ্ধার লক্ষণের দ্বারা খেয়াল শিল্পীর সূচনা তার কিছু কিছু সুধীরলালের মধ্যে ছিল। কিন্তু ছলনাময়ী কোলকাতা নগরী যেমন মজতেও জানে, তেমনি জানে মজাতে; বিপথচালয়িত্রী শক্তি তার জন্মগত বুঝি। লঘুসংগীতের স্বখাতসলিলে সুধীরলালের নিমজ্জন তাঁকে শিল্পত্বের দ্বারদেশ থেকে নিবৃত্ত করল। চিন্ময়বাবু বিবিধ রীতির ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে গেলেন; যে স্বকীয় সার্গমের ছক তিনি উদ্ভাবন করেছেন তাতে গাণিতিক পারম্যুটেশন-কম্বিনেশন আছে, শিল্পের ছাপ নেই।

এ ছাড়াও যে সব গাইয়ে এই যুগে খেয়াল গাইয়ে হিসেবে আসরে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরথীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচীনদাস মতিলাল. শ্রী এ কানন, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী, শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী দীপালি নাগ, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অনেকে বিগত কুড়ি বছর ধরে খেয়াল গাইছেন, কেউ কেউ তারো বেশী। একটি লক্ষণীয় বিষয় এঁদের সম্বন্ধে এই যে, দশ বৎসর পূর্বে যিনি এঁদের গান শুনেছেন, আজকের দিনেও যদি তিনি আবার শোনেন তাহলে এই গায়নের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সংযোজন বা পরিবর্তন খুঁজে পাবেন না। শুধু এইটুকু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে যে, মাইকের কল্যাণে প্রায় প্রত্যেকের স্বরক্ষেপই নিয়ন্ত্রিত ওজনে সঞ্চরণশীল। এই গায়কগায়িকারা প্রধানতঃ দুইজন খেয়ালিয়া—বড়ে গোলাম আলী এবং আমীর খাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেও এঁদের একটি সামান্য লক্ষণ এই যে, গিরিজাবাবুর 'মিষ্টি করে গাওয়ার' নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করে খেয়ালকে এঁরা অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত করে তুলেছেন; তদুপরি গোলাম আলী সাহেবের অর্ধস্বরে (half voice) স্বরোচ্চারণ-ভঙ্গি অনুকরণ করে খেয়ালকে এঁরা ললনাভাষণে পরিণত করেছেন। খেয়ালী স্বরোচ্চারণের ওজন (weight) স্বতন্ত্র এবং রাগরূপায়ণে ব্যক্তিত্বসঞ্চার সার্থক খেয়ালের প্রাথমিক শর্ত। গোলাম আলী সাহেবের অনুকরণে এঁরা এত অন্ধ এবং চিন্তাহীন যে, অতিতারার ষড়জে স্বরক্ষেপের দুর্বল চেষ্টার কি পরিণতি হতে পারে সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন নন। দুণী খেয়ালে ছন্দ এবং তানের বৈচিত্র্য নির্বাসিত হয়ে তার জায়গা জুড়ে বসেছে ছুট তানের তেহাই দিয়ে বাঁটের দায়-সারা কাজ। দুণী খেয়ালের সেই রসাভাস আজকালকার আসরে কদাচিৎ পাওয়া যায়। তৈরীর দিকটা অবশ্য সব কিছু নয়, কিন্তু তৈরীকে অগ্রাহ্য করেও খেয়ালের উত্তরণ সম্ভব নয়। আঙ্গিককে অধিগত করেই তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের দ্বারা অন্যেরা প্রভাবিত হবেন এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু মননহীন অনুকরণের ফল কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে তার প্রমাণ সমকালীন বাঙালী-খেয়াল। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের শিক্ষা চিরকালীন ঘটনা। কিন্তু শিক্ষিত বিষয়ের চর্বিতচর্বণে শিল্প সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি মাত্রেই যে অভিনব কিছু হবে তাও সত্য নয়। নতুন, সুন্দর এবং স্বকীয় উদ্ভাবনেই শিল্প প্রয়াসের সার্থকতা। সমকালীন খেয়ালরীতিতে বাঙালী শিল্পীরা অভিনবত্বের মায়ামারীচের দ্বারা বিমোহিত। যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। বিলায়েত হোসেন খাঁ লোকগীতির সংমিশ্রণে মসগুল; রবিশঙ্করের কর্ড এফেক্টের প্রয়াসে দৈলীপ-হার্মানির হাস্যকর ব্যর্থতা অনিবার্য। অভিনবত্বের হাতছানি এত প্রবল যে ইমরাৎ হোসেন বেহাগের অবরোহে কোমল নিষাদের ব্যবহারে পর্যন্ত আগ্রহী (সচেতন ভাবে কি না কে জানে)! ফলতঃ উত্তরাঙ্গে যদি বৃন্দাবনী সারঙ্গের ছায়া আসে তাহলেও এই অভিনবত্বপ্রয়াস প্রশংসিত হবে কি না জানি না।

অবস্থাদৃষ্টে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, অন্যতন বাঙালী খেয়াল-শিল্পীরা একটি সংকটের গোলক ধাঁধাঁয় ঘূর্ণ্যমান। সবাই নতুন পথের অন্বেষণে। পথ হয়তো খুব দূরে নয়, হয়তো কাছেই। সে পথ ব্যক্তিত্বের পথ, স্বকীয় রীতির পথ। ব্যক্তিত্ব যেহেতু বিভিন্ন হয়েও বিশিষ্ট, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন এবং রবীন্দ্রনাথ সমকালীন যুগন্ধর হয়েও যেহেতু আপন আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল স্বরাট, সেই হেতু খেয়ালশিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বোধ এবং তার বিবর্তনেই খেয়ালের মহিমা পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠালাভ করবে মনে হয়। তখন হয়তো আবার এমন দিন আসবে যখন উত্তর ভারতের অন্য কোনো ফৈয়াজ বাঙলা দেশের অন্য কোনো ভীষ্ম-দেবকে বলবেন, "এক্‌ঠো ঠুম্‌রী শুনাও ভীস্‌সো।" অথবা ভীষ্মবাবুর দেশী টোড়ীব পরে গুণমুগ্ধদের দ্বারা আবার দেশী টৌড়ি গাওয়ার অনুরোধের উত্তরে হয়তো সেই সংগীতশার্দূলকে অকপট সত্যভাষণ করতে শোনা যাবে "ক্যা গায়েগা ? যো কুছ থা সব্ তো বো গা লিয়া।"

হীরেন চক্রবর্তী

বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু ক্ষোভ ও হতাশা

ইতালীয় পরিচালক ফেলিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, ছবির ব্যাপারে আমি সব সময় বিষয়মুখী (objective) হতে পারি নি। তার কতকগুলো সোজা কারণ আছে। আমি কখনো নিজেকে পেশাদার চলচ্চিত্র পরিচালক মনে করতে পারলাম না, কেননা আমার ছবি ক্র্যাফ্‌টসম্যান-এর অভিব্যক্তি মাত্র। আমার মনে হয় আমি যেন কথক, কথকতা বলছি, কিংবা গায়ক, গাইছি গান। আমি ছবি তৈরি করি, কারণ আমি মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করি, কারণ রূপকথার অবাধ কল্পনায় আমি ভেসে যেতে চাই, কারণ আমি যা দেখেছি, যেসব মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি—তাদের কথা বলতে চাই। তাই ছবি করতে গিয়ে জীবনের কথা, আপন ধারণার কথা এত পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, আমাকে নিয়ে কানাকানি চলে, আমার জবানবন্দীতে অনেকে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আর তাই বিষয়মুখিতা সম্পর্কে আমাকে উদাসীন থাকতেই হয়।

এই ঔদাসীন্য জাত-শিল্পীর নিরাসক্ত প্রত্যয়। শুধু চলচ্চিত্র বলে নয়, শিল্পের যে কোন শাখায় সৎ রূপকার রকমারী জিনিসের মাঝখান থেকে তার বিষয়কে বেছে নেবে, আপন বিশেষ দর্শনের রঙে তাকে রঞ্জিত করবে, করবে সেই উপাস্য শিল্পবস্তুতে হৃদয়দান কিন্তু কোন কিছুতেই তার আসক্তি জন্মাবে না, মোহগ্রস্ত হবে না তার মন অথচ একটা আত্মমুখ উদ্‌গতি (Subjective Sublimity) তার সৃষ্টিকে মহিমময়তা দেবে।

ইতালীর নিও-রিয়্যালিজম বা ফরাসীর 'Nouvelle vaque' এর বীজ বাংলা ছবির নরম মাটিতে উপ্ত হয়েছে এবং বাংলার কতিপয় চিত্রপরিচালক সেই নতুন ফসলের সেবা করছেন একান্ত অনুরাগে ও অনুগতভাবে—এমন কথা ইদানীং শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। এবং সত্যজিৎ রায়ের সংগে আরো পাঁচ-ছ' জন বাঙালী চিত্রপরিচালকের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে প্রায় এক নিঃশ্বাসে।

আমার বক্তব্য, এতদ্বারা যাঁদের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে,—তাঁরা যা নন, কিংবা তাঁরা যা হতে চান না, জোর ক'রে সেই আসনে বসিয়ে তাঁদের এবং দর্শকদের মাথাটি বিগড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, তাঁরাও আপন আপন ক্ষমতার সীমানা টপ্‌কে বাইরে আসতে পারছেন না, আর দর্শকরাও তাঁদের সম্পর্কে নিজেদের আশাকে কমিয়ে দমিয়ে সাধারণ চাহিদায় ন্যস্ত করতে পারছেন না। দর্শক বলতে, এখানে অবশ্য আমি মনে করেছি দায়িত্ববান দর্শক, যাঁদের রুচির কিছু ঠিক ঠিকানা আছে। সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া শিল্পীর সেই নিরাসক্ত প্রত্যয়, অপেশাদার মন নিয়ে কথকতা বলার সেই আগ্রহ তেমন করে আর কারো মধ্যেই ফুটে ওঠে নি, তেমন ক'রে আর কেউ একটি শিল্পীর স্বকীয়-বোধের পরিমণ্ডল রচনা করতে পারেন নি। শুধু ঋত্বিক ঘটক এক-আধবার নিজের সম্বন্ধে তেমন কিছু আশাজনক ধারণা দিতে চেয়েছিলেন যেন, কিন্তু উন্নাসিক উৎসাহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত উদ্যম তাঁর সম্পর্কে আস্থা ও নিরাপত্তা বোধ জাগায় না। তাই পশ্চিমের 'নতুন ঢেউ' দিয়ে কিংবা নব্য বাস্তবতা নিয়ে আমরা যতই জল্পনা কল্পনা করি না কেন, সেই ঢেউয়ের উত্তেজনা এবং বাস্তবতার আলোড়ন আমাদের বহির্দেশে, ভেতরে ভেতরে একজনই মাত্র তাঁর প্রভাবকে আপন কর্মে সার্থক ক'রে তুলতে পেরেছিলেন—তিনি সত্যজিৎ রায়। তবে এখন ভয় হয় তিনিও হয়ত কোনদিন মনে-প্রাণে 'পেশাদার' হয়ে উঠবেন! নইলে যদিচ সত্যজিৎ রায়ের সংগে আরো কয়েকজন চিত্রপরিচালকের নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়ে থাকে কিন্তু তাঁদের সংগে সত্যজিৎ রায়ের ব্যবধান অন্তত কয়েক মাইলের। এবং তাঁদের স্বকীয় কোন শিল্প-জগৎ প্রকীর্তিত হয় না। তাঁরা হয়ত 'ভাল ছবি' করার সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন কিন্তু আসলে তাঁদের জাত নেই, চরিত্র নেই, তাঁরা সুবিধেবাদী। প্রয়োজন হলে আপন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে জনগণেশের ভজনায় নেমে পড়তেও বিলম্ব করেন না তাঁরা। এই দলে আছেন তপন সিংহ, অসিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুটিকয়েক নব্য আশাবাদী পরিচালক। মৃণাল সেন 'নীল আকাশের নীচে' নামে একটি সস্তা ভাবপ্রবণ (Sloppy Sentimental) ছবি ক'রে কেন জানিনা, অকারণ প্রশংসিত হয়েছিলেন (আর তাতে নব্যতার তিলমাত্র নিদর্শনও ছিল না)! তবে, তাঁর পরবর্তী ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' বহুতর অমার্জনীয় গাফিলতি প্রকট করলেও, অনেকটা ভদ্র গোছের এবং তাতে মোটামুটি একটি শিল্পী-মনের সংস্পর্শ টের পাওয়া যায়। আর রাজেন তরফদার 'গঙ্গা'য় সর্বার্থসার্থক হতে পারেন নি। সিদ্ধির সন্নিকর্ষে পৌঁছেও অকূলে ভেসে গেছেন।

এবং, এই হলো আমাদের দেশের অভিশাপ। সর্বাঙ্গীণ সফলতা জিনিসটা আমাদের আয়ত্তে নেই, নেই স্বভাবে। আমাদের দেশের মাটিতে তাই রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশও আর উৎপাদিত হয় না। আমরা সাহিত্যে যেমন জোলার ন্যাচারালিজম কিংবা সার্ত্র-এর একজিস্‌টেনসিয়ালিজমকে সর্বাঙ্গীণ সফল করতে পারি না, তেমনি চলচ্চিত্রে ইতালীর নিও-রিয়্যালিজম বা ফরাসীর নিউ ওয়েভকে আয়ত্ত করতে গিয়ে বিফল হই। শুধু অফুরন্ত উৎসাহের পরিশ্রম এবং ক্লান্তিটুকুই আমাদের সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে থাকে। সেদিক থেকে সত্যজিৎ রায়ই প্রথম বিশ্বাসভাজন প্রতিভা যাঁর মধ্যে সর্বার্থ সার্থকতার একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যিনি দেশের হয়েও সংস্কারের সীমায় নিজেকে বদ্ধ করে রাখতে পারেন নি.—পরিশ্রুত ক্ষমতার ঐশ্বর্যে দিগ্বিদিকে বিকশিত হয়েছেন। বিকশিত না হওয়া ছাড়া তাঁর কোন উপায়ও ছিল না, কারণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে

মানসিকতায় ও দৃষ্টিভংগিতে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী ইওরোপীয়। তাছাড়া, ট্যালেন্ট এবং জিনিয়াস এ-দু'টো জিনিসই তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু 'তিনকন্যা' দেখার পর মনে হয়েছে, একটি শিল্পী সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রাগুক্তি কখনো কী করা যায়! উচিত কি করা! গ্যোতে কিংবা রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী শৈল্পিক নিয়মানুবর্তিতা, পবিত্রতা কিংবা গাম্ভীর্য অথবা ভারসাম্য সব শিল্পীই কী ইচ্ছে করলে অভ্যাস করতে পারেন! পারেন তেমন শ্রদ্ধায় আপন সৃষ্টিকে উন্মুখর রাখতে? তাই, সত্যজিৎ রায় ইদানীং যতই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছেন, ততই তাঁর সম্বন্ধে দুঃখবোধ করতে হচ্ছে, অত্যন্ত বেদনার সংগে তাঁর প্রতি বিশ্বাসারোপের ভুলকে করতে হচ্ছে অনুভব। আর, এই অনুভূতি কি অপরিসীম যন্ত্রণার! কারণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্মশানভূমিতে যিনি প্রথম প্রাণের সাড়া নিয়ে এসেছিলেন, আজ তাঁকেও যদি বিভ্রম বলে ভাবতে হয়, তাহলে বেদনাবোধের যথেষ্ট কারণ থাকে না কী! 'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার' ছাড়া সত্যজিৎ রায় আর কি ছবি করতে পেরেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি উৎসাহ বোধ করতে পারি আমরা। তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যের কতটুকু মর্যাদা তিনি দিয়েছেন, নিজের শিল্পীসত্তার সততার প্রতিই বা খেয়াল রেখেছেন কতটুক্!

'তিনকন্যা'য় সত্যজিৎ রায় আত্মসমর্পন করেছেন সাধারণ প্রবৃত্তির কাছে। নিজেকেও বোধ হয় যথেষ্ট অসম্মানিত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁর তিলমাত্রই খেয়ালে ছিল! 'মণিহা'রার গল্পকে তিনি সম্যক অনুধাবন করতে ভুলেছেন, ভৌতিক রস ও কৌতুক রসের প্রাবল্যে কাহিনীর মূল আবেদনকে বারংবার উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছে। উপরন্তু সত্যজিৎ রায় নিজের ধারণাকেও তেমন শিল্পোৎকর্ষে প্রচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। 'পোস্টমাস্টার'-এ তাঁর আয়োজনের অভাব হয়নি, তিনি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কৃপায় আমরা ছবির 'ডিটেইলস'কে করেছি চাক্ষুস কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা রতন আর পোস্টমাস্টারের সম্বন্ধটুকুই ঘনীভূত হতে পারল না। একটি মানুষের উলাপুর গ্রাম ত্যাগে ছোট্ট এক মেয়ের পৃথিবী যে কখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তা আমরা কখনোই টের পেলাম না। 'সমাপ্তি'র স্থানে স্থানে প্রতিভাবান শিল্পীর স্পর্শ থাকলেও চরিত্রের নাম বদল থেকে শুরু করে অন্যান্য ঘটনা সংস্থাপনে এমন অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন পরিচালক যে রবীন্দ্রনাথের গল্পের শোভনতা বজায় থাকেনি। আসলে সত্যজিৎ রায় তিনটি গল্পকেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছেন আর দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্র এমন কি সংলাপ পর্যন্ত সাজিয়েছেন এমন সাধারণ চিন্তায় যাতে তাঁর রূপকারী মনের স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয় না। 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'অপরাজিত'র সেই মহৎ শিল্পী কোথায় যেন হারিয়ে যান। তাঁর রচিত নিজস্ব পরিমণ্ডলের সব রহস্যকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি যেন দিগম্বর সেজেছেন এখন; কিন্তু এ দিগম্বরতা মোহমুক্ত, নিরাসক্ত, সমাধিমগ্নাভিলাষী সন্ন্যাসীর দিগম্বরতা নয়, এতদ্দ্বারা তিনি যেন তাঁর মনের বাসনাকেই প্রকট করেছেন,—গড্ডলিকায় গা ভাসাবার আগে নিজেকে করছেন উন্মুক্ত।

চলচ্চিত্র আসলে কি? চলচ্চিত্র ভিসুয়্যাল পারসেপসন (visual perception)—চেতনার সহযোগে দৃষ্টিকে বিস্তৃত করা। আর এই চেতনা ও দৃষ্টির বুনুনীতে আমরা ধীরে ধীরে যে স্তরে পৌঁছই তার নাম ইন্টেলেকচুয়াল পারসেপসন (Intellectual perception)। আমরা দৃষ্টিতে বৈদগ্ধ্যপ্রাপ্ত

ইহ, দর্শন এবং তার সংগে সংগে মনন সুক্ষ্মতর পথে চলতে থাকে। অংকনশিল্প যেমন কালের বিবর্তনে কিউবিজম ইত্যাদি সুক্ষ্মতর রূপে ক্রমিক পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে, চলচ্চিত্রেও তেমনি ইণ্টেলেকচুয়াল পারসেপসনকে ধারাল করে তোলার চেষ্টায় নানা আয়োজনের অন্ত নেই বর্তমানে। কিন্তু এই আয়োজনের ফলশ্রুতি হিসেবে 'অযান্ত্রিক'-এর যাথার্থ্য হয়ত পরিস্ফুট হয় আমাদের কাছে, কিন্তু বহু বুদ্ধি ব্যয়েও 'কোমল গান্ধার'-এর প্রামাণিকতা দুর্জ্ঞেয় থেকে যায়। আমরা যদিচ জানি Modern Aesthetics is built upon the disunion of elements, heightening the contrast of each other ; reputation of 'identical elements which serves to strengthen the intensity of contrast' (Film form and Film Sense : Eisenstein) ইত্যাদি এবং এও জানি যে, এই 'সেনট্রিফুগাল আন্দোলন' (centrifugal movement) তখনই জন্মলাভ করে যখন একটি শিল্পের অবক্ষয় দেখা দেয়। যখন উগ্র হয় উৎকট প্রাতিস্বিকতা। কিন্তু শিল্পের জীবনায়ন বা জীবনের শিল্পায়ন মানেই তো শুধু বেদম বিশৃঙ্খলা নয়, নয় চূড়ান্ত সৌন্দর্যহীনতা। মানুষের সৌন্দর্যবোধেরও নিয়ম আছে এবং সেটাই শিল্পের প্রাথমিক প্রয়োজন। কেন মার্কসই তো বলেছিলেন : 'hence man also creates according to the laws of beauty'। কিন্তু 'কোমল গান্ধার'-এর বক্তব্য যতই গূঢ় ও উচ্চাশ্রয়ী হোক না কেন, (যদিচ তাতেও সন্দেহের কারণ আছে) সেই সংবাদটুকু পরিবেশন করতে গিয়ে ছবির পরিচালক যে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে একটি অসংযত ও অসংবৃত মনের উত্তেজনা ও উন্মাদনাই প্রকাশ পেয়েছে,—দৃষ্টিতে, হৃদয়ে কিংবা বুদ্ধিতে একটুও প্রসাদকণিকা যুক্ত করে নি। ছবিটি দেখে মনে হয়, এক অত্যুৎসাহী জীবন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছে করেই ঢোকবার ও বেরোবার পথকে ভুলে এক বিরাট গোলকধাঁধায় বারংবার পরিক্রমিত হয়েছেন। আর, তাঁর সেই উদ্দেশ্যবিহীন পরিক্রমার অসীম নির্বেদ্যতায় দর্শকদেরও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। 'অযান্ত্রিক' ছবির শিল্পরীতি ও বর্ণনাভংগি দেখে ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল যে ঋত্বিক ঘটক হয়ত একটি বিশেষ দর্শনের অধিকারী, হয়ত মানুষ-ই তাঁর ছবির প্রধান কথা, হয়ত তিনি তাদেরই প্রবক্তা। কিন্তু অতঃপর কয়েকটি ছবি দেখে এবং বিশেষত 'কোমল গান্ধার'-এর পর এই ধারণার বশবর্তী হয়েছি যে, ছবি করার আগে ঋত্বিক ঘটক নিজেকে কিছুদিন শাসনে রাখলে পারেন এবং তিনি পুনরায় শিল্পের সংযম শিক্ষা করুন—ইণ্টেলেকচুয়াল পারসেপসনকে তীক্ষ্ণ ও সুক্ষ্ম করার অর্থ যে শুধুই কিছু বিশ্রী গোলমাল নয়,—এই তত্ত্বকে অনুধাবন করুন। আধুনিক কবিতার টুকরো টুকরো চিত্রকল্প, প্রতিবেশ, মেজাজ আধুনিক চলচ্চিত্রেও ভর করুক, তাতে আপত্তি নেই যদি তাতে টোট্যালিটি থাকে। 'কোমল গান্ধার'-এ তা নেই বলেই এত কথা। অবশ্য কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট আপত্তির কারণ ছিল বরাবর। আমি মনে করি না বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলন এমন বয়স্কতা প্রাপ্ত হয়েছে, যদ্দ্বারা আন্দোলকদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীকে আশ্রয় ক'রে একটি ছবি করা চলে অথবা একটি ইতিহাস লিখে ফেলা যায় হঠাৎ। আমার বাড়ীর বৈঠকখানার শোভায় বাংলাদেশের সব মানুষ আকৃষ্ট হোক এবং তাদের শ্রম ও সময় ব্যয় ক'রে কাতারে কাতারে এসে তা দেখে যাক—এ আমি আশা করতে পারি না। সমগ্র দেশ ও জাতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের সেই সব মশালচীর (?) ব্যক্তিগত জীবনের আশা নিরাশার কাহিনীও আমার বৈঠকখানার মতোই অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন—অন্ততঃ এখন। আসল কথা, আমরা তেমন

কিছুই অর্জন করতে পারি নি বলে যা দেখি তাতেই অভিভূত হয়ে নিজেদের ঢাক এমন ক'রে নিজেরাই পেটাই যে অপরে লজ্জা পায়, যদিচ আমাদের অনেক ঐশ্বর্য ভেবে আমরা তাতে সান্ত্বনা পাই। নইলে যে সব নাটক, উপন্যাস, ছবি শুধু বালখিল্যতাই জাহির করে তাকে নিয়ে গভীর ভাবাবেশে আমরা মাতামাতি দাপাদাপি করি কেন! ওই অকারণ ভাবাবেশটুকু ত্যাগ না করলে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে কোনদিনই উর্বরতা আসবে না, আসা সম্ভব নয়।

তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দী' সম্পর্কে আলোচনা আমি করব না। কেননা এছবি দেখলে মনে করা দুষ্কর যে বাংলা চলচ্চিত্রের কয়েকজন আধুনিক অভিভাবক নতুন চিন্তার আয়ুধে সজ্জিত হয়ে উন্নত ছবি করার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন! এছবি কোন অগ্রগতি নয় বরং পশ্চাদাপসরণ বলাই শ্রেয়। আমি জানি না কি কারণে তপন সিংহের নাম সত্যজিৎ রায়ের সংগে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে, —তিনি স্বচ্ছ ছবি করেন এই পর্যন্ত, অনেকক্ষেত্রে তা চোখ ও মনকে তৃপ্তি দেয়; কিন্তু তাঁর কোন বিশেষার্জিত দৃষ্টিভংগি নেই, নেই দর্শন। তাঁকে ঘিরে একটি শিল্পীর স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয় না। তিনি নিশ্চিতরূপেই একটি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। নইলে 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর অমন দুর্বল চিত্ররূপ তিনি দেবেন কেন? আর তা ছাড়া আমার অনেকবারই মনে হয়েছে ছবির টেকনিক্যাল সেন্স-এ তাঁর যেন সবিশেষ কর্তৃত্ব নেই।

অসিত সেন বা তপন সিংহকে সুবিধেবাদী ও চরিত্রহীন বলার বিশেষ হেতু আছে। চরিত্র থাকলে তাঁরা এক নিমিষে সব বিসর্জন দিয়ে অতি সাধারণ রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করেন কেন! 'ঝিন্দের বন্দী' এবং 'স্বরলিপি' দেখলেই আমার কথার সত্যাসত্য অনুধাবন করা যেতে পারে। এমনিতে অসিত সেনের ছবিতে বিন্যাসের ঐক্য ও ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয় সাধারণত। কোন একটি শট্ ইংরাজী ছবির মতো চমক সৃষ্টি করলেও পরবর্তী শট্‌টি অবশ্যম্ভাবীভাবে কল্পনার দৈন্যকে প্রকট করেই থাকে। তবু সব মিলিয়ে অসিত সেন তপন সিংহের মতো আপন সাধ্যানুযায়ী উন্নত ছবি করার প্রচেষ্টায় ব্রতী। বিশেষত 'চলাচল' ও 'পঙ্কতপায়' তিনি এমন একটি পরিণত সুর এনেছিলেন, প্রেমকে এত গভীরতায় উপস্থাপিত করেছিলেন যা বাংলা ছবিতে প্রায়শই দেখা যায় না। তবে আমার ধারণা, তপন সিংহের মতো অসিত সেনও গল্প ভালো বুঝতে চান না, পারেন না বলাই বিধেয়। আর উভয়েই ইমাজিনেশন-এর দৌড়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নিশ্চিতভাবেই পরিশ্রান্ত হন। তবু দু'জনের মধ্যে অসিত সেনকে অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ম মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং তাঁর ছবি দেখতে দেখতে কখনো কখনো ইংরাজী ছবির আমেজ পাওয়া যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না আবিষ্কার করি সত্যি সত্যিই সেটি ইংরাজীর দাক্ষিণ্যে লাভ করা। অপরপক্ষে তপন সিংহ কোমল, বাঙালীসুলভ ভাবালুতা তাঁর পারিপাট্যে এবং যখনই তিনি তীক্ষ্ম ও দৃঢ় হতে চান তখনই 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর মতো ভয়ংকর ছবি করে বসেন।

রাজেন তরফদার এবং মৃণাল সেনকে নিয়ে আলাদা আলোচনা করা এই পরিস্থিতিতে সঙ্গত হবে না, কেননা তাঁরা মাত্র দুতিনটি ছবি করেছেন এযাবৎ। (মৃণাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি 'পুনশ্চ' যদিচ দেখবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে ছবিটির বিশদ আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবু এটুকু বলতে পারা যায় যে, ছবিটি 'বাইশে শ্রাবণ'এর পর কোন উল্লেখযোগ্য সংযোজন নয়, হয়ত স্থান বিশেষে কিছু সংশোধন হতে পারে; কিন্তু সর্বসাকুল্যে 'পুনশ্চ' দেখে মৃণাল সেন সম্বন্ধে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পোষণ করবার

কোন কারণ নেই। 'বাইশে শ্রাবণ'এর বিশেষ বিশেষ 'মুড' বা মেজাজ এবং শৈল্পিক উপরিকতা এ ছবিতে আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। তাছাড়া 'পুনশ্চর' কাহিনীতে গলদ আছে, যে সমস্যাকে বিতীর্ণ করতে চেয়েছেন পরিচালক তার সুস্থ ও যুক্তিসম্মত সমাধান হয় নি।) ছবিগুলিতে তাঁদের চিন্তাধারার ও কর্মপদ্ধতির কিছু কিছু নমুনা পরিস্ফুট হলেও সেগুলিই তাঁদের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রূপকর্ম হয়ত নয়। তাই তাঁদের ভবিষ্যৎ গতিবিধির ওপর নির্ভর করবে তাঁদের স্থায়িত্ব এবং আমাদের আলোচনার ধারা।

আলোচ্য নিবন্ধে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাইলাম যে একমাত্র সত্যজিৎ রায় ব্যতীত আর কোন পরিচালকেরই স্বোপার্জিত কোন বিশেষ দর্শন নেই, নেই শুদ্ধ শিল্পীর তন্ময়তা। ফেলিনির মতো অপেশাদার মনের নিরাসক্ত প্যাসনের তাড়নায় এঁরা কেউ চলচ্চিত্রের সেবা করেন না। তাই নিউ ওয়েভ কিংবা নিও-রিয়্যালিজম-এ ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন উৎসাহ প্রদর্শন করলেও তাঁদের সব উৎসাহ ও উত্তেজনা বহিরঙ্গে, অন্তরে অন্তরে তার চেতনা মাত্র একজনই অনুভব করেছেন এবং আপন কর্মে তার সার্থক রূপচ্ছবি এঁকেছেন—তিনি সত্যজিৎ রায়। বাকী সবাই বাংলা ছবির বাল্যাবস্থা ঘোচাতে উন্নত ছবি করার চেষ্টা করছেন এই মাত্র, কোন 'বাদ'এর সমর্থনে কিংবা কোন 'তরঙ্গে' ভেসে গিয়ে নয়। এঁরাই আবার সুবিধে বুঝে দর্শকদের মনোরঞ্জনে নেমে পড়েন সময় সময়—তৈরি হয় 'ঝিন্দের বন্দী', 'স্বরলিপি'। তাই বলছিলাম, সত্যজিৎ রায়ের সংগে এক নিঃশ্বাসে এক সংগে ঋত্বিক ঘটক, অসিত সেন, তপন সিংহ, রাজেন তরফদার কিংবা মৃণাল সেনের নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়—একটি সুস্পষ্ট আড়ালে ওঁদের আলাদা করে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের সবটুকু মনোযোগকে জড়ো করে যে মানুষটির ওপর স্থাপিত করেছিলাম সেই সত্যজিৎ রায়েরও সাম্প্রতিক বিচলিত অবস্থা দেখে আমরা আশংকিত। দর্শকদের প্রসন্নতাকল্পে তিনিও অবশেষে টলবেন এই অনুমানে আতংকিত—স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর যে দর্শকসমাজ আশ্চর্য রুচিবিকৃতির পরিচয় দিচ্ছেন।

অসিত গুপ্ত

রবীন্দ্রঐতিহ্য ও বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ একদা ঘোষণা করেছিলেন, "যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে······তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই—তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।" তাঁর আরও একটি রচনায় পাচ্ছি "কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তব তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত,"······আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবু তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়।"

আমার আলোচনার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র ঐতিহ্য। সেজন্য, রবীন্দ্র রচনার উদ্ধৃতি দিয়েই আমার কথারম্ভ। পূর্বোদ্ধৃত ঐ বিস্ময়াবহ উক্তিগুলো স্মরণ করার মুহূর্তে আমার মন এই বোধে উজ্জীবিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির বিশ্বব্যাপী উৎসবে আমাদের জনমানসে যে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বোধন অপরিহার্য ছিল তিনি ঐসব অমূল্য উক্তির রচয়িতা, যেখানে তাঁর হৃদয়-মন্থন-করা অনুভব ও অত্যাচারবিরোধী প্রতিজ্ঞা আমাদের এক দুর্লভ দুঃসাহসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, অন্যায়কে ধিক্কার দিয়ে মানুষকে তার অপ্রমেয় শক্তিতে স্বাধীনতায় স্থিত হতে বলেছে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা, শতবার্ষিকীর কলরবমুখরিত অনুষ্ঠানগুলোতে সে রবীন্দ্রনাথকে জানা ও আবিষ্কার করার কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যাদের আন্তর জীবনের গভীরতায় কখনও কোনো আশ্রয় লাভ করেননি, তারা ক্ষমার্হ; কিন্তু, যাঁদের অর্থাৎ 'বিশ্বভারতী' কর্তৃপক্ষের উদ্যম এ ব্যাপারে সর্বাধিক এবং একনিষ্ঠ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল, তাদের নিরুৎসাহ এবং লক্ষ্যভ্রষ্টতা আমাকে স্তম্ভিত করেছে, আমাদের চিত্তে রবীন্দ্রচিন্তার স্বীকৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কাগ্রস্ত করেছে। কেননা, কালান্তর গ্রন্থের যথাক্রমে 'সত্যের আহ্বান' ও 'কালান্তর' শীর্ষক যে-দুটি প্রবন্ধ হ'তে ঐ উদ্ধৃতি দু'টি সংগৃহীত হয়েছে, বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে "সহজলভ্য" করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 'বিচিত্রা' গ্রন্থে সেই প্রবন্ধদ্বয় সংকলিত হয়নি। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও আমাদের আশঙ্কার হেতু অবিদ্যমান থাকতো যদি ঐ প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা ও সংগ্রামশীলতার যে প্রত্যক্ষ ঐশ্বর্যশীল প্রতিফলন, তা অন্য কোনো প্রবন্ধে বিধৃত হতো। কিন্তু 'বিচিত্রা'য় কালান্তর গ্রন্থের প্রতিনিধিত্ব করার নিমিত্ত যে-দুটি প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়েছে, তা তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ এবং কালান্তরের রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করার পক্ষে নিঃসন্দেহে অপ্রতুল।

'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ শতধা খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের সেই খণ্ডিত সত্তা ও অসম্পূর্ণ পরিচয় কবিকে

গণমানসে কোন্ আলোকে উদ্ভাসিত করবে এবং সে পরিচয় আমাদের ভাবীকালের সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করবে সে সম্পর্কে চিন্তিত হওয়ার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের জাতীয় জীবনের তমিস্রা বহুল পরিমাণে দূর করেছে—একথা বলার আরেক অর্থ তিনি শুধুমাত্র কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক বা শিল্পী ছিলেন না, আমাদের দেশচেতনা, রাষ্ট্রচিন্তা, বিশ্বদর্শন, স্বদেশ সাধনা এক কথায় সমুদয় অনুভবই তাঁরই হৃদয়ানুভূতির সরসতায় উদ্‌বোধিত, তাঁর কর্মশক্তিতে শক্তিমান। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে ভুবনব্যাপী সংগ্রাম আমাদের দেশে তার কালজয়ী শক্তি ও দুঃসাহসের অভিপ্রকাশও আমরা তাঁর রচনায়ই লাভ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তিত্ব কেবল আপনার নয় এক শতাব্দীর গুঞ্জনমুখর ইতিহাস, জনচিত্তে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধিই আমাদের কাম্য; আর, তাঁকে পরিচিত করানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর স্বাভাবিক ভাবে আবর্তিত, তাঁদের কর্ম-চিন্তায় সেই চৈতন্যের স্বাক্ষর না-থাকা মর্মান্তিক ভাবে লজ্জার। তাতে পুনরায় এ-সত্যেরই নিদর্শন পাওয়া গেল যে আমাদের চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা আজও অস্বচ্ছ, অসম্পূর্ণ। এমন কি, যাঁরা ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে তাঁর স্নেহ-আশীর্বাদ-অনুগ্রহ লাভ করার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের রবীন্দ্র-উপলব্ধিও আত্মিক ভাব-সাযুজ্যের নিরিখে নির্ভরযোগ্য নয়। নতুবা, সমগ্র বিশ্বমানবের হয়ে তাঁর যে সংগ্রাম ও আবেগ-উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ সযত্নে সেই অংশগুলো পরিহার করে রবীন্দ্রনাথকে সেই মানুষের কাছেই 'সহজলভ্য' করার হেতু কি?

তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র এবং অভিব্যক্তিকে খর্ব না-করে যদি রবীন্দ্রসাহিত্য লোকায়ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে এই ধরনের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে একটি মৌল জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ—যেমন উপন্যাসের একটি টুক্‌রো, নাটকের একটি দৃশ্য, প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর দুটি-একটি প্রবন্ধ, কবিতা-পুস্তক থেকে দু'চারটে কবিতা নিয়ে এই সংকলনের আবির্ভাব। গ্রন্থের নিবেদনে আশা অভিব্যক্ত হয়েছে, "এই সঙ্কলন-গ্রন্থ বিশাল রবীন্দ্রবর্ষের কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন যদি হয়ে থাকে তাহলেও আমাদের যত্ন এবং আগ্রহ সার্থক হয়েছে বলতে হবে।" অধুনা আমাদের দেশে সৌখিন সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা অতিশয় বর্ধিত। তাদের পরিশ্রম-বিমুখ চিত্ত এই গ্রন্থটিকেই রবীন্দ্ররচনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণ করে তৃপ্ত হবে, এবং স্বীয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এই বিচিত্রা-সর্বস্ববোধই প্রচারিত ও উদ্‌বোধিত হবে। এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কাকে দৃষ্টিগোচর রেখে ওই গ্রন্থটির পরিকল্পনা এমন ভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল যাতে রবীন্দ্রমানসেতিহাসের কোনো অনুভব বা প্রত্যয় বিসর্জিত না হয়। কিন্তু, গ্রন্থটি এমনভাবে সজ্জিত যাতে রবীন্দ্র-উপলব্ধি গুরুতররূপে বিঘ্নিত ও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য; এবং এই ব্যর্থতার অর্থ আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়া। আমাদের আশঙ্কা, রবীন্দ্রনাথকে সহজলভ্য করতে গিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের মর্মে একটি অলক্ষ্য আঘাত হেনেছেন।

আমাদের দেশের বিচারের ক্ষমতাহীন পাঠকের বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হবার প্রবণতা অসামান্য। সেই প্রবণতার কথা স্মরণে উপস্থিত রেখে 'বিচিত্রা' সংকলনে রবীন্দ্রসাহিত্যের অমনোযোগী পাঠক কিভাবে যুগপৎ বিভ্রান্ত এবং বঞ্চিত হয়েছেন তা লক্ষ্য করা যাক। 'সঞ্চয়িতা'য় সংযোজন অংশের আগ পর্যন্ত যেসব কবিতা স্থান লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেগুলো নির্বাচন করেছিলেন; সুতরাং,

'বিচিত্রা'র কবিতাংশে সম্পাদকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিকবোধ, রুচি, নির্বাচন এবং আদর্শের অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিচার স্বীকার করে নেবেন, এটাই একান্ত প্রত্যাশিত কিন্তু, স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির উপর আস্থাশীল থাকতে পারেন নি। তাঁদের এবংবিধ রবীন্দ্ররুচি বিশোধন প্রয়াসের ফলে পাঠক যেসব কবিতার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তার মধ্যে এসব বিখ্যাত কবিতাগুলো অন্যতম—'সোনার তরী', 'ঝুলন' 'এবার ফিরাও মোরে', 'দুই বিঘা জমি', 'জীবন দেবতা', 'দেবতার গ্রাস', 'শিবাজি-উৎসব', 'ছবি', 'চঞ্চলা', 'প্রশ্ন', 'বাঁশি', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'আমি', আফ্রিকা'। আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সংযোজন-অংশে যে সব কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল তাদের অসংখ্য খারিজ কবিতার মধ্যে 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের', 'জন্মদিন', 'ঐকতান', 'ওরা কাজ করে' ইত্যাদি আশ্চর্য কবিতাগুলোও রয়েছে। এমন কি, কবিপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে যেসব কবিতাস্ফুলিঙ্গ তাঁর অন্তরাকাশ বিশ্ববিমোহন আলোকে রঞ্জিত করে জ্বলে উঠেছিল—'রূপ-নারায়ণের কূলে', 'প্রথম দিনের সূর্য' 'তোমার সৃষ্টির পথ' ইত্যাদি—তার একটিও 'বিচিত্রা'য় সংযোজিত হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। আলোচ্য সংকলনের নির্বাচকগণ কাব্যোৎকর্ষ বিচারের কি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন যার ফলে সূর্যাস্তের লগ্নের ইঙ্গিতময় সন্ধ্যাতারাগুলো বর্জিত হলো তা আমাদের জানবার কথা নয়; তবে এও প্রশ্নাতীত যে, যাঁরা এই সংকলন-গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট রচনার মধুভাণ্ড বিবেচনায় গৃহে স্থান দিয়েছেন তাঁরা মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত হয়েছেন।

এর চেয়েও বিস্ময়কর 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রতি, সম্পাদকগণের মনোভঙ্গি। এই গ্রন্থ থেকে 'কালান্তর', 'লোকহিত', 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম', 'বাতায়নিকের পত্র', 'সত্যের আহ্বান', 'বৃহত্তর ভারত' ইত্যাদি যুগান্তকারী, সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী মানবিক প্রত্যয়ে দুঃসাহসী এবং প্রচার-সুদুর্লভ উল্লাসে অনন্য নিবন্ধগুলো বর্জন করা হয়েছে। সুতরাং, 'কালান্তর' গ্রন্থের পাতায় পাতায় আমরা মানবিক কল্যাণের ভাবনায় চিন্তাকুল প্রকাণ্ড হৃদয় যে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করি, তাঁকে 'বিচিত্রা' সংকলনের কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ ঐশ্বর্যশীল চিন্তা ও অনুভব থেকে 'বিচিত্রা'র পাঠক বঞ্চিত হয়েছেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া যাক—

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
আমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

(প্রশ্ন)

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমাদের নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,

এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

(আফ্রিকা)

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠি বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য করে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি। (জন্মদিন)

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বানী লাগি কান পেতে আছি। (ঐকতান)

ওরা কাজ করে

দেশের দেশান্তরে

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,

পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

গুরু গুরু গর্জন, গুন্ গুন্ স্বর

দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

দুঃখ সুখ দিবসরজনী

মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ—'পরে

ওরা কাজ করে। (ওরা কাজ করে)

রূপনারাণের কূলে

জেগে উঠিলাম;

জানিলাম এ জগৎ

স্বপ্ন নয়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম

আপনার রূপ—

চিনিলাম আপনারে

আঘাতে আঘাতে

বেদনায় বেদনায়;

সত্য যে কঠিন,

কঠিনেরে ভালবাসিলাম— (রূপনারাণের কূলে)

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হোলো চীনের মর্ম্মস্থানের উপর।...ওদিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্ম্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।' (কালান্তর)

এইসব উদ্ধৃতি এবং প্রবন্ধারম্ভের উদ্ধৃতি দুটো আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, রবীন্দ্রমানসের একটি বিশেষ দিককে পাঠকের অনুভবের প্রত্যক্ষতা থেকে সরিয়ে রাখবে একটি সচেষ্ট প্রয়াস যেন সম্পাদকবৃন্দকে সর্বক্ষণ ব্যাকুল করে রেখেছিল। সেদিকটা হলো কবির সুতীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভঙ্গী। কবির উদার মানবিক বিশ্ববোধ প্রতি মুহূর্তে তাঁকে য়ুরোপীয়, এশীয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত দানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃদ্ধ করেছে। অন্তরের অপ্রমেয়

শক্তি, তেজ এবং শুভবুদ্ধিতে বলশালী হয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে "বিনিপাত" বলে অভিসম্পাত দিয়ে গেছেন, এবং ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের সংগ্রামশীল ঐতিহ্য ও মানবধর্মী প্রত্যয়কে আদর্শের এক সুউচ্চ শিখরে স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শের উত্তরাধিকার আমাদের, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের। আজ-কের বিপর্যস্ত বিশ্বে এবং নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ সমস্যায় পীড়িত ভারতবর্ষে কবির যে-বাণী আমরা অন্তরে গ্রহণ করতে পারি এবং দুঃসাহসে সমস্ত দুর্দৈবকে প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করতে পারি, তার সন্ধান উদ্ধৃত কাব্য ও গদ্যাংশে পাওয়া যাবে। অথচ, ঐ কবিতাগুলো এবং প্রবন্ধরাজির একটিও সংকলনে স্থানলাভ করল না, এটা কি ঈষৎ বিস্ময়ের বস্তু নয়? একটা আশ্চর্য সংগঠন নয়?

জানিনা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এর কি জবাব দেবেন। তবে, মানুষকে উন্নততর সাংস্কৃতিক পরিবেশের অধিকার দান করা এবং মুক্তির আনন্দে মহিমময় করার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে আজীবন সাধনা তাতে মোহমুগ্ধ অন্ধ বৈশ্যতার বিরুদ্ধে নিদ্রাহীন সংগ্রাম যেমন সত্য, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়ন নৃশংসতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামও ক্লান্তিহীন। মানবিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে মানুষের উত্তরণকে যদি সম্ভাবনাযুক্ত করতে হয় তবে পথের এই দুর্দৈবগুলোকে অতিক্রম করতেই হ'বে। দেশের "অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্মঅবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়"-দের সম্বোধন করে কবি যে লিখেছিলেন, আজ ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে আত্মক্ষয়ী কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় নেই, তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য ভিক্ষুকের মত কাড়াকাড়ি করার দিনও আজ নয়, মিথ্যা অহঙ্কারে গৃহকোণের অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত অস্তিত্ব বহন করার সময়ও আর নেই, আমাদের অসীম ব্যর্থতার লজ্জা থেকে চিরকালের মত বাঁচার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী মহৎ মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যেতে হবে—রবীন্দ্রনাথের উদাত্তকণ্ঠের সেই আহ্বান যদি রবিন্দ্র-সাহিতের সাধারণ পাঠক না শুনতে পায় তবে রবীন্দ্রনাথকে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্য একান্তভাবে নিস্ফল হয়ে যায় না কি? আমাদের জাতীয় জীবন নানাবিধ গ্লানি ও অন্যায়ের স্বীকৃতিতে কলুষিত; সেই কলুষ-কাঠিন্য থেকে আমরা রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথেই আত্মরক্ষা করে পুনরুজ্জীবিত হতে পারি। তাঁর মানব-মৈত্রীর মহামূল্য সত্যটি আমাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত হলেই শোষণ-অত্যাচারের অরণ্যে মুক্তি ও সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, মানুষেরই ঘরে মানুষ প্রতি-ষ্ঠিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ বিস্ময়কর রচনাগুলোই যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন থাকে তাহলে জনচিত্তে রবীন্দ্র-আদর্শের প্রসার কিরূপে সম্ভব? তাতে, প্রকারান্তরে, রবীন্দ্রনাথই কি লাঞ্ছিত হচ্ছেন না?

অরবিন্দ পোদ্দার

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ধারণা সচরাচর মোহপ্রবণ মন্তব্যের মুখাপেক্ষী; অর্থাৎ, যুক্তির তুলনায় বিশেষণের ব্যাপ্তিতে, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তে আবেগপ্রবণতায় তার পক্ষপাত। সম্ভবত সমগ্রভাবে যুগোত্তর কিংবা যুগান্তকারী মনীষার বিস্তর জনপ্রিয়তার মূলে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত অজ্ঞাতসারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়াশীল। এবং এরূপ অবস্থায় যদি এমন কেউ থাকেন যিনি ভিন্নতর পদ্ধতিতে, যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসার নানা উপকরণের সহায়তায় রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়নে উৎসাহী তাহ'লে তাঁর জটিল এবং গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সেক্ষেত্রে সমালোচকের বক্তব্যের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগের অভাব অনেক সময় অকারণ ও তাৎপর্যহীন বাকবিতণ্ডার হেতুমূল হয়ে থাকে।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর, সশ্রদ্ধ ও পরিশুদ্ধ বক্তব্য একালের সার্থক সাহিত্য-বিচারের সহায় এবং যেরূপ সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে তেমনি এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কালপুরুষের প্রতিভা সম্পর্কেও হয়তো আগামী শতবর্ষ ধরেই পাঠকসাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও ঔৎসুক্য অব্যাহত থাকবে। এরূপ পট-ভূমিকায় রবীন্দ্র-সমালোচনা চর্বিতচর্বণের নামান্তর না হয়ে নব-নব বিশ্লেষণ ও সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের আলোকে উজ্জ্বলতর এবং সার্থকতর হোক এটাই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা এবং উৎকেন্দ্রিক রবীন্দ্রচিন্তাকে ক্রমশ সংহত ও কেন্দ্রানুগ করবার পক্ষেও বোধ হয় একপ্রকার অপরিহার্য।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এযাবৎকাল একদিকে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই পুনরুক্তিতে, এক-দেশদর্শিতায় আচ্ছন্ন অন্যদিকে তেমনই এমন দৃষ্টান্ত ইদানীং বিরল নয় যেক্ষেত্রে রবিপ্রতিভা-বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার খাতিরে এবং সম্ভবত অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টায় খুব আশ্চর্যরকমের যুক্তিহীন মন্তব্যের নিপুণ প্রয়োগ অনিবার্য হতে দেখা গিয়েছে। অতএব যখন কেউ-কেউ এরূপ মন্তব্য করেন যে রবিপ্রতিভা একান্তভাবেই প্রতীচ্যের ভাবধারার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ অথবা রবীন্দ্রনাথ সর্বসাকুল্যে এক ডজন উল্লেখযোগ্য সার্থক কবিতা লিখেছেন তখন এরূপ হঠোক্তির প্রতিবাদে মন সায় না দিয়ে পারে না। এবং তখন এ কথাও মনে না জেগে পারে না যে প্রসঙ্গ ও উপকরণে রবীন্দ্র-চিন্তা এযাবৎকাল যে-ধরনেরই হোক না কেন নবত্বের নামে যদি উল্লিখিত ধরনের হঠোক্তি সংস্কৃতিবান লোকের মুখে উচ্চারিত হয় তাহলে এদেশের সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে সম্ভবত মৌন থাকাই শোভন ও সঙ্গত।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচারের ক্ষেত্রে যদি নতুন বক্তব্য প্রকাশের খেয়ালে বাকচাতুর্যকেই প্রশ্রয় দেয়া যায় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত না রেখে স্বাধীকার প্রমত্ততায় দু'চারটি খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা রচনার উপর নির্ভর ক'রে মতামত স্থাপনের ব্যগ্রতা সমালোচককে পেয়ে বসে তাহলে তার পরিণাম শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। এবং অনুরূপ অবস্থায় একথাই মনে হবে যে গতানু-গতিক মামুলী চিন্তাধারাই বরং কাম্য তবু নতুন বক্তব্যের নামে এই ধরনের মন্তব্য না গ্রহণ করাই সমীচীন।

উত্তরকালের চোখে এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপে স্পন্দিত। তাঁর সাহিত্য, চিত্রকলা ও গান

এখন পর্যন্ত জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না ঘটলেও বাংলা সাহিত্য থাকতো এবং কালক্রমে তার লালন ও পরিবর্ধন সম্ভবও হ'তো। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ বর্তমান যে-দেশে সেক্সপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়নি ; তথাপি সে-সব দেশের সাহিত্য কালক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবদান বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অঙ্গীভূত করেছে বলেই রবিপ্রতিভার মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকবার ন্যায়সঙ্গত কারণ থেকে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে একালের পাঠক সম্প্রদায় যে আন্তরিকভাবে উৎসাহী তার মূলেও কাজ করছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব ; রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুধাপানেই শ্রেষ্ঠসাহিত্যের আস্বাদন সম্ভবপর হওয়ায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠসাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে।

আদর্শের দিক থেকে মানবতার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ সমগ্রতার প্রতীক। খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটনাপ্রবাহকে গ্রহণ করবার পরিবর্তে এই ধরনের ঘটনাসমূহের সামগ্রিক রূপনির্ণয়ের চেষ্টা তাঁর সাহিত্য-জীবনে বিচিত্ররূপে স্ফুটতর হয়েছে। সত্যকে নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করবার সাধনায় রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বারবার অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাহিত্যে, সমাজচিন্তায়, রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-চিন্তায় এই সাযুজ্যসন্ধানী গভীরতা ক্রিয়াশীল। প্রধানত এই কারণেই রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো বিশেষ কালের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুগমন না করে নিত্যকালের সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে।

উল্লিখিত মন্তব্য অবশ্য এরূপ ধারণার পরিপোষক নয় যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো অংশই কালক্রমে ম্লান হবে না অথবা কালের ক্রমবর্ধমান তিমিরেও সে-সাহিত্যের সর্বত্র সহজ আকর্ষণের সূর্যরশ্মি সমান-ভাবেই প্রতিফলিত হবে। বরং বলা যেতে পারে বিভিন্ন কালের পাঠকসমাজ বিভিন্ন অংশের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করবে এবং এক এক সময়ে অংশত হলেও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হতে থাকবে। একটি সহজ উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এখনকার দিনে কোনো সাহিত্য-সভায় কোনো সাধারণ ব্যক্তিই যখন আর 'দুই বিঘা জমি' কিংবা 'সোনার তরী' অথবা 'মানস সুন্দরী' পাঠ করতে রাজী হন না বরং অপেক্ষাকৃত অনেক পরবর্তীকালের লেখা 'জন্মদিন' কিংবা 'আফ্রিকা' প্রভৃতি কবিতার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন তখন একথা স্বীকার ক'রে নিতে বাধা থাকে না যে সমকালীন সমাজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা এবং ধ্যান-ধারণাই প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন যুগের পাঠক-সমাজের মূল্য-বিচারকে গভীরভাবেই প্রভাবিত করে থাকে। যুগে যুগে পাঠকের চিন্তাধারাও একই রকম থাকে না, কালক্রমে পরিবর্জন ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাতে ভিন্নতর উপলব্ধির নিবিড় স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভিন্নতর অংশের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্রতর হ'লে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকে না।

সুতরাং একালের রুচি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির পর্যালোচনা যেমন স্বাভাবিক অন্য-দিকে তেমনই রবিপ্রতিভা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি কিংবা চরম উক্তি প্রয়োগের বিড়ম্বনাও অনেক। যদিও একদিক থেকে সাহিত্যিক মাত্রেই কালের পুতুল তবু রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্রভাবে সুদীর্ঘ কাল ধরে' নবনবরূপে ক্রিয়াশীল প্রতিভার দিগন্তসঞ্চারী সূর্যালোক আগামী বহুকালপর্যন্ত কাব্যপাঠক ও সংস্কৃতি

পিপাসু চিত্তকে অনুপ্রাণিত করবে এটাই স্বাভাবিক। নিজের জীবিতকালেই কবি তাঁর মূল্যবান রচনার অনেক অংশকে নিজেই বর্জন করেছেন, পূর্ণাবয়ব কাব্য-শরীরের দুর্বল অংশগুলোকে অস্বীকার করার মধ্যে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পরিমিতিবোধের সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত। সুতরাং যদি ভবিষ্যতেও তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনার ফসলের আরো কিছু অংশ অনুভবক্ষমতায় ম্লানতর প্রতিপন্ন হয় তাহলেও আশঙ্কার কারণ নেই, যেহেতু কালের কষ্টিপাথরে নিঃসংশয়রূপে উত্তীর্ণ হবার মতো প্রচুর উপাদান রবীন্দ্র-কলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এক সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং বাংলাসাহিত্য সমার্থবাচক মনে হ'তো, যেহেতু রবিপ্রতিভার প্রভাব সে-সময়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল। রবিঠাকুরের গান, ছবি, কবিতা, গল্প ও নাটক তখনকার দিনের রুচিমান পাঠক সম্প্রদায়কেও অবাধ আত্মনিমজ্জনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু, বলাবাহুল্য, প্রতিভা যতো বহুমুখীই হোক, একদিন না একদিন তার দৃঢ়বদ্ধ আকর্ষণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে তরুণ-তরদের সাহিত্য-আন্দোলন আজ থেকে তিরিশ বছরেরও অধিককাল আগেই শুরু হয়েছিল এবং আজকের দিনে এমন আধুনিক সাহিত্যের কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে, চিন্তায় স্বভাবে ও আবেদনে যে-সাহিত্য স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঐতিহ্য একদিকে যেমন আধুনিক লেখকের আত্মশক্তি অর্জনের সহায়, অন্যদিকে তেমনই সমকালীন জীবনবোধের (যে-জীবনবোধ রবীন্দ্রযুগে হয়তো ভিন্ন ধরনের ছিল) প্রসার ও ব্যাপ্তির মধ্যেই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসার একালের সাহিত্যে লক্ষণীয়।

এখানেই কিছু আশঙ্কার কারণ থেকে যায়। হাল আমলের লেখকদের কৃতিত্বকে বড়ো ক'রে দেখাবার উন্মাদনায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অবদানকে খুব সীমাবদ্ধরূপে বর্ণনা করার বাতুলতা কোনো কোনো আত্মতৃপ্ত সমালোচককে যখন পেয়ে বসে এবং যখন শুধু অবাচীন তরুণই নয় বিশেষ শিক্ষাসম্পন্ন প্রবীনও কিছু কিছু অভূতপূর্ব ও মজার বাক্যপ্রয়োগে রবিপ্রতিভার প্রকৃত অবদানকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুগামী করতে সচেষ্ট হন তখন জ্ঞানপাপীর ভূমিকা সম্পর্কে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সর্বজনস্বীকৃতির স্বাক্ষর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাপ্তি বর্তমান, উত্তরকালের সাহিত্যে এখন পর্যন্ত তার তুলনা বিরল। উত্তরকালের সাহিত্য খণ্ডিত ও প্রতিযোগী উদ্যমে নিয়োজিত হয়েও এযাবৎকাল সীমাবদ্ধভাবেই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভার আবির্ভাব এযুগে অচিন্তনীয় এবং খণ্ড-খণ্ড রূপে এ যুগের লেখকরা ক্রিয়াশীল। কেউ কেউ কোনো কোনো দিক থেকে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী অতএব অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্ট সুদীর্ঘকালের সাহিত্যের তুলনায় এখনও পর্যন্ত এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-খণ্ড উদ্যোগ অত্যন্ত পরিমিতভাবেই সার্থক।

এরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একালের মানুষের ধ্যানধারণাকে সত্যবস্তুর নিকটবর্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব এ যুগের সমালোচকের। এই বিরাট ও মহান হিমালয়সদৃশ প্রতিভার মূল্যবিচারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াসুলভ যে-ধরনের চতুর অথবা উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য সম্প্রতি কেউ কেউ করেছেন দু'চারদিন বাদেই তার গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে গেছে, বলা বাহুল্য। অথচ রবিপ্রতিভার

সঠিক সমালোচনা কিংবা মূল্যায়ণই উত্তরকালের সৃজনী সাহিত্যের প্রগতিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখানে বলা দরকার হাল আমলের ইংরেজী, মার্কিন ও য়ুরোপীয় প্রাদেশিক সাহিত্য ও চিত্রকলার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠক-গোষ্ঠির পরিচয় যেমন একদিকে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও রসোপলব্ধির প্রসার ঘটিয়েছে অন্যদিকে তেমনই সেই অভিজ্ঞতাকেই পুঁজি ক'রে রবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করবার উদ্যোগ সফলতা লাভ করবে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ যে-কালের প্রতিনিধি সে-কাল এখন আর নেই, যে-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মানসীমূর্তির প্রেরণা জুগিয়েছিল সে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হবার সুযোগ একালের সমাজচিন্তায় কিংবা সংসারধর্মে আর নেই একথা স্বীকার ক'রেও বলা যেতে পারে যে উপনিষদ, বাংলার লোকসাহিত্য, বৌদ্ধসাহিত্য, ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা, বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞা ও উপলব্ধিকে উড়িয়ে দিয়ে একমাত্র প্রতীচ্যের আলোকে রবীন্দ্রচিন্তা পুনর্নির্মাণের পরিণাম শুভ হবে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বর্গাবর্ত' নিবন্ধে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে দান্তে যেমন "মুমা"-র রসানুবাদ ক'রে খৃষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি উপনিষদের অনুগত বলে' হিন্দুসভ্যতারই কবি। যদি তাই হয় তাহলে ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীচ্য সভ্যতার ফল এরূপ সিদ্ধান্ত পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্তরকালের ঋণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। "আমাদের সময় English Men of Letters পর্যায়ের অনেক বই অবশ্য-পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না তিনিও নাকি Failure of a great poet. নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হ'তো ধৃষ্টতা। ইংরেজী সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জনী আমলের বৃটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক। কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে করেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে।—রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করেছিল কেবল তা নয়, তার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিক আমাদের মনকে অনুকূল করেছিল। তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হ'য়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজী পুঁথি থেকে ধার করা নয়, যার দ্বারা সোনাকে সোনা এবং পিত্তলকে পিত্তল বলেই চেনা যায়।" ('আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ')

এবং এই উদ্ধৃতি থেকে এসত্যও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে প্রতীচ্যের চিন্তাধারা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে-পরিমাণে তাঁর আয়ত্তে এসেছিল সে-পরিমাণে তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। এশিয়া ও য়ুরোপের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, স্থানীয় সংস্কারের উর্দ্ধে তাই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করা তাঁর পক্ষে এতো অপরিহার্য হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই য়ুরোপের বিবদমান জাতিগুলোর স্বার্থপরতায় যে-নগ্নতা প্রকট হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে শক্তিমত্ত ইংরেজ বণিক শক্তি দুর্বল জাতিকে যে-ভাবে পীড়ন করেছিল (বুয়োর যুদ্ধের ঘটনাবলী উল্লেখ্য) তাতে প্রতীচ্যের কাছে প্রেরণা পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবত সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের

প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেই কালোপযোগী প্রেরণার উৎসসন্ধানে তৎপর ছিলেন। অন্তত তাঁর 'সাহিত্যতত্ত্ব' 'সাহিত্যের তাৎপর্য' 'সাহিত্যধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই দিক থেকে বিচার্য। একই সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তায় বুদ্ধদেব এবং যিশু খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের মহিমা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যিশুখৃষ্ট প্রসঙ্গে ম্যারিয়া চরম আত্ম-নিবেদনের সহজ রূপটি মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে মনে হয়েছে সুজাতার কথ —যে সুজাতা ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের সত্যতাকে উন্মোচিত করেছিল।

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত বোধহয় সঙ্গত যে উত্তরকালের পক্ষে রবীন্দ্রচর্চার প্রয়োজন এখনই নিঃশেষিত হয়নি এবং সে-কারণেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেষ কথা বা চরম উক্তির মোহ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন এত বেশী। যতোই দিন যাবে ততোই রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি আশা করা যায় এমন একদিন আসবে যে-সময়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থক ও সামগ্রিক মূল্য-বিচার সহজতর হবে। সেক্সপীয়র সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা তাঁর তিরোধানের বহুকাল পরবর্তী যুগে সম্ভবপর হয়েছে এবং যুক্তি ও বিচার পদ্ধতিতে সার্থকতর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম না হওয়াই সম্ভব।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কালপুরুষ ।
প্রথম বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা । কার্তিক । ১৩৬৮
সম্পাদক । বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

চিত্র।
বীরভূমের মাটির পুতুল (পুরোগামী প্রকাশনীর সৌজন্যে।)

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষে পরিমল চন্দ্র কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১৯বি, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত।
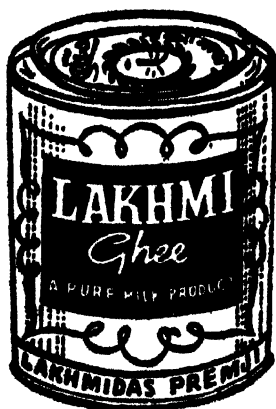
প্রথমবর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কা ল পু রু ষ
কার্তিক ॥ ১৩৬৮

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

হীরেন মুখোপাধ্যায়

বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। প্রচার মাত্রেই কিছু খারাপ নয়। বিশেষ ক'রে কবি, সাহিত্যিক শিল্পী এঁদের প্রচার না হ'লে সমাজ এবং সভ্যতার সমূহ ক্ষতি। কালিদাস তাঁর মেঘদূত যদি নিজের অবসর সময় পড়বার জন্য লিখে যেতেন এবং পাছে তা খোয়া যায় এই ভয়ে বালিশের নীচে তাকে সযত্নে রক্ষা ক'রতেন তাহলে তাঁর প্রতিভার কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত না কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হ'ত। আগেকার কালে এই প্রচারের ভার নিতেন পৃষ্ঠপোষক কোন রাজা বা শ্রেষ্ঠী। এখনকার কালে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগে সংগে এঁদের স্থান দখল ক'রেছেন রসিক সমালোচক। সুন্দরসের বোদ্ধা সবকালেই খুব বেশী থাকে না, কিন্তু যাঁরা সত্যকারের রসিক সমালোচক তাঁদের কর্তব্য হ'ল উৎকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য বা শিল্পের অন্তর্নিহিত রসের সংগে সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ প্রয়োজনটা আজকাল বেশী অনুভূত হ'চ্ছে তার কারণ প্রাচীন বা মধ্যযুগে শিল্প বা সাহিত্য ছিল ধর্ম-ভিত্তিক এবং স্বাভাবিক কারণেই জনসাধারণের সংগে তার সংযোগ ছিল। কিন্তু

আধুনিককালে সাহিত্য বা শিল্প ধর্মের বাঁধন ছেড়ে হ'য়ে উঠেছে 'সেক্যুলার' বা লৌকিক। জনসাধারণের সংগে তার সংযোগ প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেলে সেটাকে ভিত্তি ক'রতে হবে শিল্পের মূল দাবীর উপর, সেটা হচ্ছে রসের দাবী। সেজন্ত মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সে দায়িত্ব গ্রহণ ক'রবেন রসিক সমালোচক।

এত কথা বলার প্রয়োজন হ'ল এই কারণে যে মৃত্যুর তেইশ বছরের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ আজ বিস্মৃত। অবনীন্দ্রনাথের ভাগ্যে বৎসরান্তে তবু একবার জন্মোৎসব জোটে, গগনেন্দ্রনাথের ভাগ্যে তা-ও না। যেখানে প্রচারের অপপ্রয়োগের ফলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা পাচ্ছেন সেখানে গগনেন্দ্রনাথের মত একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়াটা বিস্ময়ের বৈকি। কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত জনসাধারণের শিল্পানুরাগের পরিচয় নিলে তার মধ্যে আর বিস্ময়ের কিছু থাকে না। স্বদেশ ও বিদেশের কোন শিল্পকলার সংগে এঁরা পরিচিত নন কিন্তু 'কালচারের' দম্ভে এঁরা ভরপুর। শিল্পবোধের তৃতীয় নেত্র এঁদের আজও খোলেনি (এর জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা) কিন্তু এঁরাই হ'লেন শিল্পজগতের কর্ণধার।

দেশবাসীর ঔদাসীন্য ও রুচিবিকৃতির ফলে গগনেন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর জনকয়েক বন্ধুবান্ধব ও অন্তরংগের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল। এঁরাও একে একে বিদায় নেবেন (ইতিমধ্যে অনেকেই নিয়েছেন) তারপর তাঁর নামটুকু অবশিষ্ট থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ তবু চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের স্মৃতিতে কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ সে ভাগ্যও করেন নি, তাঁর একজনও অনুগামী নেই। অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণাংগ আলোচনা করা দুঃসাধ্য। তাঁর ছবি বেশীর ভাগই বাইরে বেরিয়ে গেছে তাঁর বন্ধুস্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষদের সংগে, দেশে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও সাধারণের নাগালের বাইরে। রবীন্দ্র-ভারতীর চেষ্টায় তাঁর অনেক ছবির পুনরুদ্ধার হয়েছে কিন্তু সেগুলি যে অবস্থায় আছে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কাবোধ করছি। তাঁর ছবির কোন chronology বা সময়ানুক্রমিক তালিকা আজও তৈরী হয়নি এবং এখন আর তা' করা সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করলে মোটামুটি একটা খাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু তারজন্য তাঁর সমস্ত ছবি হাতের কাছে পাওয়া দরকার। সেটা সম্ভব হবে তখনই যখন তাঁর ছবি সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী আর্ট গ্যালারী গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

গগনেন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে সুরু করেন তখন আমাদের দেশে আধুনিক চিত্রকলা কোন খাতে বইছে তা' একটু আলোচনা করা দরকার। অনেকেই জানেন আমাদের দেশে আধুনিক চিত্রকলার পত্তন করেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু সেটা তাঁর পক্ষে একদিনে সম্ভব হয়নি। এ পথে তিনি প্রথম পরীক্ষা সুরু করেন ১৮৯৪-৯৫ সাল নাগাদ এবং ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব চিত্ররীতি উদ্ভাবন করতে তাঁর সময় লেগেছিল অন্ততঃ দশ থেকে পনেরো বছর। অবনীন্দ্রনাথের আগে আমাদের দেশে চিত্রকলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ১৮২০ থেকে ১৮৯৫ মোটামুটি এই ৭৫ বছরকে আমরা ভারতীয় চিত্রকলার অবনতির যুগ ব'লে অভিহিত করতে পারি। তার আগে মোগল আমল থেকে সুরু ক'রে বৃটিশের অভ্যুত্থান পর্যন্ত 'মিনিয়েচার'

(আকারে ছোট) চিত্রকলার যে ধারা আমাদের দেশে চলে এসেছে তাকে মোটামুটি আমরা তিন-ভাগে ভাগ করি, মোগল, রাজস্থানী এবং পাহাড়ী। শেষোক্তটির উদ্ভব প্রথম দু'টির সংমিশ্রণে। এই পাহাড়ী চিত্রকলার আবার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল কাংড়া শৈলীতে কাংড়া শৈলীর স্থায়িত্বকাল মোটামুটি ৪০ বছর, ১৭৮০ থেকে ১৮২০। শিখদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং গুর্খা আক্রমণের ফলে কাংড়া শৈলীর সমাপ্তি ঘটে, যদিও আরও কিছুকাল এর জের চলেছিল।

ইতিমধ্যে দেশের পটভূমি পাল্টেছে। ইংরেজরা দিল্লীর শাহানশাকে নামমাত্র সম্রাট রেখে নিজেরাই দেশের বিভিন্ন অংশ শাসন করছে। দেশীয় রাজন্যবর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা আশ্রয়-চ্যুত হয়ে ইংরেজ রাজপুরুষদের বেতনভোগী হ'ল। সাহেব, মেম, পাইক, বরকন্দাজ, বেয়ারা, হুকাবরদার এঁকে কোন রকমে তারা দিন গুজরান করতে লাগল। দেশী ঢংএর সংগে বিলিতী ঢং মিশিয়ে এই যে ছবি হ'ল এরই নাম পাটনা কলমের ছবি। একখানি মোগল বা কাংড়া ছবির পাশে এক-খানি পাটনা কলমের ছবি ফেললেই বোঝা যাবে কি প্রচণ্ড অধোগতি।

সেই সংগে সংগে সাহেবদের আর্ট স্কুল থেকে আরেক শ্রেণীর শিল্পীর সৃষ্টি হ'তে লাগল যাঁরা মডেল বসিয়ে ড্রইং শিখলেন, অ্যানাটমী, পারস্পেকটিভ্ সম্বন্ধে বিলিতী ছবি দেখে জ্ঞান অর্জন ক'রলেন। এঁরা আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে রাজামহারাজাদের প্রতিকৃতি আঁকতে লাগলেন বিলিতী ঢংএ তেল রংএ। তখন এর চাহিদাও ছিল প্রচুর। এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় হ'লেন রবি বর্মা। কিন্তু এতেও বিপদ ছিল না, বিপদ হ'ল তখনই যখন এঁরা আবার দেবদেবীর ছবি আঁকতে সুরু করলেন জনসাধারণকে খুশী করার জন্য এবং সেই ছবি পানের দোকান থেকে জমিদারের বৈঠকখানা পর্যন্ত অলঙ্কৃত করতে লাগল। এঁদের হাতে পড়ে শিব হ'লেন ভীম, দুর্গা হ'লেন শাড়ীপরা মেমসাহেব। সমাজের ওপর তলার লোকেরা একেই আর্টের পরাকাষ্ঠা বলে গ্রহণ করলেন। আর দেশের নিজস্ব চিত্রকলা কোনরকমে বেঁচে রইল লোকশিল্পকে আশ্রয় করে।

এরই মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রসাধনা সুরু করলেন। হ্যাভেল সাহেব তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন মোগল ও পারসীক চিত্রকলার সংগে। এই সব ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ এবং উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ তাঁকে বিচলিত করলেও তিনি তাঁদের অনুকরণ করলেন না। তিনি যে ছবি আঁকতে সুরু করলেন তার মেজাজ মোগলাই হ'লেও তার টেকনিক এবং দৃষ্টিভংগী আলাদা। তিনি টেম্পারার বদলে ওয়াশ ব্যবহার করলেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর শিষ্যরাও ওয়াশে ছবি আঁকতে সুরু করলেন কিন্তু গুরুর সংগে তাঁদের দৃষ্টিভংগীর মিল ছিল সামান্যই। এঁদের বেশীর ভাগই অজন্তার নবাবিষ্কৃত দেওয়ালচিত্রের দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হ'লেন যে তাঁদের ছবিতেও অজন্তা ধরণের নরনারী আমদানী করতে লাগলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন এ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যরা প্রত্যেকেই ছিলেন ক্ষমতাবান কিন্তু গুরুর প্রতিভা বা কল্পনা-শক্তি দু'একজন ছাড়া আর কেউই পাননি। এঁদের শিষ্যদের বেশীর ভাগই আবার অতি সাধারণ স্তরের শিল্পী। ফলে কিছু দিনের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান আর্টে'র নামে যা' সৃষ্টি হ'তে লাগল তা কতকগুলি দৃশ্য বা ঘটনার একঘেয়ে বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু দেশে তখন তারই চলন। কাজেই অক্ষম অনুকারকদের ভীড়ে হারিয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি। দেশে তখন এমন কোন শিল্পী

ছিলেন না যিনি অন্ততঃ একবার 'মা ও ছেলে', 'প্রোষিতভর্তৃকা', 'বিরহিনী', কিংবা 'রাধাকৃষ্ণ' আঁকেননি। গগনেন্দ্রনাথই এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

এইটাই সবচাইতে বিস্ময়কর। একই বারান্দার দু'প্রান্তে ব'সে দু'ভাই ছবি এঁকেছেন কিন্তু কারও এতটুকু প্রভাব কারও ওপর পড়েনি। বিরোধটা আরও প্রকট হয় যখন ভাবি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গগনেন্দ্রনাথ। এই ইণ্ডিয়ান সোসাইটির উদ্যোগেই সোসাইটির কক্ষে বছরের পর বছর তথাকথিত ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রদর্শনী হয়েছে যার মধ্যে অন্ততঃ আট দশখানা ক'রে থাকত গগনেন্দ্রনাথের ছবি। প্রতি বছরেই অন্যান্য ছবির সংগে তাঁর ছবিও ইণ্ডিয়ান আর্টের নমুনা হিসাবে আলোচিত হ'য়েছে যদিও মিলের চাইতে উভয়ের মধ্যে অমিলটাই ছিল বেশী। আরও অবাক লাগে এই ভেবে, বছরের পর বছর তাঁর ছবি অন্যান্য ছবির সংগে প্রদর্শিত হওয়া সত্বেও তাঁর একজনও অনুগামী জোটেনি।

গগনেন্দ্রনাথ প্রথম কবে ছবি আঁকতে সুরু করেন বলা শক্ত। তবে অবনীন্দ্রনাথের বহু পরে। আমার নিজের ধারণা ১৯০২-৩-এর আগে গগনেন্দ্রনাথ কোন ছবি আঁকেননি। ১৯০২ সাল নাগাদ দু'জন জাপানী শিল্পী টাইকান ও হিশিদা এঁদের অতিথি হ'য়ে ঠাকুরবাড়ীতে আসেন। গগনেন্দ্রনাথ এঁদের কালি তুলির ড্রইং দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে থাকবেন। গগনেন্দ্রনাথের প্রথম ছবি জাপানী ধরণের কতকগুলি কালি তুলির ড্রইং, বিশেষ কতকগুলি কাকের স্টাডী। ছবিগুলি একদিক দিয়ে অসাধারণ। স্মরণ রাখতে হ'বে এর আগে গগনেন্দ্রনাথ কোন ছবি আঁকেননি এবং চিত্রশিক্ষার জন্য কোন আর্ট স্কুলেও যান নি। প্রথম প্রচেষ্টাতেই এতখানি সার্থকতা বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া টেক্‌নিকের দিক দিয়ে কালি তুলির ব্যবহার আমাদের দেশে নতুন। এদিক দিয়ে গগনেন্দ্রনাথকে পথিকৃৎ বলা চলে। আমাদের দেশের মোগল, রাজস্থানী, পাহাড়ী চিত্রকলায় সর্বত্র উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র সাদা কালোর কোন স্থান নেই। কালি তুলির ব্যবহার প্রথম প্রচলন হয় চীন দেশে সুঙ্ (sung) রাজাদের আমলে দ্বাদশ শতকে, সেখান থেকে জাপানে যায় চতুর্দশ শতকে এবং জাপানে এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে। বিশ শতকের সুরুতে টাইকান এই লুপ্ত ধারাটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। কালি তুলির ব্যবহার প্রাচ্যের একান্ত নিজস্ব। শুধুমাত্র 'চাইনীজ ইঙ্কের' সাহায্যে সাদা থেকে কালোর পর্যন্ত রং-এর বিভিন্ন স্তর (tone) ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন একমাত্র ওস্তাদ চীনা ও জাপানী শিল্পী। এ পথে গগনেন্দ্রনাথ নবাগত। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের ছবিগুলির দিকে তাকালেই বুঝতে পারব জাপানী ছবি থেকে এগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষ করে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মূল। জাপানী শিল্পীরা কালি তুলির সাহায্যে প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র রূপকে ধরে দেবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে মেঘ, কুয়াশা পাহাড়, অরণ্যের নিয়ত লুকোচুরি চলছে। মানুষ পশুপাখী এর মধ্যে অবান্তর। যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে তবে তাকে প্রকৃতির মধ্যে অংগীভূত হয়ে যেতে হবে, নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকলে চলবে না। জলার ধারে দীর্ঘ একটা বাঁশ গাছের ডালে ছোট্ট একটা পাখী বসে দুলছে, হঠাৎ দেখলে মনে হ'বে বাঁশ পাতাই। এইখানেই জাপানী শিল্পীর কৃতিত্ব। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই জাপানী শিল্পীর লক্ষ্য। এ প্রকৃতি বিপুল বিশাল জীবজগৎ সম্পর্কে উদাসীন, এর কাছে দাঁড়িয়ে ভয়

বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টি মেলে এর দিকে তাকিয়ে থাকা চলে কিন্তু একে আপন ভাবা যায় না। গগনেন্দ্র-নাথের কালি তুলির ছবিগুলি কিন্তু আমাদের চিরপরিচিত জগৎ। বিশেষতঃ তাঁর প্রথম দিককার ছবিগুলি। এগুলির দিকে তাকালে ভয় বিস্ময়ের বদলে আমাদের মনে আনন্দ কৌতূহলের সঞ্চার হয়। তাঁর কাকের ড্রইংগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় কি তীক্ষ্ণ শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি। এ কাক তিনিও দেখেছেন আমরাও দেখেছি কিন্তু কাকের এমন রূপ ত আমাদের চোখে পড়েনি। উঠোনের মাঝে একটি শূন্য হাঁড়ির পাশে একটি নিঃসংগ কাককে ঘোরাফেরা ক'রতে আমরাও দেখেছি কিন্তু সে দেখা এ দেখার মধ্যে প্রভেদ অনেক। কয়েকটি তুলির টানে একটি মুহূর্তকে যিনি চিরকালের জন্য ধরে দিতে পারেন তিনি সত্যকারের শিল্পী। একটি পাঁচিল বা উঁচু গাছের ডালে তিনটি কাক পাশাপাশি বসে আছে। সকলের দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ। মোগল শিল্পীদের মত তাদের পাখা বা পালক এঁকে শিল্পী অযথা সময় নষ্ট করেন নি, তার কারণ সেটা তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয়। তিনি চেয়েছেন এদের একাগ্রতা ও অভিনিবেশকে কয়েকটি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে এবং সেদিক দিয়ে তিনি সার্থক হয়েছেন। একই চাইনীজ ইঙ্কের বিভিন্ন পর্দায় এদের মাথা গলা ও পেটের রং চিত্রিত করেছেন, তার সংগে পেষ্ট বোর্ডের রংকে এমন ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে অনভিজ্ঞ চোখে সেটা ধরাই পড়বে না।

প্রথমদিকের এই ড্রইংগুলির পরে আমরা পাই কতকগুলি পোর্ট্রেট স্টাডী। ঠাকুর বাড়ীর সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট অনেককেই দেখতে পাওয়া যাবে এইসব প্রতিকৃতি চিত্রে। এগুলিও কালি তুলিতে আঁকা। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পেন্সিল ড্রইং-এ অনেকের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ তাঁর মত ডিটেইলের দিকে লক্ষ্য না রেখে কয়েকটি মোটা তুলির টানে ব্যক্তির স্পিরিট এবং মুডকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। গগনেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট বেশীর ভাগই প্রোফাইল অর্থাৎ কিনা পাশ থেকে আঁকা। এই সংগে পরবর্তীকালে আঁকা তাঁর স্ব-প্রতিকৃতিখানি তুলনীয়। সাদা পটভূমিকায় আঁকা কালো মুখাবয়বখানির কেবলমাত্র আউটলাইন দেখা যায়, চোখ কান, নাক, মুখ সবই অন্ধকারে ঢাকা তবু মানুষটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এ এক অপূর্ব অনুভূতি। দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ কোন পরিচিত ব্যক্তির ছায়া দেখলে যে অনুভূতি জাগে এ অনেকটা সেই অনুভূতি।

১৯১০-১১ সাল নাগাদ গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র জন্য কালি তুলিতে অনেক-গুলি ছবি আঁকেন (মোট ২৪টি)। এগুলি গগনেন্দ্রনাথের এক স্মরণীয় কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের লেখাকে যদি বলা যায় চিত্রময় কাব্য গগনেন্দ্রনাথের রেখাকে বলা যায় কাব্যময় চিত্র। একটি অপরটির পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তখন কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি জল পড়ে পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটা এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সংগে খেলা চলিতে থাকে।" লেখাটি পড়ার পর মনে হয় আমাদের তো একদিন এমনই অনুভূতি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে সেই অনুভূতিকে জাগিয়ে তুললেন; কিন্তু তার সংগে যখন গগনেন্দ্রনাথের ছবি দেখি

বলাবলি করিতেছে।" গগনেন্দ্রনাথ ছবিটিতে তিনটি নারীমূর্তি এঁকেছেন, তাদের মধ্যে দুজন দর্শকের দিকে ফেরানো। একফালি জ্যোৎস্না রেলিঙ ও থামের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঠিক তাদের মাঝখানে এসে পড়েছে; তাতে একজনের মুখ ও হাঁটুর কিয়দংশ ও অপর দুজনের হাঁটুর সামান্য অংশ আলোকিত হ'য়ে উঠেছে, বাকী সব অন্ধকারে ঢাকা। যেটুকু জ্যোৎস্না বারান্দায় এসে পড়েছে কিছুদূর গিয়ে তা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে, শুধু অস্পষ্ট দেখা যায় কয়েকটা থাম এবং বারান্দার অপর দিকের রেলিঙ। ছবিটির দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দাসীদের মৃদুস্বরে কথাবার্তা কানে আসবে কিন্তু মনে হবে না এরা আমাদের পরিচিত সেই শঙ্করী বা প্যারী দাসী, মনে হ'বে এরা অন্য কেউ যাদের অস্তিত্ব একমাত্র এই জ্যোৎস্নালোকেই সম্ভব।

তাঁর পরবর্তী হিমালয় সিরিজ, পুরী সিরিজ এবং রাঁচি সিরিজে এই ওয়াশ পদ্ধতিকে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছেন তার তুলনা বিরল। হিমালয় সিরিজে তুষারমৌলি নাগাধিরাজের যে ধ্যানগম্ভীর রূপ তিনি এঁকেছেন তার উৎস খুঁজতে হ'বে ভারতের মাটিতে। হিমালয় ভারত-বাসীর কাছে কেবলমাত্র তুষারাচ্ছাদিত পর্বতমালাই নয় তারও বেশী কিছু, হিমালয় ভারতবর্ষের আত্মা। সে আত্মা রূপ পেয়েছে শিবের কল্পনায়, যে শিব নিরাবরণ, নিরাভরণ, ভস্মাচ্ছাদিত ধ্যানমগ্ন যোগী*। গগনেন্দ্রনাথ সেই ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির ছবি এঁকেছেন**। একদিকে পাইনগাছের অরণ্য কালির ছোপে মেঘের আকার ধারণ করেছে অন্যদিকে ঢেউএর পরে ঢেউ তুলে তুষারশুভ্র পর্বতমালা আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। আকাশ, মেঘ, পাহাড় ও বরফকে তিনি এমন ভাবে ধুয়ে দিয়েছেন যাতে একটা আরেকটার সংগে মিশে গেছে তবু একটিকে অপরটি থেকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই ধীর স্থির হিমালয়ের কাছে এসে তার নৈঃশব্দ ভংগ করতে আমাদের সাহস হয় না।

কেবলমাত্র হিমালয়ের মহিমময় রূপ ছাড়াও সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক ছবি এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ। এগুলির মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, গগনেন্দ্রনাথ ছবিতে রং দিতে সুরু করেছেন। যেখানে যেখানে রং দিয়েছেন সেখানেই তা আশ্চর্য নিপুণতার সংগে দিয়েছেন; পাহাড়ের খাঁজে ফোটা কয়েকটি নাম-না-জানা ফুল, এক ভুটিয়া দম্পতী কিংবা কোন নিঃসংগ অশ্বারোহী সবাই বিচিত্র বর্ণে সমুজ্জল হ'য়ে আমাদের হাতছানি দেয় সেই জগতে, যে জগৎ প্রত্যক্ষ থেকে বহু দূরে।

হিমালয় সিরিজের (১৯১৪-১৫) পরে বেশ কিছুকাল গগনেন্দ্রনাথ শুধু ব্যঙ্গচিত্রই আঁকেন

* The Aryans fell in love with India and became Hindus. And what was their thought about the Snow-Mountains? Lifted above the world in silence, terrible in their cold and their distance, yet beautiful beyond all words, what are they like? Why, they are like—a great monk, clothed in ashes, lost in meditation, silent and alone! They are like,—like,—the Great God Himself, Siva, Mahadev! —(Sister Nivedita)

** এই প্রসংগে গগনেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে আঁকা হর-পার্বতীর ছবিখানি স্মরণীয়। (এটি এখন শ্রীমতী ঠাকুরের সংগ্রহে আছে)। ছবিটি কালি তুলিতে আঁকা এবং গগনেন্দ্রনাথ তখন আলোছায়ার সংঘাতে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করছেন। ছবিটির পশ্চাতপটে হিমালয়ের তুষার শুভ্র চূড়া দেখা যায় বাকী সব অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারের মাঝে গুটিকয়েক আলোক রেখায় ফুটে উঠেছে শিব-পার্বতীর ছবি। উমার মুখ আনত, প্রায় সবই অবগুণ্ঠনে ঢাকা শুধু কপাল ও কপালের চারধারে এক ফালি আলো অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে। শিব ধীর, স্থির, অবিচল, মুখ উমার দিকে ফেরানো কিন্তু দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। একটুকরো আলো শিবের কপালে চন্দন পঙ্ক লেপন করেছে।

এ সম্বন্ধে আলোচনা* আমরা পরে করছি। ১৯২৩-২৪ নাগাদ তিনি পুরী সিরিজ এবং চৈতন্ত সিরিজের ছবিগুলি আঁকতে সুরু করেন। ছবিগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের সুর শুনতে পাওয়া যায়। হতে পারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু তাঁরা হৃদয়কে শূন্য করে দিয়েছিল, অথবা এও হ'তে পারে তিনি নিজে থেকেই আস্তে আস্তে ভক্তিমার্গের দিকে এগোচ্ছিলেন যার ফলে পুরী সিরিজ ও চৈতন্য সিরিজের ছবিগুলি সর্ব অলঙ্কার বর্জিত হয়ে উঠেছে। পুরী সিরিজের ছবিগুলিতে রং আছে, কিন্তু অতি সামান্য, চৈতন্য সিরিজের ছবিগুলির কয়েকটিতে রং আছে, বেশীর ভাগেতেই নেই। পুরী সিরিজের ছবিগুলিতে পেষ্টবোর্ডের রংটিকে তিনি এমন সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন যে তারপর অতি সামান্য রং-ই তাঁর দেবার প্রয়োজন হয়েছে। একটু লাল বা নীল ছোপ, অল্প কয়েকটি তুলির টান, এতেই পুণ্যার্থীদের ভীড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও দরকার হ'লে এর উপরে একটা পাতলা ফিকে নীল বা ফিকে সবুজের 'ওয়াশ' দিয়ে দিয়েছেন। তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে শিল্পী এঁকেছেন এই ছবিগুলি।

চৈতন্য সিরিজের ছবিগুলি পুরী সিরিজ থেকে একটু স্বতন্ত্র। ছবিগুলির মধ্যে শুধু যে অন্তর আকুল করা বৈরাগ্যের সুরই বাজছে তা নয় ছবিগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে পল্লী বাংলার নিজস্ব রূপ। চৈতন্যের জন্ম একমাত্র এই বাংলাদেশের মাটিতেই সম্ভব ছিল, তার কারণ এতখানি সরলতা কোমলতা ও ভাবোচ্ছ্বাসের সমন্বয় অন্য দেশের মাটিতে সম্ভব হ'ত না। বাঙালীর হৃদয়ের যত দোষগুণ সবই চৈতন্যে বর্তেছে। গগনেন্দ্রনাথ চৈতন্য সিরিজের ছবিগুলি আঁকতে গিয়ে তাই বাংলার মাটি ও মানুষের ছবি এঁকেছেন। গঙ্গার ধারে গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছেন চৈতন্য, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর কপালে চন্দন লেপে দিচ্ছেন। পিছনে গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দু'টো নৌকা, একটি পাল তুলে এগিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে যেখানে আকাশ ও গঙ্গা মিশেছে, আরেকটিতে মাঝি দাঁড় টানছে, সেটি পারে এসে ভিড়বে। গঙ্গার ধারে দুটি নারিকেল গাছ একটু হেলে উপরের দিকে উঠে গেছে, আরেকটি আম গাছের ডাল নীচু হয়ে ঝুঁকে প'ড়েছে চৈতন্যের মাথার উপর। এর কোন দৃশ্যই আমাদের অচেনা নয়। আরেকটি ছবি, যেখানে চৈতন্য মা ও স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছেন গভীর রাত্রে, তাঁরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলেন ঘর শূন্য। বিধবা মা 'নিমাই' 'নিমাই' ব'লে ডেকে ডেকে শ্রান্ত হ'য়ে বসে পড়েছেন কুটিরের দাওয়ায়, বধূটি উঠানের খোলা দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে অর্গলটি চেপে ধ'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে পথের দিকে, উভয়েরই আশা হয়তো নিমাই ফিরতেও পারে। রাত নিঃঝুম, পৃথিবী নিঃস্তব্ধ, শুধু দুটি প্রাণী প্রহর গুণছে অসীম বেদনা বুকে বয়ে, গগনেন্দ্রনাথ সেই বেদনার রূপ আঁকলেন কালোর সংগে একটু হলদে আর একটু লাল মিশিয়ে। আরেকটি দৃশ্য যেখানে চৈতন্যের সংগে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হচ্ছে—চৈতন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন, গায়ে একটি নীল উত্তরীয়, ঈশ্বরপুরী দ্রুত এগিয়ে আসছেন চৈতন্যকে তুলে ধরার জন্য। দুজন আশ্রমবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন চৈতন্যের এই অবস্থা দেখে। পিছনে কুটিরের সারি, দূরে কয়েক সারি আম গাছ, তার ওধারে লোকালয়, দেবমন্দির সব যেন কুয়াশায় ঢাকা। সবে ভোর হচ্ছে, তখনও লোকজন জাগেনি, একঝাঁক পাখী বাসা ছেড়ে আকাশে উঠেছে। পূর্ব আকাশ গৈরিক হ'য়ে উঠেছে। সে গৈরিকের ছাপ মাটি-মানুষ সবার গায়ে লেগেছে। সারা ছবিটিকে গেরুয়া রংএ ছুপিয়ে দিয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ।

অন্য একটি দৃশ্য যেখানে চৈতন্য কেশব-ভারতীর দ্বারে আঘাত করে সেই দরজার গায়েই ঢলে পড়েছেন, কেশবভারতী করাঘাতের আওয়াজ পেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছেন কুটির ছেড়ে, গগনেন্দ্রনাথ শুধু সাদা ও কালোয় শীতের সকালের যে চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা নেই। কালির কালো এখানে চলে গেছে জলে ধুয়ে ধুয়ে, শুধু একটু আধটু ছোপ লেগে আছে এখানে ওখানে, তাতেই ছবিটি ফুটে উঠেছে। চৈতন্য সিরিজের বেশীর ভাগ ছবিই এই রকম 'ওয়াশে' আঁকা। তার মধ্যে দু' একটি ভাবালুতার পর্যায়ে পৌছুলেও বেশীর ভাগই অনবদ্য সৃষ্টি। এর মধ্যে দু'টি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে, একটি গয়ায় বিষ্ণু পাদ-পদ্ম-স্পর্শে মূর্ছিত চৈতন্য, আরেকটি পুরীর বেলাভূমিতে উপবিষ্ট চৈতন্য। প্রথমটিতে চৈতন্যকে দেখলে মনে হয় যেন আনন্দ সাগরে ডুব দিয়েছেন, তাঁর সংগী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। দ্বিতীয়টিতে চৈতন্য বসে আছেন পুরীর সমুদ্র তীরে, বাতাসে তাঁর উত্তরীয় উড়ছে, চৈতন্য ভাবাবিষ্টের মতো চেয়ে আছেন তরংগায়িত সমুদ্রের দিকে, সেখান থেকে ডাক এসেছে তাঁর। শিল্পী সামান্য একটু তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুললেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য এক ভক্তের রূপ আর আঁকাবাঁকা একটি রেখায় সমুদ্রের ঢেউএর ইংগিত দিলেন, এ-ছাড়া সারা ছবিতে হাল্কা সাদা 'ওয়াশ' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমাদের কানেও সমুদ্রের আহ্বান পৌছায়।

১৯২৫ সালে গগনেন্দ্রনাথ রাঁচী সিরিজের ছবিগুলি আঁকেন। এগুলি প্রকৃতিতে পূর্ববর্তী চৈতন্য সিরিজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গগনেন্দ্রনাথ এখানে রং ব্যবহার করেছেন, বেশ উজ্জ্বল রং। রাঁচীর মাটি, মানুষ, অরণ্য, পাহাড় সবাইকে ধরে রেখেছেন তিনি এই সব ছবিতে। এগুলির সংগে তাঁর আগেকার হিমালয় অঞ্চলের রঙীন দৃশ্যচিত্রগুলির অনেকটা মিল আছে।

কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায় সুরু হয় এক বিশেষ ধরণের চিত্র সৃষ্টির সংগে যেগুলি সাধারণ মহলে 'কিউবিক আর্ট' নামে পরিচিত। গগনেন্দ্রনাথের ছবি বলতে সাধারণ লোকে তাঁর এ জাতীয় ছবিই বোঝে। কবে থেকে তিনি এই তথাকথিত 'কিউবিক আর্ট' আঁকতে সুরু করেন বলা শক্ত*। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯২৩-২৪ সালে তিনি এই ধরণের ছবি আঁকতে সুরু করেছেন (আলাদ্দীন, একটি সংগীতের জন্ম)। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই সময়েই বা তার কিছু আগে তিনি চৈতন্য সিরিজের ছবিগুলি সমাপ্ত করেছেন। একই সময় বা কিছু সময় আগে-পরে শিল্প-প্রতিভাকে এ-রকম দুই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'তে বড় একটা দেখা যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার পাশ্চাত্যের কিউবিক চিত্রকলার সংগে গগনেন্দ্রনাথের তথাকথিত কিউবিক চিত্রকলার পার্থক্য দুস্তর, নীরদ চৌধুরী ম'শায় ঠিকই বলেছেন** এ দু'টি জিনিষ একেবারে

---

* শ্রীমোহনলাল গংগোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা' গ্রন্থে বলেছেন ভবানীপুরে স্বদেশী Exhibition-এ আগুন লেগে গেলে সেখান থেকে দু'টি কাঁচের টুকরো কুড়িয়ে এনেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ। কাঁচের টুকরো দুটির ভিতর ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে তার থেকে নানা বর্ণের সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই দেখতে দেখতে গগনেন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন একটা যন্ত্র কিনে আনলেন। যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা 'মাইক্রোস্কোপে'র মত (আসলে তার ভেতরে 'প্রিজম্' দেওয়া ছিল) এবং সেটির ভিতর দিয়ে কাঁচের টুকরো বা পাথর টুকরোকে দেখলে বর্ণালীর সৃষ্টি হত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে রং-এর ওলোট পালোট হত। এই দেখতে দেখতে গগনেন্দ্রনাথের মনে 'কিউবিক' ছবি আঁকার প্রেরণা জাগে।

** নীরদচন্দ্র চৌধুরী—(১) Art of Gaganendra Nath Tagore, Mod. Review, March 1938.
(২) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী—বিশ্বভারতী পত্রিকা—২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বিপরীতধর্মী। কিউবিষ্টদের মতে সংসারে যতকিছু দৃশ্যমান বস্তু আছে সবের মধ্যেই কিউব প্রচ্ছন্ন আছে। এই আভ্যন্তরীণ abstract রূপকে তাঁরা বিভিন্ন কিউবের সমবায়ে প্রকাশ করবেন, ফলে বস্তুর বাহির ভিতর সব একসংগে দ্রষ্টার চোখের সামনে হাজির হবে। এঁরা পুরোমাত্রায় 'কর্ম'বাদী অর্থাৎ কিনা এঁরা বস্তুর বাহ্যিক রূপ নিয়ে মাথা ঘামান না, এঁদের কাছে সব বস্তুরই কাঠামো মূলতঃ জ্যামিতিক এবং শিল্পীর কাজ হ'ল সেই জ্যামিতিক রূপ উদ্ঘাটন করা। ছবি যিনি দেখবেন তিনি এই জ্যামিতিক রূপ থেকে আনন্দ উপভোগ করবেন, তার সংগে মানস অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। এ আনন্দ অনেকটা ইঁটের পাঁজা দেখার আনন্দ। শিল্প জগতে এত বড় গোঁড়ামি এর আগে কখনও প্রশ্রয় পায় নি। প্রথমতঃ বস্তুমাত্রই কিউবের সমবায়ে গঠিত (আসলে চতুষ্কোণ), সেখানে বৃত্ত-বৃত্তাংশের কোন স্থান নেই এ রকম ধারণা একমাত্র পাগলের মাথাতেই আসা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ছবিতে বস্তুরূপের সাদৃশ্য এসে পড়লে ছবির জাত গেল এ রকম ছুঁতমার্গ অসুস্থ চিন্তার লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, ছবি দেখার আনন্দের সংগে মানস অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই—এ রকম দাবীর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি, তিনি যেমন চতুষ্কোণ ব্যবহার করেছেন তেমনি প্রয়োজনবোধে বৃত্ত, বৃত্তাংশ ত্রিভুজ সব কিছুই ব্যবহার করেছেন। নিছক 'ফর্ম' সৃষ্টির আগ্রহে তিনি কোন ছবি আঁকেননি, তাঁর ছবির প্রধান উদ্দেশ্য দর্শকের মানস অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা*। ছবিকে তিনি ধাঁধায় রূপান্তরিত করতে চান নি, তিনি চেয়েছেন তাঁর ছবি যেন দর্শকের মনে হর্ষ বিস্ময় প্রভৃতি রসের সৃষ্টি করে। এর জন্যে আলো ও ছায়ার (অথবা রঙীন ছবির বেলায় বিভিন্ন রংএর) পাশাপাশি অবস্থানকে অদ্ভুত ভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।** একফালি আলো কোন এক ছিদ্রপথে এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে একবার সিঁড়ির গায়ে আর একবার দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শেষে অন্ধকারে হারিয়ে গেল, কিন্তু যাবার পথে যে আলোছায়ার খেলা সৃষ্টি করে গেল তা' দর্শকের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে। ধরা যাক 'উদয় সাগর তীরে পদ্মিনী' ছবিখানি। সুউচ্চ এক তোরণের সামনুদেশে কয়েক ধাপ সোপান—তার উপর এসে দাঁড়িয়েছেন পদ্মিনী। অন্ধকার থেকে হঠাৎ যেন আলোর রাজ্যে এসে পড়েছেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ

---

* এই তথ্যটি বুঝতে পারেননি বলেই জনৈক পণ্ডিত সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "Apart from their very evident lack of power—a power which in some mysterious way was present in the work of Braque and Picasso—Gagonendranath's pictures were actually no more than stylised illustrations....There is no attempt to break the shapes down into their fundamental structure or to link them into a single coherrent rythm. (W. G. Archer—India and Modern Art 1959).

এর উত্তর অনেকদিন আগেই O. C. Gangoly দিয়েছিলেন একটি ইংরেজী প্রবন্ধে—

Mr. Tagore never yielded to this temptation of breaking up Forms, but stuck to an original method of synthetic cubism in which the diverse facts of a subject were skilfully woven in intriguing and dynamic patterns. (Modern Review March, 1938).

** আলোছায়া সম্পর্কে শিল্পীর সচেতনতা আমরা আগেই জীবনস্মৃতি পর্যায়ের দু'একটি ছবিতে লক্ষ্য করেছি। এই প্রসংগে আরেকটি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটিও এই সময়ের আঁকা। ছবিটির নাম—'মন্দির দ্বারে'।

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উদয়সাগরের দিকে। আলোর বন্যায় ভেসে গেছে উদয়সাগরের তীর, সে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে পদ্মিনীর বসন, শুধু জেগে আছে তাঁর চুলগুলি। আলোর ঢেউ এসে লেগেছে সোপানের গায়েও, কিন্তু কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়েই তা আবার হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। ছবিটি দেখলেই মনে হয় পদ্মিনীর মত আমরাও হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে এসে পড়লাম, চোখে মুখে যেন সেই আলোর স্পর্শ অনুভব করা যায়।

কিংবা ধরা যাক আলাদ্দীনের ছবিখানি। আলাদ্দীন বসে আছে তার যাদু প্রদীপটি হাতে নিয়ে একটি উঁচু আসনের উপর ছবির প্রায় কেন্দ্রস্থলে। তার চারধারে একটি আলোক বৃত্ত—তার মধ্যে কত সিঁড়ি, কত সুড়ঙ্গ, কত অস্পষ্ট আলোছায়ার জগত। বৃত্তের নীচের অংশে আলোছায়ার কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে এক সিঁড়ি, সে সিঁড়ির কোথায় শেষ তার কোন হদিস নেই। এই বিচিত্র পরিবেশে এত কাছে থেকেও আলাদ্দীনকে মনে হচ্ছে যেন কত দূরে, সে এক রহস্যজগতের অধিবাসী, সেখানে যা' কিছু ঘটছে সবই যেন রহস্যময়। রূপকথার জগতকে এইভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন গগনেন্দ্রনাথ।

পরে সাদা আলোর জগত ছেড়ে যখন রংএর জগতে অবতরণ করলেন শিল্পী তখন এই রূপকথার জগতটাই আরো বিচিত্র বর্ণে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। ঐ যে ছোট্ট নৌকাখানি পরীর দেশে যাবে ব'লে এসে দাঁড়িয়েছে রামধেনু রঙা এক সেতুর নীচে, ওখানে যাবার বাসনা তো একদিন আমাদেরও ছিল। ঐ বিচিত্র স্বপ্নময় আলোকোজ্জ্বল সেতুর ওধারে কি আছে তা' আমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। কিংবা ঐ যে সাত ভাই চম্পা ও এক বোন পারুল আলো আঁধারের বেড়াজালে আটকা প'ড়ে চোখ মেলতে পারেনি ওদেরও ত আমরা চিনি। অথবা ঐ যে রাজকন্যা সোপান বেয়ে নেমে আসছে থিয়েটারের মঞ্চের মত একটি কক্ষে* (যার এ-কোণ ও-কোণ থেকে খুঁজে বার করা যায় একটি কাকাতুয়া, কয়েকটি হাঁসের ছানা ও একটি কালো বেড়াল) তাকেও তো এই অদ্ভুত পরিবেশে আমরা একদিন দেখেছি, আজ বহুদিন পরে দেখে আবার চিনতে পারলাম। শিশুর কাছে রূপকথার জগত বাস্তবের মতই প্রত্যক্ষ, বড় হওয়ার সংগে সংগে তা হারিয়ে ফেলে। গগনেন্দ্রনাথ সেই রূপকথার জগত যাদুদণ্ডের স্পর্শে আবার আমাদের চোখের সামনে হাজির করলেন।

গগনেন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে সোনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে ছবিতে রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা আবার ছবির আলঙ্কারিক গুণ বৃদ্ধি করেছে। এগুলির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে জাপানী সোনার পর্দা-চিত্রগুলির। সবশেষে ব্যঙ্গ-চিত্র-শিল্পী হিসাবে গগনেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের উল্লেখ না করলে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি যখন ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতে সুরু করেন (১৯১৫-১৬) তখন এদেশের ব্যঙ্গ-চিত্রের শৈশব অবস্থা এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা' শিল্প নামের যোগ্য নয়। গগনেন্দ্রনাথই প্রথম তাকে শিল্পের পর্যায়ে

---

* গগনেন্দ্রনাথের শেষের দিকের অনেক ছবিতে থিয়েটারের মঞ্চ সজ্জার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা কিছুই বিচিত্র নয় তার কারণ গগনেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন একজন ভাল অভিনেতা, ঠাকুর বাড়ীর প্রায় সব অভিনয়েই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। বিচিত্রা ভবনে 'ফাল্গুনী' নাটকে রাজার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে অ্যানি বেসাণ্ট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। মঞ্চ-সজ্জার ভার বেশীভাগ ক্ষেত্রেই থাকতো তাঁর উপর এবং এ বিষয়ে তিনি যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও স্মরণীয়।

উন্নীত করলেন। তাঁর ব্যঙ্গ-চিত্রকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(১) সামাজিক (২) রাজনৈতিক (৩) ব্যক্তি বিষয়ক। প্রথম ছুটিতে সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ববিধ অন্যায়কে নির্মম ভাবে কশাঘাত করেছেন, তৃতীয়টিতে তখনকার দিনে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কার্টুন এঁকে বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে পীড়া দিত, তাই শাসকশ্রেণী যখন বিল উপস্থাপিত করলেন মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য—তিনি আঁকলেন অনশনক্লিষ্ট ছু'টি গরু হাঁফাতে হাঁফাতে টেনে নিয়ে চলেছে স্ফীতকায় John Bull-কে, অদূরে ভারতমাতা শায়িতা, সন্তানদের দুঃখ দেখার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক অন্যায় ও অসংগতিও তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি। তখনকার দিনে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সাহেবীয়ানার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি আঁকলেন 'Garden party at an Indian house'. সে ভোজসভায় কে যে ভারতীয় আর কে যে সাহেব চেনবার উপায় নেই ; সবাই কোট, প্যান্ট, হ্যাট পরা, শুধু বাবুর্চি বেয়ারা ছাড়া। গগনেন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করে ছবির গায়ে লিখে দিলেন—

"Garen party at an Indian House. Find the Indian.
A puzzle for younger generation."

কিংবা 'নবহুল্লোড়ের' সেই ছবিটি যেখানে বাধ্য পুত্রকে মা মাথায় হাত দিয়ে বোঝাচ্ছেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য। ছেলে ডান হাতটি গালে দিয়ে ভাবছে, হাতের কনুইটি একখানি 'রোমিও জুলিয়েটে'র উপর ন্যস্ত, বাঁ হাতে একটি টোপর ধরা। ছেলের মা একহাত ছেলের মাথায় বুলোচ্ছেন আরেক হাতে চুলের কাঁটায় বিদ্ধ করে একটি হাঁড়ির ভিতর থেকে টেনে তুলছেন দ্বিতীয় পক্ষের ভাবী বধূকে যার বাঁ হাতে ধরা দ্বিতীয়ভাগ ও ডান হাতে টাকার পুঁটুলী। অদূরে দেখা যাচ্ছে ছেলের বাবা সদ্য মৃতা প্রথম পক্ষের বধূর মুখের উপর চাদর টেনে দিচ্ছেন, চাদরের গায়ে একটি প্রজাপতি পিন দিয়ে গাঁথা। সামাজিক কু-প্রথাকে এমন নির্মম ভাবে কশাঘাত আর কেউ করেননি। এ রকম বহু ছবি এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ ; তার মধ্যে কতকগুলি 'অদ্ভুত লোক' ও 'বিরূপ বজ্র' নামে ছু'টি বইএর আকারে লিথো পদ্ধতিতে ছাপা হয়ে ঠাকুরবাড়ী থেকে বের হয়। পরে 'নবহুল্লোড়' বলে আরেকটি বই-এ আরও কতকগুলি ছাপা হয়। এগুলি এখন পুনর্মুদ্রিত হ'লে গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-চিত্রের সাথে অনেকের পরিচয় ঘটে।

তখনকার দিনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে যে সব ব্যঙ্গ-চিত্র এঁকেছিলেন তার মধ্যে জগদীশ-চন্দ্রকে লক্ষ্য করে 'অপূর্ব সাড়া' নামে ছবিটি উল্লেখযোগ্য। গগনেন্দ্রনাথের অনেক ব্যঙ্গ-চিত্রের মত এটিও রঙীন, পুরোপুরি finished ছবি। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে, ছবিটি ১৩২৮ সালের 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এবং পরে আবার বিশ্বভারতী পত্রিকায় পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রবাসীতে প্রকাশের সময়ে চিত্র পরিচিতিতে এই কথাগুলি লেখা হয়—

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জড় উদ্ভিত চেতন সকল পদার্থকেই সাড়া দেওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু পদার্থ সাড়া দেয় আচার্য্যের সোনার কাঠির ছোঁয়া পাইলেই—। আপনা হইতেই নয়। শিল্পী কিন্তু কল্পনায় দেখিয়াছেন দেশে এমন সাড়া পড়িয়া গেছে যাহাতে আচার্য্যের আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই দেশের সকল বস্তুই সাড়া দিতে সুরু করিয়াছে। বাঁশগাছ হাঁকিতেছে—Strike. Strike ;

লজ্জাবতী চেঁচাইতেছে—Shame, Shame; বনচাঁড়াল বলিতেছে—Agitate, Agitate; চাঁদ চেঁচাইতেছে—চাঁদা, চাঁদা; এবং সরস্বতী লক্ষ্মীর শূন্য আসনে পদ্মবনে ব্যাঙ সাহেব গলা ফুলাইয়া হাঁকিতেছে—বন্দেমাতরম্।·········ফরিদপুরের পূজারী খেঁজুর গাছ প্রণাম করিতে করিতেও চোখ মেলিয়া কাণ্ড কারখানা দেখিতেছে এবং হিমালয় বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। ওদিকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া আচার্য্য জগদীশের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। বজ্র আচার্য্য জগদীশের অবলম্বিত সাধনার প্রতীক।"

জীবনের শেষ ক'বছর আংশিক পক্ষাঘাতে অক্ষম হ'য়ে পড়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। কিন্তু যতদিন তাঁর হাতের তুলি সচল ছিল ততদিন তিনি তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেননি। জীবনে কোনদিন প্রথাগত পথে তিনি চলেননি, নিজের পথ নিজে তৈরী করে নিয়েছেন। ছবি আঁকাটা তাঁর ছিল নেশা, পেশা নয়, এজন্য তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। আপন খেয়ালে শিল্পী ছবি আঁকতেন, সমালোচকদের বাহবা পাবার লোভে তিনি তুলি ধরেননি। আত্মপ্রচারে ছিল তাঁর একান্ত অনীহা, তার মাশুল যে কিভাবে তাঁকে দিতে হয়েছে তা আমরা দেখেছি। আধুনিক কালে যখন 'আধুনিক শিল্পী' কথাটা স্ববিরোধী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন গগনেন্দ্রনাথের ছবি দেখলে মনে হয় আধুনিক হয়েও শিল্পী হওয়া যায়। তাঁর কাছ থেকে এখনকার 'আধুনিক শিল্পীদের' শেখার কি কিছুই নেই?

বাংলার লোক-নৃত্য : পুরুষ ও নারী

আশুতোষ ভট্টাচার্য

একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে নৃত্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর স্থানই অধিক, কিন্তু সকল সময় সকল জাতির পক্ষেই একথা সত্য নহে। হিন্দুর উচ্চতর সংস্কারেও নৃত্যের অধিষ্ঠাতা যিনি দেবতা, তিনি নারী নহেন, তিনি পুরুষ, তিনি নটরাজ শিব, তিনিই দক্ষিণ ভারতের সংস্কারে রঙ্গনাথম্। তাণ্ডব নৃত্যের স্থান লাস্য নৃত্যের নিম্নে নহে। কোন কোন আদিবাসী সমাজের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তবে প্রধানতঃ দেখা যায়, মৃগয়াজীবী, যুদ্ধবিগ্রহশীল যাযাবর জাতির মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে নৃত্যে নারীরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। আসামের এবং হিমালয় অঞ্চলের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ বা কিরাত জাতি সমূহের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। নাগা, মিশমি, আরব ইত্যাদি জাতির যুদ্ধ নৃত্য ইহাদের প্রত্যেকের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নাগা জাতিরই অন্যতম যে শাখা মণিপুরী নাম গ্রহণ করিয়া দেশের সমতল অঞ্চলে বসবাস করিয়া কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে নারী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিলেও তাহাকে সক্রিয় অংশ বলা যায় না, কিন্তু মণিপুরী জাতির মধ্যে নারীর স্থান এই ক্ষেত্রে যে কেবলমাত্র প্রধান তাহাই নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহারাই এই বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মধ্যভারত ও উড়িষ্যার নৃত্যগীতকুশল গদবা, মুরিয়া ও মারিয়া নামক আদিবাসীর মধ্যেও নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, ইহারও কারণ ইহারা সমতল ভূমির অধিবাসী এবং কৃষিজীবী। কিন্তু মধ্য ভারতেরই পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল আদিবাসী বাস করিয়া থাকে, তাহারা ভৌগোলিক দিক দিয়া একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্য হেতু তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও পার্থক্য সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কোরাপুট জিলার মুচুকুন্দ উপত্যকার সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী অর্ধনগ্ন বোণ্ডা জাতির মধ্যে নারী নৃত্যে প্রায় কোন অংশই গ্রহণ করে না, একমাত্র পুরুষের অংশই সেখানে সক্রিয়। কিন্তু সেই পর্বতেরই পাদমূলে অবস্থিত গ্রামগুলিতে গদবা নামক যে জাতি বাস করে, তাহাদের নারী নৃত্য-কুশলতার জন্য ভারত-বিখ্যাত। কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্যই ইহাদের সংস্কৃতি বিষয়ে এই পার্থক্যের কারণ। বোণ্ডা জাতি প্রায় চারিহাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে বাস করিয়া প্রাত্যহিক জীবনে সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু সমতল ভূমির অধিবাসী গদবা জাতি কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকিবার ফলে জীবন-সংগ্রাম অনেক পরিমাণে সহজ করিয়া লইয়াছে। সে জন্যই সেখানে নারীর জীবনে

স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা যেমন আছে, অবকাশ এবং অবসরও সেই পরিমাণেই রহিয়াছে। বোণ্ডা জাতির নারী-সমাজের তাহা নাই। সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক কর্মে যেখানে পুরুষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে সেখানে নৃত্যেও পুরুষেরই অধিকার এবং যেখানে নারী সেই প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সেখানে সেই কার্যেও নারীরই অধিকার। সুতরাং নারীর আকৃতি এবং প্রকৃতি যে নৃত্যের পক্ষে কোথাও অপরিহার্য মনে করা হইয়া থাকে তাহা নহে। নৃত্য জাতির একটি সংস্কার, জীবনাচরণের সঙ্গে এই সংস্কারের সম্পর্ক। এমন কি, এই সংস্কার যে সর্বদাই রস-সংস্কার, তাহাও নহে, অনেক সময় ইহা ধর্মীয় সংস্কার, ইহার সঙ্গে আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক আছে, সুতরাং ইহা সমাজের কেবলমাত্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নহে।

বাংলা দেশের সমাজ কৃষি-ভিত্তিক, সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে নৃত্যে নারীই প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষে ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে নৃত্যের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার মধ্যে পুরুষেরও যে একটি প্রধান অংশ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে নহে, প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মনসা-মঙ্গলে বেহুলার নৃত্যগুণের কথা ব্যাপকভাবে উল্লেখিত থাকিলেও শিবনৃত্যের বর্ণনাও রহিয়াছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মধ্যে যেমন ডোম্‌নীর নৃত্য করিবার উল্লেখ আছে, যথা—

একসো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

অর্থাৎ এক সেই পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাঁপড়ি, তাহাতে আরোহণ করিয়া ডোম্বী বা ডোম্‌নী নৃত্য করে, আবার তেমনি বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদের নৃত্য করিবার উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বি সমা হোই॥

অর্থাৎ বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদ নৃত্যে করেন, দেবী গীত গাহেন, বুদ্ধ নাটক সমাপ্ত হইল।

নাথ সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়, গোরক্ষনাথ মীননাথকে উদ্ধার করিতে আনিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, পুরুষ বেশে নৃত্য করেন নাই।

নাচন্তি যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে॥

মঙ্গলকাব্যে যে স্বর্গভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকা চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একজন স্বর্গের নর্তক একজন নর্তকী; সুতরাং পুরুষ ও নারী এখানে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে যে সকল প্রাচীন পদ্ধতির শিবনৃত্যের বর্ণনা আছে, তাহাও শিবের একক নৃত্যের বর্ণনা নহে, বরং সর্বত্রই যুগ্ম নৃত্যের বর্ণনা,

অর্থাৎ শিব-পার্বতী, শিব-মনসা ইঁহাদের যুগ্ম নৃত্য, তথাপি ইহাদের মধ্যে শিবের অংশই যে প্রধান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যপ্রসঙ্গ বাদ দিলে লোক-সমাজে যে নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে নারীরই যে প্রাধান্য ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ব্রতনৃত্যের (ritual dance) মধ্যে নারীরই প্রধান স্থান। ব্রতনৃত্যের মধ্যে কেবলমাত্র গাজনের নৃত্যে পুরুষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক (magic) নৃত্যের মধ্যে পুরুষেরই স্থান, কিন্তু ইহাদের প্রয়োগ বর্তমানে এত হ্রাস পাইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যে সকল নৃত্য যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেমন বীরভূম জেলার ঢালী, রায়বেঁশে কিংবা পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের পাইক নৃত্য ইহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য। একথা নিতান্তই স্বাভাবিক যুদ্ধনৃত্য মাত্রই পুরুষেরই নৃত্য, কোন ভাবেই ইহাদের মধ্যে নারী অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আসামের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির মধ্যে সামাজিক জীবনের অন্যান্য আচরণে নারী প্রাধান্য লাভ করিলেও যুদ্ধনৃত্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। এমনকি নরমুণ্ডশিকারী (head-hunter) নাগা জাতির মধ্যে নারী জাতিও নরমুণ্ডশিকারে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধনৃত্যে কোনদিক দিয়াই অংশ গ্রহণ করে না। পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় সাহিত্য ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর নারীই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কিত নৃত্য বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে পশ্চিম বাংলার একটি নৃত্যের মধ্যে নারী কোনদিন যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত বলিয়া ক্ষীণতম একটু আভাস পাওয়া যায়। কারণ, একথা সত্য, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে সম্ভবতঃ রাঢ় অঞ্চলের নারীর একদিন যুদ্ধনৃত্যেও অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ভাঁজো নৃত্য তাহার একটি নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনেক নৃত্য এবং ক্রীড়া (game) যে প্রাচীনতর সমাজ-জীবন হইতে আগত যুদ্ধকার্যের অবশেষ (remnant) তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। ভাঁজো নৃত্যের মধ্যেও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে একদল যুবক ও একদল যুবতী সারিবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, তারপর এক-একটি দল এক-একবার করিয়া সম্মুখের দিকে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অন্য দলকে 'আক্রমণ' করে। আক্রান্ত দল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে, এবং পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া 'আক্রমণকারী' দলকে 'আক্রমণ' করে। ভাঁজোর বালি আনয়ন উপলক্ষে বালির স্তূপ অধিকার লইয়া এই কপট যুদ্ধ (mock-fight) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কপট যুদ্ধই অনেক সময় নৃত্যের রূপ লাভ করিয়া থাকে, এখানেও তাহাই হইয়া থাকে। এই নৃত্য যদি কোন গোষ্ঠী-সংগ্রাম (community fight)-এরই অবশেষ হইয়া থাকে, তবে একথাও মনে করিতে হইবে যে প্রাচীনকালে অন্ততঃ রাঢ় অঞ্চলে নারীও যুদ্ধনৃত্যে যোগদান করিত। পূর্ব বাংলার কৃষিসঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদিন নারী স্বহস্তে ধনুর্বাণ লইয়া সেই অঞ্চলে শস্যনাশকারী হস্তী ও ব্যাঘ্র শীকারে যোগদান করিত। সুতরাং কৃষিজীবী সমাজে নারী যুদ্ধকার্যে যোগদান করিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। কারণ, কৃষিজীবী সমাজে গৃহের কর্ত্রী নারী, বিশেষতঃ সেই

সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) হইয়া থাকে, সুতরাং পরিবার ও গৃহসম্পত্তি রক্ষা করিবার সকল দায়িত্বই নারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সেই গৃহসম্পত্তির উপর বাহির হইতে যখন কোন আক্রমণ হয়, তখন সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নারীকেই প্রথম অগ্রসর হইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং যাযাবর সমাজে নারী যেমন পুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হয়, কৃষিজীবী সমাজে নারীরই নারীকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য যুদ্ধকার্যও তাহার সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং যদিও আজ প্রত্যক্ষভাবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে বাংলার সমাজেও নারী একদিন যুদ্ধনৃত্যে যোগদান করিত, তথাপি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে যে ইহা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

বর্তমানে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় পশ্চিম বাংলার ঢালী, রায়বেঁশে, পাইক প্রভৃতি যুদ্ধনৃত্য ব্যতীত পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের জারী নৃত্যে কেবল পুরুষই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে নারীর কোন স্থান নাই। কিন্তু পূর্ব ময়মনসিংহের জারীনৃত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা মূলতঃ নারীরই নৃত্য ছিল, কালক্রমে সেই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর মুসলমান সমাজে নারীর প্রকাশ্য নৃত্যের অধিকার হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুরুষ কর্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। কারণ জারী-নৃত্যকালীন পুরুষ অনেকটা নারীর মত অভিনয় করিয়া থাকে। যেমন পায়ে নূপুর পরে, কাঁধের গামছাটি হাতে লইয়া আঁচলের মত করিয়া দুলাইতে থাকে। ইহার কাহিনী কারবালার যুদ্ধের কাহিনী; কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী হইলেও ইহা করুণরস প্রধান এবং এই করুণরস স্ত্রীচরিত্রসুলভ। সুতরাং সকল দিক হইতেই মনে হইতে পারে যে এখানে পুরুষ সামাজিক জীবনের আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর একটি আচরণ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার লোক-নৃত্যের ইতিহাসে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তুর্কী আক্রমণের পর হইতেই বাংলার বৃহত্তর সামাজিক জীবনে যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহা অনুসরণ করিয়াই বাংলার লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল। নারীর অধিকার ইহার মধ্যে একদিক দিয়া সঙ্কুচিত হইল, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ তো নারীর অনুকরণ করিতে লাগিল আবার অন্যদিক দিয়ে কোন কোন অঞ্চলে ইহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। নৃত্য ও সঙ্গীত মুসলমান ধর্ম বিরোধী আচরণ, বিশেষতঃ তুর্কী আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের অসহায় অবস্থার মধ্যে নানা কারণেই নারীর নৃত্য আর অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কোন কোন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থে দেখা যায় নৃত্য এক শ্রেণীর নারীর ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী নর্তকী বলিয়া একটি সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, নূতন সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিল, সমগ্র সমাজের সহানুভূতিহীন দৃষ্টির মধ্যেও যতটুকু বাঁচিয়া রহিল, তাহার মধ্য দিয়ে তাহা কোন প্রকার শিল্পসম্মত উচ্চতর সাধনারূপ লাভ করিতে পারিল না, ক্রমে ক্রমে তাহা বিনাশের পথই প্রশস্ত করিয়া লইল।

যে সকল অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের প্রভাব কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব তেমন সক্রিয় হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলে বাংলার লোক-নৃত্যের প্রাচীনতম পরিচয় কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। অথচ হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, এমন অঞ্চল বাংলা দেশে খুব অল্পই আছে। উত্তর বঙ্গের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির শাখাভুক্ত কোচ ও রাজবংশী জাতির কথা এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায়। তাহাদের মধ্যেও স্বভাবতঃই দেখা যায় নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পুরুষের স্থান সেখানে নিতান্ত সঙ্কুচিত।

বাংলার পুতুল

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রূপের অনুশীলনে ছবি আগে কি মূর্তি আগে তা নিয়ে তর্কের অবসান হয়নি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে আঁকা ছবি কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে মূর্তির মত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। বর্ণালী ঢং ছবিকে দেয় সরসতা; অবয়বের জমাট পূর্ণতায় মূর্তির মহিমা মূর্ত্তি, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর গড়নের ডৌলেই পূর্ণ নয়; স্পর্শ করে তার ঘনত্ব অনুভব করা যায়। রূপ এখানে নিতান্ত দৃষ্টির বিভ্রম নয়; অনুভূতিকে যাচাই করে নেওয়া যায় তার অস্তিত্বের নিঃসংশয়তায়।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই সাধারণতঃ বলা হয় পুতুল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমাজেই পুতুলের ব্যবহার দেখা যায়; তবে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের ব্যবহারের ক্ষেত্র; উপকরণ, নির্মাণ কৌশল এবং তৈরী পুতুলের আকৃতি আর সংবেদনে অনেক রকমের পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু আমাদের সমাজে এসে পৌঁছুতে দেরী হয়নি; গেল পনের কুড়ি বছরের মধ্যে পুতুলের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পুতুলের আবির্ভাব আর তার ক্রম-বিবর্তনের কাহিনী বেশ কৌতূহলজনক।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি কে কোথায় প্রথম সৃষ্টি করেছিল এবং কোন প্রেরণায় তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। শিল্পতত্ত্বানুরাগী অপেক্ষা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরাই বোধ হয় এ সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকারী। শিল্পের উদ্ভব ও বিবর্তনে মানুষের মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানীদেরও কিছু নিজস্ব মত আছে।

মানুষের অনুকরণ স্পৃহা, ইঙ্গিত প্রবণতা এবং যাদুক্রিয়ার বিশ্বাস থেকেই সম্ভব পুতুলের উদ্ভব হয়েছিল। সুপ্রাচীন যুগের গুহামানবেরা বাসগুহার প্রাচীরে যেসব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে মানুষের চিত্রাঙ্কন প্রয়াসের সেইগুলিই সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন। এইসব ছবিতে সে যুগের নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখা যায়। এইসব জানোয়ার ছিল সে যুগের মানুষের প্রবলতম শত্রু। বর্ণের প্রলেপে উজ্জ্বল, অত্যন্ত সজীব এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আঁকা এই ছবিগুলিতে রেখা আর রঙের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় থাকলেও এগুলিকে নিছক শিল্প প্রেরণার নিদর্শন বলে মনে করা যায় না। সেই আদিম যুগের মানুষের আদৌ কোন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প প্রেরণা ছিল বলে অনুমান করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই মনে হয় অন্য কোন প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা ঐসব ছবি এঁকেছিল।

আদিম জাতির জনগণের মধ্যে এখনও এমন অনেক বদ্ধমূল সংস্কার আছে যার প্রভাব সভ্য সমাজে থাকলেও সেগুলিকে কুসংস্কার বলেই অভিহিত করা হয়। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এই ধরণের সংস্কারগুলির অন্যতম। সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না এমন অনেক শক্তি পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু বৃক্ষলতা এমন কি জড় পদার্থকেও নিয়ন্ত্রিত করে! অনেকে এই সমস্ত শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে নানাভাবে নিজের ইচ্ছাকেও কার্যকরী করতে পারে।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় তাকে বলা চলতে পারে যাদুক্রিয়া (Magic)। কোন শত্রুর ছবি আয়ত্বাধীনে থাকলে সেই শত্রুর অনিষ্ট করবার ক্ষমতা হ্রাস পায়; সেই শত্রুর ছবির উপর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা আঘাত বা ক্ষতি সাধন করলে উদ্দিষ্ট শত্রুর অনুরূপ আঘাত প্রাপ্তি বা ক্ষতি সাধিত হতে পারে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সেই প্রাচীন গুহা মানবেরা নাকি পর্বত বা গুহা প্রাচীরের গায় ছবি এঁকেছিল। সেই সুপ্রাচীন যুগের কোন মূর্তি এখনও কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি, তবে মানুষ আর পশুপক্ষীর মূর্তিও যে খুব প্রাচীন কালেই অনুরূপ কারণেই আত্মপ্রকাশ করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রেরণা থেকেই টোটেম সম্পর্কিত বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। অনিষ্টকারী শত্রুর ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করে তার উপর যাদুক্রিয়া দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট সাধন করা সম্ভবপর হয় এই বিশ্বাস থেকে যেমন অনিষ্টকারী পশু মূর্তি নির্মাণের প্রেরণা এসেছিল তেমনি এই ধরণের পশুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্যও হয়ত তার ছবি বা মূর্তির সঙ্গে রাখবার বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার প্রেরণা উদ্ভূত হয়েছিল। এমনি করে টোটেমের মূর্তি গড়ার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। এইসঙ্গে পরম রহস্যময় প্রজনন শক্তির প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই জননী-মূর্তির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। প্রজনন কার্যে নারীর অংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রধান; এই সূত্রেই নারী-শক্তিকে দেবত্ব আরোপ এবং মাতৃকা-পূজার প্রবর্তন হয়। মানবী ছাড়াও এই প্রজনন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পশু বা সরীসৃপ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এই সমস্ত পশু বা সরীসৃপের মূর্তি থেকেই দৈবী-মূর্তির প্রবর্তন সূচিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রবর্তিত যাদুক্রিয়া উপলক্ষ্যে নির্মিত মূর্তি থেকে ক্রমে দেবদেবীর মূর্তির উদ্ভবের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দৈবী-প্রতিমা পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে যেখানে এই সমস্ত মূর্তি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ব্যবহারে অন্যতর বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে রইল, পুতুল তার অন্যতম।

হয়ত সেই সুপ্রাচীন কালেই যাদুক্রিয়ার প্রয়োজনে তৈরী পুতুল মানব শিশুর হাতে পড়েছিল; হয়ত যে মানুষ প্রথম পুতুল গড়েছিল সেই তুলে দিয়েছিল ঐ পুতুল তার সন্তানের হাতে; সেই শিশুও পেয়েছিল ঐ পুতুলে তার মনের অনেক খোরাক। যে জন্তুটিকে দূর থেকে দেখে তার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে, যাকে নিয়ে তার মনে অনেক আলোড়ন, নিদ্রায় যার আকৃতি স্বপ্ন হয়ে তাকে ছুঁয়ে যায়, তারই আকৃতি হাতে পেয়ে শিশুর কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল; সেই পুতুলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার নিজের জগৎ। বনের পশুকে ভয় করলেও পুতুলের পশু হল তার করায়ত্ব; ঘরের মানুষ তার দূরে চলে গেলেও পুতুলের মানুষ নিতান্ত তারই ইচ্ছার বাহন। এই পুতুল নিয়ে স্বভাবতই গড়ে তুলেছিল শিশুরা তাদের নিজেদের একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলে সে সর্বশক্তিমান, পুতুল-পশু, পুতুল-মানুষ তারই আজ্ঞাবহ। সম্পূর্ণ তারই ইচ্ছাধীন। ক্রমে বহু পশু মানুষের কৌশলে ধরা পড়ে পোষ-মানা পশুতে পরিণত হল, হল মানুষের আজ্ঞাবহ; তার কেনাবেচার সামগ্রী। এদিকে অলঙ্কারে পোষাকে নিজেকেও মানুষ সাজিয়ে তুলল সম্পূর্ণ নূতনভাবে। ক্রমে পুতুলের জগতেও পরিবর্তন দেখা দিল; আদিম পশু আদিম নরনারীর পরিবর্তে ক্রমে গৃহপালিত পশু

আর মার্জিত মানুষের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। গৃহপালিত হলেও কোন কোন পশুর প্রাচীন টোটেম বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হল না ; নানা দেবদেবীর বাহনরূপে তাদের অনেকগুলিই যেন টিঁকে রইল প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে, তেমনি শিশুচিত্তেও তাদের স্থান রইল অটুট হয়ে। অন্যদিকে সমাজে বিবর্তন ঘটল, নানা বৈচিত্র্যময় বিবর্তন ঘটল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে রূপবৈচিত্র্য কেবলমাত্র যে স্বীকৃতি লাভ করল তাই নয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আকার নিল। সেইজন্যই দেখি একই গৃহে একজন হয়ত ঘোর বৈদান্তিক, অন্য জন পুরাণবিহিত মূর্তি পূজায় উৎসাহী ; আবার গৃহরমণীরা প্রাচীন যাদুক্রিয়া থেকে একটুখানি মার্জিত ব্রত আচার নিয়ে ব্যস্ত। এই বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সমাজে পুতুলের বিভিন্ন রূপ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই ধরণের পুতুলকে দেখি খেলার সামগ্রী হিসাবে শিশুদের হাতে ; আবার সেই ধরণের পুতুলই কিন্তু বারব্রত উপলক্ষ্যে পুররমণীদের হাতে মর্যাদা নিয়ে দাঁড়ায় ব্রতবিহিত নানা পাত্র-পাত্রীর আকারে। আবার এই পুতুলেরই বৃহদায়তন পরিমার্জিত রূপ দেখা দিল উচ্চস্তরের প্রতিমায়। পুতুল তাই মানুষের এক অপরূপ সৃষ্টি ; মানুষের সংস্কৃতিগত বিবর্তনের এবং মানুষের মনন কল্পনার ভাবসমৃদ্ধ আলেখ্য।

বাংলাদেশের পুতুলের ধরণ-ধারণ এবং তৈরী করবার পদ্ধতিতে এমন অনেক বৈচিত্র্য আছে যা নজর করে দেখবার মত। বিষয়-বৈচিত্র্যেও পুতুলগুলি কম যায় না। শরীরের জমাট গড়ন, নানা রঙের প্রলেপের উজ্জ্বলতা, মুখ, চোখ, হাত, পা, কাপড় পরবার ধরণ, বসবার, দাঁড়াবার, ছেলে-কোলে করবার বিচিত্র ভঙ্গী পুতুলগুলিকে কত বৈচিত্র্যেই না সমৃদ্ধ করে রেখেছে। কল্পনার বিচিত্রতায়, অভিব্যক্তির সংক্ষেপণে এবং ব্যঞ্জনার সরসতায় বাংলাদেশের পুতুলগুলি যেন সত্যই তুলনাহীন।

পুতুল নির্মাণের উপকরণ প্রধানত মাটি ; অবশ্য মাটি ছাড়া আর কোন উপকরণ যে পুতুল গড়তে ব্যবহার না হয়, তা নয়। কাষ্ঠের তৈরী পুতুলের প্রচলন মাটির পুতুলের মত না হলেও বেশ জনপ্রিয়। ধাতুর পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল এমন কি পিটুলীর পুতুল, সরের পুতুল, গোবরের পুতুলের প্রচলনও বাংলাদেশে দেখা যায়। মাটির পুতুলের ব্যবহার প্রধানত দেখা যায় শিশুদের খেলার সামগ্রীরূপে। কিন্তু ছোটদের খেলার পুতুল ছাড়া ঐ একই ধরণের পুতুলের ব্যবহার আছে নানা ধরণের বারব্রত উপলক্ষ্যে। মেয়েলীব্রত উপলক্ষ্যে ননীর পুতুল, পিটুলীর পুতুলেরও ব্যবহার আছে। মাটির পুতুলের চলনও ব্রতে দেখা যায়। বিশেষ করে ষষ্ঠীর ব্রতে মাটির তৈরী ষষ্ঠী ঠাকুর। লক্ষ্মীব্রত আর মনসাব্রত উপলক্ষ্যে চিত্রিত সরা বা ঘট তৈরী করবার রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য কোন কোন ব্রতেও পুতুলের প্রয়োজন হত। ব্রত ছাড়া পুতুল, বিশেষ করে হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত ষষ্ঠীতলা মাদারের হাট বা পীরের সমাধির উপর রেখে যাওয়ার প্রচলনও এখানে আছে। পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামের অতি পরিচিত কোন গাছের তলায় অজস্র হাতী, ঘোড়া আর ছেলে-কোলে-করা মা পুতুলের সমাবেশ দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

আজ আর বাংলার গ্রামের হাটে, মেলায় কিম্বা তীর্থক্ষেত্রে প্রথাগত পুতুলের সেই সমাবেশ দেখা যায় না। কলিকাতার অনতিদূরে কৃষ্ণনগরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশিষ্ট ধরণের পুতুলের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার আর দশ জায়গার পুতুল থেকে

এর রূপ-রস ছিল স্বতন্ত্র। নিপুণ ও নিখুঁত স্বাভাবিকতা ছিল এই পুতুলের বৈশিষ্ট্য। জমিদার, মোসাহেব, পাইক, বরকন্দাজ, ময়ূরপঙ্খী নৌকো, কাটা ছাগলের মুণ্ডু, মাছ, পাখী, আম, জাম, সুপুরীর কুচি এত বাস্তব, এত নিখুঁত পোষাকে-পরিচ্ছদে মুখের গড়নে আর ভঙ্গীতে রঙে আর আকৃতিতে, যে অনেক সময় আসল থেকে নকল চিনে নেওয়া কঠিন হত। এই পুতুলের চাহিদা কি করে হল, অনুপ্রেরণা এল কোথা থেকে তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এইসব পুতুলেরই কিছুদিন আগুপিছু মুর্শিদাবাদে হাতীর দাঁতে তৈরী ঐ ধরণের নানা খেলনারও প্রচলন হয়েছিল। এই সব উপকরণের চাহিদা ছিল নবাব পরিবারের অন্দর মহলে এবং তাদেরই অনুকরণে এই শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করত নবাব দরবারের পরিষদেরা। সেই ধারাকে অনুসরণ করেই যে এই স্বভাবানুগামী বা বাস্তবধর্মী শিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পুতুল সহজেই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বহু ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ঐ ধরণের কৃষ্ণনগরের পুতুল ভারতবর্ষের পরিচয় হিসাবে স্বদেশে নিয়ে যেত। এইসব পুতুলের নিখুঁত নকল-নবিশীয়ানায় যে কৌশল, যে পারঙ্গমতা ছিল প্রচলিত ধারার ভারত শিল্পের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত ধারার পুতুলের তুলনায় এই বাস্তবধর্মী পুতুলের বাজারে চাহিদা থাকলেও সাংস্কৃতিক মূল্য খুব বেশী কিছু ছিল না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্যে প্রথাগত পুতুল অতুলনীয়; এই জাতের পুতুলের গঠনের বৈশিষ্ট্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের পারিপাট্যে যুগাতীত জনমানসের পরিচয় প্রতিলিখিত ছিল। এরা প্রাচীন যুগ থেকে বয়ে আনছিল সেই বিস্মৃত কালের এক অজানা ধূপের সৌরভ, এক না দেখা জগতের স্বপ্ন।

পুতুলের, বিশেষ করে মাটির পুতুলের বিস্তৃত প্রচলন কোন কোন দেশের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলেই গণ্য হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অনেক জায়গায় মাটিতে গড়া পুতুলের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। এইসব জায়গা কিছু পরস্পরের কাছাকাছি নয়; এদের মধ্যে খুব যে যাতায়াত ছিল যাতে করে এক অঞ্চলের প্রভাবে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে একই ধরণের জিনিষের আদান-প্রদান চলত তাও বলা যায় না। সেইজন্যই অনুমান হয় যে স্বতন্ত্র হলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষ স্বভাবের প্রেরণাতে একই ধরণের পুতুল তৈরী করতে ব্রতী হয়েছিল। এইসব পুতুলের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য কিন্তু খুবই বিস্ময়কর। অত্যন্ত সহজে এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল; যার জন্য নির্মাতাকে কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করতে হয়েছিল বলে মনে হয় না। অভীষ্ট পশু বা মানুষের সঙ্গে এই সব পুতুলের আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য শিল্পীর যে বিশেষ কোন মাথা ব্যথা ছিল তা মনে হয় না। অত্যন্ত সংক্ষেপে মাথা, হাত, পা আর শরীর তৈরী করেই শিল্পী সন্তুষ্ট; মুখ, চোখ, নাক আর ঠোঁট এবং শরীরে সামান্য কিছু অলঙ্কারের আদল এলেই হল। মূর্তিগুলির মধ্যে নারী-মূর্তির সংখ্যা ছিল বেশী; এইসব নারী-মূর্তির ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতার লক্ষণগুলি বিশিষ্ট করে দেখান হত। পুতুলের মধ্যে পশুমূর্তির টোটেম সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য এবং নারীমূর্তির মাতৃত্ব লক্ষণ থেকে এই অনুমানই করা হয় যে সেই প্রাচীনতম পর্যায়ের পুতুলের ক্ষেত্রে শিল্পচাতুর্য অপেক্ষা নানাপ্রকারের বিশ্বাসে পরিপুষ্ট ইঙ্গিত প্রবণতাই ছিল প্রধান।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পর্যায়ের পুতুলের ক্ষেত্রেও মোটামুটি এই একই সিদ্ধান্তই নেওয়া যেতে পারে। উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধুর হরপ্পা, কুল্লি, ঝোব, এবং মহেঞ্জোদরো ইত্যাদি অঞ্চল থেকে যে অসংখ্য মাটিতে তৈরী পুতুল পাওয়া গিয়েছে বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য হলেও খুব বেশী নূতনত্ব এগুলির মধ্যে নেই। এইসব পুতুলের মধ্যে যে সব পশুর অনুকৃতি পাওয়া যায় ডৌল বা গঠন সৌকর্যের দিক থেকে সেগুলি সমসাময়িক আমলের মোহরাঙ্কিত পাটা বা Seal-এর উপরে খচিত পশুমূর্তির মত সুগঠিত না হলেও অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের দিক থেকে বোধ হয় একই পর্যায়ের। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি মোহরাঙ্কিত পাটা; এই পাটার উপরে খচিত একটি দৃশ্যে দেখা যায় এক ব্যক্তি একটি দণ্ডের উপর একটি পশুমূর্তি নিয়ে চলেছে; তার পেছনে চলেছে একদল অনুগামী। হয়ত এটি একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রার ছবি যেখানে দৈবী ইঙ্গিত সমৃদ্ধ পশুমূর্তিটি ছিল প্রাচীন টোটেম থেকে উদ্ভূত কোন দৈবীশক্তির প্রতীক। প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির প্রায় সবগুলির ক্ষেত্রেই এই ধরণের দেবতার প্রতীকরূপে পশুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। মিশরের স্ফিনিক্স্ বা এপিস ষাঁড়, ক্রিটের মিনটার নামীয় ষাঁড়, গ্রীকদের এ্যাপলো বা হেলিয়সের ঘোড়ার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে নানা দেবতার প্রসঙ্গেও এই ধরণের পবিত্র পশুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্রের বৃষ, সূর্যের অশ্ব, বিষ্ণুর গরুত্মন (গরুড়) ইত্যাদি সেই সেই দেবতার প্রতীকরূপে বৈদিক সমাজে মর্যাদা লাভ করেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার মানুষ ও পশুর আকৃতির পুতুলের সঙ্গে খুব প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও পরবর্তী যুগের মাটির পুতুল যে ভারতের সুপ্রাচীন যুগের সংস্কৃতির ধারা থেকে রস আহরণ করেই পুষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের পলিমাটিতে গড়া সমতল ভূমিতে কবে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, কবে সভ্যতার পদসঞ্চার হয়েছিল তা এখনও স্থির করে বলা চলে না। কিন্তু পাটলিপুত্রে মৌর্য রাজাদের আবির্ভাবের যথেষ্ট আগে থেকেই যে এই গঙ্গা বিধৌত সমভূমিতে সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল অনেক বড় বড় সহর এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তের স্মৃতি বিজড়িত তমলুক থেকে আবিষ্কৃত কয়েকটি মাটির পাত্র, বেড়াচাঁপায় পাওয়া মোহরাঙ্কিত মাটির চক্রাকার পাটা, হরিনারায়ণপুরের কয়েকটা জিনিষ থেকে এই অনুমান আজ দৃঢ় হচ্ছে যে বাংলার তথাকথিত পলিমৃত্তিক সভ্যতা হয়ত নিতান্তই অর্বাচীন নয়।

অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলায়ও মাটির পুতুল সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গড়ে উঠেছিল। বেড়াচাঁপা, তমলুক বা হরিনারায়ণপুরের আবিষ্কৃত অসংখ্য পুরাবস্তুর মধ্যে মাটির তৈরী মূর্তি এবং পুতুলের সংখ্যা খুবই ব্যাপক। নির্মাণ কৌশল এবং বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই পুতুলগুলিকে বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা চলে। এর মধ্যে অনেক পুতুল আঙুল দিয়ে তৈরী। এইগুলির মাথা চ্যাপ্টা, নাক পাখীর ঠোঁটের মত। হাতে বা পায়ে কনুই হাঁটু বা আঙুল দেখাবার কোন চেষ্টা এইসব পুতুলে দেখা যায় না। এগুলির চোখ আর গয়না আলাদা করে মাটির দলা বা লেত্তি দিয়ে তৈরী। পোড়াবার ফলে কোন কোনটি একটু কালচে বাকিগুলি ফিকে বাদামী। রঙের বালাই

এসব পুতুলে ছিল না ; কোন কোনটার গায় একটা হাল্কা ধরণের প্রলেপ লাগান হত পোড়াবার আগে, যার ফলে পোড়াবার পরে এগুলির গায় একটা জেল্লা দেখা দিত।

আঙ্গুল দিয়ে তৈরী করা পুতুলের পর উল্লেখ করা যেতে পারে ছাঁচে গড়া পুতুলের কথা। মৌর্য রাজাদের রাজত্বের কিছুকাল পরেই ছাঁচে গড়া পুতুলের প্রচলন হয়েছিল ; প্রাচীন আমলের শহর বন্দরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক ছাঁচে গড়া পুতুলও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ থেকে যে সব ছাঁচে গড়া পুতুল আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে তার মধ্যে আনুমানিক শুঙ্গ আমলের তৈরী, বাঁকুড়া জেলার পোখরনা (প্রাচীন পুষ্করণা) থেকে পাওয়া একটি সুন্দর নারী মূর্তিই সবচেয়ে পুরোনো। এই পুতুলটি লম্বায় পাঁচ ইঞ্চির মত, চওড়ায় আড়াই ইঞ্চি ; কানে কর্ণপুর, গলায় একাবলী, সরু কোমর বেড়ে আঁট করে পরা ধুতির ভাঁজ ঘাগরার মত করে ছড়িয়ে ডান হাতে ধরা, বাঁ হাতে সযত্নে ধরা একটি শুকপাখী ; দাঁড়াবার লাস্যময়ী ভঙ্গী থেকে এই মূর্তিটিকে দেবীমূর্তি অপেক্ষা কোন যক্ষিণী বা নায়িকা মূর্তি বলেই অনুমান হয়। দিনাজপুর জেলায় বানগড়, মেদিনীপুরের তমলুক, ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় থেকে আশুতোষ সংগ্রহালয়ের প্রত্নতত্ত্বসন্ধানীরা অনেক রকমের পুরোনো পুতুল সংগ্রহ করেছেন। এইসব পুতুলের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অতীত যুগের এক ভুলে যাওয়া সভ্যতা, এক স্বপ্নময় জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব পুতুলের মধ্যে হাতে গড়া মূর্তিও আছে ; তবে অধিকাংশই ছাঁচে গড়া। এর মধ্যে কতগুলি নানারকমের জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি ; জন্তু-জানোয়ার-গুলির মধ্যে হাতী, ভেড়া, ছাগল, ষাঁড়ই বেশী। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের একটি দৃশ্যে শকুন্তলার শিশু পুত্র সর্বদমনের একটি মাটিতে গড়া ময়ূর নিয়ে খেলা করবার বর্ণনা পাওয়া যায়। মাটিতে গড়া পশুমূর্তিগুলি মনে হয় শিশুদের ক্রীড়াসামগ্রী হিসাবেই ব্যবহার হত। তবে বাচ্চাদের খেলনা ছাড়া এর অন্য ব্যবহার যে ছিল-না এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। উত্তর সৈন্ধব সভ্যতার যুগ থেকেই পশুমূর্তির দৈবী ইঙ্গিতের ব্যবহার প্রচলিত। বেদের যুগেও দেখেছি ভিন্ন ভিন্ন পশুকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রতীকরূপে গণ্য করা হত। উত্তরকালে সুউচ্চ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন পশুমূর্তিকে কোথাও হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক, কোথাও দিক্‌পতিদের প্রতীক, কোথাও ভগবান বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতীক বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় যে সব অলঙ্কার মণ্ডিত জানোয়ারের আকৃতির পুতুল পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য দেবতার প্রতীক বা বাহন বলেই অনুমান করা হয়। ছাঁচে গড়া মূর্তির মধ্যে আছে অনেক বিচিত্র গড়নের একক বা একাধিক নারী মূর্তি খচিত ফলক। একক মূর্তিগুলিকে সাধারণতঃ যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এইসব মূর্তির গড়নে, অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদে দাঁড়াবার বিচিত্র ভাবব্যঞ্জক এবং লাস্যপূর্ণ ভঙ্গীতে অতিশয় আত্মসন্তুষ্টিতে গরীয়ান, বৈষয়িক প্রাচুর্যে আত্মস্থ ভোগপূর্ণ সমাজের একটি সুন্দর ছবি প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। ছোট আয়তনের পোড়ামাটির মোহরের গায় সুন্দর তোরণ এবং তোরণশীর্ষে উপবেশন রত ময়ূর খচিত কয়েকটি চিত্রে সেকালের শিল্পসৌষ্ঠব মণ্ডিত নগর তোরণের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই ধরণের নগর তোরণের কিছু পরিচয় মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের সন্নিকটবর্তী সাঁচীতে স্তূপবেষ্টনীর তোরণে পাওয়া যায় ; কিন্তু ভারতের বাইরে দক্ষিণ

-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় সুদূর জাপান পর্যন্ত অনুরূপ ছন্দের আলঙ্কারিক তোরণের ব্যবহার এখনও প্রচলিত রয়েছে।

একাধিক মূর্তি খচিত ফলকগুলির মধ্যে সঙ্গিনী ও প্রতিহারী সহ একটি নায়িকার চিত্র, চার ঘোড়ায় টানা রথে শিকারে ব্যস্ত রাজকীয় বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ এমনি কয়েকটি ছবি লক্ষ্য করার মত। অনুমান হয় সে যুগে প্রচলিত আখ্যায়িকা বা কোন পরিচিত ঘটনার উপকরণ নিয়েই এইসব ফলকের ছবিগুলি সাজান হয়েছিল।

এর পরের পর্যায়ে খৃষ্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে ধরণের মাটির পুতুলের নির্মাণ ও ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল সেগুলির কথা এইবার বলা যেতে পারে। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিদেশাগত কুষাণ রাজবংশ রাজত্ব করত। বাংলাদেশের কোন অঞ্চল এদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল কিনা তা এখনও জানা না গেলেও শিল্পের দিক থেকে, বিশেষ করে প্রচলিত পুতুলের আকৃতি প্রকৃতির দিক থেকে এই সময়ে বাংলাদেশে যে সব পুতুল চলত সেগুলি কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র মথুরা এবং উত্তর ভারতের বারাণসী, শ্রাবস্তী, কৌশম্বী, ইত্যাদি অঞ্চলের পুতুলের সমগোত্রীয়। এইসব পুতুলের মধ্যে নানা জাতির লোকের চেহারার আদল আনবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের কৃষ্ণনগরের পুতুলে মানুষের আকৃতিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবার যে প্রয়াস দেখা যায় চেহারা মুখ নাক চোখের গড়ন এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে স্বতন্ত্রতা এবং বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট করে কুষাণ যুগের পুতুল-শিল্পীরা যেন তারই পূর্বাভাষ দিয়ে গিয়েছেন। এরপর পাটুলীপুত্রের গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা বাংলার এক বৃহৎ অঞ্চলকে যে তাঁদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তার বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যুগেও মাটিতে পুতুল নির্মাণের এবং ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল; ভারতের বিভিন্ন গুপ্তকালীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সে যুগের অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল পাওয়া গিয়েছে; এই যুগের সাহিত্যেও নানা ধরণের পুতুলের ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই যুগের পুতুলে কুষাণ আমলের পুতুলের মত জাতিগত (Ethnic) এবং পরিচ্ছদগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা জাতির সমাবেশে ভারত সমাজ ও মনে কুষাণ যুগে যে আলোড়ন এসেছিল, স্বভাবতই গুপ্তরাজাদের অভ্যুত্থানে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। গুপ্ত সম্রাটেরা কেবল একান্তভাবে ভারতীয়ই ছিলেন না, ভারত সংস্কৃতির কৃতি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁরা দেশকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন এবং ভারতের সভ্যতাকেও তাঁরা দূরবিস্তারী পদক্ষেপে বহু পরিমাণে অগ্রসর হয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এ কালের সাহিত্য এবং উচ্চকোটীর শিল্পে জাতির এই আত্মপ্রতিষ্ঠিত রূপটি অতি সহজেই চোখে পড়ে। কুষাণ আমলের ব্যাপক ও পরিস্ফুট রূপটি স্থৈর্যহীন এবং চঞ্চলতায় পূর্ণ। এ যুগের শিল্পে অতৃপ্ত আবেগময় জীবন পথে ত্যাগ ও নির্বাণ মার্গের আকস্মিক আবির্ভাবের ছবি কুষাণ আমলের রাজকবি অশ্বঘোষের কাব্যে যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এমনটি বোধ হয় অন্য কোথাও দেখা যায় না। উপরের স্তরে অভিব্যক্ত চাঞ্চল্যের আড়ালে যে আত্মসন্ধান কুষাণ যুগে চলেছিল গুপ্ত আমলে এসে সেই প্রচেষ্টাই পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।

ভারতবর্ষ যেন নূতন করে গুপ্ত যুগে আপনার আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। এই চেতনার স্পর্শ থেকে পুতুল শিল্পও বাদ যায়নি। এই যুগের পুতুলগুলিও যেন কোন এক গভীর-ভাবেতে আবিষ্ট ; বহির্জগতের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগের পরিচয় এই যুগের পুতুলের কেশবিন্যাস অলঙ্কার এবং পরিধেয়ের মধ্যে থাকলেও এইসব পুতুলের আননে এবং দেহ গঠনে উচ্চ গ্রামের ভাস্কর্যের মতই একটা আত্মসমাহিত ভাবগর্ভ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পের জগতে পুতুলের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, সাধারণ মানুষের মনন-কল্পনা, রাগরঙ্গ, হাসি-অশ্রুর যে ছোঁয়া পুতুল শিল্পে স্বভাবতই আশা করা যায় গুপ্ত যুগের পুতুলগুলিতে তার কিছুই বড় একটা দেখা যায় না। এই পুতুলগুলি যেন ভাবজগতে বিচরণশীল উচ্চ গ্রামের বিদগ্ধ মনের পরিপোষক কোন সমাজের সমুজ্জ্বল ছবি। পুতুল হিসাবে সাধারণ স্তরের মানুষের সমাজ ও জীবনগত চিন্তা-কল্পনার বাহন হিসাবে এগুলির যথার্থতা কম। এ যেন এক অতিশয় পরিমার্জিত সমাজের আলেখ্য, আপনার রূপ ধ্যানে আত্মস্থ, আপনার সভ্যতা এবং আত্মগরিমায় সমাধিস্থ। নির্মাণ কৌশলে এবং নিখুঁত ব্যঞ্জনায় এই যুগের পুতুল সমৃদ্ধ হলেও পুতুল হিসাবে এগুলিকে আমি খুব উচ্চ মূল্য দিতে রাজী নই।

গুপ্তোত্তর যুগে কিন্তু পুতুল আবার তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছিল বলেই মনে হয়। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট যুগ—পাল ও সেন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ কিছু কম পাওয়া যায় নাই ; বস্তুত কিছুদিন আগেও বাংলার প্রাচীন ইতিহাস বলতে পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসকেই বোঝাত। বাংলার প্রচলিত কিম্বদন্তী আর সাহিত্যাদিতেও সেন এবং কিছু পরিমাণে পাল রাজাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই বাংলার অতীত ইতিহাসের গণ্ডী নির্ণীত হত। কিন্তু পরে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ এবং তাম্রপট্টলী এবং কিছু সংখ্যক খোদিত লেখা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাস আস্তে আস্তে ক্রমে আরও প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। তবুও অতীতের কোন যুগের ইতিহাসই এখনও পাল এবং সেন যুগের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নাই। অবশ্য পাল এবং সেন যুগ ইতিহাসের উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকলেও আমরা যে উপকরণ নিয়ে এখানে আলোচনা করছি, সেই পুতুল কিন্তু এ যুগ থেকে খুব বেশী পরিমাণে আমাদের হাতে এসে পৌছায় নাই। এ যুগের প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ যে সমস্ত স্থান বা অঞ্চল ঐতিহাসিকের সন্ধানে এসেছেন সে সব অঞ্চলে স্বভাবতই দীর্ঘকাল জনবসতি ছিল ; এইসব স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে গৌড়ই প্রধান ; অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকেও পাল বা সেন রাজাদের কীর্তির মধ্যে জড়িত মন্দির বা মূর্তি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশই কিন্তু সেন রাজত্বের অবসানে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত এবং বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে বিশেষ করে পাল-সেন আমলের পুতুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘটে না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ছাড়া পাল আমলের অন্য কোন প্রত্নসম্ভার সমৃদ্ধ অঞ্চল এখনও ব্যাপকভাবে অন্বেষণ করা হয় নাই। মালদহের গৌড়ে বা পাণ্ডুয়ায় হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে বা পাণ্ডুয়ায়, নবদ্বীপের সন্নিকটে লক্ষণসেনের ভিটায়, বানগড়ে বা বেড়াচাঁপায় পাল বা সেন আমলের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া গিয়ে থাকলেও এ যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে পৌছান হয় নাই।

পুতুল হিসাবে গণ্য না হলেও পাল সেন যুগে মাটিতে গড়া এমন কতকগুলি মূর্তি পাওয়া

গেছে যে সব মূর্তিকে পুতুলেরই সমগোত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের মূর্তির মধ্যে পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে লাগানো মূর্তিগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরের মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ বিহারের মূল মন্দির রূপে নির্মিত হয়েছিল। এই বিহারের নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। পালবংশের খ্যাতনামা সম্রাট ধর্মপাল ছিলেন এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর গড়নে। মন্দিরের ভিত্তি নক্শার প্রত্যেকটি বাহু মাঝখানে বেশ খানিকটা করে বাড়ানো ; উপরের দিকে আবার মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে ; ভেতরটাতে ছোট একটা ফাঁপা চৌকোনো গর্ত আছে উপর থেকে অনেকটা নীচ পর্যন্ত ; এ ছাড়া সবটাই জমাট। মন্দিরের শীর্ষে কি ছিল এখন আর নিশ্চয় করে বলা যায় না। প্রাচীরের গায়ে নানা প্রকারের মূর্তি খচিত রয়েছে দেখা যায়। এই সব মূর্তির মধ্যে কতকগুলি পাথরের তৈরী ; গঠনের বৈশিষ্ট্যে এবং দেহের ডৌলে এই মূর্তিগুলিকে পালযুগেরও পূর্বেকার তৈরী বলে অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী পুরাণ কাহিনী থেকে গৃহীত বিষয় বস্তুর উপর এই সব মূর্তি গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা এবং শিব বিবাহাদি দৃশ্যের প্রাধান্য থেকে মনে হয় নিজেদের মন্দিরে অলঙ্কার সজ্জার জন্য নির্মাতারা কোন পূর্বতন প্রতিষ্ঠান থেকে এই মূর্তিগুলি আহরণ করে এনেছিলেন। এই মূর্তিগুলি ছাড়া প্রাচীরের গায়ে আর যে সব মূর্তি আছে সেই সব মূর্তির সবকটিই কিন্তু সোজাসুজি বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক নয়। অবশ্য ধ্যান সমাহিত বুদ্ধ বা অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেবতার কিছু প্রতিমা এই মূর্তিগুলির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য মূর্তির অধিকাংশই সমসাময়িক সমাজ জীবনের ছবি বলে মনে হয়। এইসব ছবির বৈশিষ্ট্য, এগুলির অধিকাংশই একক ভাবে, এক বা একাধিক মূর্তি খচিত ফলকের আকারে প্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলকগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়ানো বা বসা অনেক নর-নারীর মূর্তি আছে। এই সব নর-নারীর দেহ গঠনে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং আদব-কায়দায় যে সব লক্ষণ সুস্পষ্ট তা থেকে মূর্তিগুলিকে তখনকার যুগের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিরূপ বলেই অনুমান হয় ; এই সব অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিল আদিবাসী শবর-শবরী ; বর্তমান কালের কোচ, হাজং, ডাফলা মিকির ইত্যাদি অধিবাসীদের পূর্বগামী। এই সব ফলকের কতকগুলি স্পষ্টই ছাঁচ থেকে তৈরী বলে বোঝা যায় ; অন্যগুলি শিল্পীরা যেভাবে এখন প্রতিমা তৈরী করেন সেই ভাবে হাতের ডৌলে নির্মাণ করা হয়েছিল। মূর্তি-গুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস এবং কর্মরত অবস্থার অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াসলব্ধ ক্রিয়া কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। মাছ ধরা, শিকার করা, ছাগল ভেরা চরান, নর-নারীর সমবেত নৃত্য ইত্যাদি যে সব দৃশ্য এই ফলকগুলিতে দেখা যায় তাতে শিল্পীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং দেখা জিনিষটিকে তার ভাব সমৃদ্ধি সমেত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারা যায় না। পাহাড়, জঙ্গল, জল এবং প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্যও তাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি ; সেই সঙ্গে আছে তাদের চারদিককার পশু জগৎ। দক্ষ অনুভূতিবাদী আধুনিক শিল্পীর মতই অনায়াস কৌশলে তারা জল, জঙ্গল পাহাড়কে রূপ দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন বাস্তবপন্থী শিল্পীর মত সৃষ্টি করেছিল তাদের পশুপক্ষীগুলিকে। কিছু দিন আগেকার তৈরী পাথরের মূর্তিগুলিতে ডৌলের যে বৈশিষ্ট্য ছিল মাটিতে গা[illegible]র মূর্তির বৈশিষ্ট্য তা থেকে সম্পূর্ণ

ভিন্ন ; গুপ্ত যুগের মূর্তিতে লালিত্যের এবং সুষমার যে সমাবেশ দেখা যায় পাথরের অভিজাত মূর্তি শিল্পের সেই বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী যুগের পাথরের মূর্তি শিল্পে বর্তেছিল। এই আভিজাত্য, কমনীয় দেহশ্রী এবং লাস্যময় ভাবগর্ভ অঙ্গভঙ্গী পাথরের মূর্তি এবং প্রতিমা শিল্পকে বিশিষ্ট করে রেখেছিল। এই সুমার্জিত মূর্তি শিল্পে শিল্পীর গভীর সাধনা, দীর্ঘ অনুধাবন এবং যত্নশীল আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মাটির গড়া ফলকগুলিতে কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ সাধনালব্ধ অভিব্যক্তির কোন পরিচয় নাই। এইসব মূর্তির দেহ গঠনে সযত্ন সৃষ্ট লালিত্য, কমনীয়ভাব বা ডৌলের বিশেষ বালাই নাই। অত্যন্ত সহজ ও অনায়াসলব্ধ কৌশলে এই ফলকগুলি গঠিত হয়েছিল ; শিল্পী সচেতন আয়াসে মূর্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বেশবাস বা ভঙ্গীকে পরিমার্জিত করবার কোন প্রয়াসের পরিচয় রাখেনি। এইখানেই এইসব ফলকের সঙ্গে পুতুলের শিল্প লক্ষণের সাদৃশ্য। পুতুলেও প্রচলিতভাবে শিল্পীর এই অনায়াসলব্ধ কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুপরিকল্পিত বিন্যাস বৈশিষ্ট্য বর্জিত, সহজ ও অনাড়ম্বর কোন গভীর ইঙ্গিতহীন প্রত্যক্ষ আবেগে সমৃদ্ধ এই ফলকগুলিতে সেকালের পুতুলের শিল্পধারাই অভিপ্রকাশ দেখা যায়।

ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, শিল্পের বিবর্তন ক্ষেত্রে পাহাড়পুর মন্দিরের এই ফলকগুলির যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বহু প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের ভাস্করেরা মূর্তি নির্মাণে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল ; হরপ্পায় বেলেপাথরের তৈরী দুইটি মূর্তির খণ্ডিতাংশ পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নির্মাণ কৌশলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাস্তবানুগ ডৌলে, ত্বকের অনুভূতিপ্রবণ মসৃণতায় এই মূর্তি দুটিতে যে আভিজাত্য এবং উচ্চ স্তরের শিল্প কৃতিত্বের ছাপ পড়েছে তা থেকে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য শিল্প যে অতি প্রাচীন কালেই খুব উন্নতি লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। সুপ্রাচীন সেই তাম্র-প্রস্তর সভ্যতার যুগে শিল্পীরা কেবল পাথর নয়, ধাতু ঢালাই করে মূর্তি নির্মাণ করবার কৌশলও যে আবিষ্কার করেছিল মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইসব অভিজাত উপকরণে নির্মিত উচ্চ গ্রামের ভাস্কর্যের পাশাপাশি সেই তাম্র-প্রস্তর যুগের এক শ্রেণীর মাটির পুতুলও যে ব্যাপকভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত হ'ত তার কথা আগেই বলেছি। অনুভূতিপ্রবণ বাস্তবানুগ অভিজাত শ্রেণীর মূর্তির পাশে এই পুতুল শ্রেণীর মূর্তি নির্মাণ কৌশলের বৈশিষ্ট্যে শিল্পানুরাগী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমাজে অতি সহজেই পাশাপাশি যেমন বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি এবং আচার ব্যবহারের অস্তিত্ব দেখা যায় তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও সমভাবের এই স্তরগত বৈষম্যের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। সমাজের উচ্চকোটীর মানুষ যখন নিজের মার্জিত এবং পরিশীলিত রুচি এবং নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগে অভিজাত শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে ভাব ও ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ অভিজাত শিল্প। সাধারণত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাথর ও ধাতুই হয়েছে এই অভিজাত শিল্পের বাহন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধিতে কালের পরিবর্তন খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। পরিশীলিত উচ্চ স্তরের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে তারা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, ঐ সমাজের অর্জিত সংস্কারের নির্যাস নানা স্তরের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে নিচের দিকে এসে থাকলেও সাধারণ মানুষ তার চিরাচরিত সংস্কারকে ধরে থাকবার প্রাণপণ প্রয়াস করেছে। এই

ভাবে সমাজের নিম্নতর স্তরে এক বিচিত্র ধরণের সভ্যতার উন্মেষ ও বিবর্তন হয়েছে। এই সভ্যতায় উচ্চ স্তরের অর্জিত সংস্কারের প্রভাব অনুভূত হলেও ভাব ও পরিকল্পনার চিরাচরিত পথ তারা ত্যাগ করে নাই ঐ সংস্কারের সঙ্গে তারা বিভিন্ন দিক থেকে অনুভূত অন্যান্য সংস্কারকেও মিলিয়ে নিতে চেয়েছে এবং তাতে বহুল পরিমাণে সাফল্যও লাভ করেছে। এদিকে আবার মন তাদের যেমন সরল ও আদিম ধর্মী থেকে গিয়েছে তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণ আহরণে এবং নির্মাণ ও অভি-ব্যক্তির কৌশলে এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষিত শিল্প স্বভাবতই চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ক্বচিৎ এই শ্রেণীর মধ্যে পাথর ধাতুর অনুরূপ অভিজাত উপকরণের ব্যবহার দেখা যায়। এইসব উপকরণের দুর্মূল্যতা যেমন এর একটা কারণ, এইসব উপকরণের নির্মাণ কৌশলের জটিলতাও তেমনি তার অন্য একটি কারণ। যখন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ পাথর বা ধাতু দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করেছে তখন সেই মূর্তি মূল উপকরণ মাটি বা বেত বা শোলা ইত্যাদি উপকরণের আভাস বর্জন করে নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। এই ভাবে আদিম উপকরণ এবং আদিম নির্মাণ কৌশল সাধারণ শ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপ থেকে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্কুলান কম; তাই তার উপভোগের ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই লোকশিল্প আপন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তার মৌলিক সংবেদনের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই তা হলেও সহজ এবং অনুভূতিশীল গণ্ডীর মধ্যে যখনই সুযোগ এবং সামর্থ্য হয়েছে লোকশিল্প জীবন রসে সমৃদ্ধ এবং রূপ ও বর্ণের বৈচিত্র্যে গরীয়ান হয়ে উঠেছে। অভিজাত শিল্পের ভাব সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতা যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের মনন-কল্পনার প্রসার এবং সভ্যতার সমৃদ্ধির পরিচায়ক, সাধারণ স্তরের পুতুলের বর্ণ সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতাও তেমনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচায়ক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমাজের উন্নততর স্তরের মানুষেরা যেখানে সাধারণ মানুষকে দমন করে নিজেদের আধিপত্য এবং শোষণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে সাধারণের শিল্প ব্যাপকতা বা প্রাচুর্য লাভ করতে পারেনি। সভ্যতার সামগ্রিক রূপ সেখানে অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ। মিশর, গ্রীস বা রোমে উচ্চকোটীর শিল্প প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে থাকলেও সমসাময়িক যুগের শিল্প থেকে সেইসব প্রাচীন সভ্যদেশের সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাম্র-প্রস্তর যুগের ভারতীয় সভ্যতায় কিন্তু উচ্চ স্তরের শিল্পকলার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবহার ও উপভোগের শিল্পেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পার উচ্চ স্তরের নাগরিকেরা যখন নিপুণ কারু-কার্য শোভিত পাথরের নৃত্য মূর্তি বা শিলমোহর নির্মাণ করছিল, সাধারণ লোকের উপভোগের জন্য তখন মাটির মূর্তির অসংকুলান হয়নি। বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের অভিব্যক্তি আজও সেই যুগের আবিষ্কৃত উপকরণ থেকে পাওয়া যায়।

ভারত সংস্কৃতির এই বিশেষত্ব পরবর্তী যুগের সভ্যতার যে সব উপকরণ পাওয়া গিয়েছে তা থেকেও বেশ বুঝতে পারা যায়। মৌর্য যুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার গতি প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এই শিল্পের ধারাবাহিক বিবর্তনের কোন ইতিহাস না পাওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক এই শিল্পকে পশ্চিম এশিয়া তথা পারস্যদেশের অ্যাকামিনিড

শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতীয় শিল্পের ধারাকে অনুসরণ করলে কিন্তু অশোকের শিল্পকে সম্পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক শিল্পের প্রভাবগ্রস্ত বলে মনে হয় না। বরং এই শিল্পকে প্রচলিত ধারার ভারত শিল্পেরই মার্জিত ও অভিজাত রূপ বলে অভিহিত করা সমীচীন। এই যুগের আগে থেকেই ভারতবর্ষে একটা সজীব ও গতিশীল লোকশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাক্‌মৌর্য আমল থেকেই লোকশিল্পের অন্তহীন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মৌর্য যুগের বেশ কিছুদিন আগে থেকে মাটিতে তৈরী যে সব পুতুল ও মূর্তি তৈরী ও ব্যবহৃত হচ্ছিল তার যথেষ্ট নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। লোকশিল্পের অন্যান্য কোন উপকরণের আজ আর কোন অস্তিত্ব না থাকলেও এই পুতুল ও মূর্তি থেকেই এ যুগের প্রাণবান লোকশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য যুগেও এই পুতুল ও মূর্তি ব্যাপকভাবেই নির্মিত ও ব্যবহৃত হচ্ছিল। সম্রাট অশোক যে প্রেরণায় ও প্রয়োজনে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রতী হয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকেরা তার অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে থাকলেও অন্তত নন্দবংশের রাজারা যে চক্রবর্তীত্ব লাভ করেছিলেন এ কথা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তার পূর্বে ভরত বা কুরুবংশীয় রাজারা দীর্ঘকাল ভারতে চক্রবর্তীত্ব ভোগ করে গিয়েছেন এ কথা ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। এদের আমলের কোন দরবারী শিল্পের সন্ধান না পাওয়া গিয়ে থাকলেও তাঁরা যে দরবারী শিল্পের প্রয়োজন অনুভব করেননি বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে রাজকীয় বা দরবারী শিল্প আত্মপ্রকাশ করেনি—এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রকৃত চক্রবর্তীত্বের ধারা মৌর্য রাজবংশের সঙ্গেই বিলোপ পেয়েছিল এবং শুঙ্গবংশীয় সম্রাটদের দরবারী শিল্পের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে গতানুগতিক সংস্কার থেকে এক পা এগিয়ে শিল্পে পাথরের ব্যবহার উৎসাহ দিয়ে ভারত-শিল্পে এক যুগবিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী শিল্পে পাথর ব্যবহার করে প্রচলিত দরবারী ও রাজকীয় শিল্পকে স্থায়ী উপকরণে রূপায়িত করে থাকলেও তাঁর উত্তরাধিকারী শুঙ্গবংশীয় সম্রাটেরা তা করেননি। এই কারণেই অনেকে মনে করেন যে দরবারী শিল্পের ধারা অশোকেই আরম্ভ ও অশোকেই শেষ; শুঙ্গরাজাদের আমলে বৌদ্ধরা যে স্তূপপ্রাচীর নির্মাণ করেছিল তাতে প্রচলিত লোকশিল্পেরই প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্রাট অশোক শিল্পের উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহার প্রবর্তনের আগে অনুমান হয় যে উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহারের বিশেষ অনুমোদন ছিল না।

পরেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘকাল শিল্পকর্মে পাথরের ব্যবহার করেন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব পাথরের মূর্তি বা অন্যান্য শিল্পকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তা হয় বৌদ্ধ বা জৈন সম্প্রদায়ের বা বিদেশাগত রাজন্য বা রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা কি কারণে পাথরের ব্যবহার করেননি তার কোন কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তরে রচিত ভাস্কর্যে ক্রমে লোকশিল্পের পর্যায় থেকে অভিজাত শিল্পে ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়। মনে রাখা দরকার যে এই পর্যায়ের শিল্পের দেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আর সম্রাট বা রাষ্ট্র পরিচালক অভিজাতগোষ্ঠীকে পাওয়া যায় না; এই আমলের দেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে

অধিকাংশই শ্রেষ্ঠী বা বণিক এবং শিল্পী-শ্রেণীর লোক। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ছিলেন যবন (গ্রীক্) বা শক (কুষাণ) বংশীয় নরপতিরা।

অবশ্য এ যুগেও অভিজাত শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই সাধারণের উপভোগের শিল্প সমান দীপ্তির সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্রমে অভিজাত শিল্প প্রধানত ধর্মকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হতে থাকে—প্রতিমা, চিত্র এবং মন্দিরে এই শিল্পের অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করে। দীর্ঘ পরিশীলন ও ধ্যানলব্ধ আত্মজ্ঞান এই শিল্পের মাধ্যমে যখন অভিজাত ও অনভিজাত নির্বিশেষে সকলকে অভিসিঞ্চিত করছিল, লোকায়ত শিল্প কিন্তু সেই যুগেও ক্লান্তিগ্রস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত লোকায়ত শিল্পের বহু নিদর্শন বারাণসীর রাজঘাট, উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, বাংলার চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীরে এই লোকায়ত শিল্পেরই নূতন রূপবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ যাবৎ লোকশিল্প ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু যে না ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ প্রাচীরে, বুদ্ধগয়ার মন্দির পরিক্রমণ বেষ্টনীতে এবং উড়িষ্যার খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহামুখে পাথরের গায় খোদাই করা কাঠ, মাটির তৈরী মূর্তি এবং পটে আঁকা ছবির অনুসরণে তৈরী বহু চিত্রালেখ্য ও মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক যুগের লোকশিল্পের প্রত্যক্ষ সন্ধান পাওয়া না গেলেও ধর্মীয় প্রেরণায় শ্রেষ্ঠী বা শিল্পীগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় রূপায়িত এই সব শিল্পকর্মের আকৃতি, বিন্যাস ও দেহ গঠনে সমসাময়িক লোকশিল্পের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই শিল্প নিতান্তই ধর্মভিত্তিক এবং সমসাময়িক লোকশিল্পের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন পরিচয় এই সব শিল্পে পাওয়া যায় না। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রে নির্মিত মন্দিরে শিল্পীকে বিষয়বস্তু নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল বলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত কৃষ্ণলীলা বা শিবলীলা বিষয়ক প্রস্তর ফলকগুলি হয়ত মন্দির নির্মাণের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাণের শেষে মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকেরা এই ফলকগুলি সংগ্রহ করে মন্দির প্রাচীরে খচিত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস করেন। অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ সুন্দর ও সুঠাম গঠনের ফলকগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন গোঁড়ামিকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি, তেমনি মাটিতে গড়া ফলকগুলির ক্ষেত্রেও তাদের গোঁড়ামির অভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই ফলকের বিষয়-বস্তুগুলি নিতান্তই সমাজ নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ ধর্মাশ্রয়ী বলে কোন মতেই অনুমান করা যায় না। আবার যে সমাজের ছবি এই ফলকগুলিতে দেখা যায় সেই সমাজও সভ্য, বর্ণশাসিত সমাজ নয়। আদিবাসী, বর্ণবহির্ভূত নরনারী, নর্তক, নর্তকী, বাদক ইত্যাদি ও বিবিধ জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে সমৃদ্ধ এই ফলক-গুলি সে যুগের পারিপার্শ্বিক সমাজের ও জগতের নিখুঁত আলেখ্য এবং সমাজ সচেতন লোকশিল্পীর প্রতিভার সৃষ্টি বলেই অনুমান করা যেতে পারে। উপকরণ হিসাবে মাটি লোকশিল্পেরই উপজীব্য; নির্মাণ কৌশল এবং নির্মিত মূর্তি এবং দৃশ্যের বিন্যাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে এবং পশুমূর্তির চিত্রণে যে আদিম এবং প্রারম্ভিক শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই মন্দিরেরই সংলগ্ন অভিজাত শ্রেণীর মূর্তি ও ফলক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং প্রচলিত লোকশিল্পের ধারার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। মন্দির প্রাচীরে এই ধরণের ফলকের ব্যবহার যে এ যুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল

পূর্ববঙ্গের বানগড়, মহাস্থান, সাভার এবং ময়নামতি থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ফলক থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সাধারণ মানুষের আবেগপ্রবণ আদিমধর্মী জীবন-সমৃদ্ধ শিল্পের অন্যতম অভিব্যক্তি হিসাবে এই ফলকগুলি চিরকালই সমাদর লাভ করবে।

এই আবেগপ্রবণতা ও প্রাণধর্ম বাংলার শিল্পকর্মে দীর্ঘকালের জন্য আসন গ্রহণ করে থাকলেও সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান আক্রমণের পর প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বহু সৌধ ও মন্দির একে একে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে থাকে; নূতন কোন প্রয়াসও বহুকাল রূপ গ্রহণ করতে পারে নাই। মুসলমান আক্রমণের প্রথম বিপর্যয়কে অতিক্রম করে সমাজকে আত্মস্থ হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল; ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা পুনরায় ভাল করে মাথা তুলতে পারে নাই। তবে তার আভ্যন্তরীণ শক্তি সাময়িক ভাবে নির্বাপিত যজ্ঞাগ্নির মতই প্রধূমায়িত অবস্থায় ছিল; অচিরে অনুকূল আবহাওয়ায় দীপ্তিমান হয়ে উঠতে তার বিলম্ব হয় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস পথে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহাগ্রন্থ বাংলার সেই দুর্দিনে দৃঢ় অবলম্বনের মতই ছিন্ন ভিন্ন সমাজ ও মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ের পথে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব বহন করেছিল। এই গ্রন্থ দুইটিতে সে যুগের বাঙ্গালীর মনের গতির দিক নির্দেশও লক্ষ্য করা যায়। এই রামায়ণ ও মহাভারত রচনার কালেই বাংলাদেশ আবার মন্দির নির্মাণের প্রয়াসে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আবার কর্মের সাড়া পড়ে যায়। সেই যুগ থেকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলায় কত যে ছোট বড় মন্দির নির্মিত হয়েছে তার কিছু সংখ্যা নির্ণয় এখনও হয় নাই।

বাংলার সংস্কৃতি ভাণ্ডারে মুসলমান আমলে নির্মিত এই মন্দিরগুলি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মহাকাব্য এবং অন্যান্য নানা কবির রচিত মঙ্গল কাব্যগুলির মতই অমূল্য সম্পদ; নিশ্চিত বিলোপের পথ থেকে আত্মরক্ষা করে বাঙ্গালী যে দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পেরেছিল, এই সব উপকরণে তার সাক্ষ্য অতি স্পষ্ট।

এই মন্দিরগুলিতে একদিকে যেমন বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে বাঙ্গালীর জনশিল্পের পরিচয়েও এইসব মন্দির অতিশয় সমৃদ্ধ। অধিকাংশ মন্দিরের প্রাচীরই অসংখ্য ফলকে অলঙ্কৃত হয়ে প্রভূত শোভা ধারণ করে বিরাজ করত। মুসলমান আমলের বাংলাদেশে নির্মিত মন্দিরগুলির গঠনকৌশলে মন্দির প্রাচীরে খচিত চিত্রফলকগুলিতে যে প্রতিভাদৃপ্ত শিল্প-কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য কোন পরাধীন জাতির ইতিহাসে অনুরূপ শিল্পকর্ম সৃষ্টির পরিচয় আমার অজ্ঞাত। সত্য বলতে কি রাজনৈতিক পরাধীনতা যে বাঙ্গালীকে কখনই পঙ্গু করতে পারেনি, তার প্রাণের সঞ্চয় যে কখনও নিঃশেষ হয় নাই মুসলমান আমলে রচিত বাংলা সাহিত্যে, শ্রীচৈতন্যের প্রবল ধর্ম আন্দোলনে এবং মন্দিরাশ্রিত বিপুল শিল্পকর্মে তার প্রমাণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

এই যুগের মন্দির প্রাচীরে খচিত চিত্রফলকগুলিতে পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ও ময়নামতির মৃৎফলকে উত্তরাধিকার কালোপযোগী পরিণতি লাভ করেছিল। সময়ের পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি মন্দির প্রাচীর সংলগ্ন ফলকগুলিতেও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত মন্দিরের আকৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলার হরিৎ শস্যক্ষেত্র এবং শ্যাম বৃক্ষ-পল্লব শোভিত সমতল বিস্তৃতির পটভূমিতে যে চালাঘরকে নিয়ে বাঙ্গালীর জীবন, সেই চালাঘরকে অবলম্বন করেই বাঙ্গালী তার মন্দির নির্মাণ করল। মন্দির নির্মাণের প্রচলিত ও শাস্ত্রীয় বিধিনির্দিষ্ট উপকরণ ছিল পাথর, এই পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় বাঙ্গালী তার ব্যবহার ত্যাগ করল; ব্যবহার করল ইট; তেমনি শাস্ত্রীয় আকৃতির সর্বতোভদ্রাদি নক্সা ত্যাগ করে চালাঘরকেই সে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করল। চালাঘরের গৃহ-মুখ বিস্তৃত এবং মন্দিরের সম্মুখভাগও বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে দেখা দিল। শিল্পী দেখল এ এক অপূর্ব সুযোগ; পোড়ামাটির ফলক নির্মাণে তার পারদর্শিতা বহু যুগের। এই ধরণের ফলক পর পর জুড়ে দিলে মন্দিরে বিস্তৃত সম্মুখের ক্ষেত্রেও তার ন্যাড়া ন্যাড়া ভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে প্রযুক্ত শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত হয়ে উঠবে। মন্দিরের প্রাচীর সুন্দর করে সাজাবার জন্য এক যথোপযুক্ত শিল্পধারার প্রবর্তন হল; টুকরো টুকরো করে ছাঁচে তৈরী করে অনেকগুলি চিত্রফলক হয় মন্দিরের গায়ে জুড়ে দেওয়া হত; নয়ত প্রাচীরের গায় পাতলা আস্তরণের মত টালি লাগিয়ে নরুণ পাটানি দিয়ে খোদাই করে ছবি ফুটিয়ে তোলা হত। এমনি করে নূতন কৌশলে রচিত এক সমৃদ্ধ চিত্র সম্পদ আত্ম-প্রকাশ করল যার বিষয়বস্তু প্রধানত রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলা নির্ভর। এ ছাড়া বৃষবাহন শিবের নানা ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত চিত্রফলকও অনেক মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করল। মন্দিরের পর মন্দিরে ছোট বড় অসংখ্য ফলকে কত যে বিচিত্র দৃশ্য, কত নৃত্যগীতের বৈচিত্র্য, কত দেবদেবী, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত জীবন কাহিনী মুখর আবেগে শোভাযাত্রা করে চলেছে অন্তহীন প্রাণচঞ্চল এক মনোহর গতিভঙ্গে।

এই ফলকগুলির নির্মাণ কৌশল অনুধাবন করলে কয়েকটি রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাঁচ থেকে তৈরী করে মন্দিরের প্রাচীরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এ রকম কিছু ফলক কয়েকটি প্রাচীর থেকে পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত কৃষ্ণকুব্জা সংবাদ সম্বলিত কয়েকটি ছাঁচে ঢালা ফলক আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অধিকাংশ ফলকই অবশ্য এক এক খণ্ড টালিকে প্রয়োজন মত খোদাই করে তৈরী করা। তবে কোথাও কোথাও একই দৃশ্যের ভিন্ন অংশ একাধিক ফলকেও খোদাই করা হ'ত। এইসব ক্ষেত্রে একই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাধিক ফলকে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলারও পরিচয় পাওয়া যায়; মন্দিরের অলঙ্করণে প্রধানত ধর্মভিত্তিক বিষয়বস্তুরই ব্যবহার প্রচলিত ছিল সমধিক। বিশেষ করে প্রবেশ দ্বারের ঠিক উপরে রাম-রাবণের যুদ্ধের বলদৃপ্ত গতিমুখর ছবি অধিকাংশ মন্দিরের শোভাবর্ধন করত। এ ছাড়া সীতার বিবাহ এবং রামাভিষেকের দৃশ্যও বেশ আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে উৎকীর্ণ করা হ'ত। মুর্শিদাবাদের বড়নগরে রাণী ভবাণী নির্মিত মন্দিরের প্রাচীর সজ্জায় উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলী তক্ষণনৈপুণ্যে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল তার তুলনা বিরল। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দিরেও বিশেষ ক'রে শ্যামচাঁদের মন্দিরের ফলকগুলিও শিল্পগৌরবে সমৃদ্ধ। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী ও গৌড়াচাঁদের মন্দিরের প্রসিদ্ধিও কম নয়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চলে যে অসংখ্য চিত্রালেখ্য শোভিত মন্দির আছে অবিলম্বে তার

অনুসন্ধান করে তালিকা রচনা করা, এবং যত্নের সঙ্গে এই সমস্ত মন্দিরগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সমাজ চিত্র হিসাবেও এই মন্দির প্রাচীরের অনেক ছবিকেই বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে গণ্য করা প্রয়োজন। নরনারীর দেহগঠনে, পোষাক-পরিচ্ছদে, অলঙ্কারে, গৃহের আকৃতিতে ও অভ্যন্তর সজ্জার তৈজসপত্রের আসবাবে-আবরণে, পাল্কি, গাড়ী, নৌকো ইত্যাদি যানবাহনে, বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি হাতিয়ারে মুসলমান যুগের বিশেষ করে এই যুগের শেষ ভাগের একটা অপূর্ব নিখুঁত ছবি এই চিত্রগুলি থেকে গড়ে তোলা যায়। এই ছবিগুলিতে যেন সেই নবাব বাদশা তাদের রাজসভা, তাদের আশ্রিত জমিদার মনসবদার, সিপাই সান্ত্রী, পাইকবরকন্দাজ, ফরাদমশালচি, হারেমের মণিরত্ন সমালঙ্কৃত বেগম এবং তাদের বাঁদী ইত্যাদি নিয়ে একটা বিচিত্র সমাজ, একটা বিচিত্র জীবন প্রণালী, একটা চলমান ছন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যে জীবন এই বাংলারই ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, ফেলে রেখে গিয়েছে তাদের পায়ের চিহ্ন এর সহরে ও বন্দরে।

এই সমাজ জীবনের যারা ছিল কারিগর, যারা বহন করে নিয়েছিল এই জীবনের চাকা, নিজেদের মেহন্নত দিয়ে তাদেরও ছাপ পড়েছে এইসব চিত্রফলকে; বিগত দিনের বিস্তৃত ইতিহাসের চলচ্ছবি আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি; যা কিছু ছাপ তার রয়ে গেছে তা এই মন্দির প্রাচীরের গায়ে বৈশিষ্ট্যময় এই ফলকগুলিতে। বেশ নিখুঁত অভিজ্ঞতা নিয়ে সাধারণ চোখে দূর থেকে দেখা বিস্তৃত কর্মমুখর সমাজের ছবি ধরে রেখে গিয়েছেন সে যুগের জনতার শিল্পী; সাধারণ মানুষের দেখবার বুঝবার এবং উপভোগ করবার জন্য। মুসলমান আমলের বাংলার মন্দিরে উৎকীর্ণ কারুকার্য এবং চিত্রালেখ্যের বুঝি তুলনা নাই।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতে প্রাচীন লোক সংস্কৃতির যে সব ধারার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটেছিল বাংলার মন্দির শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরাজরা এদেশে জাঁকিয়ে বসবার ঠিক আগে রাণী ভবানী বড়নগরে যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাতেই মন্দিরে উৎকীর্ণ চিত্রালঙ্কারণের শেষ দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এর পর প্রাচীন আদর্শে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণি নির্মিত কালীমন্দিরই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এর পরে বাংলাদেশে বাংলারীতির আর কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির তৈরী হয় নাই। একটা প্রবল স্রোতধারা যেন বর্তমান যুগেরও প্রারম্ভে এইখানে এসে নিজেকে শেষবারের মত দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল—একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবসান ঘটল। পুরোপুরি রক্ষিত হলেও এর প্রাচীরে প্রচলিত ধারার চিত্রফলকের ব্যবহার দেখা যায় না। মন্দিরসজ্জার জন্য তৈরী মাটির ফলক এবং মূর্তি নির্মাণের কৌশল এইবার হারিয়ে গেল, বিলুপ্তি ঘটল একটা দীর্ঘকালের শিল্পধারার।

একদিকে মুসলমান যুগে প্রচলিত শিল্পধারাকে অবলম্বন করে যেমন মন্দিরের প্রাচীরে ব্যবহৃত সজ্জার ব্যাপক মৃৎফলকের প্রচলন হয়েছিল তেমনি এ যুগে নানা প্রয়োজনে তৈরী ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিরও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ, মূর্তিগুলির নির্মাণ কৌশল এবং আকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এগুলি প্রাক্ মুসলিম যুগের ক্ষুদ্রায়তন খেলনা বা ব্রত-পার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তৈরী পুতুলেরই সগোত্র। মুসলমান আমলের প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ জনপদগুলির কোন

বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান এখনও হয় নাই; ফলে এই যুগের ব্যবহৃত পুতুলের সঙ্গে বড় একটা পরিচয় ঘটে না। তবে প্রাচীন ক্ষুদ্রায়তন পুতুল নির্মাণে যে ছেদ পড়ে নাই পরবর্তী যুগে ইংরাজ আমলের তৈরী পুতুল থেকে তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়।

পুতুলের নির্মাণ ও ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন খুব কমে গিয়ে থাকলেও বাংলাদেশে পুতুলের প্রচলন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও গ্রাম বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পুতুল তৈরী হয় এবং সেই পুতুলের বেশ কাটতি দেখা যায় মেলাগুলিতে। তবে পুতুলের প্রচলন থাকলেও তার বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু পরিমাণে লোপ পেয়েছে এবং লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পুতুলের নির্মাণ ও কাটতিও কিছুকালের মধ্যেই লোপ পেয়ে যেতে পারে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনই প্রথম বাংলার অন্যান্য লোকশিল্পের সঙ্গে পুতুলের মূল্যবান ঐতিহ্যের দিকে শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এরপর বাংলার সংস্কৃতি প্রেমিক রাজকর্মচারী গুরুসদয় দত্ত পুতুলের মূল্যবোধে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম সর্বপ্রথম রীতিসম্মত ভাবে পুতুল সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে এবং বর্তমানে অন্যান্য অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পুতুল সংগ্রহ ও পুতুলের ধারাকে উৎসাহিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সংগ্রহশালাগুলিতে প্রদর্শিত পুতুলের রীতিপ্রকৃতি অনুসরণ করলে বহু অভাবিত তথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বাংলাদেশে প্রচলিত পুতুলের এমন কতগুলি শ্রেণী আছে যা দেখলে এ কথা প্রতীয়মান না হয়ে পারে না যে পুতুলের নির্মাণ কৌশল এবং আকৃতিতে একটা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রবহমান রয়েছে। এই ধরণের পুতুল কাদামাটি থেকে আঙ্গুলে টিপে তৈরী করা হয়; নাকটা এইসব পুতুলের পাখীর ঠোঁটের মতন নাকের দুদিক চাপা, মুখ বড় একটা নির্দিষ্ট নাই। অধিকাংশ পুতুলের গায় কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দেখান হয় না, তবে আলাদা করে মাটির লেত্তি থেকে তৈরী গয়না পুতুলের গায় বসানো থাকে; পুতুলের বুক আর চোখও কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদা মাটির ডেলা দিয়ে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়; চাচর দিয়ে কোথাও কোথাও বা পুতুলের গায় আঁচড় কেটে চোখ আর অলঙ্কার দেখাবার রেওয়াজও চোখে পড়ে। এই ধরণের পুতুলের অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াসসিদ্ধ দেহগঠন এবং চোখ, মুখ, হাত-পা, পরিচ্ছদ-অলঙ্কারের বাহুল্যহীন ইঙ্গিতনির্ভর দ্যোতনা প্রাচীন হরপ্পা সংস্কৃতির পুতুল শিল্পের সঙ্গে এই পুতুলগুলিকে সমগোত্রীয় করে রেখেছে। এই প্রবহমান ধারার পুতুলের ব্যবহার বাচ্ছাদের খেলার সামগ্রী হিসেবে যেমন চলে তেমনি দেখা যায় ব্রত উপলক্ষে তৈরী ষষ্ঠী বা অনুরূপ লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রে। ষষ্ঠী ঠাকুরের পুতুল সাধারণত ছেলে-কোলে-মায়ের আকৃতিতে তৈরী হয়; আশুতোষ মিউজিয়ামে ছয়টি সন্তান কোলে উপবিষ্ট একটী ষষ্ঠী মূর্তি আছে যার রূপসজ্জার আদিম প্রকৃতিতে গড়নের সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনায় শিল্প কর্মের এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। গোবর, পিটুলী, সর ইত্যাদি নানা উপকরণে এইসব পুতুল তৈরী হলেও কাদামাটিতে তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া পুতুলের প্রচলনই এই জাতের বিশেষত্ব। অপূর্ব লাল রঙের এক ধরণের পুতুল মৈমনসিং ও কুমিল্লা অঞ্চলে তৈরী হত; ওখানকার শিল্পীরা এখন কিছু আসামে কিছু পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে এবং কিছু পরিমাণে এই ধরণের পুতুল এখনও তৈরী করছে। এই সুন্দর

বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিমধর্মী পুতুলগুলিতে সাধারণত বর্ণানুলেপনের কোন প্রয়াস দেখা যায় না ; কিন্তু অন্যান্য জাতের পুতুলের মধ্যে বর্ণানুরঞ্জিত পুতুলের প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা সহজেই নজরে পড়ে। আজও বাংলাদেশে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বছরের নানা সময় নানা ধরণের মেলা বসে ; আর এইসব উৎসব সংশ্লিষ্ট মেলাকে আশ্রয় করে পুতুল ব্যবসায়ীদের সমাগম ঘটে। ইতিপূর্বে জাপান ও জার্মানী থেকে আমদানী করা সস্তার চীনেমাটির পুতুল এবং বর্তমানে প্লাষ্টিকের গোত্র পরিচয়হীন ছন্দবিবর্জিত পুতুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচলিত ধারার এইসব পুতুলের প্রচলন কমে গিয়ে থাকলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নাই। এই ধরণের পুতুলের অন্য এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তথাকথিত কৃষ্ণনগরের পুতুল। এইসব পুতুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও প্রচলিত ধারার পুতুল এখন বাজারে চলছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার এইসব পুতুল ব্যবসায়ীকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপযুক্তভাবে এই পুতুলকে বাঁচিয়ে রাখা বিশেষ আয়াসসাধ্য। যে কয়েকটি কেন্দ্রে এখনও পুতুল তৈরী হয় তার মধ্যে হুগলী জেলার নূতন গ্রাম, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, চব্বিশ পরগণার মজিলপুর, নদীয়ার নবদ্বীপ ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কালীঘাটে এক সময়ে একটি সুন্দর ছন্দের কাঠের পুতুলের প্রচলন ছিল ; দুঃখের বিষয় এই ধারার পুতুল এখন আর বড় একটা তৈরী হয় না।

বীরভূম এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের পুতুলের গড়নে লম্বা চোঙের মত শরীর এবং সরু বাঁকানো চোঙের আকৃতির হাত ; এক হাত কোমরে অন্য হাত মাথার ওপর কিছু ধরা অবস্থায় দেখা যায়। ওল্টানো কল্কির মত শরীরের নীচের অংশ ঘাগরার মত অনেক ক্ষেত্রে লম্বা লম্বা টানা রেখাবিশিষ্ট। ওল্টানো কল্কির মত শরীর এবং বাঁকানো চোঙের মত হাত অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুতুলের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন তবে বর্ণানুরঞ্জিত এই ধরণের পুতুলের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল বলেই অনুভূত হয়। এই অঞ্চলের কোন কোন পুতুলে অভ্র থেকে সাদা রঙের প্রলেপ দেখা যায়।

নতুন গ্রামের পুতুলের গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরী পুতুলগুলির সজীব এবং বর্ণাঢ্য আবেদন সহজেই শিশুরমনকে আকৃষ্ট করতে পারে ; এই রীতির পুতুলেরই সগোত্র এক ধরণের প্যাঁচার মূর্তি দেখা যায় ; গড়নের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণের দ্যোতনায় এই প্যাঁচাগুলি খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত নবদ্বীপের বাজারে এই ধরণের প্যাঁচার সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর বাহন এই প্যাঁচা এক সময়ে সম্পদ বৃদ্ধির দ্যোতক হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নাড়াজোলের পুতুলের গড়নের বৈচিত্র্য এবং বর্ণ প্রলেপে নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই পুতুলগুলি সাধারণত সাত আট ইঞ্চি উঁচু হয়, মূর্তিগুলি তৈরী করে প্রথমে তার গায় খড়ি গোলা লাগানো হয়। তারপর গিরিমাটি, হত্তেল, নীল, প্রদীপের কাজল, আর মেটেসিঁদুর গুলে রঙ করা হয়। তারপর বেলের আঠা দিয়ে তৈরী এক রকমের প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়ান হয় ; এই প্রলেপের অন্য একগুণ বর্ণের উজ্জ্বলতাকে মলিন হতে না দেওয়া আর ধুলোবালি থেকে পুতুলের রঙকে রক্ষা করা। রাধাকৃষ্ণ গৌরনিতাই ইত্যাদির মূর্তি ঝাঁপিকোলে লক্ষ্মীমূর্তি, সন্তান কোলে মাতৃমূর্তি, কেড়ে মাথায় গয়লানী, লালপেড়ে শাড়ীপরা গেরস্থ বউ নাড়াজোলের পুতুলের বিষয়বস্তু। এইসব পুতুলে যেমন একটা শান্ত বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি আছে তেমনি সাধারণ মানুষের সচ্ছন্দ

জীবনের একটা পরিশীলিত আমেজ পাওয়া যায়। এই পুতুলগুলি নিতান্তই গ্রামীণ মানুষের প্রিয় জিনিষ, তাদের সরল মনের গৃহগত আকর্ষণ, ভালবাসা এবং চিত্তবৃত্তির পরিচয়ে সমৃদ্ধ।

মজিলপুরের পুতুলের গড়ন ফাঁপা চোঙের মত, দু'ভাগে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে কুমোরের চাকের হাড়ি থেকে তৈরী, মুকুট মাথায় দক্ষিণরায়ের মূর্তিগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে পুতুল গড়তে এই হাঁড়ীর ব্যবহার খুব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের দেবতা; এই দক্ষিণরায়ের সঙ্গে অনেক কিংবদন্তী, অনেক প্রচলিত কাহিনী জড়িত আছে। অদ্ভুত দর্শন মুকুট শোভিত এই দক্ষিণ-রায়ের মূর্তিতে যে আদিম উগ্রতা এবং রাজকীয় শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রচলিত লোক-শিল্পের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অসাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিন্দুদের পূজিত দক্ষিণরায়ের অনুকল্প মুসলমানদের বনবিবির মূর্তিগুলিও প্রচলিত ধারায় দক্ষিণরায়ের মূর্তির মতই।

এইসব বিশিষ্ট পর্যায়ের পুতুল ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া নানা বৈচিত্র্যে শোভিত নানা ঢংএর পুতুল আশুতোষ মিউজিয়াম, আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রির ক্রাফ্ট মিউজিয়াম, পশ্চিম বাংলা সরকারের শিল্প দপ্তরের বিভাগীয় মিউজিয়াম এবং ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব পুতুলের উপকরণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। মাটি ছাড়া কাঠ আর ন্যাকড়ার কিছু কিছু পুতুলও এইসব সংগ্রহে আছে।

পুতুলের জন্ম কি সূত্রে হয়েছিল তা আজ গবেষণার বিষয়। তত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যাদু-ক্রিয়ার অনুসঙ্গরূপেই পুতুলের জন্ম হয়। পরে শিশুদের হাতে খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও পুতুলের সেই প্রারম্ভিক আবেদন কোনদিনই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আদিম সমাজের এবং মনের যে সংবেদন অনেক হাজার বছর আগেকার পুতুলে দেখা যায় বর্তমানে প্রচলিত অনেক পুতুলেও তার আভাস অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; মানুষের মনের বিবর্তন ঘটেছে; পরিবর্তন ঘটেছে অনেক বিশ্বাসের। ক্রমে মানুষের মন অধিকতর যুক্তি নির্ভর হয়েছে; আদিম ভয় এবং অন্ধ বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন সমাজের সকল স্তরকে সমান ভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। অনেক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কোন কোন সমাজ অনেক বিষয়ে আদিম পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। কোন কোন দেশে অগ্রসর সমাজ আপনার সামাজিক বিবর্তনের চাপে আদিম সমাজকে নিশ্চিহ্ন বা আত্মসাৎ করে নিয়েছে; এইসব দেশে আপাতদৃষ্টিতে আদিম সমাজের বিবর্তনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইউরোপে আদিম সমাজ আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাইরের প্রভাবকে বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করেছে; আফ্রিকামহাদেশে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে। বিপুল আমেরিকা মহাদেশ দুটিতে এই ধরণের আদিম সমাজ ইউরোপীয় আগন্তুক জনতার দ্বারা পরাভূত এবং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে ক্রমবিবর্তনশীল সমাজের নিকট সান্নিধ্যে আদিম সমাজগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে হাজার হাজার বছর ধরে জীবনযাপন করছে; তাদের সমাজ গঠন পদ্ধতি, তাদের জীবন-যাত্রা, তাঁদের বিশ্বাস ও ধর্ম

বাইরের প্রভাবে বড় একটা প্রভাবিত হয়নি। অন্যদিকে তথাকথিত অগ্রসর সমাজেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজ গঠন পদ্ধতি, নানাপ্রকারের যুক্তিহীন বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলি মানুষের সমাজ গঠনের আদিম স্তর থেকে খুব বেশী অগ্রসর নয়। একই পরিবারের পুরুষ ও নারী বিশেষে বিশিষ্ট ধরণের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার রীতির পরিচয়ও সহরেই দেখা যায়। পরিবারের পুরুষেরা যেখানে পুরাণের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে ধর্ম সাধনে তৎপর, ন্যায়-শাস্ত্রের জটিল যুক্তি-সর্বস্ব তত্ত্বে যাদের সহজ প্রবেশ তাঁরাও প্রতিমা পূজা, এবং বিবাহাদিতে আদিম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত অনেক আচার পালন করছেন। সেই পরিবারেরই মহিলারা আবার উপনিষদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত বিবর্তিত ধর্মীয় উপলব্ধিকে ব্রত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ আদিম বিশ্বাস এবং যাদুভিত্তিক ক্রিয়া কর্মে পর্যবসিত করে পালন করছেন। ভারতবর্ষের, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ মানুষের ধর্মীয় বিবর্তনের এক বিচিত্র পরীক্ষাক্ষেত্র। সমাজ মনের এই বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সচেতন না হলে বাংলার লোকশিল্প বিশেষ ক'রে পুতুলের রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বাংলায় প্রচলিত পুতুলের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের অসংখ্য স্তরের এবং ক্রমায়ত বিভিন্ন গড়নরূপ এবং সংবেদনের এক প্রান্তে সংক্ষিপ্ত আদিম পর্যায়ের পুতুল অন্য প্রান্তে অত্যন্ত সুপরিণত সমাজের নারী-মূর্তি যার পরনে উধ্বর্বাস এবং লালপেড়ে সাদা শাড়ি। এই দুইপ্রান্ত সীমার মধ্যে হাজার রকমের পুতুলের বিচিত্র রকমের গড়ন, বহু বিচিত্র যার ব্যবহার, নানা সংবেদনে যা সমৃদ্ধ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পুতুল মাত্রেরই মৌলিক রূপ বা গড়ন আদিম পর্যায়ের পুতুলেরই সগোত্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বভাবানুগ আকৃতি পুতুলের জগতে খুব জনপ্রিয় নয়; বরং অত্যন্ত সংক্ষেপে নাক, মুখ, হাত, পা তৈরী করাই ছিল আদিম ধরণের পুতুলের বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের পুতুল স্বভাবতই হাতের আঙুলের সাহায্যে তৈরী। ক্রমে এই ধরণের পুতুলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু স্বভাবানুগ করে করবার চেষ্টা হতে থাকে; উলঙ্গ এবং অলঙ্কার বর্জিত পুতুলের গায় অলঙ্কার আর আবরণ দেওয়া হল। সভ্যতারপথে পুতুলের অগ্রগতি হল সুরু। কিন্তু পুতুলের মৌলিক রূপটি এতেও বদলায় নি। এর পরের স্তরে এল বর্ণানুলেপন; অনেক পুতুলের গায় সুন্দর রঙ্ লাগান হল; রূপ ও রুচির বিবর্তনে পুতুলেরও আকৃতি বদলাল। সমাজের রুচির আরও বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় পুতুলনির্মাণে ছাঁচের ব্যবহারে। ছাঁচ ব্যবহারে একটা সুবিধা হল, একই ধরণের পুতুল একই ছাঁচ থেকে একাধিক তৈরী করা সম্ভব হল। কিন্তু বংশানুক্রমে আয়ত্ত করা পটুত্বে ছাঁচ ব্যবহার না করেও পুতুল নির্মাতারা এমন পুতুল তৈরী করত যাতে এক ধরণের একটি পুতুল থেকে অন্য একটি পুতুলকে পৃথক করা সম্ভবপর হয় না। অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে কারিগরেরা পুতুলের পর পুতুল তৈরী করত; ঠাকুর্দা থেকে বাপ, বাপ থেকে ছেলেতে এই নির্মাণ কৌশল বর্তাত; সেই কাদামাটি, সেই মাটিকে ছেনে পুতুল করবার উপযুক্ত করে নেওয়া, তাতে মাপমত একটু চুণ একটু গোবর মেশান। পুতুলের চোখ মুখ হাত-পা শরীর ঠিক একই ধাঁচের একই রসের ভিয়ান দিয়ে তৈরী করে বাজারে উপস্থিত করা হত; যারা পুতুল সংগ্রহ করে নিত তারা চিরাচরিত সেই রসেরই রসিক। কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই এই পুতুলের অর্থ বোধ হত; এই রস গ্রহণ করবার জন্য লোককে উৎসাহিত করতে হত না। এই সমাজ যেমন প্রত্যেকটি

পুতুলের গড়ন, আকৃতি ঢং এবং বর্ণ থেকে রস ও আনন্দ আহরণ করতে পারত, সেই আদিম আকৃতির পুতুল থেকে মার্জিত গড়নের আধুনিক সমাজের ছবি পর্যন্ত সমস্ত পুতুলই ছিল তাদের প্রিয়। প্রত্যেক শ্রেণীর পুতুল প্রায় সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের চিত্ত বিনোদন করত। সমাজিক বিবর্তনের নানা পর্যায়ের এবং নানা স্তরের এমন সুন্দর ছবি পুতুলের রাজ্যের বাইরে আর কোথাও বড় পাওয়া যায় না। এইসব পুতুল সাধারণ মানুষের যেমন নানা প্রয়োজন মেটাত, জোগান দিত নানা রসের তেমনি সাধারণ কারিগরের বিশদ পর্যবেক্ষণের এবং দেখা জিনিষকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় বহন করত। ধর্মীয় চিন্তা এবং সামাজিক রীতিনীতি ছাড়াও পুতুলগুলি বিশেষ করে শিশুদের দেখা জিনিষের গড়ন সম্পর্কে সচেতন করবার উপকরণ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করত। শিশু বয়স থেকে অসংখ্য বিচিত্র ধরণের পুতুল দেখে, হাতে ধরে এবং ভেঙ্গেচুরে এবং জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে রূপ বা গড়নের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে ধারণা জন্মাত তা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের হওয়া দুষ্কর। বাজারের কেনা পুতুলের অনুপ্রেরণা থেকে শিশুদের নিজেদের হাতে পুতুল গড়ার উৎসাহ জন্মাত। এতেও আকৃতির বিশিষ্টতা সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিপুষ্ট হত, সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় রূপের নানা বিশিষ্টতার রস গ্রহণের পক্ষে এই অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিমেয়। আজকের পুতুল বাজার ছেড়ে সংগ্রহশালার আধারে সযত্নে স্থান সংগ্রহ করেছে। দূর থেকে তার রূপানুধ্যান এবং রস গ্রহণ করতে হয়। এতে পুতুলের মর্যাদা বেড়ে থাকলেও সমাজ তাতে লাভবান হয়নি; সমাজে ব্যাপকভাবে পুতুলের প্রচলনের অবসানের ফলে বিশেষ করে শিশু সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ করা সহজ নয়।

মনের বাঘ

গৌরকিশোর ঘোষ

হামজার চোখ টলটল করছিল। খানিকটা মদের প্রভাবে, খানিকটা আবেগের প্রাবল্যে। হামজাও অভিনেতা। ও যে আবেগের দাস, সেটা এতদিন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবের তলায় দিব্যি লুকিয়ে রেখেছিল। একটা নিরাসক্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় সহস্র সাফল্যমণ্ডিত রজনী সে দিব্যি হাততালি কুড়িয়ে এসেছে। এইমাত্র সে যেন তার মেক-আপ তুলে আসলরূপে বেরিয়ে এল। অথবা, এইটাই কি তার আসল রূপ ?

ছোট্ট অপরিসর সেই দেশি মদের দোকানটার ধুলো ঢাকা বাল্‌ব ভেদ করে যেটুকু আলো বেরিয়ে আসছিল, তাতে হামজাকে একটা বৃদ্ধ গৃধিনীর মত দেখাচ্ছিল। বেঞ্চিতে বসে মদের গ্লাসের দিকে সে ঝুঁকে রয়েছে—একটা গৃধিনীই যেন ডালের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

"ভালবাসার জন্য নয়,"···সামনের রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে, বাসের তীব্র হর্ণ, ট্রামের ঠং ঠং হামজার স্বরকে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে দিল, "আমি মুকুলকে ঠিক ভালবাসিনি"···ট্যাক্সি এসে একটা ঠেলাকে ধাক্কা মেরেছে। তুমুল ঝগড়া। "শালা যত্তো জোটে আমারই কপালে, শান্তিতে মালও টানতে দেবে না"—ও পাশের মাতালটা কঁকিয়ে উঠল। "না ভালবাসা নয়," হামজা আবৃত্তি করল। ট্রাকের জোরালো হর্ণে পৃথিবী চিরে গেল। "আমার ইয়ে খাও শালা"—মাতালটা অভিসম্পাত দিল। "আমি খতম।" হামজা বিড়বিড় করল, "আমার বয়েস হয়েছে, এখন যৌবনের কাছে ভিটে বিকিয়ে আমাকে কেটে পড়তে হবে। আমি হেরে গেলাম। জীবনে এই প্রথম আমি হার মানলাম।"

বললাম, "কাৎরাচ্ছ কেন ?" বাস ট্রাক ট্যাক্সির হর্ণ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। মাতাল খিস্তি ছুঁড়তে লাগল। "আমি মুকুলকে ভালবাসি না। তুমি ওকে নিতে পার।" হামজা বলে উঠল, "মুকুলকে কে ভালবাসে ? ভালবাসার কথা কে বলছে ? আমি বলছি আমার হারের কথা। যে জোরে তুমি আজকের বাজী জিতেছ, আমি তার কথাই বলতে চাইছি। সেই জোরই আমার নেই। সেই যৌবনই আমার নেই। আমি আমি (যান্ত্রিক গোঙানিতে ওর স্বর ডুবে গেল) জরাগ্রস্ত। তুমি যে মার ("মার মার, শালাদের ধরে ধরে ইয়েতে গঙ্গাজল ভরে দে"—মাতাল লাফাতে লাগল) দিয়েছ, সে মার যৌবনের মার। আমি খতম।"

"ভালবাসা জীবনে সর্বক্ষণ গুরুত্ব অধিকার করে থাকে না। সব সময় কেউ ভালবাসায় ডুবে থাকতে পারে না। জীবনের আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আমি তা জানি। আমি সেজন্য গোঙাচ্ছি না, ইডিয়ট। আমার কাৎরানি আমার পরাজয়ের জন্য। এমন অসহায় আমি আর কখনও বোধ করিনি।"

"ছাখ," হামজা একদিন কফি হাউসের চেয়ার থেকে বলেছিল, "এই জীবনে সব চেয়ে বড় জিনিস কি, তা বলা মুস্কিল। সম্ভবত কিছু নেই। সম্ভবত আছে। সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এক একটা

জিনিস বড় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিভেদে জীবনের গুরুত্বভেদ ঘটে। অধ্যাপক সত্যেন বোসের জীবনে রিলেটিভিটি তত্ত্ব অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, অতুল্য ঘোষের জীবনে পলিটিক্স, রামকিঙ্করের জীবনে শিল্প সাধনা, স্যর বীরেনের জীবনে ইন্ডাস্ট্রি, তেমনি এমন লোকও আছে, আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আছে, যার জীবনে কোষ্ঠকাঠিন্যই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

"তাছাড়া, জীবন কথাটার মধ্যেই এমন ফাঁক আছে যে, শুধুমাত্র এই শব্দটার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তেও পৌছানো যায় না। কোন ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়-সীমা, এইটেকেই যদি জীবন ধরি, তাহলেও কোন সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে না, কারণ এই সময়-সীমা একটিমাত্র জীবন নয়, অসংখ্য জীবনের সমষ্টি। সময় যেমন অসংখ্য মুহূর্তের সৃষ্টি। এই মুহূর্তগুলো ব্যক্তির অস্তিত্বকে মুহূর্মুহু নানা ছাঁচে ঢালাই করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ বদলাচ্ছে, তার ঢঙ বদলাচ্ছে। কাজেই আমরা যেমন কেউ একটা মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারিনে, তেমনি একটা তত্ত্ব, একটা সত্য, একটা সিদ্ধান্ত সম্বল করেও বাঁচতে পারি নে। আদালতের 'হাঁ' কি 'না' জীবনে প্রয়োগ করা প্রচণ্ড মুর্খামি।

"জগৎ অসংখ্য অণুর, সময় অসংখ্য মুহূর্তের, জীবন অসংখ্য অনুভবের সমষ্টিমাত্র।" হামজা আরেকদিন বলেছিল, "আমরা কিন্তু এই আণবিক সংগায় বাস করি নে। আমরা বাস করি এই তিনের সৃষ্ট একটা প্যাটার্নের মধ্যে। যে প্যাটার্নকে এস্কেপিস্ট্ ফিলসফাররা বলেছেন স্বপ্ন অথবা মায়া অথবা মতিভ্রম। এই মায়া আর কিছুই নয়, আমার মতে আমাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ভেদ, অভিজ্ঞতার মূল্যভেদ।

"১৯৩০ সালে আমি ভেবেছিলাম, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আমি বৃটিশদের তাড়াতে পারব। এখন আমার কাছে তা মতিভ্রম। কিন্তু ১৯৩০-এ, সেই সতেরো বছরের আমির কাছে—সেই অগ্নিগর্ভ রাজবন্দীর কাছে সে দিনের সিদ্ধান্ত ছিল তোমার আমার অস্তিত্বের মতই সত্য। হিজলির কারান্তরালে বসে যেদিন শুনলাম আমাদের এই অতর্কিত গ্রেপ্তারের পিছনে আমার বাবার হাত আছে, আমার বাবা ঘৃণ্য এক ইন্ফরমার, সেদিনকার আমি ক্রোধে, ঘৃণায়, প্রতিহিংসা গ্রহণের সংকল্পে আর পাঁচজনের মতই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার বাবার বিচারকরা আমার সামনে বসে যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিল, তখন তার সমর্থনে আমি আমার অকম্পিত হাত তুলে ধরেছিলাম। এই সিদ্ধান্ত বাইরে পাঠাবার দায়িত্ব আমার উপরেই পড়েছিল—সম্ভবতঃ আমি তাঁর, এক বিশ্বাসঘাতক চরের, এক দেশদ্রোহীর ঔরসজাত ছিলাম বলে—আমি আমার দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠিত হইনি। সেদিন আমার কাছে সব চাইতে বড় ছিল 'দেশ'। যে বাবা নিজে না খেয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, ওভারটাইম খেটে আমার পড়ার খরচ জুগিয়েছিলেন, আমার কঠিন অসুখে চিকিৎসার খরচ যোগাবার জন্য ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন (আমার রোগ জর্জর দেহের উপর সেই ক্ষুধিত স্নেহ এখনও ভাসে: "বাপজান, তুই ভাল হয়ে ওঠ। তুই বাঁচলে আমার সব বাঁচবে")—এইসব ঘটনা তখন আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার চোখে এগুলো ছিল মায়া। এখনকার আমি এই কারণে খুশি, যে আমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যায়নি। এখন আমার আমাদের সেই আগেকার সিদ্ধান্ত মায়া বলে মনে হয়।

"১৯৩৯ সালে ভেবেছিলাম, হিটলার ঘাতক, ১৯৫০ সালে ভেবেছিলাম স্তালিন সভ্যতার শত্রু।

এখন সবই মায়া বলে মনে হয়। 'যেমন বর্তমান কংগ্রেসী শাসকদের কাছে গান্ধী দর্শন মতিভ্রম মাত্র। মানুষের দুনিয়ায় সবই সম্ভব। এখানে যেমন ভয়ানক উৎফুল্ল হবার কিছু নেই, তেমনি নিদারুণ হতাশ হবার কোন চিহ্নও খুঁজে পাই নে। অতীত যদি আমাদের কিছু দিয়ে থাকে, তবে ভবিষ্যৎও কিছু দিতে পারে। তবে তার সঙ্গে তোমার আমার ষোল আনা মতের মিল হয়ত—হয়ত কেন, একেবারে নিশ্চিত—নাও হতে পারে।"

"ভবিষ্যৎ", অবনী টেবিল থাপড়ে বলে উঠেছিল, "ভবিষ্যৎ আমাদের আরেকটা যুদ্ধ দেবে। আর দেবে ঘোড়ার ডিম।"

হামজা বলেছিল, "ঘোড়ার ডিম দেবে কিনা, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে যুদ্ধই যে দেবে, এ-কথা ভাবছ কেন?"

"বাঃ" অবনী বিরক্ত হল, "তুমি কি অন্ধ? দেওয়ালের লিখন পড়তে পাও না? বার্লিন নিয়ে কম্যুনিস্টরা কি কাণ্ড করছে, দেখতে পাচ্ছ না। ওরা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে ছাড়বে।"

"কম্যুনিস্টরাই শুধু যুদ্ধ বাধাবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে, এ-কথাই বা ভাবছ কেন?"

"ওরাই তো এখন মারমুখী।"

"তুমিও কি মারমুখো নও।"

"নিশ্চয়ই", অবনী বলল "নিশ্চয়ই আমি মারমুখো। কম্যুনিস্টদের সর্বগ্রাসী আধিপত্য থেকে বাঁচতে গেলে মারমুখো হতে হবে না।"

"কি বাঁচাতে চাও।"

"ডেমোক্রেসি, ফ্রীডম্‌, অস্তিত্ব।"

"লড়াই করে অস্তিত্ব রাখবে?"

"শেষ পর্যন্ত লড়াই ছাড়া আর কি উপায় আছে বল?"

"তবে কম্যুনিস্টদের ঘাড়ে যুদ্ধের সব দায়িত্ব চাপাচ্ছ কেন?"

"ওরা যে অ্যাগ্রেসিভ্‌। স্পুটনিক, গাগারিণ, এসব মহড়া দেখেও বুঝতে পারছ না। কি কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছে ওরা?"

"জর্জ স্টীফেনশন যখন লোকোমোটিভ তৈরি করেন তখন কি তিনি সৈন্য আর সমরসম্ভার পরিবেশনের জন্য তা করেছিলেন?"

অবনী এই কথায় চটে গিয়েছিল। বলেছিল, "জর্জ স্টীফেনশন কম্যুনিস্ট ছিলেন না।"

হামজা আরেকদিন বলেছিল, "ত্যাখ, আমি কম্যুনিস্ট নই। ১৯৪০এ ফ্রান্সের পতন ঘটাল নাৎসী সৈন্য, স্তালিন তখনও হিটলারের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। এই ঘটনাই আমাকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। তারপর থেকে বুঝেছি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রও চালবাজীকেই বেশি প্রাধান্য দেন। ওদের ফৌজও মুক্তি ফৌজ নয়। কিন্তু তাই বলে ওরা মানুষ নয়, রক্ত-পিপাসু রাক্ষস, একথা ভাবতে পারি নে। মানুষ যদি মূলতঃ বিবেচনাশীল হয়, তবে কম্যুনিস্টরাই বা বিবেচনাশীল হবে না কেন? রহস্য আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।"

"কম্যুনিস্ট সত্তা, ফাসিস্ত সত্তা, হিন্দু সত্তা, মোসলেম সত্তা, খ্রীষ্টিয়ান সত্তা, বলে কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।" হামজা আরেকদিন বলেছিল।

"ধর্মীয় গোঁড়ামীর কোন একটা শাসনে সসাগরা পৃথিবী সর্বকালে শাসিত হবে, এ একটা অবাস্তব কল্পনা"—হামজার আরেকদিনের উক্তি। "হিন্দু পারেনি, বৌদ্ধ পারেনি, খ্রীষ্টিয়ান পারেনি, মুসলমান পারেনি, ফাসিস্ত পারেনি, নাৎসী পারেনি। কম্যুনিস্টই এর ব্যতিক্রম হবে?"

"ভবিষ্যৎকে এত গুরুত্ব দেবার কোন মানেও হয় না।" অনেক বাক্যব্যয় করার পর হামজা প্রশান্ত ভাবে বলেছিল, (আরেকদিন, অন্য পরিবেশে), "আমার মৃত্যুর পরও যে জগৎ থাকবে, সে সম্পর্কে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি প্রাত্যহিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কারণ সেটা আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে।"

* * *

হামজার এখনকার পীড়িত মুখে সৌম্যের লেশমাত্র নেই। এই ঘুপসি মদের দোকানটার হতশ্রী চেহারাটার সঙ্গে হামজার এই ছন্নছাড়া মূর্তিটা বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি ট্রাক রিকশা ঠেলা একটা বিশৃঙ্খল হট্টগোল সৃষ্টি করেছে। সবাই আগে যাবার চেষ্টা করেছিল, এখন কেউই যেতে পারছে না। "ঝাঁটা মারি শালা বায়েলার মুখে। সেই বাগবাজার থেকে নিরিবিলিতে দু ঢোক মাল খাব বলে শালা এখানে এলাম, তা দেখ কাণ্ড। পোমা—পোমা—পোমা—অর্থহীন গোটাকতক শব্দ ছুঁড়ে দিল। এতক্ষণে ট্রাফিক পুলিশ এল।

হামজা তরল চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বলল, "ঘা'টা লেগেছে আমার অহং-এ। বড় রকমের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে এখন অনেকদিন ধরে এই ক্ষত চাটতে হবে।"

আমার হঠাৎ মুকুলের কথা মনে পড়ল। তাকে নিয়েই এত কাণ্ড, আর সে এখন কোথায়? তার দিদির বাড়িতে? নির্জনে শুয়ে আজকের, কয়েক ঘণ্টা আগের সেই অকর্কিত আক্রমণের কথা ভাবছে? না কি অন্য একটা ছোকরার সঙ্গে (একদিন ঝমঝম বৃষ্টিতে আমি দেখেছি একটা ছোকরা ছাতার আড়ালে মুকুলকে বাস স্টপ্ থেকে অফিসে পৌঁছে দিচ্ছে। সে ছোকরা কে, কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানিনে। দরকারই বা কি?) ফষ্টিনষ্টি করছে, না কি এতদিনকার তোলা ফটোর মধ্যে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে?

যা খুশি করুক মুকুল, আমাদের আর তাতে কিছু যায় আসে না। দুটি পুরুষের অন্তিম সংগ্রামের ফলাফল আজ ঘোষিত হয়েছে। একটি অহং জিতেছে। একটি অহং বসে বসে পরাজয়ের ক্ষত চাটছে জিভ্ দিয়ে আর মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। আমাদের আজকের অস্তিত্বে এইটেই সব থেকে বড় ঘটনা। আর সব তুচ্ছ।

* * *

"তুমি তো আমাকে দেখেছ, কলেজে পড়ার সময়," সুশীলা বলেছিল, "কি রকম লাজুক ছিলাম। কারো দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতাম না। সব সময় মনে হত, সবাই বুঝি আমার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে আমার এই শরীরটার দিকে। কেন যে একথা মনে হত আমার বলতে পারিনে। সম্ভবত মানসিক ব্যাধি। তার প্রধান কারণ, খুব বাচ্চা বয়েস থেকেই আমার

শরীরটা সুতোয় ঢাকা ছিল। বুলাকে আমি অনেকদিন পর্যন্ত খালি গায়ে থাকতে দেখেছি। সেজন্যই সম্ভবত ছোটবেলায় ওর স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল।

"শরীর সম্পর্কে সচেতনতা আমার চাইতে বুলার অনেক কম ছিল। এই কারণেই আমি সুবোধের ব্যাপারে ও রকম আপ্-সেট্ হয়ে পড়েছিলাম। সম্ভবত বুলাও তোমার ব্যবহারে আমার মতই আপ্-সেট্ হয়ে পড়ে থাকবে। তোমরা বুঝতে পারবে না, আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে শরীরটা কেমন একটা অদ্ভুত বস্তু।

"এখন আমার কোন শুচিবাই নেই। আমার সেই অধ্যাপক মশাই আমার এই দেহ-দেহ রোগ সারিয়ে দিয়েছেন। না, তার প্রতি এখন আর আমার রাগ বিদ্বেষ কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে দেখা হলে তিনি যখন 'মা মা' বলে গায়ে ঢলে পড়েন, সেই সময় গা-টা কেমন যেন ঘিন ঘিন করে ওঠে। ঠিক ঐ রকম একজন অফিসার এখানে আছেন। কথায় কথায় 'তুমি তো আমার মেয়ের বয়িসী' বলে গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেন।"

সুশীলার বলার ধরণে আমি হেসে উঠেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, ও কার কথা বলতে চাইছে। রঙ্গচারীকে উনিই উস্কে দিয়েছিলেন তা আমি জানি! সুশীলাকে আমি সাবধান করে দিতেই এসেছিলাম। সুশীলা শুধু হেসেছিল।

"তাহলে শোন," হাসতে হাসতে ও আবার শুরু করল, "ওর কথা কিছু বলি; আমি এখানে আসার পর, উনি আমার গার্জেন বনে গেলেন। প্রথম কথাই বললেন, 'বেশ মা বেশ, এইটুকু বয়েসে একা এতদূর এসেছ, তোমার সাহস আছে। তুমি আমার মেয়ের বয়িসীই হবে। কিছু সংকোচ করো না। এখানে একা থাকতে ভয় করলে আমার কোয়ার্টারেও চলে আসতে পার।' এই মা মা শুনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক মশাই-এর কথা মনে পড়ে গেল। আমি শুধু হেসে বললাম, অসুবিধে হলেই জানাব। সেই সূত্রপাত। তা তোমাকে বলব কি, আমাদের যুবক অফিসারবৃন্দও কম যান না। পটাপট সব সম্বন্ধ পাতাতে লাগল। কেউ বোন, কেউ দিদি। একেবারে রাখি বন্ধনের ধূম পড়ে গেল। যারা মুখে কিছু বলতে পারল না, বুঝতে পারলাম, তারা অস্বস্তিতে ভুগছে। আমার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ হওয়া উচিত তা ঠিক করতে পারছে না বলে আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগল। কয়েকজন মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী অফিসার ছিল, তারা 'মিস্ নাগ', 'হ্যালো ডক' ইত্যাদি বলে সামিয়ে নিল। বিপদ হল বাঙ্গালী কয়েকজনকে নিয়ে। আমি বাঙ্গালী, ওরাও বাঙ্গালী, আমার উপর ওদের যেন পৈতৃক দাবী। অথচ আমাকে সহজে গ্রহণ করতে পারছে না। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।"

সুশীলাকে আমার ভাল লাগার প্রধান কারণ ওর এই অকপট বলিষ্ঠতা। সুশীলার সঙ্গে যতটা সময় কাটিয়েছি, একবারও মনে হয়নি সে মেয়ে। তার কথায়, কাজে, আচরণে একটা আশ্চর্য স্বচ্ছতা। ওর নামে এত বদনাম, কিন্তু ওকে ঘিরে এমন একটা মর্যাদা, যা গোটা প্রশাসনে আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

"তারপর শোন, মাসখানেকের মধ্যেই আমার সেই 'কাকাবাবু' আমার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে তুললেন। প্রথমে দিন কতক তাঁর স্টেশন ওয়াগান করে সমস্ত প্রোজেক্ট দেখিয়ে নিয়ে

বেড়ালেন। তখনও আমি ধরমকোটে ট্রান্সফার হইনি। হেড্‌ কোয়ার্টারেই আছি। আমার 'দাদারা' আর 'ভাইয়েরা' এসে আমাকে ফিসফিস করে বলল, ঐ বুড়োর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা যেন না করি। লোকটার ক্যারেকটার ভাল নয়। কলকাতায় অনেক কেচ্ছাকাণ্ড করেছে। এখানেও দু একটা রিফিউজি মেয়েকে ইত্যাদি। আমি ওদের বললাম, তবে তো ভালই হল, উদ্বাস্তু মেয়েরা এখন দিনকতক স্বস্তিতে থাকবে। এ কথার ফল কি হল শুনবে ? আমার 'কাকাবাবু' একদিন খুব গম্ভীরভাবে বললেন, আমি নাকি তার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছি। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। সে কী কথা! স্পষ্টই জানালাম, আমার নষ্ট করার মত সময়ের বড় অভাব।

"আরেকদিন 'কাকাবাবু' এসে বললেন, 'ছাখ মা, একটা কথা বলি, কিছু মনে কর না। এখানে অনেক রকম লোক আছে। সকলের সঙ্গে আড্ডা রসিকতা করা ঠিক শোভন হয় না। তাছাড়া ওরা সব মানে সবাই যে খুব গুড্‌ ব্রিডের, এটাও ত, মানে তুমি আমার মেয়ের মত তাই বলছি। বললাম, ওরা সবাই অসেন, এলে কি মুখের উপর না করা যায়, বলুন ? তার পরদিনই খবর পেলাম, আমি নাকি কাকাবাবুকে বলেছি, আমার 'দাদা' আর 'ভাইয়েরা' এসে আমাকে খুব জ্বালাতন করে, তাই আমি 'কাকাবাবু'র কাছে নালিশ করেছি। আমি ত অবাক। বিরক্তও হলাম। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু হল। আমার নামে উপরে উড়ো চিঠিও গেল, আমি নাকি এখানকার অফিসারদের খুব ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছি। তখন ধরমকোটের কাজ শুরু হয়েছে। 'কাকাবাবু' আমাকে নিয়ে কাজ দেখতে বের হলেন। হাসপাতালের কাজ শুরু হয়েছে। সেটা বর্ষাকাল। ধরমকোট শহর থেকে দু মাইল দূরে কাজ হচ্ছে। আমাদের গাড়ি কাঁচা রাস্তায় এমন বসে গেল যে আর ওঠানো গেল না। হেড্‌ কোয়ার্টারে খবর দিয়ে গাড়ি আনতে হবে, দেড় দুদিনের ধাক্কা।

"আমরা দুজনে কোনক্রমে ধরমকোট পৌছালাম সন্ধ্যের মুখোমুখি। খুঁজে খুঁজে বলরামের হোটেলে গিয়ে উঠলাম। 'কাকাবাবু' বড় সরকারী অফিসারের মেজাজে হাঁক ডাক শুরু করলেন। ডাক বাংলো আছে কি না, জিজ্ঞাসা করলেন। না, ডাক বাংলো নেই। থাকবার কোন জায়গা ? না, তাও নেই। তবে, বলরাম বলল, হিন্দীতে, কারণ 'কাকাবাবু' হিন্দীতেই কথা বলেছিলেন, সাহেব যদি মনে করেন, সে এই হোটেলেই একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। পিছনের দিকে যে ঘরখানায় ও থাকে, সেইখানে দুখানা খাটিয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

"হোটেল বলতে কলকাতায় যা বোঝায়, এ কিন্তু তা নয়। পাঞ্জাবীদের খাবারের দোকান যেমন হয়, তেমনি। সেদিন আমি বুঝতেই পারিনি, বলরাম বাঙ্গালী। ওর চেহারা, কথাবার্তা, চালচলনে বাঙ্গালীত্বের কোন লক্ষণ আমি তখন দেখতে পাইনি। ধরমকোটে ট্রাক ড্রাইভারদের একটা বড় আড্ডা। দিনে রাত্রে শ খানেক ট্রাক তো যায়ই। এখন আরও বেড়েছে। শিখ পাঞ্জাবী সব ড্রাইভার। বলরামের দোকানে ওদের খাবার, বিশ্রাম নেবার প্রধান জায়গা। ("এই কোম্পানী খানা লাগাও"—এই ওদের বুলি) আমি বলরামকে ওদেরই একজন প্রথমে ভেবেছিলাম। ("এই কোম্পানী দো লস্সি")

"বলরাম যে কাউকে গ্রাহ্য করে না, খাতির করে না, সে আমি প্রথম থেকেই টের

পেয়েছিলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। ওর দোকানে অনেক খদ্দের। সে নিজেই রুটি সেঁকছে, খদ্দেরকে খেতে দিচ্ছে, অর্ডার মত চা বানাচ্ছে, লস্যি বানাচ্ছে। নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। 'হাফপ্যাণ্ট আর স্যাণ্ডো' গেঞ্জি গায়ে, কোমরে একটা তোয়ালে। বলরামের হাতের, বুকের, পায়ের পেশীর দিকেই আমার দৃষ্টি আগে পড়েছিল। এক সুগঠিত পেশী, এত সুন্দর একটা দেহ আমি আর কখনও দেখিনি। আমি আমার একাডেমিক নজর দিয়েই ওকে দেখছিলাম। যেন আমাদের অ্যানাটমির ক্লাসে মানবদেহের একটি মডেল নিরীক্ষণ করছি।

তারপরে পরিচয় পেলাম ওর ব্যক্তিত্বের। একটা জিনিষ আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, কাজ ও কত পরিপাটি করে সম্পন্ন করে যাচ্ছে। ওর তৎপরতা আছে, ব্যস্ততা নেই। আমরা ওর দোকানে বা হোটেলে, যাই বলনা কেন—ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ও এগিয়ে এল। টেবিল মুছে, চেয়ার এগিয়ে দিল। একটা ছোকরাকে ডেকে উনুনের তরকারিটা নাড়তে বলল। একজন খদ্দেরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাকে বললে, 'চৌদ্দ আনা' 'কাকাবাবু'র প্রশ্নের উত্তরে বললে, এখানে ডাক বাংলো নেই। ভাল হোটেল? থাকবার জায়গা? না, নেই। তবে সাহেব ইচ্ছে করলে, আজ রাতটা কোন রকমে এখানে কাটিয়ে দিতে পারেন। সে পিছনের ঘরে দুটো বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

"যে স্বরে সে অন্য পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, 'কাকাবাবুর' সঙ্গেও সেইভাবে কথা বলছিল। 'কাকাবাবু'কে ইতস্তত করতে দেখে, সে বললে, খুব বেশি অসুবিধা হবে না। সাহেব ইচ্ছে করলে ঘরখানা দেখতে পারেন। "আজকাল মাঝে মাঝে দু একজন সাহেব আওরাত নিয়ে এসে পড়েন। গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, রাত্রে থাকতে চান, আমি তাই একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি।" বলরামের এই উক্তিতে কাকাবাবু প্রথমে হতচকিত, পরে বিব্রত এবং শেষে এমন রাগ হয়ে উঠলেন, যে আমার ওর অবস্থা দেখে হাসি পেল। আমার মুখে-চোখে হয়ত হাসির রেখা ফুঠে উঠে থাকবে। তাতে 'কাকাবাবু' আরও রেগে গেলেন। বললেন, 'রাস্কেলটার কথা শুনেছ। কী ভেবেছে আমাদের, অ্যাঁ।' আমি বললাম, 'এমন খারাপ কথা তো কিছু বলেনি। আপনি চটছেন কেন?' 'কাকাবাবু' বললেন, 'বলো কি তুমি? কদর্য ইঙ্গিতটা ধরতে পারলে না।' মাঝে মাঝে দু একজন সাহেব আওরাত নিয়ে রাত্রে এখানে আসেন—এর মানে কি?' আমি বললাম, 'এই যে আপনি আমাকে নিয়ে এখানে এসে উঠলেন, এর কি কিছু মানে আছে?' 'কাকাবাবুর মুখখানা যদি একবার তখন দেখতে! আমার হাসি পাচ্ছিল বেদম। কিন্তু অতি কষ্টে গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলাম। আমার মনে হল, বলরাম যেন বিস্মিত হয়েই আমার দিকে একটুক্ষণ চাইল। ওর ঠোঁটের ফাঁকেও এক টুকরো হাসি উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখলাম। বলরাম কাকাবাবুকে বলল, 'কিছু দেব?' কাকাবাবু খেঁকি কুকুরের মত খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে উঠলেন, 'যাও যাও আপনা কামমে যাও। যব জরুরত পড়েগা তব বোলায় গা।' আমি ওকে এক গ্লাস জল দিতে বললাম। ওর ছোকরাটা আমাকে জল দিয়ে গেল। বলরাম আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে ওর অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে মন দিল।

"কাকাবাবু গজগজ করতে লাগলেন। এইসব লোক ক্রিমিন্যাল টাইপের। বুঝেছ। এইসব জেনগুলো বদমায়েসির আড্ডা। পুলিশে রিপোর্ট করা উচিত। আমি বললাম, 'তাহলে আমরা

থাকব কোথায় আজ?' কাকাবাবু বললেন, 'এইখানেই থাকতে হবে, বাধ্য হয়ে, এমনই হতচ্ছাড়া জায়গা যে একটা ডাকবাংলো পর্যন্ত নেই। ডাকবাংলো অনেক সেফ্, বুঝলে না।' বললাম, 'এইখানেই যদি থাকতে হয়, তাহলে জায়গাটা দেখা যাক। কি বলেন?' কাকাবাবু বললেন, 'অগত্যা।' বলেই ডাক দিলেন, 'এই হোটেলওয়ালা, ইধর শুনো।' বলরাম তেমনি সুরেই হাঁক পাড়লে, 'এই ছোকরা, যাও শুনো সাব ক্যায়া বোলতা হ্যায়।'

"কাকাবাবু আরও চটে গেলেন। 'কি রকম ইম্‌পার্টিন্যান্‌স্, দেখেছ!' ছোকরা এল। বললাম, আমাকে ভিতরে নিয়ে চল। আমি আর কাকাবাবু ভিতরে ঢুকে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। আরামে থাকার কোন ত্রুটিই নেই। ব্যাটারি সেট্ রেডিও, ড্রেসিং টেবিল অব্দি সেখানে আছে। দুটো খাট। মশারি। একপাশে বাথরুম। দুটো খাটের মাঝখানে একটা পুরু পর্দা, টেনে দিলে দুটো আলাদা ব্যবস্থা হয়ে যায়। ছোকরা ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে কাচানো বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বের ক'রে দিলে। বাথরুমে জল দিল, নতুন সাবান বের ক'রে দিল।

কাকাবাবুর মেজাজটা ভাল হয়ে এল। 'না ব্যবস্থা ভাল। পাকা ব্যবসাদার সন্দেহ নেই।' তিনি ছেলেমানুষের মত এটা-সেটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। 'দেখেছ, দেখেছ, কাকাবাবুর গলার আওয়াজ চড়ে গেল, 'আমি বলিনি, সুশীল। এটা একটা বদমাইসির আড্ডা! এই ছাখ, প্রমাণ।' কাকাবাবু দেরাজের ভিতর থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করলেন। আমি জানি, আন্‌-লাইসেন্সড্ কারবার। বে-আইনী ব্যবসা।' উল্লাসে কাকাবাবুর চোখ চকচক করতে লাগল। 'এই ছোকরা,' তিনি সরকারী আওয়াজে হাঁক ছাড়লেন, 'এই ছোকরা, উস্ বদমায়েস কো বোলাও। 'আভি বোলাও।' ছোকরা মুহূর্তের মধ্যে বলরামকে ডেকে নিয়ে এল। 'এ-সব কী? অ্যাঁ, এ-সব কী! গোপনে গোপনে এ-সব ব্যবসাও চলে। পুলিশে ধরিয়ে দেব, হারামজাদা রাস্কেল।'

বলরাম একটুও বিচলিত হল না। ভ্রূক্ষেপও করল না। বলল, 'ছাখো সাহেব, তুমি কে আমি জানি না, জানতেও চাই না। তোমার মতন সাহেব ঢের দেখেছি। তুমি যদি আমার এখানে থাকতে চাও থাক। না হলে বেরিয়ে যেতে পার। তোমার খুশি। তবে ভাল চাও যদি, অর্থাৎ ঘাড় গর্দান আস্ত রাখতে চাও যদি, গালমন্দ কি চিল্লাচিল্লি কর না। মনে রেখো এই হোটেলের মালিক আমি। সে আর দাঁড়াল না। নিজের কাজে চলে গেল। কাকাবাবু বোতলটা হাতে ক'রে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে মুখ দিয়ে টু শব্দটি বের হল না। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। আমি বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। বলরামের দৃঢ় ভারি গম্ভীর স্বরটি—'এ মনে রেখো এ হোটেলের মালিক আমি'—ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে আমার শরীরে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে লাগল। 'মালিক আমি' কথাটা তো কতবার শুনেছি। কিন্তু তার মানেটা যেন এই জানলাম। দেখ, কথা বললেই হয় না, বলতে পারা চাই ঠিক মত করে, বলার যোগ্যতা থাকা চাই। তবে সে কথা মনে দাগ কাটে। কাকাবাবু যে আর ট্যা ফোঁ করলেন না, ঝানু এক গেজেটেড্ অফিসার কেচোর মত নেতিয়ে গেলেন, তার কারণ ঐ 'মালিক আমি।' সম্রাটের কণ্ঠস্বর ঐ কথা দুটোর মধ্যে বেজে উঠেছিল।

এই কাকাবাবুটিকে আমার কেঁচো ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। সেদিন অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যেতেই টের পেলাম আমার কাপড়চোপড়ের মধ্যে একটা কেঁচোই যেন কিলবিল করছে।

আমি একটুও ভয় পাইনি, অপ্রস্তুত হইনি এমন কি রাগও করিনি। পরম শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কি কাকাবাবু, ভয় করছে না কি?' কাকাবাবু যেন মুহূর্তে অহল্যা হয়ে গেলেন। তারপর দাঁত-খোলা গলায় আমতা আমতা করলেন, 'সুশীলা, তুমি জেগে আছ? এই ইয়ে আমার কেমন ঘুম আসছে না।' বললাম, 'অপরিচিত জায়গায় কারো কারো অমন হয়। আমার তো বেশ ভালই ঘুম হচ্ছে। তা আপনি এক কাজ করুন না, আমার পাশে শুয়ে পড়ুন, আপনার চুলে আমি হাত বুলিয়ে দিই। নাক-টাক ডাকে না তো আপনার।' কাকাবাবু এই কথা শুনে নিজের বিছানায় চলে গেলেন। আর কখনও বিরক্ত করেননি।"

ওর কথার ধরণে আমি হেসে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম, ব্রহ্মচারীকে বলেছিলে না কি, এই গল্প।

সুশীল বলল, "ব্রহ্মচারীকে কেন বলব। আরেকটা মুখোরোচক কেলেঙ্কারি চাউর করতে। দেখ কেলেঙ্কারি ছড়ানোয় আমার প্রবৃত্তি নেই। আর তা ছাড়া কাকাবাবু অফিসার সত্যিই ভাল। অনেক যুবকের চাইতে এর উদ্যম, উৎসাহ বেশি। তবে দুর্বলতা তো সব মানুষেরই থাকে। সেইটাই তো আর সব নয়।"

"তুমি এই ঘটনার দ্বারা কি বোঝাতে চাইছ, সুশীলা?" ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। "শরীরটার কোন মূল্যই তুমি দাও না, এই কি?"

"ঠিক তা নয়, বরং বলতে পার অতিরিক্ত কোন মূল্য ওতে আরোপ করি না। দেখ," সুশীলা বলল, "শরীরের নানা ব্যবহার আছে। যৌন ব্যবহার তার মধ্যে একটা। আমার কথা হচ্ছে এই একটা কাজের উপর আমরা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করি কেন? এতে কি আমাদের অস্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় না?

"দেখ, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কোন বলিষ্ঠ জীবনে প্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, তার অন্যতম কারণই হচ্ছে দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। এটা এক মানসিক বিকারের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। আমার কথাই ধর না, শরীর সম্পর্কে আমার যদি পারিবারিক ছুঁৎমার্গ বজায় থাকত তাহলে কি আমি এই অরণ্যরাজ্যে আসার কথা কখনও ভাবতে পারতাম, এমন নিঃসঙ্কচিত্তে এদের মধ্যে কাজ করতে পারতাম। চিরকালই আমাকে লেডিজ্ সীটটি সম্বল করে জড়সড় হয়ে কাটাতে হত। চেস্টিটি রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের পুরুষদের পৌরুষ গিয়েছে, মেয়েদের মনুষ্যত্ব গিয়েছে। আমাদের আছে শুধু এক নপুংসক উত্তরাধিকার। ফলে আমরা পৃথিবীর অধিকার, জীবনের অধিকার, কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। শুধু কাঁদছি, আর কাৎরাচ্ছি আর হা হুতাশ করছি: আমাদের সব গেল, সব গেল, সব গেল। সব রাখতে গেলে, সব দিকে নজর দিতে হবে।

"ভাগ্যিস্ এখানে এসেছিলাম, ভাগ্যিস্ চেস্টিটির বালাইটি ঘুচেছিল, তাই আমি সব পেয়েছি। মনের মত জীবন, মনের মত কাজ, মনের মত মানুষ, পুরুষ, পুরুষের মত পুরুষ। সব সব সব পেয়েছি।"

* * *

"এখানে আমি ভালবাসা পেয়েছি," সুশীলার মুখ চকচক করে উঠেছিল, "এখানে আমি ভালবাসতে পেরেছি।"

"রবীন্দ্রনাথ বিধাতার কাছে, আমাদের কাছ থেকে ওকালত-নামা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার কেন দেওয়া হবে না ?" সুশীলা একদিন বলেছিল। "আমি আমার সহপাঠী অনেক মেয়েকেই বেশ আবেগ দিয়েই কবিতাটা আবৃত্তি করতে দেখেছি। কেন নাহি দিবে অধিকার—এইটুকু নাকি সুরে বলেই যেন তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। আর যেন তাদের কিছু করার নেই। এর পর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু মেদ বাড়াও। আর সর্বক্ষণ শাড়ির ব্যাণ্ডেজে নিজেকে আবৃত করে রাখ। যেন এই পৃথিবীর সুখ দুঃখ আমাদের নয়, পরিবর্তন, উত্থান পতন আমাদের জন্য নয়, এই বিরাট কর্মোদ্যোগে আমাদের অংশ নেবার কথা নয়। আমরা শুধু গলগ্রহ হয়ে থাকব। সেইজন্যই আমরা জন্মেছি। এই দেখ না, এখানে এত বড় একটা উদ্যোগ হচ্ছে, এর পরিণাম যাই হোক না কেন, কাজ তো আছে প্রচুর, আমার দুঃসাহসিনী বন্ধুদের অনেক চিঠি লিখেছিলাম, এখানে কাজ নিয়ে আসার জন্য, তা ভয়েই মরে গেল সব, কেউ এল না। ছেলেরাই আসতে চায় না, তা মেয়েরা।

"একজন বড় মজার চিঠি লিখেছিল, জানো। লিখেছিল, তোমার কীর্তি কলাপ এখানে জানতে আর কারো বাকি নেই। সমাজের শাসনের বাইরে গিয়ে খুব মজা লুটছ। নিজের লেজ কেটেছ বলে এখন সবার লেজ কাটতে চাইছ। না খেয়ে মরব তাও ভাল, কিন্তু ভগবান যেন তোমার মত দুর্বুদ্ধি না দেন। অত লোকের সঙ্গে ঢলাঢলি না করে, একজনকে বরং গেঁথে ফেল।" সুশীলা হাসল। এই মেয়ে পলিটিক্‌স্ করত। এখন গরীব বাপের ঘাড় ভেঙে খায় আর শাঁসালো বর পাকড়াবার আশায় সেজেগুঁজে পাত্রপক্ষের সামনে দুরুদুরু বুকে পরীক্ষা দিতে বসে। নিজের বরটা জুটিয়ে নেবে, এমন ক্ষমতাও নেই।

"অথচ, এই মেয়েই একদিন দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন প্রাণ করি পণ কেন আহরণ করবে না, একথা জোর গলায় ঘোষণা করত। আমার মারও নাকি এই কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল। এক বন্ধুর বাড়িতে মার মুখে—'যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—আবৃত্তি শুনে বাবা এমনই গলে গিয়েছিলেন যে ঘটক পাঠিয়ে তার পরের লগ্নেই মাকে বাসর কক্ষে এনে ফেলেছিলেন। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি মাকে দেখছি একতাল কাদার দলা। আমাদের ঝি ক্ষান্তমাসির মধ্যেও ঢের আগুন আছে। আমরা কখনও মার মুখে কোনদিন রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিনি। একটা বাঁধানো ফটো ছিল আমাদের বাড়িতে, মা গলবস্ত্র হয়ে দুবেলা প্রণাম করত সেটাকে। আর তার পাশে মাথায় শেলেট গায়ে ভাড়া করা গাউন পরা মার একখানা ফটো ছিল। বাবা গর্ব করে তাঁর বন্ধুদের দেখাতেন—বেথুনের মেয়ে। কনভোকেশনের পর মা যেমন গাউনটা ফেরৎ দিয়ে এসেছিল, তেমনি ভাড়া করা শিক্ষাটাও যেন ফেরৎ দিয়ে এসেছিল। মার সারাদিনের কর্ম ছিল আমাদের গা ঢেকে রাখা আর ছাতে না যাই, সেটা দেখা।

"আমি এখানে এসে যত না পরিশ্রম করছি, তার ঢের বেশি শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে, এখানকার চাকরি নেবার সময় বাড়ির সঙ্গে লড়াই করতে। আমাকে ওরা মেডিকেল কলেজে পড়তেও দিতে চায়নি। অথচ আমাদের পরিবারের শিক্ষিত বলে, কালচারড্ বলে তো কত নাম ডাক। আমাদের পরিবারের কলঙ্ক ছিলেন আমার ছোটকাকা। ছোটকাকা বাড়িতে এলে বাড়ি যেন

রসাতলে যাবে, সবাই এমন ভাব দেখাত। কারণ ছোটকাকা মদ খেতেন, কোন এক থিয়েটারের মেয়ে নিয়ে দিন কতক ছিলেন। বাস্। অথচ এই লোকটার মত উদার, সাহসী, উজ্জ্বল জীবন্ত লোক আমি খুব কম দেখেছি। আমার ছোট বয়সের ভালবাসা সব তাঁকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। আমার আত্মহত্যা করতে যাবার কারণের কথা, সব প্রথমে অকপটে তাঁকেইব লেছিলাম। কাকা প্রথম কথাই বলেছিলেন, তোর শারীরিক ক্ষতি যদি কিছু হয়ে থাকে বল, ডাক্তার দেখাই। যেন পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ছড়ে গিয়েছে, আয়োডিন লাগাতে হবে কি না কাকা জিজ্ঞেস করছেন।

"কাকা বলতেন, মনুষ্যত্ব গেলেই সব গেল। যেমন তোর সেই অধ্যাপক। ও তার মনুষ্যত্বকেই ধর্ষণ করেছে, তোকে নয়। ক্ষতি তোর থেকে তারই বেশি হয়েছে, কারণ তুই তো তাকে আর কখনোই মানুষ বলে জ্ঞান করতে পারবি নে। এখন ভেবে দেখ, তোর যদি নষ্ট করার মতো যথেষ্ট সময় থাকে তো ওকে সাজা দেবার জন্য আইনের দ্বারস্থ হই। এই হচ্ছে আমার কাকার অ্যাপ্রোচ। আর আমার বাবা খবরটা শোনামাত্র বললেন, তোমাকে কলেজে পাঠানোই আমার অন্যায় হয়েছে। কলেজটি ছাড়। ঐ জন্যেই জাত ধর্ম খুইয়েছে। ঐ জন্যই আমি তোমাকে আগে থেকে বারণ করেছিলাম। আদালত? খবরের কাগজ, ওরে বাবা! কেলেঙ্কারীর আর বাকি থাকবে না কিছু। গোটা পরিবারের আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। মা বললেন, এই বেলা ওর বিয়ে দিয়ে দাও। আমাকে শুচি করবার জন্য মা অনেক টোটকার ব্যবস্থা করেছিলেন। মা বাবার গুরু এক গ্র্যাজুয়েটানন্দ ব্রহ্মচারী আমার শুদ্ধির জন্য আমাকে তাঁর আশ্রমবাসিনী হতে বললেন। তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে উপদেশ দিতে লাগলেন। সব থেকে মজার কথা, আমার মা আর বাবা আমাকে জোর করেই আমার দীর্ণ দেহটির রিপুকর্মের ভার সেই সাবালক, সেই মোহনীয় ওস্তাগরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রায়। আমার নাস্তিক কাকাই আমাকে উদ্ধার করেন।

"বলরাম সম্পর্কে আমার মনোভাব কাকাকে জানিয়েছিলাম। কাকা খুশি হয়ে লিখেছিলেন, 'মর্ত্যে বা ত্রিদিবে একমাত্র তুমিই আমার'—এর চাইতে জোরালো মন্ত্র আমার জানা নেই। তার আশ্রয় যখন পেয়েছিস তখন আর বলার কী থাকতে পারে।

"মা আমার চিঠির জবাব দেননি। শুষি—আমার ছোট বোন, ইকনমিক্সে এম এ—লিখেছিল, এত কাণ্ডের পর এক হোটেলওয়ালা, রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না, সেজদি। তোর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছিল, হলধরটি কি কলম ধরতেও জানেন? ওকে লিখেছিলাম, কলম ধরতে শেখেনি, সে ফুরসৎ পায়নি। তবে সুন্দরভাবে হাতা ধরতে জানে। কুড়ি বছর ধরে ওটা রপ্ত করেছে। এখানে কাছাকাছি একটা বিরাট ইস্পাত কারখানা তৈরি হচ্ছে। ও সেখানে জমি কিনেছে। একটা এয়ারকণ্ডিশনড হোটেল খুলবে।"

এবার আমিও অবাক হলাম। সুশীলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি না কি?"

সুশীলা হাসল। "ওর ইচ্ছে তো তাই। বলরামের স্বভাবটাই এমন, ও ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারে না। ক্রমশই নিজেকে বদলাচ্ছে। দুবছর আগে 'কাকাবাবু'র সঙ্গে যেদিন প্রথম ওর হোটেলে যাই, তখনকার হোটেল আর এখনকার হোটেল একেবারে চেনা যায় না।

"কুড়ি বছর আগে সহায় সম্বলহীন বলরাম এখানে এসে একটা চায়ের দোকান খুলেছিল।"

সুশীলা যেন বিরাট কোনও প্রোজেক্টের এক পি-আর-ও, সাংবাদিকদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্ল্যান্ট দেখাচ্ছে। "ঐ যে ঐ গাছ-তলাটায়। কোনদিন খেত, কোনদিন খাওয়া জুটত না। কুড়ি বছর এইভাবে লড়াই করে, তবে দাঁড়িয়েছে।"

বলরামের ছোকরাটি এসে চা দিয়ে গেল। বলরাম যথারীতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খদ্দের সামলে যাচ্ছে। হাফপ্যান্ট পরনে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে। এক জোয়ান খদ্দের পয়সা কড়ি নিয়ে ঝগড়া করছে ওর সঙ্গে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। তুমুল ঝগড়া বেধে উঠল। শেষ পর্যন্ত মারামারি। বলরাম ওকে ধরে বেধড়ক ঠেঙালে। তারপর হাত মুছতে মুছতে আমাদের কাছে এল।

সুশীলার দিকে চেয়ে হাসল। "আরে সেই রিপোর্টার এসেছিল। রঙ্গচারী। অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। তুমি মাঝে মাঝে এখানে আস, রাত্রে থাক—একথা সত্যি নাকি?"

আমি সুশীলার দিকে চাইলাম। সুশীলা হেসে ফেলল। বলরামকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তা তুমি কি বললে?"

"মিথ্যে কথা বলি না কি আমি।" বলরাম বলল, "সত্যি কথাই বললাম।" ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

আমি বললাম, "রঙ্গচারীর খোরাক জুটে গেল।"

ওরা দুজনে দেখলাম ব্যাপারটা আমলই দিল না। হাসল শুধু।

"রঙ্গচারী আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে।" বললাম।

"তা তুমি কি বলেছ?"

"আমি," সুশীলার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "আমি কি বলব? বলেছি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে।"

"আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল।" সুশীলা বলেছিল। "যাই বল রঙ্গচারীকে আমার ভালই লেগেছে কিন্তু। কপটতা নেই। স্পষ্টবাদী। মুংরিদের গ্রামে সেদিন রাত্রে একটা পোয়াতি খালাস করতে গিয়েছিলাম। তখন অনেক রাত। সেই গ্রামে রঙ্গচারী দেখি এক বাড়িতে বসে খুব মদ খাচ্ছে। যখন কাজ শেষ করে বেরিয়েছি তখন দেখি রঙ্গচারী আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। বললে, 'গুড্ মর্ণিং ডক।' ওকে আমিও 'গুড্ মর্ণিং' জানালাম। তখন অন্ধকার প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে। আমায় বললে, 'চল তোমাকে এগিয়ে দিই।' বলে আদিবাসী লোকটার হাত থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে নিল। বলল, 'ও বেচারীকে আর কষ্ট দেবে কেন, ওকে থাকতে বল। আমরা দুজনেই যাই।' বললাম, চল। যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'ছাখ, আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কেলেঙ্কারীর কথা শুনেছি। তুমি কিছু মনে কর না, এটা আমার প্রোফেশন্যাল কোয়ারি। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন কবব, সাফ জবাব দেবে?' বললাম, 'বলব।' রঙ্গচারী বলল, 'সত্য হোক মিথ্যা হোক, আমার তাতে মাথা ব্যথা নেই, তুমি যা বলবে, আমি তাই কাগজে ছাপব; তবে এমন কিছু বল না, যা পরে আবার নিজেই অস্বীকার করবে। আই হেট্ টু বি কন্‌ট্রাডিক্‌টেড্।'

"বললাম, 'ভণিতার দরকার কি? যা জানতে চাও, বল না? জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।' রঙ্গচারী বলল, 'ধরমকোটের এক হোটেলওয়ালার সঙ্গে তোমার গোপন সম্পর্ক কিছু আছে?

বুঝলাম, পুরনো নালিশ নতুন লোকের কানে উঠল, এবার লক্ষ চোখে ভাসবে। আমার গুরুত্ব আমার সহকর্মিদের কাছে যে কতখানি, তা বুঝতে পারলাম। আমি ছাড়া ওদের কাছে আর দ্বিতীয় কোন অস্তিত্ব নেই। আমার হাসিই পেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বিরুদ্ধে যেসব চার্জ গিয়েছে তার কপি পেয়েছ ?' রঙ্গচারী বললে, 'হাঁ। তবে তোমাকে বলছি, যদি এর মধ্যে ট্রুথ কিছু থাকে তবেই ছাপব, নইলে আই কেয়ার এ ড্যাম্ ফিগ্ ফর্ ইট্। তাই ত তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমার সঙ্গে ধরমকোটের এক হোটেলওয়ালার কোন গোপন সম্পর্ক আছে কি না ?' বললাম, 'এটাকে তুমি গোপন বলবে কি না, তুমিই জান, হ্যাঁ ওখানকার এক হোটেলওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক আছে।' 'তুমি কখনও কখনও ওখানে রাত কাটাও ?' 'হ্যাঁ কাটাই।' 'ওর সঙ্গে রাত কাটাও ?' 'হ্যাঁ।' 'থ্যাংক ইউ। আই লাইক্‌ড্ ইওর আন্‌সারস্ ভেরি মাচ্ সুশীলা (এই প্রথম রঙ্গচারী আমার নাম ধরে ডাকল) তোমার মত মেয়ের অস্তিত্ব আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তোমার মত পরিণত মন, আমি দেখিইনি। তা তুমি তোমার ঐ অপোগণ্ড সহকর্মীদের কপালে হাম টাম খেয়ে চুপ করিয়ে রাখতে পার না ? আই নো, হোয়াট ইজ্ বাইটিং দোজ অফুল বাগারস্।' "

সুশীলা হেসে ফেলল। "যাই বল, আমার কিন্তু ওকে ভালই লেগেছে। আমিই ওকে বলরামের কাছে আসতে বলেছিলাম। বলরাম সম্পর্কে ওর প্রবল আগ্রহ দেখলাম। 'হু ইজ্ হি সুশীলা,' ওর মুখে খালি এই কথা। 'তোমারও মত মেয়ে রাত কাটাবার জন্য সাধারণ একটা হোটেলওয়ালার কাছে যাচ্ছে, আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না। সাম্ বাগারস্ সে, হি ইজ এ কমিউনিস্ট, এই প্রোজেক্ট বানচাল করে দেবার জন্য ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে, ইজ ইট ট্রু ? ইজ্ হি এ কমিউনিস্ট সুশীলা ? আর ইউ এ কমিউনিস্ট ?' বললাম, 'দেখ রঙ্গচারী আমি কম্যুনিস্ট নই, আই হেট্ পলিটিক্স্। বলরাম কম্যুনিস্ট কি না, আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেসও করিনি, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। তবে কোন কম্যুনিস্ট কুড়ি বছর ধরে একটা হোটেল গড়ে তুলেছে, এমন উদাহরণ আমি পাইনি।' "

বলরাম উঠে যাচ্ছিল। খদ্দের সামলাচ্ছিল। কখনও এসে আমাদের সামনে বসছিল। আবার উঠে যাচ্ছিল।

সুশীলা বলল, "রঙ্গচারী বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বলরাম কি কমিউনিস্ট ?' কেন বলতে পার ? রাজনীতির রং কি এতই পাকা হয়, সে রং ছাড়া মানুষকে কল্পনা করা যায় না ?"

বললাম, "এ যুগে রাজনীতিই মানুষের প্রভু। একে তো আমরা এড়াতে পারিনে। তাছাড়া মানুষকে সনাক্ত করবার জন্য বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্ন রং ব্যবহার করেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল ধর্ম, এখন হয়েছে রাজনীতি।"

সুশীলা চুপ করে গেল সেদিন। শুধু বলল, "তা হবে হয়ত।"

আরেকদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বলরাম যদি অন্য ধর্মের কি অন্য দেশের লোক হত, তাহলে, শুধুমাত্র সেই কারণেই কি আমার মনোভাবের পরিবর্তন হত বলতে চাও ?"

সুশীলা কি বলতে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। সুশীলা কোন উত্তর না পেয়ে আমার দিকে চাইল। "বোঝাতে পারছিনে, না ?" খানিকক্ষণ ভাবল। "ধর একটা সাধারণ উদাহরণ

দিয়েই বলি, বলরাম যদি মুসলমান হত, তাহলে এখন যেমন ওর দেহের সান্নিধ্যে আমার জন্ম আমার রক্ত মাতাল হয়ে ওঠে, তখন কি তা হত না? ও যদি কমিউনিস্ট হত আর আমি ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী তাহলে ওর আলিঙ্গন এখন যেমন আমার অস্তিত্বকে সার্থক করে তোলে, তা কি তুলত না?"

এর উত্তর আমার জানা নেই। "এই সব যদি ফদি দিয়ে জীবনের কোন সত্যে পৌছনো যায় বলে আমি বিশ্বাস করিনে।" আমি ঐ প্রসঙ্গ একেবারে শিঁকেই তুলে দিলাম।

"দেখ পলিটিক্সে আজ আমার কোন আগ্রহ নেই," হামজা একদিন বলেছিল, "কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমরা পলিটিক্সের প্রভাব এড়াতে পারি না। কখনও কখনও পলিটিক্সের ছাঁচে আমাদের জীবন, আমি চাই আর না-চাই, ঢালাই হয়ে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভূতের ভয় যেমন কোন কোন সময় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কথাটা আজগুবি শোনাতে পারে, কিন্তু এটা ফ্যাক্ট্।

"মেটিয়াবুরুজের ষড়যন্ত্র আমার বাবার জন্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম বোমা দিয়ে, ডিনামাইট্ দিয়ে ডক উড়িয়ে দেব। আমার বাবা পুলিশকে খবর দিয়ে, এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। সম্ভবত মোটা পুরস্কার পেয়েছিলেন। সব থেকে বড় পুরস্কার, আমার জীবন তিনি বাঁচাতে পেরেছিলেন। টাকার জন্য অথবা একমাত্র বংশধরের জীবন রক্ষার জন্য, তিনি এই কাজ করেছিলেন তা আমি জানিনে। এই ঘটনার প্রভাব আমার জীবনে কিভাবে পড়েছিল, আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছি।

"আমি যে-দিন জানতে পারলাম, আমি এক গুপ্তচরের সন্তান সেইদিন আমার মনে হল আমার দেহ মন অশূচি, অশূচি। মনে হল, এক বেশ্যার গর্ভে যদি আমার জন্ম হত, তাহলেও যেন ভাল হত। কিন্তু এ কী, এক ইমফরমারের ছেলে আমি! আমাদের দলের যারা বাইরে ছিল, তারা বাবার প্রাণ নেবার জন্য দু দুবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হল তখন এই ব্যর্থতায় আমিও অন্যান্যদের মত ক্ষেপে গিয়েছিলাম। পুলিশের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়েছিল। আমার দুজন কমরেড ঘটনাস্থলে মারা যায়। একজনের ফাঁসি হয়। আমাদের দলের নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কালাপানি যাবার সময় তাঁর কাছে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এর প্রতিশোধ আমি নেব।

"দুবছর বাদে আমি জেল থেকে বের হলাম। আমার বাবা জেলের গেটে ছিলেন। দুবছর তার সঙ্গে দেখা করিনি। আমি বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছুটে এলেন। কিছু বলবার আগেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার হাত দুটো লোহার সাঁড়াশীর মত গনগনে গরম। ("বাপজান, বাপজান, চোখে আর নজর নাই। ভাল দেখতে পাই না। লেকিন ইয়ে ক্যায়া হুয়া তেরা হালত?") ইচ্ছে হচ্ছিল এক ধাক্কায় বুড়োটাকে ছিটকে ফেলে দিই। মনে মনে তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠলাম। মনে মনে গর্জে উঠলাম, হঠ্ যাও, গাদ্দার কাঁহে কি। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না। সেই বুড়োটার জীর্ণ শীর্ণ শরীরে জ্বরের প্রচণ্ড তাপ, চোখ দুটো যেন লাল ডাঁটা, শরীরে জ্বরো গন্ধ। ঠেলে ফেলতে মায়া হল। বলতে চাইলাম, আমি তোমার ছেলে নই, দুষমণ। পারলাম না। ভেবো না, আমার মনে সেদিন পিতৃভক্তি জেগে উঠেছিল। আসলেই

নয়। সেই মুহূর্তেও আমি পুরোপুরি পলিটিক্যাল বিয়িং-ই ছিলাম। বাবার প্রতিও আমার ঘৃণা প্রচণ্ড ছিল। যেটা বদল হয়েছিল, সেটা আমার পলিটিক্যাল চরিত্র। জেলে সন্ত্রাসবাদী হয়ে ঢুকেছিলাম, মার্কস্‌বাদী হয়ে বের হলাম। খুচরো প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় না করে বিপ্লব সংগঠনে আত্মনিয়োগ তখন শ্রেয় বলে জেনেছি। পিতৃহত্যায় আত্মগ্লানি মোচন অপেক্ষা শহীদ হবার সার্থকতা কাম্য বলে মনে হয়েছে। বাবাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে একটিও কথা না বলে, দলের গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়লাম। একটা বুক ফাটা আর্ত চীৎকারে সেই বিকালের আবহাওয়া হা হা করে উঠল। ভুণ্ডক বুড়ো। বিশ্বাসঘাতক! মীরজাফর! মনে একটা উল্লাস লাফ ঝাপ দিতে লাগল। "তোমার ছেলে নেই, তোমার ছেলে মরেছে।" ঘোড়ার গাড়ির বাইরে মুখ বাড়িয়ে বললাম। (শহীদ, শহীদ, আমি শহীদ) দলের বন্ধুরা হাততালি দিল, "সাবাস কমরেড্।"

"আরও পাঁচবছর পরের কথা বলছি। আমি তখন প্রেমে পড়েছি। পার্টিরই একটা মেয়ের সঙ্গে। আমি তক শ্রমিক সংগঠনে মেতেছি। সে ছাত্র সংগঠনে। সে ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। বাবা ব্যারিস্টার। হ্যারি পলিটের সাক্ষাৎ শিষ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেয়ে। সর্বহারার বন্ধন মুক্তির জন্য তার চোখে আগুন ঝরত। সত্যিকারের আগুন। ("কমরেড্, তোমার চোখের আগুনে সর্বহারার দুনিয়া আলোকিত হবে") আমার বুকের ভিতরে যে আগুন জ্বলত, তার পরিচয় সে পেয়েছিল। ("কমরেড্ কমরেড্, তোমার বুকের আগুনে শোষণ, অত্যাচার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে")। আমরা দুজনেই 'মুক্তি, শান্তি, প্রগতির' মন্ত্রে বাঁধা পড়েছিলাম।

"তিন বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। শ্রমিক সংগঠন, জেল, আর তার চোখে চোখ রেখে। ইতিমধ্যে সে পার্টির প্রথম র‍্যাঙ্কে চলে গিয়েছে। যুদ্ধ এসে হানা দিয়েছে। পার্টির ভিতরে নীতিগত ফাটল দেখা দিয়েছে। একসময় চেয়ে দেখি আমরা ফাটলের দুধারে দুজন দাঁড়িয়ে আছি। তখনও পর্যন্ত আমাদের মূল লক্ষ্য এক। সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ। আমি তার চোখে 'আলট্রা' সে আমার চোখে 'ইনফ্রা।'

"তারপর দুজনের পথ ক্রমশ বেঁকে যেতে লাগল। শুধুমাত্র ভালবাসা দিয়ে দুটো অস্তিত্বকে এক ঠাঁই বেঁধে রাখা গেল না।" হামজা হেসেছিল। জীবনের বাস্তব ঘটনার রকমই এই। কাল্পনিক কোন ছবির সঙ্গেই মিল হয় না।

"তোমাদের এই প্রেম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।"

হামজা বলল, "তবে কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?"

আমি জবাব দিয়েছিলাম, "ঠুনকো রাজনীতির উপর।"

"রাজনীতি ঠুনকো হতে পারে, কিন্তু তা সত্য নয় কেন?"

"কারণ রাজনীতি জীবনের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।"

"তোমাদের মুস্কিল কি জানো," হামজা বলেছিল, "কতকগুলো ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু আউড়াতে পারো না। শব্দে শব্দে বাজী মাত করার প্রবণতা তোমাদের মত ছদ্ম বুদ্ধিজীবীদের

প্রধান ব্যাধি। তার কারণ বাস্তব জীবনের কোন চরম সমস্যারই মুখোমুখি তোমাদের দাঁড়াতে হয়নি কখনও।"

আশ্চর্য, অনেকটা এই রকম কথা সুশীলাও বলেছিল। "ছ্যাখ, অনেক জিনিষের অর্থ কল্পনায় যে রকম মনে হয়, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে দেখলে তার চেহারাই বদলে যায়।"

* * * *

হামজা ঠিক কথা বলেনি। এটা ঠিক, আমি ওর মত বুদ্ধিমান নই। ওর মত বিদ্যের জোরও আমার নেই। ও যতটা পরিষ্কার মাথায় সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, যত সহজে বুঝতে পারে, আমি তা পারি নে। মাঝে মাঝে মূর্খের মত কথাবার্তা বলি, তাতেও সন্দেহ নেই। তবে আমি জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করিনি, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইনি, এ-কথা ঠিক নয়।

বহুবার আমাকে বহু সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। সেদিনও আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার নিয়তির মুখোমুখি। সেই গভীর রাত্রে, দরজার খোলা কপাটের ফাঁক দিয়ে যে প্রলম্ব ছায়াটাকে মেঘ-সরে যাওয়া চাঁদের আলো আমার পিঠের কাছে ঠেলে দিয়েছিল, সেই ছায়াই আমার নিয়তি।

আমার কোলে তখন রথীনের বউএর মাথা। তার গায়ে প্রবল জ্বর। আমি বসে বসে তার মাথায় জলপটি দিচ্ছিলাম। একটু আগেই মালগাড়ী ইঞ্জিনের আলোটা ঘরের ভিতর গোয়েন্দাগিরি করে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে তার কালো অন্ধকার দেহ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগন্যাল পায়নি। অসহিষ্ণু ইঞ্জিন বার বার চীৎকার করছিল। রথীনের বউ অচৈতন্য, তাড়সে গোঙাচ্ছে। পাঁচীলের উপর থেকে ঝপ্‌ করে একটা ভারি দেহ উঠোনে পড়ল। ধীরে ধীরে তার ছায়া বারান্দায়, বারান্দা থেকে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। থামল। আর এগুচ্ছে না। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ও কি কিছু ভাবছে? দরজা তো খোলা। দু পা এগোলেই ভিতরে আসতে পারে। আটকাচ্ছে কোথায়? "কি ভাবছ তুমি?" ছায়াটাকে প্রশ্ন করলাম মনে মনে। "দ্বিধা কেন তোমার?" আমি কি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, ও চোর নয়? এই ছায়ার যে মালিক তার হৃদয় পুড়ছে, আমি কি তা বুঝতে পেরেছিলাম? ছায়াটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। অনড়। মাঝে মাঝে অন্ধকার এসে তাকে মিলিয়ে দিতে লাগল। গর্ভবতী মেঘ চাঁদের আলো আড়াল ক'রে দিচ্ছে। ছায়াটাকে সুযোগ দিচ্ছে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকতে। ছায়াটা তবুও নড়ছে না। তবে কি ও ভয় পেয়েছে? কিসের ভয়? তবে কি ও কিছু সন্দেহ করছে? কিসের সন্দেহ? ও কি ভাবছে, আর মাত্র দুটো পা এগিয়ে গেলেই চিরদিনের মত একটা রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। এক নির্মম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—যে রহস্যের আড়ালে এখনও পর্যন্ত এক চরম প্রশ্ন অমীমাংসিত হয়ে পড়ে আছে, যার উত্তর ওর জানা নেই, ও কি তা জানতে চায় না?

রথীনের বউ ককিয়ে উঠল। "বড় ব্যথা। একটু জল খাব।" রথীনের বউয়ের মুখে জল ঢেলে দিলাম। সে আমার হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধরল। মেঘ এসে আলো ঢেকে দিল। "আমার ভয় করছে, ভয় করছে। আমার কাছে সরে এস না।" বললাম, "ভয় কি, আমি জেগে

আছি, তুমি ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়।" আমার সাড়া পেয়ে ও ব্যাকুলভাবে আমার হাত দুটো চেপে ধরল। অবুঝের মত আমাকে টানতে লাগল। "ভয় করছে, আমার বড্ড ভয় করছে। আমার কাছে সরে এস না।" আমি দরজার দিকে চাইলাম। সেখানে অন্ধকার, জমাট অন্ধকার। "এস না, আমার কাছে সরে এস না। আমি একটুও নড়তে পারছি নে। বড় ব্যথা। আমার সারা গায়ে ব্যথা।"

ট্রেনখানা সিগন্যাল পেয়েছে। কেমন এক রকম শব্দ করতে করতে ভূতের মত এগিয়ে চলেছে। যেন অনিচ্ছুক গাড়িগুলোকে ইঞ্জিনখানা হ্যাঁচকা টান মারতে মারতে নিয়ে চলেছে। মেঘ সরে গেল। ছায়াটা মিলিয়ে গিয়েছে অথবা চুপিসাড়ে এসে ঘরের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। রথীনের বউয়ের ভ্রূক্ষেপও নেই। সে সমানে ককিয়ে চলেছে, "এস না, আমার কাছে সরে এস না।" আমারই বা এত ভাবনা চিন্তার দরকার কি? আমি ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। ওকে আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ালাম। একটু ককিয়ে উঠল। ওর জ্বরতপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখে জ্বালা ধরাতে লাগল। ওর পিঠের কাপড় সরিয়ে সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ও শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। বেতের বাড়িতে পিঠে অনেক দাগ কেটে বসেছে। রথীন ওকে আজ মেরেছে। কিছুদিন যাবৎ মারছে। রথীনের বউ আমাকে কিছুই জানায়নি। আজও না। আজ মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছে, তাই আমি টের পেলাম।

রথীনের মেজাজ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। আগে ও সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলত। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে সকলের বক্তব্য শুনত। প্রত্যেকের কথা বুঝতে চেষ্টা করত। লালঝাণ্ডারা যে বিশেষ সুবিধে করতে পারত না, সে শুধু রথীনের জন্য। রথীনের উপর রেলশ্রমিকদের প্রচণ্ড ভরসা ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও রথীনকে সমীহ করতেন এর শান্ত দৃঢ় স্বভাবের জন্য। কিন্তু এখন রথীনের স্বভাব ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে। দেখতে লাগলাম রথীনের বিরুদ্ধে ক্রমশ সকলের বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। ইতিমধ্যে শ্রমিকরা ধর্মঘটের ব্যাপারে ক্রমশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে, এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে, কর্তৃপক্ষ উপরওয়ালার নির্দেশে, এক শ্রমকল্যাণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলেন। শ্রমিকদের মূল দাবীদাওয়ার ফয়শালা এই কমিটির এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হলেও, ছোটখাট অনেক সমস্যার সমাধানের ভার এই কমিটির হাতে দেওয়া হবে, কর্তৃপক্ষ সে আশ্বাস দিলেন। কম্যুনিস্ট ইউনিয়ন প্রকাশ্যত এই কমিটি গঠন এক বিরাট ধাপ্পা বলে প্রচার করতে শুরু করল এবং গোপনে "কয়েকটি শর্তে" এই কমিটিতে যোগ দিতে পারে বলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগল। রথীন সরাসরি এই কমিটির বিরোধিতা করবে বলে জেদ ধরল। এই বিষয়ে আমাদের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক সমিতির সঙ্গে ওর প্রচণ্ড মতবিরোধ হল। আমার পক্ষে রথীনের মত সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব প্রকাশ্যত সমর্থন করলে কম্যুনিস্টদের দুমুখো নীতি বানচাল করে দিতে পারতাম। সমগ্র কমিটির শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব আমরাই করতে পারতাম। যুদ্ধ সমর্থন নীতি অটুট রাখতে পারতাম। আমাদের নীতি ও কাজে পরস্পর বিরোধিতার অবসান ঘটত। এবং শ্রমিকদের কিছু কিছু কল্যাণসাধনের মধ্য দিয়ে ওদের উপর আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারতাম। রথীনের মাথা এত পরিষ্কার

হওয়া সত্ত্বেও সে একথা বুঝতে চাইল না। আমার মনে হল, রথীন যে জন্যই হোক, এ ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে না বলেই বুঝছে না। আমি ওকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম। কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে রথীন আমাকে চরম বেইজ্জৎ করে বসল। আমাদের পাঁচ বছরের নিবিড় সম্পর্কে এই প্রথম ও অতর্কিতে ফাটল সৃষ্টি করে দিল। আমার বিরুদ্ধে হিংস্রতমভাবে সে বিষোদ্গার করল।

আমি অবাক। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। রথীনের কপালের শিরা ফুলে উঠল। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। মুখের রেখায় রেখায় ঘৃণা ফুটে উঠছে। এই রথীন! রথীন! আমি যার অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গ। যার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমি চুপ করে শুনে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। ওর কোন মন্তব্যেরই জবাব দিলাম না। শুধু দেখতে পেলাম, ওর বাড়ির দরজা আমার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা আর কখনও খুলবে না। কখনও না?

অনেক দিন পরে আমি আবার ইউনিয়ন অফিসের আশ্রয়ে ফিরে এলাম। একা থাকতে চাইছিলাম। রথীন এক ধাক্কায় আমাকে গভীর জলে ঠেলে দিয়েছে। সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে অবকাশ পাওয়া গেল না। আমাদের ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট (যখন শুধুমাত্র এটা এম্প্লয়ীজদের সংগঠন ছিল, তখন ইনিই বরাবরকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখন প্রেসিডেন্ট রথীন) রসময়বাবু এলেন। আমার অদূরদর্শিতার প্রভূত নিন্দা করলেন। (আমিই এটার মধ্যে শ্রমিক এনে ঢুকিয়েছি) এবং রথীন যে তলে তলে কম্যুনিষ্টদের হয়ে কাজ করছে, সেটা আমাকে জানালেন। অবিলম্বে রথীনকে হঠানো আবশ্যক, সে কথা বারবার আমাকে জানিয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছে করছিল, রসময়ের মাথাটা ভেঙে দিই। যাবার সময় বলে গেলেন, "রথীনের বউয়ের সঙ্গে তোমার নাকি খুব মাখামাখি?" রসময়বাবুর কথাটাকে খুব অশ্লীল বলে মনে হল। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। "তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি?" রসময়বাবু বলে উঠলেন "দেখ ভাই, আমার আর বলার কি আছে। যা বলবার, রথীনই একদিন বলবে। আমি তোমাকে একটু সতর্ক করে দিলাম মাত্র।" ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রসময়বাবুর কথায় আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দাটা খানিক যেন সরে গেল। আমি, রথীন আর তার স্ত্রী আর একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে নেই। আমি আর তার স্ত্রী এখন পৃথক বিন্দু। একেবারে আলাদা। এখন তাই রথীন আর আমার মধ্যে সংঘর্ষ বাধছে। ভবিষ্যতেও বাধবে। কেন? রথীনের স্ত্রী রথীনের অধিকারে। সে এখন আর নারী নয়। একটি বিশেষ সম্পত্তি, তার স্ত্রী। তাই পাছে তার সম্পত্তি, তার স্ত্রী অন্যের অধিকারগত হয়, রথীন সেই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ভালবাসা পেয়েই রথীন আর সন্তুষ্ট থাকছে না, এখন, সে এখন তার স্ত্রীর উপর একচ্ছত্র অধিকার চায়। তাই রথীনের চিত্ত এখন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তাই সে আমাকে এখন ঘৃণা করছে। মাত্র কদিনের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেল। যতদিন আমাদের ভালবাসায় ভরসা ছিল, ততদিন কোন গোলমাল বাধেনি। আজ আর রথীন ভালবাসায় ভরসা রাখতে পারছে না, অধিকারকেই সে ভরসা করছে। রথীন ভালবাসার ভাগ দিতে

বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। অধিকারের সূচ্যগ্র ভাগও সে কাউকে দিতে চায় না। ভালবাসার চাইতে অধিকারের মূল্যই কি বেশী ?

এখন তবে আমার কর্তব্য কি ? রথীনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করা। রথীনের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ? একটা ভালবাসার, দ্বিতীয়টা কর্মক্ষেত্রের। কোন সম্পর্ক ছেদ করব ? ভালবাসার ? আমি কি ওকে আর ভালবাসি না ? বাসি বই কি। অতএব এ সম্পর্ক ছেদ করার কোন প্রশ্নই উঠে না ! তবে কি কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক ছেদ করব ? পাগল। রসময়বাবুরা যাই বলুন, শুধুমাত্র আফিসের বাবুদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়া যায় না। তাতে একটি প্রধান শক্তিকে —শ্রমিক শক্তিকে—ডাইনের হাতে তুলে দিতে হয়। সেটা ক্ষতিকর। শ্রমিক শক্তিকে ধরে রাখবার প্রধান অবলম্বন রথীন—এখনও রথীনই। ওকে ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে আর কোন সম্পর্ক ছেদ করব ? রথীনের স্ত্রীর সম্পর্ক ? আমার তো সেখানে কোন অধিকারের প্রশ্ন নেই। আমার সম্পর্ক ভালবাসার। এটা ছেদ করা মানে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডকেই ছিঁড়ে ফেলা। মিথ্যে প্রতিজ্ঞায় লাভ নেই। পারব না।

তবে কি করতে পারি ? রথীনের অশান্তি, তার মনের জ্বালা আর বাড়াতে না পারি। সেটা আমার হাতেই আছে। আজ থেকে আর রথীনের বাড়িতে যাব না (যাব না ? কখনোই যাব না ? রথীন যখন বাড়ি থাকবে না, তখনও না ? ওর বউ যদি ডাকে, তবুও না ?)—না, কখনোই আর যাব না। (পারব তো ?) এটা আমাকে পারতেই হবে। যদি কখনো অজ্ঞাতসারে ও বাড়ির দিকে পা দুটো এগিয়ে যেতে চায় ? পা দুটো টেনে নেব। যদি কখনো ও পথে যেতে চোখ দুটো ও বাসার দিকে ঘুরে যায় ? চোখ বন্ধ করে ফেলব। যদি কখনো ও বাসার থেকে পরিচিত আহ্বান ছুটে আসে ?—"শোন, শোন, শুনে যাও, একবারটি এস না ?"—শুনব না, শুনব না, কানে হাত চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাব। যদি মনে বাজে ? মনে—মনকে—তাহলে আমি নাচার, নাচার, নাচার। ঘরের মধ্যে নিজেকে আটকে রেখে শুধু ছটফট করব।

এই যে এখন, নিজেকে বন্দী করে রেখেছি। যাচ্ছি কি ? না যাচ্ছি না, তবে সবই তো দেখছি। রথীনের বাসা, উঠোন, ঘর, আসবাব, রথীনের স্ত্রী, তার অবয়ব, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, সব আমার পরিচিত—সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রথীন, রথীনের ছায়া—

দরজায় ছায়া পড়ল। চমকে উঠলাম। "কে ?"

"আমি। রথীন।"

রথীন ! রথীন কেন ? অন্ধকার এগিয়ে এল।

"তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" রথীন আমার পাশে এসে বসল। এই প্রথম রথীনের সঙ্গ পেয়ে আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। রথীন একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল। "দেখ," রথীন আবার কাশল, "আমি তোমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।" (সে তুমি এখনও করছ রথীন। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, তুমি আমাকে 'তুমি' কখনও বলতে না। তোমার মনে আছে কি না, জানিনে, আমি তোমাকে 'আপনি' বলেছিলাম। তুমি তখনই হেসে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলে, বলেছিলে "আপনি কি রে ? এক সঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের, কাঁধে কাঁধ দিয়ে

লড়াই করতে হবে, ওসব আপনি আজ্ঞে চলবে না। রথীন বলবি আমাকে, রথীন। তোমার আমার বয়েসের তফাৎ অনেক ছিল রথীন, তুমি এক ঝাপটায় তা ঘুচিয়ে দিয়েছিলে। আমি তোমাকে তুই কখনো বলতে পারিনি তবে রথীন না বলে পারিনি। তুমি তুই থেকে এখন তুমিতে চলে গেছ। এটা কি তোমার সুব্যবহার ?) "আমি," আবার কাশল রথীন, "ক্ষমা চাইছি, মাফ চাইতেই এসেছি।" (তুমি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে এসেছ রথীন। কেন, তা আমি জানি। তুমি জানতে, তুমি জান, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, এত অন্তরঙ্গ, আমাদের বন্ধুত্ব এত পাকা, ভালবাসা, হ্যাঁ রথীন আমাদের ভালবাসা এত গভীর যে একদিনের বৈঠকি তকরারে তা মিটে যাওয়া শক্ত, তুমি জানো তা মিটে যাবে না, তাই নিজে এগিয়ে এসেছ নিজ হাতে তা মিটিয়ে দিতে। তাই ভদ্র সম্বোধনের দ্বারস্থ হয়েছ, তুই ছেড়ে তুমি বলছ। তাই ভদ্র ব্যবহার আশ্রয় করছ। ঘটা করে ক্ষমা চাইছ। কিন্তু তুমি যা চাইছ রথীন, তা হবে না। আমাদের সম্পর্ক ঘোচাতে তুমি পারবে না, তা সে যত চেষ্টাই কর। কি তুমি ঘুচাবে রথীন ? আমি তো তোমার পুত্র নই যে ত্যাজ্যপুত্র করবে, তোমার অন্নে প্রতিপালিত ভাই নই যে আশ্রয়চ্যুত করবে, তোমার মহাজন নই যে দেনা শোধ করে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবে ? তোমার আমার সম্পর্ক ভালবাসায় গড়া। আর ভালবাসায় ত্যাগ করার স্থান নেই, গ্রহণ ছাড়া আর কিছু করা যায় না। তুমি ভালবাসা চাও না, অধিকার চাও। অধিকারে আমার রুচি নেই। ভালবাসাই আমার ভরসা।) "আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি," রথীন ইতস্তত করতে লাগল, "কাজটা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। এ বারের মত আমায় মাফ কর। (রথীনের স্বরে পুরনো উষ্ণতা ফিরে আসছে। আমি জানি তা আসবে, আসতেই হবে।) দেখিস (অনুতাপ ঝরে পড়ল) দেখে নিস, আর কখনো হবে না।"

"কেন যে মাথাটা তখন গরম হয়ে গেল, বোকার মত তোকে গালমন্দ করলাম। তোর মনে খুব লেগেছে আমি জানি। আমাকে এইবারের মত তুই মাফ করে দে।" রথীন ব্যগ্রভাবে আমার হাত চেপে ধরল। "আমি অনেকক্ষণ এসেছি। রসময়বাবু ছিল তাই আসতে পারিনি। (রসময়বাবুর কথা তাহলে তোমার কাছে গিয়েছে রথীন ?) বাসায় এতক্ষণ তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (কোথায় অপেক্ষা করছিলে বললে, তোমার বাসায় ?) তুই যখন এলি না, তখন আমার ভয় হল। বউকে সব কথা খুলে বললাম। বউ বলল, তাহলে ওকে নিয়ে এস গিয়ে, নইলে ও কিছুতেই আসবে না। (তোমার বউ ঠিকই ধরেছে, রথীন, তোমার বাসায় আমি আর যাব না, যাওয়া উচিত হবে না।) শোন্, চল, বাসায় চল। আমার এগারটায় ডিউটি। বেরোতে হবে আমাকে।"

"শোন রথীন, তোমার সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে।"

"বেশ তো, বাসায় গিয়েই বলিস।" আমি যেন অবুঝ বালক। নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। ওর ভাবখানা এই। আমার হাসি পেল।

"এ সব কথা বাসায় বসে আলোচনা করা যাবে না। এখানেই ভাল।"

"বেশ তো, তবে কালই বলিস," রথীন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, "তুই কি চাস, ডিউটি ফেল করে আমি চার্জশীট্ খাই।"

"না, নিশ্চয়ই তা চাই না তবে—"

"আবার তবে কি, "রথীন এতক্ষণে হেসে উঠল, হাল্কা গলায় বলল, "তবে এখন চল। আমার হাতে আর সময় বেশি নেই।"

আমি মরীয়া হয়ে বলে উঠলাম, "তোমার সংসারে আমি আর অশান্তির সৃষ্টি করতে চাইনে রথীন, ওখানে আমার না যাওয়াই ভাল।"

রথীন উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার ধপাস ক'রে বসে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, "কি বললি, তুই গেলে আমার সংসারে অশান্তি হবে!"

বললাম, "রসময়বাবু কি বলে গেলেন, শুনেছ।"

রথীন আবার ক্ষেপে গেল। "শুনেছি। কি বলতে চাস তাও বুঝেছি। তুই আজকাল দেখছি রসময়ের কথায় বড্ড বেশি কান দিচ্ছিস। মিটিং-এও দেখলাম, এখনও দেখছি। শুধু বুঝতে পারছি নে, সব ব্যাপারে রসময়বাবু নাক গলাচ্ছেন কেন? আমাদেরই বা রসময়বাবুর কথায় উঠতে বসতে হবে কেন? আমরা ওর বাপের খাই না পরি।" একটু থেমে রথীন বলল, "রসময়বাবুর মতলব ভাল নয়। আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে উনি রস চুষতে চাইছেন। ইউনিয়নে ফাটল ধরাতে চাইছেন। তোর আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন। ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যানের পদটি ওকে দেবার প্রতিশ্রুতি পেলে উনি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মিলাতেও রাজী আছেন। এ সবই আমি জানি। যাক এ-সব ব্যাপারে আরেকদিন আলোচনা করা যাবে। এখন আমার সময় নেই। আচ্ছা, তোকে এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পরিষ্কার জবাব দিবি?"

রথীন আমার উত্তরের আশায় চুপ ক'রে প্রতীক্ষা করতে লাগল। "দেব।"

রথীন বলল, "তুই আমার বউকে ভালবাসিস?"

"বাসি।"

"এমন কাজ তুই কখনো করবি কি, যাতে আমার বউএর নজরে তুই ছোট হয়ে যাস?"

"না।"

"আমার বউকে আমিও ভালবাসি। আমিও চাইনে আমার বউ আমাকে ছোট নজরে দেখুক।" রথীন আন্তরিকভাবে বলল, "তোকে না নিয়ে যেতে পারলে, আমি বউয়ের কাছে চিরকালের মত ছোট হয়ে যাব। কারণ আমার সন্দেহ, বউও এই রকম একটা কিছু ধরে নিয়েছে। তুই কি চাস, আমি ওর কাছে ছোট হয়ে যাই।" এ যেন অন্তিম আবেদন। আমি অমান্য করতে পারলাম না বটে, তবে রথীনের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলাম, এ বিষয়ে পরদিনই একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে হবে। অশান্তি হবে না, এ-কথা ও মুখে যত জোরেই বলুক, ওর কাজে তার উল্টো পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে কেন? (কেন তুমি বউকে মারো? সেদিন রাত্রে চোরের মত কি দেখতে এসেছিলে? কেন সে রাতে ঘরের ভিতর ঢোকোনি?)

কেন তার মেজাজ এমন বিগড়ে যাচ্ছে ? এর পরিষ্কার জবাব আমাকে পেতে হবে। ওর মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে।

রাত্রে রথীনের বউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, তুমি কাকে বেশি ভালবাস ? আমাকে না রথীনকে ?"

"কেন বল তো ?" ও একটু অবাক হল। "সেদিন ও-ও এ-কথা জিজ্ঞাসা করছিল।"

আমি হেসে ফেললাম। "তা তুমি ওকে কি বললে ?"

"বললাম, ওকেই বেশি ভালবাসি।" ও হাসল।

"এখন কি বলবে ?"

"বলব তোমাকেই বেশি ভালবাসি।"

"কিন্তু আসলে কাকে বেশি ভালবাস ?"

"তোমরা বড় বোকা। কিচ্ছু বুঝতে পার না ?"

জীর্ণ অট্টালিকা থেকে

মতি নন্দী

অশোক আর গীতা পৌঁছল প্রায় সন্ধ্যায়। গলিতে ঢুকে বাড়ি খুঁজে নিতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। বিরাট বাড়ি।

কড়ানেড়ে অপেক্ষা করতে হল। গীতা হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, 'একটু আগেই এসে পড়লাম বোধহয়।'

'ওতে কিছু এসে যাবে না।'

অশোক আবার কড়া নাড়ল। নিঃশব্দে দরজার একটা পাল্লা অল্প একটু ফাঁক হল। একটা মাথা বেরোল, ওদের লক্ষ্য করে নীচু গলায় বলল, 'কাকে চান?'

'অজয় বাবুর কাছ থেকে আমরা আসছি।' বলে অশোক এগিয়ে এল।

'কে অজয় বাবু!'

'আপনার বন্ধু, স্কুলটীচার।'

দরজাটা আর একটু ফাঁক করে লোকটা বলল, 'আসুন'। অন্ধকার ছিল। আলো জ্বলে ওঠার আগেই ওরা দু'জনে টের পেল বহুকালের পুরনো একটা বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে, গন্ধটা ভিজে বাসি কাপড়ের মত স্যাঁতস্তেঁতে। আলোয় দেখল, অযথা মোটা ভিতের উপর দেয়াল, মোটা কাঠের দরজা, ছাদে অজস্র কড়ি বরগা, মেঝেয় বেলে পাথর।

অল্প পাওয়ারের আলো, এই জীর্ণ বিরাট বাড়ি এবং লোকটা।

'আসুন'।

লোকটা আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাত এগিয়ে দিল, গলার স্বর নীচু। ওরা অনুসরণ করল। একটা ঘরে নিয়ে এল ওদের। কোণে ভারি একটা টেবিল গোটাকতক চেয়ার।

'বসুন।'

ওরা বসল না।

'একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের, ঘরে এখন লোক আছে, এন্‌গেজ্‌ড্।'

'তাহলে—'

অশোক তাকাল গীতার দিকে।

'আপনার কি একখানাই ঘর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বিনীত ভাবে লোকটি গীতাকে জবাব দিল।

'তাহলে—'

গীতা অশোকের দিকে তাকাল।

'কিন্তু শুনেছি যে, গেলেই পাওয়া যাবে ?'

'সে বহু দিনের কথা, তখন এত লোক জানতোও না, আমিও ভরসা করে ঘর দিতাম না, তাছাড়া তখন আমার প্রয়োজনটাও কম ছিল।'

'কি, অপেক্ষা করবে ?' অশোক এমন ভঙ্গিতে গীতাকে বলল যার উত্তরে 'হ্যাঁ' বলতে হয়।

'এসেছেন যখন চলে যাবেন কেন, ওরাতো আর একঘণ্টা পরেই ঘর ছেড়ে দেবে।'

'তাহলে আমরা বরং ঘুরে আসি, একঘণ্টা পরই আসব।'

হাতঘড়ি দেখতে দেখতে গীতা বলল, 'তোমার তো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা আছে, ততক্ষণে কাজটা সেরে নাও বরং।'

অশোক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই লোকটি বলল, 'কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আর কেউ এসে পড়ে তাহলে কিন্তু তাদের বসিয়ে রাখতে পারব না।'

মিটমিট করে তাকাচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে অশোক গলা খাঁকাল, রুমাল বার করে সর্দি ঝাড়ল, ধীরেসুস্থে আলগোছে বলল, 'বেশ।'

চেয়ার টেনে গীতাকেও সে ইসারায় বসতে বলল। এইসব করতে যতটুকু সময়ের দরকার হল, ততক্ষণেই সে ভেবে নিয়েছে বাইরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

'তাহলে আপনারা বসুন। আমি ভেতরে যাচ্ছি।' লোকটা চলে যাচ্ছিল, গীতা ডাকল। 'এক গ্লাস জল দিতে পারেন।'

'নিশ্চয়।'

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। গীতা বলল, 'গেলে না কেন ?'

'কোথায়।'

'ডাক্তারের কাছে। আমাশা বড় বিচ্ছিরী অসুখ, গোড়াতেই সারিয়ে ফেলা ভাল।'

'একদিন দেরী হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

আলোচনাটা শেষ করার জন্য পায়ের উপর পা তুলে অশোক সিগারেট কেস খুলল। নেই। কেসটা শব্দ করে বন্ধ করল।

'কোথায় চললে ?'

'সিগারেট আনি, এতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকতে পারব না।'

আশোক বেরিয়ে গেল। গীতা পা দোলাতে লাগল। জল নিয়ে লোকটি এল, পিছনে একটি ছোট ছেলে। সে অবশ্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গীতাকে দেখেই ছুটে ভিতরে চলে গেল।

গীতা বলল, 'আপনার ?'

'হ্যাঁ। উনি কোথায় গেলেন।'

'সিগারেট আনতে।'

হাত ব্যাগ থেকে ভিটামিন বড়ি বার করে, মুখটা উপরে তুলে আলগোছে ফেলে দিল। জলটুকু খেয়ে আঁচলে মুখ মুছল।

'অসুখ বিসুখ আছে বুঝি ?'

'না, ওটা রোজ খাই। শরীর রাখতে গেলে এছাড়া আর উপায় কি।'

কথা না বাড়িয়ে লোকটি চলে যাচ্ছিল গীতা ডাকল, 'আপনার মাসে রোজগার হয় কি রকম? অবশ্য এ ধরণের কৌতূহল খুবই অভদ্রতা, তবু যদি কিছু না মনে করেন—'

'না মনে আর কি করব, তা দিব্যি চলে যাচ্ছে।'

'খাটতে খুটতে হয় না?'

'দোকান বাজার যাই। আগে মাষ্টারি করতুম, ছেড়ে দিয়েছি। এখন যা করি তা আর এমন কি খারাপ।'

'আপনি বেশ আছেন।'

গীতা মর্মাহত হল যেন। লোকটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে, চলে গেল। একা বসে থাকতে হলে সবাই যা করে গীতাও তাই, ঘাড় ফিরিয়ে এধার ওধার দেখতে শুরু করল। দ্রষ্টব্য কিছুই নেই; ঘরটা বেশ বড়। আলোটা সম্ভবতঃ চল্লিশ পাওয়ারের। দেওয়াল নোনাধরা, বালি খসে পড়েছে, চুণের রঙ লালচে ফলে গোটা ঘরটাই ময়লা। গীতার বাঁ পাশের দেওয়ালে একটা বন্ধ জানলা। ওর মনে হল জানলাটা নিশ্চয়ই সেই ঘরের, যেখানে যাবার জন্য তারা এসেছে। ফলে সে কৌতূহল বোধ করল। জানলার ওপাশে নিশ্চয় একটি পুরুষ ও একটি নারী রয়েছে, এখন তারা কি করছে, কি তাদের সম্পর্ক, ইত্যাদি চিন্তায় মজতে শুরু করল সে। শেষে চিন্তাটা কাটছাঁট হয়ে এমন জায়গায় পৌছল, যার পর উত্তেজনা বোধ না করে গীতার আর উপায় রইল না।

ও উঠে জানলার কাছে গেল। একটা টুকরো কথা বা শব্দ শোনার আশায় জানলায় কান ঠেকাল। কিন্তু রাস্তা দিয়ে কারা জোরে কথা বলে চলে গেল, দূরে কোন বাড়িতে কে চেঁচিয়ে উঠল, বাসন পড়ল ভিতরেই বোধ হয়। হতাশ হয়ে ও সরে এল। সেই সময়ই অশোক ফিরল, মুখে জলন্ত সিগারেট।

'সেই ট্রাম লাইনের কাছে দোকান।'

অশোকের পাশের চেয়ারেই গীতা বসল।

'এই ঘরটাওতো লোকটা কাজে লাগাতে পারত। আয় আরো বাড়ত।' অশোক তোফা টান দিল সিগারেটে।

'তা বাড়ত। কিন্তু তখন আমরা এসে অপেক্ষা করতুম কোথায়?'

কথাটা ভাবল অশোক। একমত হল।

'তবে ঘরটা বেশ নির্জন।'

'রাস্তার জানলাটা বন্ধ করলে, তবেই।'

অশোক উঠে রাস্তার দিকের একমাত্র জানলাটা বন্ধ করে দিল। দরজাটাও বন্ধ করতে যাচ্ছিল, গীতা বাধা দিল হাত ধরে।

'অন্যায় করা হবে।'

'কেন, তোমার আপত্তি আছে?'

'হ্যাঁ, ওকে ঠকান হবে। ভাড়া না দিয়ে এভাবে যদি আমরা ব্যবহার করি তা হলে, মানে এইটাই ওর জীবিকা সুতরাং বঞ্চিতই তো করা হবে, তাই নয় ?'

অশোক ভাবল। কিন্তু একমত হওয়ায় অসুবিধা বোধ করল।

'হয়ত তাই, কিন্তু রোজগারটা কি সৎভাবে উনি করছেন ? ভাড়া দেওয়ার জন্য নয়, বেশী নেওয়ার জন্যই বলছি। ঘণ্টায় পাঁচটাকা অর্থাৎ দিনে, ধর কুড়ি ঘণ্টার জন্য একশোটাকা, তাহলে মাসে হয় তিন হাজার টাকা। এর বিনিময়ে যারা আসে তারা কি পায় ? আমরা কি পাব ?'

'বাঃ, তা কি করে বলব, এখনো তো ওঘরে যাইনি আমরা।'

'ধর গেছি। ধর এই ঘরটাই হচ্ছে ওই ঘর ; আমরা দুজন একলা। এখন কি করব আমরা ?"

গীতা যেন অন্ধকার থেকে হঠাৎ প্রখর আলোয় পড়ে গেছে। ধন্দ কাটাবার মত করে মাথা নেড়ে মিটমিটিয়ে বলল, 'কেন, যে জন্য এসেছি তাই করব।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পঁচিশের পর আর বয়স বাড়েনি। এত সহজেই সব বলতে পার।'

'তবে কি খুব মহাপুরুষ-টুরুষের মত করে বলতে হবে নাকি। এখানে এসেছি কেন তা'ত জানই, জিজ্ঞাসা করার কি আছে ?'

চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল অশোক। গীতা ক্ষুব্ধ হয়েছে। মাঝে মাঝে অশোক এই রকম করে থাকে। উস্কে দিয়ে নিজে থেমে যায়, ভালমানুষ সাজে ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে। ফলে যে শোনে সে নিজেকে যাচ্ছেতাই হিসাবে না ভেবে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে অশোক বলল, 'মনে হচ্ছে ডাক্তারের কাছে এই ফাঁকে যাওয়া যেতে পারত।'

গীতা কথায় যোগ দিল না। পায়ের উপর পা তুলে হেলে বসল। ভাবখানা করল অন্যমনস্ক, চিন্তান্বিতা।

হঠাৎ অশোক ধড়ফড় করে উঠে জামা ঝাড়তে শুরু করল। তাকাল ছাদের দিকে। 'বালি পড়ছে।'

গীতার পাশে চেয়ারটাকে আর একটু টেনে নিয়ে জায়গা বদল করল।

'কি নড়বড়ে বাড়িতেই না এলুম।'

'না এলেই তো হত।'

রাগ করে গীতা বলল। তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে। অশোক চাপা শব্দ করে হাসল।

'না হত না। এতদিন তো শুধু কথাই বলেছি, সেই সব কথা আকাশে ছড়িয়ে দিলে ঢেকে যেত, সমুদ্রে ফেলে দিলে ভরাট হত। এখন আর বলতে ভাল লাগে না। প্রেম, ভালবাসা, মায়া দয়ার কথা বললে অবশ্য বলা যায় কিন্তু কোন কাজ হবে না এত পুরনো হয়ে গেছে। তাই নয় কি ?'

গীতা উত্তর দিল না তবে রাগের ভাবটুকুও নেই আর, তাকাল অশোকের মুখে।

'লক্ষ্য করেছি মানুষ একটা জটিল যন্ত্র বিশেষ। ইন্ধন যোগালে চলে, ফুরোলে থেমে যায়। আমাদের ইন্ধন ফুরিয়েছে।'

'হাততালি দেব কি?'

'কেন!'

'চমৎকার আবিষ্কার মানুষ সম্পর্কে, তাই।'

'তাহলে আমরা যে এখানে এলাম, তার পিছনে কি যুক্তি আছে?'

'ওহ্ অশোক,' গীতা উঠে এসে পিছনে দাঁড়াল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কানে কানে বলল, 'কোন যুক্তি, নেই নেই নেই, ফিরে যাবে?'

'কোথায়?' অশোক ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করল। গীতা আর একটু ঝুঁকে বলল, যেখানে হোক্।'

অশোক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, শুকনো হাসল। তাই দেখে গীতা ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। মুখ সরাতেই অশোক বলল, পচা আলুর গন্ধ, দাঁত মাজনি?'

গীতা অপ্রতিভ হয়ে গেল, রেগেও উঠল। থমথমে গলায় বলল, 'গন্ধটা তোমার গেঞ্জী থেকেও তো হতে পারে।'

'পারে, কিন্তু গেঞ্জীটা এই মুহূর্তেই খুলে ফেলতে পারি।'

'তাতে কিছুই এসে যাবে না আমার। তোমার গায়ের গন্ধ শোঁকার ইচ্ছে আমার নেই।'

'নেই তা এসেছ কেন এখানে!'

উত্তর দেবার জন্য তীব্র চোখে গীতা তাকাল। স্বরটাকে মুচড়ে কাঁপিয়ে বলল, 'আমি এসেছি না তুমিই এখানে এনেছ। বহু আগেই কারুর না কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত। তুমিই হতে দাওনি। অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর, আর একটু আয় বাড়লেই বিয়ে করব, করতে পেরেছ?

'গীতা আবার সেই পুরনো কথা, এসব কথা বহু বলা হয়ে গেছে। এখন যদি আমাদের বিয়ে হয়, তা হলে বেশি কি আর লাভ করতে পারি?

'দুজনের আয়টা যোগ হবে।'

'আর হৃদয়?'

'ওতো যুক্ত আছেই।'

'তাহলে দরকার কি বিয়ের? বিয়ে মানেতো সংসারের আয় বৃদ্ধি করা নয়। অবশ্য একটা সুবিধা এই যে প্রকাশ্যে তোমায় নিয়ে ঘরে ঢুকে খিল দিতে পারি।'

'বেশতো সেটাই বা কি কম সুবিধের। তাহলে এখানে এসে, এই নড়বড়ে বাড়ির ঘরে বসে অপেক্ষা করতে হয় না, এজন্য টাকাও খরচ করতে হবে না। ভেবে দেখ বিয়েতে বাড়তি লাভ হয়তো নেই, কিন্তু বাড়তি আয় আছে। টাকা বাঁচানো মানেই রোজগার করা।'

গীতা ঘুরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। মুখচোখে উত্তেজনা। অশোক কিছুটা বিস্মিত চিন্তাগ্রস্তও বটে।

'আমাদের তিনতলার ঘরটা খুব সুবিধের।'

'ভাড়া দেবে?'

'কেন, কাকে?' গীতা অবাক হল।

'আমাকে, আমাদের। আমিই টাকা দেব। তাহলে আর এই লোকটাকে টাকা দিতে হয় না। ঘরের টাকা ঘরেই থেকে যায়।'

অশোক ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার জন্য গীতা চুপ করে থাকল। শেষে বলল, ব্যাপারটা তুমি তলিয়ে দেখছ না একদম, এক সময় তো আমরা বুড়ো হবই, তখন কাজ করতে পারব না, রোজগারও হবে না, এমন কিছু আয়ও নেই যে টাকা জমাতে—' গীতা থেমে গেল কারণ লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকল। যেহেতু হঠাৎ থেমে গেল, তাই গীতা ভাবল লোকটা হয়তো মনে করতে পারে অনুচিত কোন আলাপ হচ্ছিল। সুতরাং গীতা কিছু একটা বলার জন্যই বলল, 'ওপর থেকে বালি পড়ছে।'

লোকটা উপরে তাকালও না, বলল 'পড়ে। খুব পুরনো বাড়িতো, সেদিন একটা কড়ি খুলে পড়েছিল, উনুনে চালান করে দিলুম, একবেলার ঘুঁটে খরচ বেঁচে গেল।' বলে হাসল, আবার বলল, 'তবে এঘরের কড়ি-বরগা ভাল।'

খুট খুট করে সদরের কড়া নড়ল। লোকটা বেরিয়ে গেল।

অশোক হাতঘড়ি দেখল।

'কত বাকি?'

'অল্প।' উত্তরের মধ্য দিয়েই অশোক বুঝিয়ে দিল, সে ক্লান্ত।

লোকটা আবার ঘরে এল পিছনে আর দুজন। পুরুষটি ফর্সা, পরিষ্কার ধুতিপাঞ্জাবী, দোহারা। লক্ষ্য করার মত শুধু চোখদুটি, বেশ বড়, ফলে ভেসে উঠেছে মুখের উপর। এমন একটা বোকামির ভাব যা বিনাদোষে কেউ চড় খেলে দেখতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকটির মাথায় সিঁদুর। হাতের হাড় এবং আঙুলের শিরা প্রকট। শুধুমাত্র শাঁখা এবং লোহা। কোলে প্রায় মাস ছয়েকের এক বাচ্চা। এ ঘরে বাচ্চাটি বেমানান।

'আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে, এনারা আগে এসেছেন।'

লোকটি আঙুল দিয়ে অশোক এবং গীতাকে দেখাল, ওরা যেন ভীষণ দমে গেল, ধরা গলায় লোকটি বলল, 'কতক্ষণ?'

'এক ঘণ্টা।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠল স্ত্রীলোকটি। পুরুষটি তার দিকে তাকাতেই মুখ নামিয়ে কোলের বাচ্চার দিকে মন দিল।

'অবশ্য এনারা যদি আপনাদের আগে যেতে দেন তাহলে যেতে পারেন।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। ভিতর থেকে ছোট ছেলেটি এসে একবার উঁকি দিল। অশোক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বুঝল পুরুষটি তার দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ কিছু একটা বলার তোড়জোর করছে, কি বলবে তা সে জানে। আগে যাবার জন্য প্যান প্যান শুরু করবে, ছোট ভাইপোভাইঝিরাও ঠিক অমন করে তাকে পাইখানা যেতে দেখলে। তখনকার মত এখন রাগ চড়ে উঠল।

ধোঁয়া ছেড়ে অশোক তাকাল, সরাসরি অভদ্রের মত। স্ত্রীলোকটি বাচ্চাকে মাই দেবার জন্য বোতাম খুলছে। চোখ সরাতেই হল।

'আপনাদের কি কাছেই বাড়ি ?'

পুরুষটি জিজ্ঞাসা করছে। ছাই ঝেড়ে অশোক বলল 'হাঁ'।

'আপনার ?' এবার গীতা প্রশ্ন করল।

'দূরে।'

'বাচ্চাকে সঙ্গে এনেছেন যে ?'

স্ত্রীলোকটি পুরুষটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গীতাকে জবাব দিল, 'না এনে উপায় নেই, তাই।'

'উনি আমার স্ত্রী নন্,' পুরুষটি সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল।

অশোক এবার মনোযোগী হল। রুচি এবং কৌতূহলবোধের লড়াইটা তারমধ্যে ভালভাবেই জমে উঠেছে ফলে অস্থির হল যাহোক একটা ফলাফলের জন্য, গীতা সাহায্য করল।

'তাহলে আপনারা কি সুবাদে এখানে এলেন ?'

পুরুষটি যেন ধরে নিয়েছিল এই প্রশ্নের সামনে তাকে দাঁড়াতেই হবে, তাই উত্তরটি তৈরী করে রেখেছিল।

'আমরা প্রতিবেশী, ওর চারটি আমার ছটি ছেলেমেয়ে। বাচ্চা নিয়ে বেরোলে কেউ সন্দেহ করবে না, তাই আনা, তাছাড়া অতটুকু কার কাছেই বা রেখে আসবে।'

'কিন্তু ওকে নিয়েই কি আপনারা ঘরে যাবেন!'

'তাছাড়া উপায় কি।'

অশোক সিধে হয়ে বসল। অবাক হয়ে গীতাও তার দিকে তাকিয়ে, স্ত্রীলোকটি ঢুলছে। বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ থেকে মাই খসে গেছে, বুক থেকে আবের মত একখণ্ড মাংস ঝুলছে।

'একটা কথা বলব ?' পুরুষটি বলল।

'জানি, আগে যেতে চান।'

'হ্যাঁ, দেরী করলে ওর স্বামী ফিরে আসতে পারে, ভীষণ খিটখিটে।'

'আপনারা এখানে এলেন কেন ?'

অবাক হয়ে পুরুষটি অশোকের দিকে তাকিয়ে থাকল। চড়খাওয়া ভাবটা যেন ভূত দেখছে। প্রশ্নটা প্রাঞ্জল করার দরকার বোধ করল অশোক, 'আপনাদের সম্পর্কটা কি ধরণের জানলে নয় বরং ভেবে দেখতে পারি।'

'আমরা দুজনেই অনেক চেয়েছিলাম, কিচ্ছু পাইনি, আমরা বিরক্ত। এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।'

বাচ্চাটা ঘুমের ঘোরে ছটফট করে কেঁদে উঠল, স্ত্রীলোকটি মুখে আবার মাই গুঁজে দিল, দিয়ে চারপাশ তাকিয়ে আবার ঢুলতে শুরু করল। পুরুষটি সিগারেটের জন্য অশোকের দিকে হাত বাড়াল।

ঘরের বাইরে জুতোর শব্দ হল, কারা চলে যাচ্ছে। লোকটি ব্যস্ত হয়ে ঢুকল, 'আসুন, ঘর খালি হয়ে গেছে।'

'একটুখানি, আগে ঠিক হোক কারা যাবে।'

'আমার কাছে সময় মানেই পয়সা, যে সময়টুকু নষ্ট হবে তার দাম দেবে কে ?'

'আমি,' উত্তেজিত হয়ে অশোক বলল, 'আমি দেবে।' এবার পুরুষটিকে সে বলল, 'আমরাও চেয়েছিলাম, পরে বুঝি পাওয়া যাবে না তাই নিস্পৃহ হয়ে গেছি। আপনি কি ভাবেন এখনো কিছু পেতে পারেন ?'

এবার যেন দিশাহারা হল ভূত দেখা চোখ দুটো।

'আপনি অবৈধ কাজ করছেন বলে বিবেক দংশনে ভোগেন না ?'

'দেখুন,' গলা খাঁকরি দিয়ে এই জীর্ণ বাড়ির মালিক লোকটি বলল, 'দেখুন এ ধরণের আলোচনা এখানে হোক তা আমি পছন্দ করি না,' স্বরটা বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক, অশোকও ঘাবড়ে গেল, ঢুলুনি থামিয়ে ফিসফিস করে স্ত্রীলোকটি কি বলল। পুরুষটি জবাবে কিছু একটা বলে অশোককে বলল, 'তাহলে আমরা যাই, এক ঘণ্টা দেরী করা আমার পক্ষে হলেও ওর পক্ষে সম্ভব নয়।'

ওরা উঠে দাঁড়াতেই ব্যস্ত হয়ে অশোক বলল, 'এক মিনিট, আমরা একটু কথা বলে নিই।' অশোক জানলার কাছে গিয়ে ইসারায় গীতাকে ডাকল, প্রশ্ন সমেত গীতা হাজির হল।

'তার মানে! ওরা কি আগে যাবে ?'

'তাই যাক্। ওরা অসৎ তাই বাচ্চাটাকে সঙ্গে এনেছে নিজেদের পতন রক্ষার জন্য। আমরা তা হতে দিতে পারি না। ওরা যাক বাচ্চাটাকে আমরা রাখব।'

'আমাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করাটা তাহলে মাঠে মারা যাবে ?' অশোকের মতই চাপাস্বরে গীতা তর্ক করতে চাইল। 'আমাদের বাঁচার শেষ অর্থটা থেকেও তাহলে বঞ্চিত হব ?'

'আহ্ তা কেন, তোমাদের ছাদের ঘরটাতো পাওয়া যাবে। বিয়ে করলে তো আর কোন বাধাই থাকবে না। আমরা বিয়ে করব। খরচও বাঁচবে, তাই না ?'

এই জীর্ণ বাড়ির মালিক লোকটি তাড়া দিল। 'যাহোক একটা কিছু ঠিক করুন।'

'হ্যাঁ, ওরাই আগে যাবেন।' অশোক এগিয়ে এসে হাত বাড়াল বাচ্চাটাকে নেবার জন্য। স্ত্রীলোকটি বিস্মিত, পুরুষটি কৃতজ্ঞ। চোখে মুখে সেই ভাব ফুটিয়ে তোলার আগেই ওরা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল বাচ্চাকে আশোকের হাতে তুলে দিয়ে।

হাত বদলের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল বাচ্চার। হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার শুরু করল। অশোক দোলাতে লাগল, তাতে কোন ফল হল না। গীতার দিকে সে বাচ্চাকে বাড়িয়ে দিল।

'আমি কেন ?'

'দেখ চুপ করাতে পার কিনা।'

গীতার কোলে এসেই বাচ্চা চুপ করল। গীতা হাসল। দেখল অশোকের চোখেও হাসি।

'ভারী সুন্দর, তবে রুগ্ন আর নোংরা।'

'বোধ হয় অপুষ্টিতে ভুগছে।'

গীতা মুখ নামিয়ে বাচ্চাকে দেখতে লাগল। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। একবার ছটফট করে উঠল। ওলট-পালট করতে চায়। জোর করে চেপে ধরল গীতা, পড়ে যেতে পারে।

হাঁপিয়ে উঠে বাচ্চা আবার চীৎকার শুরু করল, এবার আরও তীব্র, হেঁচকি তোলার মত। শ্বাস নিতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে।

গীতা তাকাল অশোকের দিকে। তার দিকেই অশোক একদৃষ্টে তাকিয়ে। দেখতে দেখতে গীতা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠল, 'কি চাও তুমি কি চাও ?'

কথা বলল না অশোক।

'আমি কিছুতেই পারব না, সে উপায় যে আমার নেই, ওকে চীৎকার করতেই হবে।' চীৎকার করে বলতে গিয়েও গীতা পারল না। গলা ভারী হয়ে গেছে, চোখ ঝাপসা। অশোক মাথা নামিয়ে রেখেছে। ওর কোলে বাচ্চাটিকে নামিয়ে দিয়ে গীতা পাশে দাঁড়াল।

'গীতা আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে বোধ হয়।' যেন বাচ্চাটিকে শোনাবার জন্যই অশোক বলল। ধীর, মৃদু, অনুতপ্ত স্বর, 'নয়তো এ কেঁদেই যাবে। একে চুপ করাবার কোন উপায় আমারও যে জানা নেই।'

অবসন্ন গীতা পাশে বসে পড়ল। হেঁচকি তোলার মত বাচ্চাটি কেঁদে যাচ্ছে।

কবিতা গুচ্ছ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আদি চেতনা

দু'দণ্ড থাকবো আমি এইখানে মৃত্তিকায় শুয়ে।
এই যে প্রাচীন বট দৃঢ়মূল এখানে দাঁড়িয়ে
পিতাপিতামহদের প্রতিবেশী। সমাহিত পূর্বসূরীদের
সমৃদ্ধ স্মৃতির সাক্ষ্য ; রুদ্ধবাক আমি সে-বটের
শাখায় শাখায় দেখি আদিরূপ ; বিগতকালের
প্রশ্নাতীত প্রশান্তির রেখা। শান্ত, স্থির অন্ধকারে
অদৃশ্য অতীত তার রোমময় বুকে খেলা করে
প্রগাঢ় বিন্যাসে। আর, অস্তোন্মুখ সূর্য রেখে যায়
গলিত সোনার রঙ কাণ্ডমূলে, পাতায়, বাকলে ;
বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্ম বর্ষা অকৃত্রিম দৃশ্য রচনায়
একটি বিন্যস্ত ঐক্য নিত্যকাল রেখেছে বজায়
এই প্রৌঢ় বীতশোক সদানন্দ বৃক্ষের শরীরে।

দু'দণ্ড থাকবো আজ সন্তর্পণে এইখানে শুয়ে
সুপ্রাচীন বৃক্ষমূলে। প্রত্যয়ের আদিম সংসারে
সমর্পিত হবে দগ্ধ আকাঙ্ক্ষারা। একান্ত নির্ভয়ে
অতীতে প্রেরিত যতো প্রতিবিম্ব। এবং যেহেতু
বৃক্ষই আদিম পিতা, আদিপ্রাণ মৌনতার সেতু,
প্রোথিত অতীত থেকে মৃত্তিকায় দৃঢ়বদ্ধতায়
সম্মানিত, অধিষ্ঠিত,—আজ আমি বিক্ষত শরীরে
অস্থির উদ্বায়ু জ্বালা অন্তর্মুখী আঁধারে ডুবিয়ে
প্রজ্ঞা মেধা মননের এই স্থির ঋষির আশ্রয়ে
উদ্ঘাটন করবোই আবর্তিত হৃদয়ের দ্বার ;

তৃষাদীর্ণ বাসনারা অতঃপর ঘুমাবে নির্ভয়ে,
অন্ধকারে, অন্তরঙ্গ সন্নিধানে, নিহিত উদ্ধার ॥

রূপান্তর

তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে।
হঠাৎ ঋতু বদলে গেল কিসের দোলা লেগে।
মেঘগুলো সব বেগে উধাও নিথর সুদূর নীলে,
সূর্য জ্বলে মাঠে-মাঠে নীরব হ্রদে বিলে।

তোমার চুল উড়ছে হাওয়ায় করছে চিকচিক,
হঠাৎ যেন সাড়া জাগে সব দিকেই ঠিক।
পাহাড়চূড়া সূর্যে জ্বলে, পাতায় আলোড়ন,
তুমি যেবার কাছে এলে তখন সন্ধিক্ষণ।

একটি নিমেষ, হলাম যেন আদিম প্রেমিক পাখী,
বেঁধে দিলাম সূর্যে চাঁদে প্রণয়ভরা রাখি।
তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে,
পাথর যতো সোনা হ'লো যাদুস্পর্শ লেগে ॥

বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত

বন্ধুকে চাই না আর। যেহেতু বন্ধুরা
বিবর্ণ পুতুল মূর্তি ; অথবা আড়ালে
প্রতিযোগী প্রেত। এমনও হয়েছে
কেউ কেউ হিংসাত্মক কল্পনার জালে
নিজেকেই বন্দী রাখে যেমন জন্তুরা
উচ্ছিষ্ট মাংসের লোভে পরস্পর মাতে।

অথচ বন্ধুর সঙ্গ বাঁচায় জীবন
এ পরম সত্য কে না জানে!
বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত ছুঁয়ে গেলে মন
সমস্ত শরীর প্রীত সুরের আহ্বানে।

বন্ধুকে চাই না আর। ইদানীং মেকি
দুর্বৃত্ত স্বজন বাড়ে, অন্তত সংখ্যায়
নিতান্ত নগণ্য নয়। ছলা ও কলায়
সংসারে নখরচিহ্ন রেখে যায় দেখি
সুযোগসন্ধানী শ্বাপদেরা।

অথচ বন্ধুর সঙ্গ বাঁচায় জীবন।
এবং বন্ধুর প্রীতি না হলেই বিভ্রান্ত সংসারে
অতৃপ্তির তীব্র ক্ষোভ বাড়ে।
বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত যদি ছোঁয় মন
মন প্রীত কল্লোলিত যমুনা জোয়ারে।

বন্ধুকে চাই না তবু আর।
যেহেতু বন্ধুর হাতে নেই প্রীতিপূর্ণ অধিকার॥

একবার ভেবে দ্যাখো

কে আমাকে বুকে রাখবে
শিশুর মতন?
বাংলা দেশ।

কে জড়ায় চেতনা আমার
সস্নেহ প্রত্যয়ে?
বাংলা দেশ।

কে আমাকে দিন থেকে রাতে,
রাত থেকে দিনে
অবিরাম স্পর্শধন্যতায়
প্রত্যেক নিমেষে
নিয়ে যায় ?
বাংলা দেশ।

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে
মেঘ বৃষ্টি জলে
হেমন্তে শরতে শীতে,
বসন্ত বন্যায়
কে নিমেষে নিয়ে যায় ?
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ
এই বাংলা, খণ্ডিত প্রদেশ।

গঙ্গায় পদ্মায় একাকার
জনমে মরণে বাঁধে সেতু
অজেয় প্রাণের বাংলা,
এই বাংলা দেশ ॥

কর্ম ও কল্পনা

অসীম রায়

৮ই এপ্রিল, ১৯৬১

এলইস্ হে আর আমার বয়স প্রায় একই একথা চার বছর আগে তার সঙ্গে প্রথম আলাপে সে জানিয়েছিল। সমবয়স হলে বন্ধুত্ব বাড়ে একথা যেমন ঠিক নয় তেমনি সমবয়স হবার সুবিধে তর্কাতীত। জীবনযাত্রার এক পর্যায় আলাদা আলাদাভাবে কাটিয়েও একই ধাপে এসে দাঁড়ানর একটা মানে আছে। এলইস্ বলে, তার বিয়ের আগে তার সমস্যা এবং আমার সমস্যা প্রায় এক ছিল। ডেইলী মেল্ এর সংবাদদাতা হিসেবে সে যা লিখত সে ভাষা অস্পষ্ট বলে প্রায় খারিজ হত রোজ আর তার সংশোধিত ভাষা কাগজের পাতায় লাগত একেবারে অর্থহীন, বর্ণহীন; সে ভাষা তাকে ব্যঙ্গ করত। অবশ্য এ ছাড়া আর এক কারণে খবরের কাগজের জগত সে ছাড়ল। 'দেখলাম আমার অতো শারীরিক ক্ষমতা নেই। পুরুষদের সঙ্গে তাল দিয়ে সব জায়গায় ছোটাছুটি, রাত জেগে পরিশ্রম, পরদিন ভোরেই চোখের নীচে কালি নিয়ে হাসিমুখে দৌড়ন—এ ধকল পোষাল না।' এলইস্ উপন্যাস লিখতে চেয়েছিল, এখনও এ বিষয় তার প্রবল ইচ্ছে। কিন্তু উপন্যাস লেখার পেছনে যে অনিশ্চয়তা আছে—যদি ঠিক যেভাবে লেখার ইচ্ছে সেভাবে লেখা না দাঁড়ায়? তার চেয়ে মনে হল আরও নিশ্চিত জগতের অধিবাসী হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে শিক্ষকতা সুরু করলে। তার পরের ধাপ উপন্যাস না হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোসেফ কন্‌রাড-এর ওপর পি. এইচ. ডি? লেখকের অনিশ্চিত জীবন না কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত সংসার? ছেলেবেলা থেকেই এলইস্-কে অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, হয়ত পড়াশোনা করা সম্ভব হবে না এ আতঙ্ক ছিল বরাবর। এলইস্ দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছে।

অনেক দূরের মানুষ হলেও এবং তার জগতের অনেক দিক অজানা থাকলেও তার জীবনের এই মূল ধারা খুব পরিচিত ঠেকে। অবশ্য তার একটা কথা বুঝতে অসুবিধা হয় অথবা সমস্যার সরলীকরণ বোধহয় যখন সে বলে উপন্যাস লেখার চেয়ে ছেলে মানুষ করা তার কাছে আরও অর্থপূর্ণ লাগে। ছেলে মানুষ করার পূর্ণতা স্বীকার করেও কি বলা চলে না যে আসলে ছেলে এবং শিল্পচর্চা প্রতিদ্বন্দ্বী ঠেকলেও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, উৎস তাদের একই এবং দুটোই দুটোকে সমৃদ্ধ করে। নিশ্চয় টমাস মানের উপন্যাসে গ্যয়টের উদ্দাম সৃজনপ্রতিভায় লোট-এর ক্ষোভ—মেয়েরা মাত্র পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সন্তানধারনে ক্ষমতাশালিনী কিন্তু লেখকের আমৃত্যু মানসপুত্র প্রসবের অধিকার—যুক্তিতে টেকে না। লোট যদি হতেন জেন্ অস্টেন?

এলইস্ আমাকে অবাক করেছিল একটু অপ্রাসঙ্গিক কারণে। চার বছর আগে প্রথম পরিচয়ে রেস্তোরাঁয় বসে তার উপন্যাস লিখবার প্ল্যান বলেছিল একদম অচেনা এক লোককে। আমার মত গ্রাম্যলোক শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রধানত মেমসাহেব বলে ভাবতে অভ্যস্ত আর মেমসাহেব

মানেই চরিত্রের focus হারানো মহিলা যাদের সঙ্গে পার্টিতে "Isn't it fine ?" বা "How awful really।" এরকম কতগুলো শব্দ আওড়ানো যায় মাত্র। এইলস্ অবাক করেছিল তার শুধু সাহিত্যবোধের জন্যে নয় (এ বোধ বোধহয় ইয়োরোপ আমেরিকার ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সমালোচনার ধারার সঙ্গে যুক্ত হলে খুব অনায়ত্ত থাকে না) সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টির দরুণ যে আর মেমসাহেব থাকে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাকে আমার ভাললাগার কারণ বলায় এলইস্ একটু লজ্জা পেল। বললে, তার স্বামারীও নাকি তার প্রতি আকর্ষণের এক অন্যতম কারণ তার লেখক হবার স্বপ্ন। অবশ্য যা ঘটনা পরম্পরা তাতে খুব নিকটবর্তী কালের মধ্যে এ স্বপ্ন বোধহয় সত্য হবে না।

একটা ব্যাপারে সামান্য অসোয়াস্তি হয় মেয়েটির সাহচর্যে। ছেলেবেলায় আমরা বেশী তিড়িং ভিড়িং করলে বাবা বলতেন এলে চেলে পোকা নড়ছে। এলইসেরও একটা এলে চেলে পোকা আছে, সেটা মাঝে মাঝে নড়ে। তার নাম রোমান ক্যাথলিসিজম। তখন তার সাহিত্যের দৃষ্টি আমার কাছে আবৃত লাগে। তখন সে বলে religious experience না হলে মহৎ লোক হওয়া যায় না। আবার স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরে আসে। তখন আবার যা দেখা যায় শোনা যায় সেই জগতের মানুষের পার্থিব সম্বন্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার যে সাহিত্যের প্রাণ তাও বলে। কিন্তু আবার এলে-চেলে পোকাটা নড়ে ওঠে তখন আবার তার কথা অস্পষ্ট লাগে, সব ছেড়ে ছুড়ে গ্রাহাম গ্রীন্ এসে দাঁড়ায় সামনে। আবার আলাপের ধাক্কায় ধাক্কায় সেই যবনিকা সরে।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৬০

গত রোববার আবার Yasnaya Polyana-য় গিয়েছিলাম।

বছর দুই আগে প্রায় এমনি সময় রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে ক্যানিংয়ের মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম। উদ্দেশ্য 'ইকনমিক ফার্মিং' আর তা হবে এমন যা একজন লোকের সাহিত্য সাধনার রাস্তাকে করবে নিষ্কণ্টক, তাকে এই হন্যে হয়ে খবরের পেছনে সকাল সন্ধ্যে ছোটার অসোয়াস্তি ও পরিশ্রম থেকে বাঁচাবে আবার কাঙাল-বেশে প্রকাশকের দোরগোড়ায় ধর্না দেবার ভবিষ্যত থেকে মুক্তি দেবে। যিনি আমার সঙ্গী তিনি গ্রামের বাসিন্দে, তাঁর জল মাটির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমার আস্থা জন্মেছিল। তিনি আমার চোখের সামনে এক স্বর্গরাজ্য উপস্থিত করলেন। আর কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে উর্ধ্বশ্বাসে সেই স্বর্গের বাসিন্দে হবার জন্যে দৌড়লাম।

কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে রেলস্টেশন থেকে পাকা দু মাইল তফাতে আমার স্বর্গ। গরজ আমার। কাজেই সে জমির যা ন্যায্য মূল্য তা থেকে বেশ চড়া দামে তা কেনা হল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত প্ল্যান অনুযায়ী পুকুর খোঁড়া, প্রায় এক বিঘে জল। ঠিক সে সময় এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। ঠিক আমার জমি যেখানে তার কাছেপিঠে ভাতের জন্যে চাষী বৌ তার কোলের ছেলেকে কুড়ি টাকায় বিক্রী করেছে। কিন্তু আমি তখন স্বর্গের বাসিন্দে হবার জন্যে বদ্ধপরিকর। সরকারী টেস্ট রিলিফে মাথাপিছু দৈনিক মজুরী চোদ্দ আনা যা চাল আটার দাম ধরলে পরিবারের তিনটি

লোকেরও দুবেলা মোটা খাবার জোটাতে পারে না। আমার সঙ্গী ঠিকই বোঝালেন যে আমাদের অন্তত তাদের দৈনিক অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাটা করতে হবে। খুব বেশী এমন দেওয়া হয়নি, মাথা পিছু এক টাকা ছ আনা। কিন্তু তার মানে পুকুর খোঁড়ায় খরচ পড়ে গেল দেড় হাজারের ওপর।

পুকুর কাটার সময় আমার কিছুটা সম্বিত ফিরে এল। সে দৃশ্য এখনও মনে আছে। জমি ঢালে কাটা হচ্ছে আর মাটি বয়ে উঠবার জন্যে তারই গায়ে সরু ফালি রাস্তা বার করা হয়েছে। তিরিশ চল্লিশজন লোক, ছুঁচলো দাড়ি, চোখ জ্বলছে পরিশ্রমে রোদ্দুরে, ঘাম আর মাটির গুঁড়োয় মুখ ভর্তি। দশবারো ফুট নীচ থেকে সেই তিরিশ চল্লিশটা মুখ আমার দিকে চেয়ে আছে। সে মুখে অবিমিশ্র বিদ্রূপ, কিছুটা করুণাও। 'বাবুকে বেশ ফাঁসানো গেছে' এরকম একটা চাপা উল্লাসও আছে কারুর কারুর চোখে। অনেকক্ষণ ধরে নীরবে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা দেখল। একজন আর একজনকে বললে, "বাবুর খেয়াল হয়েছে, আর ভাবনা কি!" তারপর তারা যে মজুরী চাইলে তা দিতে হলে এক বিঘেরও কম পুকুরে দু হাজার টাকা খরচ হয়। আমার বন্ধুটির তখন খেয়াল হয়েছে। সেই উদ্যত হাত, তীক্ষ্ণ চোখ আর চাপা গুঞ্জনকে তিনি ধমক দিলেন আর সে গুঞ্জন একবার আমাদের দিকে একটু মোড় ফিরেই আবার সামনে বিস্তৃত মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তারপর যে জমিতে বাস করা হবে, যেখানে নারকেল গাছের সারির নীচে আমার ঘর থেকে দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যাবে (নাইট ডিউটিতে সাদা কাগজে সেই ঘরখানার নক্সা এঁকেছি বহুবার) সে জায়গা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। পুরু সাদা চাপ চাপ নুন সে মাটির পরতে পরতে। বড় গাছ তো দূরের কথা বরবটি যা এ অঞ্চলে প্রচুর ফলে তার চারাও হলুদ হয়ে পড়ল। পুকুরের জলে কলমী লতাও শুকাল। খালি অপর্যাপ্ত পুঁইশাকের রসাল সবুজে আমার বাগান সবুজ হয়ে রইল সে বছর।

যখন এক বোঝা পুঁইশাকের আঁটি হাতে ঝুলিয়ে টা টা রোদ্দুরে দর দর করে ঘামতে ঘামতে আল ভেঙে দৌড়াচ্ছি আর অদূরে কলকাতা যাবার ট্রেন হুইস্‌ল দিচ্ছে (ফেল করলে চলবে না কারণ বাড়ি পৌঁছবার একঘণ্টার মধ্যেই অফিস) তখন মালুম হল এই ছ হাজার টাকার রঙ্গ। তরাপর বর্ষা। দু মাইল পাঁকের নরক। আর সে পাঁক এত জোরাল যে মনে এঁটে বসে। তার মাঝখানে এক বিষণ্ন সকালে এক ঝাড়াল শিরীষ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, আত্মীয়-স্বজনেরা যা বলেছেন তা বোধহয় ঠিক—ছ হাজার টাকা কাদায় পুঁতে এসেছি।

তারপর গত বছর দেড়বিঘে সেই ভয়ঙ্কর মাটিতে কলা লাগান হল। আর হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলাম ক্যানিং-এ যাতায়াত, আমার Yasnaya Polyana-র স্বপ্ন। গত বছর বর্ষায় সারা বাংলা দেশ ভাসল, তার সঙ্গে আমার জমিও ভাসল। চিঠিতে খবর এল: কলা হয়েছিল গাছ পচে গেছে, মাছ ছিল ভেসে গেছে, ধান ছিল ডুবে গেছে। এ রকম অবস্থাই চলেছে। প্রায় এক বছর পর গিয়েছিলাম ক্যানিং-এর গ্রামে।

দেখলাম যতখানি হাল ছেড়েছিলাম ততখানি হাল ছাড়বার ব্যাপার নয়। প্রবল বর্ষায় এবং পরপর দুবছর ধনচে চাষের ফলে মাটির চেহারা বদলাচ্ছে। এখনও এঁটেল, নোনা। তবে

সোনার ভাগ কম। আশা করা যায় তিন চার বছরের বর্ষায় মাটি ঝুরো হতেও পারে। খদ্দের জুটতে পারে কারণ স্টেশন থেকে গ্রামে পাকা রাস্তা হবার কথা হচ্ছে।

পুকুরের মাঝখানে শুকনো ধন্‌চের ডাল পোতা আছে জল মাপার জন্তে; সেখানে একটা নীল ফড়িং অনেকক্ষণ থেকে ঘোরাফেরা করছিল। জল থেকে মাথা তুলতেই চোখে পড়ল শখানেক কলাগাছের ঘন জমাট সবুজ (সেচের অভাবে প্রায় সমস্ত কাঁদির কলাই শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে) আর মুখে এসে লাগে মাঠের হাওয়া। লোনা নদীর ওপর দিয়ে একটানা গা-জুড়ানো হাওয়া বইছে দিনরাত। কয়েক হাজার টাকা দিয়ে এই হাওয়া কিনেছি।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৬০

'চলন্তিকা'-খানা হারিয়ে গেছে কয়েক মাস। কিছুদিন যাবৎ অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছে। অভিধান-নির্ভরতা অনেক সময় মানুষকে সত্যি স্থবির করে তোলে যে স্থবিরতার ইঙ্গিত করেছিলেন স-বাবু রাশিয়া থেকে ফিরে। তিন বছর রুশ-বাংলা অনুবাদ করে আবার ভদ্রলোক চলেছেন মস্কো। আটখানা বই ইতিমধ্যে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ঝড়ের গতিতে। ('উপায় নেই, পিস্-রেটে কাজ। একটা শব্দের ওপর একটু ভাববেন, সিগারেটে টান দিয়ে মাথা সাফ করে নেবেন তা হবে না)। বাংলায় তাঁর অধুনা বুৎপত্তির কথা উল্লেখ করায় বললেন, আর সব গেছে। এখন অভিধান আঁকড়ে আছি।'

ঠিক আঁকড়ে থাকার জন্তে নয় শব্দপ্রয়োগে নিজের স্মৃতিকে নাড়া দেবার জন্তেও ভাল অভিধানের প্রয়োজন। আরও মুস্কিল ইংরেজী ভাষার কল্যাণে এমন এক জগাখিচুড়ি ভাষা আমাদের মেজাজের ওপর চেপে বসেছে যে চলতি বাংলা আমাদের স্মৃতি থেকে ক্রমশই পলাতক। যেমন আমাদের মায়েরা কিংবা গ্রামাঞ্চলের বুদ্ধিমান লোকজন যখন কথা বলেন তখন তাঁদের ভাষা হয় অনেক সুনির্দিষ্ট তাদের উপমা কিংবা চিত্রকল্প ব্যবহারে বাংলাদেশের কয়েকশো বছরের চলমান জীবন কথা বলে। এ ভাষা আমাদের স্মৃতি থেকে সরে যাচ্ছে। 'চলন্তিকা' আমাদের ভাষার এই মূল সমস্যা সম্পর্কে আমাদের খানিকটা ওয়াকিবহাল করে। কাজেই এ বইখানার জন্তে বিশেষ করে একালের লোকজনের হাত বাড়ানর মানে আছে।

দুপুরে শোনা গেল পরশুরাম মারা গেছেন। নাইট ডিউটি ছিল। শোক-সংবাদ চলে গেছে, বাকী খালি 'চেক করা' শেষকৃত্য কেওড়াতলায় হল কিনা। রাত আটটায় পরশুরামের বাড়িতে ফোন করা গেল। এক স্থির অকম্পিত মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, 'এইমাত্র রওনা হয়ে গেছে।' সাড়ে নটায় শ্মশানের অফিসে ফোন করা মাত্রই সংবাদ এল, 'পুড়ছে।'

টাইপ করা রাজশেখরের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে বেঙ্গল কেমিক্যালের মত নামজাদা কোম্পানীর ম্যানেজারি করা। বোধহয় আর কোন বাঙালী লেখক এরকম দায়িত্বশীল কাজের ঝামেলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন নি। আর দৃশ্যমান জগতের প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে এরকম ওতঃপ্রোত যোগাযোগ তাঁর দৃঢ় বাস্তববোধকে

সমৃদ্ধ করেছে। রাজশেখরের মেজাজ বাংলা সাহিত্যের চলতি বিবাদকে আশ্চর্য ধাক্কা দেয়। তাঁর রামায়ণ-মহাভারত চর্চা ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে দায়িত্ববোধ তাঁকে এক দুর্লভ সাবালকত্ব দান করেছে। সাহিত্যচর্চায় যে বাস্তব জগতের দৃঢ় উপলব্ধির প্রয়োজন সে কথা তাঁর সাহিত্য-সাধনায় স্পষ্ট। সাহিত্যিক এই অর্থেই মনীষী, সে একজন 'যেদিকে মন ধায় সেদিকে ধাই' ধরণের লোক নয়।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৬০

সাম্প্রতিক ইংরেজীতে বিশেষ করে আমেরিকান বইয়ে বিশেষণের চেয়ে ক্রিয়াপদের ওপর যে জোর তা কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি লাগলেও তার এক তাৎপর্য আছে। ক্রিয়ায় যদি যথোচিত বর্ণনা না পাওয়া যায় তাহলে অন্যভাবে ভাবপ্রকাশে পাশ-কাটানো ঘটে বৈ কি যেমন জীবজন্তুর আওয়াজ মানুষের আওয়াজে আত্মসাত করে নেওয়া হয়েছে; yelp, croak, whine, whinper, bellow, squeak, bark ইত্যাদি। এগুলো আধুনিক লেখক কেন জোসেফ কন্‌রাডের মত লেখকের বইতেও যত্রতত্র। এছাড়া বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় ব্যবহারের ঝোঁক বর্ণনায় জোর এনেছে। লতাটা জানলার ওপর দিয়ে 'snaked up।' মাইকেলের নামধাতু ব্যবহারের দুর্জয় চেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের ক্রিয়াকে বাক্যের আগে কিংবা মাঝখানে একটু বেশী রকম ঠেলে দেবার মূলে তো বাংলা ক্রিয়ার এই দুর্বলতা। বাংলা বিশেষণের অনেক ডালপালা গজিয়েছে কিন্তু ক্রিয়ার জোর ও বৈচিত্র্য বাড়ান আশু প্রয়োজন।

ট্রুম্যান্ কাপোট-এর 'Other voices, other rooms' মন্দ লাগেনি বলায় এলইস্ প্যাঁচার মত বললে, 'Capote is a smallish mind।' 'Smallish' না লাগলেও 'Smartish' লেগেছিল। তা লাগলেও বইখানা আকর্ষণীয় কারণ যে প্রসারিত পটভূমিকায় এক কিশোর মনের টানাপোড়েন দেখান হয়েছে সে পটভূমিকার নবীনতা। বইটার আরম্ভ প্রায় ডিকেন্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। এলইস্ বললে, 'you don't call him great ?' এই greatness-পিপাসা আমাদের মধ্যে অনেকের এমন তীব্র যে তা চিন্তাশক্তি আবৃত করে। আসলে আমরা ইংরেজী উপন্যাসের great tradition মাথায় রেখে কথা বলি। তারপর দেখা যায় উপন্যাসের great tradition মানে ইউরোপীয় উপন্যাসের ঐতিহ্য। কিন্তু সেখানেও থামা যায় না। আমাদের মনের প্রসারতা কোন উদারনৈতিক মানবতার অজুহাতেই প্রয়োজন নয়, তা প্রয়োজন সত্যের খাতিরে। আর এলিয়টের মত প্রাজ্ঞ লোকের কাছে সভ্যতা মানে ইউরোপীয় সভ্যতা। এটা শুধু কুনো মনের পরিচয় নয়, কতকগুলো ক্ষেত্রে সত্যদৃষ্টি নাগালে না থাকার অজ্ঞতা। আর এ অজ্ঞতার ফলে অনেক সময় মারাত্মক ভুল হয়। জনৈক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে ইউরোপীয় উপন্যাসের ঐতিহ্যের ধারায় ফেলতে চেষ্টা করেছেন, যেখানে খাপ্ খেয়ে গেছে সেখানে খুশি হয়ে লেখককে নম্বর দিয়েছেন, না হলে তাঁকে ফেল্ করে দিয়েছেন। সাহিত্যের ঐতিহ্যের এরকম কোন অব্যয় রূপ নেই। সে রূপ মাথায় থাকলে অনেক আমেরিকান, ভারতীয়, চীন ও জাপানী গদ্যসাহিত্য খারিজ করে দিতে হবে। আর তা

খারিজ করে বৈদগ্ধ্যের অহমিকায় আমরা প্রজ্বলিত হতে পারি কিন্তু সত্যের চেহারা আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যায়।

৯ই এপ্রিল, ১৯৬০

একটা বাংলা ছবি দেখে বন্ধুবান্ধবেরা এমন মুগ্ধ হয়ে আছেন যে সেখানে বইটা না দেখে প্রবেশ করায় নিজেকে ব্রাত্য মনে হচ্ছিল। যাঁরা সচরাচর ভাবপ্রবণ নন তাঁদের ভাবপ্রবণতায় এমন এক উদ্দীপনা থাকে যা সংক্রামক। আর তাঁদের তারিফের ভাষা গ্যয়টের ফাউস্ট, রবীন্দ্রনাথের মানসী, কীট্‌সের ওড্, রিল্‌কের Sonnets to Orpheus কিংবা ইয়েটসের Last Poems প্রসঙ্গে চমৎকার খাপ খায়। শিল্পের কোন মহৎ প্রকাশে আমরা চমকাই, বিহ্বল হই, যা অবচেতনে ছিল তা উছলে ওঠে আর সেই ধাক্কায় আমরা যেমন একাধারে প্রজ্ঞায় আত্মস্থ হবার চেষ্টা করি তেমনি হই প্রগল্‌ভতায় মুখর। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে কোন কোন বন্ধু সেইরকম কাত।

তাঁদের একজন গত সপ্তাহে প্রত্যেক নাইট শোতে ছবি দেখে শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত। হাঁফাতে হাঁফাতে চোখ বন্ধ করে গা এলিয়ে নিজেকে কুঁচকে দুমড়ে এক একটা মন্তব্য করছেন। বাকী কয়েকজনের তিনচারবার হয়েছে। কেউ খালি 'হল্' দেখে হাতপা কামড়াচ্ছেন, খবরের কাগজের চিত্র-সমালোচকদের মূর্খতায় ন্যায্যত মর্মাহত হয়ে ছবিটার স্বপক্ষে, কোন আন্দোলন করা যায় কিনা ভাবছেন। 'খুনী, লোকটা খুনী' (পরিচালক), একজন বললেন। কারণ সুর বাছাই করে যে রকম লাগসইভাবে লাগান হয়েছে তা খুন করার সামিল। মনে আসছিল উত্তর কলকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে কেশরবাইয়ের তান বিস্তারের সময় এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দাঁড়িয়ে উঠে বুক চাপড়ান, 'মার দিয়া, হাম্‌কো মার দিয়া।' আর গভীর ভাবে আলোড়িত হলে ভগবান কিংবা প্রেমিককে লোকে যে ভাষায় সম্বোধন করে—'ডাকাত, খুনে, শালা, শয়তান'—সেই ধরণের গভীর আদরের সম্ভাষণে পরিচালককে ভূষিত করলেন কেউ। কেউ বললেন তিনি চতুর্থবার গিয়েছিলেন পাখীর ডাক শুনবার জন্য। আর একজন বললেন, 'গাছকে কিরকম খেলিয়েছে শালা দেখেছো ?···আচ্ছা শুরু হয়েছে তো কৃষ্ণচূড়া দিয়ে ?' 'না না, raintree।' 'আচ্ছা, আবার কৃষ্ণচূড়া কখন দেখা দিচ্ছে ?' 'যখন মেয়েটা ছেলেটাকে বললে···' 'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো মেয়েটা ছেলেটাকে লক্ষ্য করে একটা 'ফুল' ভারত নাট্যমের মুদ্রা দেখালে, ওটার মানে কি ?' 'ওটা আর একবার দেখতে হবে তো।' 'হাঁসের গলা পেয়েছো যখন আলাপ চলছে দুজনের মধ্যে ?' 'আমার সেই রবার্ট ফ্রস্টের কবিতাটা মনে পড়ছিল, কেমন দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেল দুদিকে যখন মেয়েটা ছেলেটা আলাদা হয়ে গেল।' এই নিবিড় ভ্রাতৃত্বের সুরে ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়া গেল সেদিন।

পরদিন নাইট শোতে ছবি দেখা হল। বইটার সম্পর্কে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাহল সাম্প্রতিক কালকে এমন গুরুত্ব দিয়ে বাংলা ছবিতে আনা হয়নি এযাবৎ। আর তা আনবার জন্তে শিল্পের দিক থেকে পরিচালক ঝুঁকি নিয়েছেন : তার জন্তে বইটা অগোছাল হয়েছে বটে কিন্তু

তার গুরুত্ব বেড়েছে। আর গলা এবং যন্ত্র সঙ্গীত সিনেমার পর্দায় অনেকখানি একাত্ম হয়েছে, কেবল সুন্দর অলঙ্কার হয়ে থাকে নি। 'জলসা ঘরে' খুব ভাল দুটো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সত্যজিৎ রায় বসিয়েছেন কিন্তু সব গানটা না শুনিয়ে ছাড়েন না। এ ছবিতে রবীন্দ্রনাথের একটা গোটা গান 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' বসানো হয়েছে কিন্তু গানটা ঘটনার সঙ্গে মিশে বাস্তবের রূঢ়তা আরও প্রকট করে।

বইটার অসুবিধে হল গল্প ভাল না। নায়িকার যক্ষ্মারোগ ঘটনার ক্লাইমাক্স হয়ে আসে। আর এই পরিচিত-ক্লাইমাক্স অপূর্ব দক্ষতায় উৎরাবার চেষ্টা সত্ত্বেও গল্পের মূল দুর্বলতা পার হওয়া গেছে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে। কেউ কেউ উৎসাহবশে চ্যাপলিনের 'লাইম-লাইটের' সঙ্গে বইটার তুলনা দিচ্ছেন। কিন্তু 'লাইম লাইটের' উৎকর্ষ জীবনের আংশিক দুঃখকে বিরাট নৈর্ব্যক্তিক ট্র্যাজিডির সঙ্গে একাত্মকরণে। 'লাইম লাইটের' নায়কের মৃত্যু অতিরঞ্জন। কিন্তু তার স্বপক্ষে বলবার কথা হল সে মৃত্যুর আগেই গল্পের গতি নির্ধারিত। নায়ক বেঁচে থাকলেও নায়িকায় সঙ্গে মিলন অসম্ভব। এ দুঃখবোধ বলা যেতে পারে অনিবার্য। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নায়িকার যক্ষ্মা অনিবার্য নয়, সেটা কাহিনীকে শেষ করার কায়দা। খুব খুশি হওয়া যেত যদি এ কায়দা না থাকত। তবে গল্পের এই কাঠামোর মধ্যেই পরিচালক আশ্চর্য বৈচিত্র্য এনেছেন। নায়িকার প্রেমিকের বিভ্রান্তি চমৎকার এবং আশ্চর্য শেষদৃশ্য।

গ্রন্থসমীক্ষা

Memoirs of a Bengal Civilian by John Beames. Chatto and Windus, London. 30/-

জন বীম্‌স্ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মী হিসাবে এ দেশে আসেন ১৮৫৮ সালে। কাজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কত ইংরেজ সিভিলিয়ান এ দেশে এসেছিলেন; তাঁদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনের নাম ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অল্প সংখ্যক ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে জন বীম্‌স্ একজন।

বীম্‌স্ সরকারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এ দেশের ভাষা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর Outlines of Indian Philology. এই বই হল 'the first attempt to prepare a scientific general accoun of all the languages then known to be spoken in India.' এর পরে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিন খণ্ডে বের হল তাঁর Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India. বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি তিনি বিশেষ করে আকর্ষণের দাবী রাখেন তাঁর Grammar of the Bengali Language-এর জন্য। এ বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বীম্‌সের ব্যাকরণ ছিল আই.সি.এস শিক্ষানবীশদের পাঠ্য।

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণের মূল্য বর্তমানে বিশেষ কিছু নেই। কারণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এতদিনে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই যুগে এই ব্যাকরণ রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বীম্‌সের ব্যাকরণের সমালোচনা করে তার ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও বীম্‌সের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসঙ্কুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুধুমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দু'টোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।"

১৮৫৮ সালের ১৬ই মার্চ বীম্‌স্ কলকাতা পৌছলেন। সাতান্ন বিপ্লব তখনও চলছে। সিপাহীরা কখন কলকাতা আক্রমণ করে সেই ভয়ে সকলে তটস্থ। "Everyone was in terror of the sepoys, who, in contempt of all geographical arguments, were supposed to be on the point of making a raid upon Calcutta at every moment."

বীম্‌সের প্রাথমিক বেতন ছিল মাসিক ৩৩৩৲ টাকা। এই টাকা থেকে বাড়ী ভাড়া দিতে

হত দেড়শ' টাকা; আর তিন জন ভৃত্যের বেতন দিতে হত পঞ্চাশ টাকা। সে সময় কলকাতায় সিভিলিয়ানদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে বীম্‌সের স্মৃতিকথার কলকাতা অধ্যায়ে। তখন কলকাতায় সবচেয়ে নামকরা ফারসী শিক্ষক ছিলেন হরিপ্রসাদ দত্ত। তাঁর কাছে সবাই পড়তে চাইত। কিন্তু এক সঙ্গে আর ক'জনকে পড়ানো যায়? তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাবার জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানরা অপেক্ষা করে থাকত।

বীম্‌স্ প্রথম কাজ আরম্ভ করেন পাঞ্জাবে। কলকাতা থেকে ডাক-গাড়ীতে পাঞ্জাব যাবার বর্ণনাটি সুন্দর। পাঞ্জাবে তখন ব্রিটিশ অধিকার অল্প দিন যাবৎ স্থাপিত হয়েছে। প্রশাসনিক আইন-কানুনের কড়াকড়ি হয়নি। সুতরাং প্রশাসনের কাজ প্রধানতঃ নির্ভর করত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপর। উপযুক্ত অফিসার কাজ করবার স্বাধীনতা পেলে কাজ দ্রুত এবং ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। বীম্‌স্ তাই পাঞ্জাবের চাকরি-জীবনে সুখী ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে পূর্ণিয়া অঞ্চলে বদলি হবার পর তাঁর চাকরি-জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হল। এদিকে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, পদে পদে নিয়ম-কানুনের বন্ধন। ইচ্ছা করলেও কাজ করা যায় না। তাছাড়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলের অফিসারদের ঔদাসীন্য তাঁকে নিরুদ্যম করেছিল। পূর্ণিয়ায় আসবার পর তিনি যখন তাঁর উপরওয়ালা কালেক্টর স্টুয়ার্ট বেইলির নিকট প্রস্তাব করলেন যে কৃষকদের উপর জমিদাররা যে অত্যাচার করে তা বন্ধ করবার জন্য গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। তার উত্তরে বেইলি "laughed at me and told me it was no business of ours; the zemindar had a right to do what he liked with his ryots. My Panjabi zeal was in fact laughed down by all the Bengal men." বীম্‌সের অভিজ্ঞতা এই যে, "In all departments the Indian native prefers a benevolent despot to a red-tape administrator."

এই সব কারণে উপরওয়ালা অফিসারদের সম্বন্ধে তিনি অনেক জায়গায় বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বাংলার গভর্নর রিচার্ড টেম্পল বিহারের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করতে গিয়ে দৈনিক পঞ্চাশ ষাট মাইল ঘুরে রাত্রিতে বসে শস্য ও জনসাধারণের অবস্থার উপরে রিপোর্ট লিখতেন। বীম্‌স্ তাই নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। পঞ্চাশ ষাট মাইল পথ একদিনে অতিক্রম করলে কতটুকু দেখা হয়? বীম্‌সের নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ছিল না। একদা যে জনসাধারণের দুর্দশা বিমান থেকে দেখে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

বীম্‌স্ অফিসার হিসাবে তাঁর অবস্থা কি ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন: "I was in fact called upon to act and not to act at the same time, a false position in which Government is fond of placing officers by way of shuffling off its own responsibility, a regular secretariat trick." (ফিলিপ ম্যাসনের ভূমিকা।)

কিন্তু এ সত্ত্বেও বীম্‌স্ অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়েছেন। বিহারের নীলকরদের ক্রোধভাজন হয়েও রক্ষা করেছেন কৃষককে। বালাসোর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীদের পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য লবণ আইনের সংশোধন করিয়েছিলেন। যখন দেশে টেলিগ্রাফের তার টান'

হচ্ছিল দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, তখন জমিদার এর জন্য ফাঁকি দিয়ে দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করত। এটাও তিনি বন্ধ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় চাউল আমদানী নিয়ে গভর্নরের কর্মচারীদের মধ্যে কি রকম দুর্নীতি চলেছে তারও বিবরণ দিয়েছেন বীম্‌স্। এই দুর্নীতিচক্রের প্রধান ছিল একজন য়ুরোপীয়ান কর্মচারী।

বীম্‌সের আত্মচরিতের শেষ অধ্যায়ে আছে তাঁর চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা। কবি রামকিষ্টু দত্ত একটি চমৎকার চরিত্র। এর কথা বীমস্ অনেকটাই বলেছেন। বিচারক হিসাবে তিনি এক আধা পর্তুগীজ-আধা মগ পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই কাহিনীটি একটি ছোটগল্পের মতোই সুন্দর। দুঃখের বিষয় বীম্‌স্ তাঁর আত্মচরিত সম্পূর্ণ করে যাননি। করলে হুগলী অঞ্চলের অনেক কথা তাঁর কাছ থেকে জানা যেত। অবসর গ্রহণের পূর্বে অনেক বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গে কাটিয়েছেন।

ভারতীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনার লেখক, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের লেখক বীম্‌সকে এই স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার মন্দির এবং ললিতকলা সম্বন্ধে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ও অন্যান্য পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই বই সে সব বিষয়ের চর্চার উপরও আলোকপাত করে না। এখানে পাই অফিসার বীমসকে,—যিনি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী এবং সহানুভূতিশীল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাঞ্জাব থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিচিতি হিসাবে বীম্‌সের স্মৃতিকথার বিশেষ মূল্য আছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে ছোটগল্প (নবসংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৫)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ডি, এম্, লাইব্রেরী। মূল্য ঃ আট টাকা।

শিল্পস্রষ্টা ও শিল্পতাত্ত্বিকের দুর্লভ সমাহার ঘটেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে। তিনি বাঙালীর ঘরে ঘরে ঔপন্যাসিক ও সার্থক ছোটগল্পের লেখকরূপে বিশেষ প্রীতির পাত্র। আবার শিক্ষা-সমাজে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগের 'উপন্যাস ও ছোটগল্প' সম্পৃক্ত বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপক, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকরূপে বিশেষ মান্য। তাই তাঁর লেখা 'সাহিত্যে ছোটগল্প' বইটি, এ বিষয়ে বাংলায় আরও দু' একটি পুঁথি রচিত হবার পরও, বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

'সাহিত্যে ছোটগল্প' ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের হাতেখড়ি নয়, ঐ নামেই তিনি পূর্বে একটি ক্ষীণকায় আলোচনা-গ্রন্থ লিখেছিলেন। লেখক জানাচ্ছেন, "বর্তমান বইটি নামতঃ তার দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচিত হয়েছে।" অর্থাৎ, এটি অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকতর আলোচনা, ব্যাপকতর পাঠ ও পরিণততর মননের ফসল। কতকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই 'মৌলিক গবেষণা' গ্রন্থটির জন্য তাঁকে 'ডক্টরেট' প্রদান করেছেন।

এই কাজে বিশ্বসাহিত্য মন্থন করেছেন অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানাচ্ছেন—" 'আর্য জাতির সর্ব প্রাচীন গল্প সংগ্রহ' জাতক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেছি, তারপর পঞ্চতন্ত্রের গতিপথ অনুসরণে, আরব্য উপন্যাসের সহযাত্রী হয়ে ইয়োরোপে পৌঁছেছি। বোক্কাচ্চিও, চসার এবং র‍্যাবলে —এই মহান ত্রয়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উনিশ শতকে আধুনিক ছোটগল্পে প্রবেশ করেছি।"

লেখক পাঠকদের সাবধান করে দিয়েছেন, "এ-খানিকে কেউ ছোটগল্পের ইতিহাস বলে গ্রহণ করবেন না।" কারণ, "ছোটগল্প-সাহিত্যের প্রেরণা, তত্ত্ব ও রূপবৈচিত্র্যই বইটিতে বিশেষভাবে আলোচ্য। এই লক্ষ্যের অনুসরণে লেখক উনবিংশ শতকের শেষাংশে ছোটগল্পের বিকাশ পর্যন্ত নির্বাচিত ইতিহাস দেবার পর ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও রূপ বিশ্লেষণ, উপন্যাস-বৃত্তান্ত-আখ্যায়িকা প্রভৃতি থেকে ছোটগল্পের পার্থক্য প্রদর্শন এবং ছোটগল্পের প্রতীক ও তার শ্রেণী-বিভাগ করণের পর একটি সার্থক ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করে 'শেষ কথা' লিপিবদ্ধ করেছেন।

সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এটাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটি রচনা করার পর থেকেই বিশেষভাবে এই ধারার সূত্রপাত। আবার এই পদ্ধতির দাবি পূরণ করতেই অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের ইতিহাস রচনা করতে না চাইলেও ইতিহাস আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন।

এবং এখানেই তাঁর আলোচনা পঙ্গু হয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে খানায় পড়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি।

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ কীথ্-এর 'হিস্ট্রি অফ স্যাংস্ক্রীট লিটারেচার' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কীথ্-এর মত বলে লেখক কয়েকটি ক্ষেত্রে যা লিখেছেন তা কীথ্-এর মত বলে সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাবে না।

'বৃহৎকথা'-র রচনাকার গুণাঢ্যের জীবনকাল নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এস. কে. আয়েঙ্গার 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া'য় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বৃহৎকথার তামিল অনুবাদের কথা বলেছেন। কেউ কেউ ভাস-এর নাটকে গুণাঢ্যের প্রভাব অনুমান করেছেন। 'কথাসরিৎসাগরের' বিবরণ অনুযায়ী কেউ কেউ বলেছেন, গুণাঢ্যের শুভানুধ্যায়ী রাজা সাতবাহন ছিলেন আন্ধ্রভৃত্য রাজবংশের সন্তান। এই বংশ খৃষ্টপূর্ব ৭৩ থেকে খৃষ্টীয় ২১৮ পর্যন্ত রাজত্ব করে; সুতরাং গুণাঢ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্ববর্তী।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "কীথ মোটামুটি গুণাঢ্যের কাল নির্ণয় করেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতব্দীর পূর্বে। ষষ্ঠ শতাব্দীও হওয়া সম্ভব।" (সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃষ্ঠা ৫৬) কিন্তু এ বিষয়ে কীথ লিখেছেন,—"We can fiairly claim that Gunadhya is not later than A. D. 500, but to place him in the first century A. D. is quite conjectural, nor in reality is any later date more assured.* কীথ তাঁর অপর গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন,—"It is, therefore, impossible to place Gunadhya with any certainty before the fifth

* A. B. Keith: History of Sanskrit Literature. Reprinted—1953.

century A. D. unless we hold that Bhasa (4th. century) derived from him, and not from tradition, some of his themes.*

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রোক্ত ৭ম শতাব্দীর কথা গুণাঢ্যের সম্পর্কে কীথ কোথাও বলেন নি।

একই ব্যাপার ঘটেছে 'দশকুমার চরিত' ও কাব্যাদর্শের রচয়িতা দণ্ডীর ক্ষেত্রে। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "বুহ্‌লার—রিচার্ডসন প্রভৃতি তাঁকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থান দিয়েছেন, 'কাব্যাদর্শের' কালবিচারে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলেছেন কীথ, আবার উইলসন—অগাসে প্রভৃতি তাঁকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

কিন্তু দেখছি, কীথ তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখছেন,—"...the chief impression conveyed by the *Dacakumaracharita* is that its Geography (See : Collins—The Geographical Date of *Raghuvamsa* and *Dacakumaracharita*—1907 page 46) contemplates a state of things anterior to the empire of Harsavardhana, and that its comparative simplicity suggests a date anterior to the works of Subandhu and Bana. Nor is there any thing to suggest a later date.†
হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৬০৬—৬৪৮ অব্দ।

কীথ তাঁর অপর গ্রন্থেও লিখেছেন, "what is moderately clear is that the style and the references to political divisions in India suggest a date not later than say A. D. 600 and possibly earlier."‡

অথচ ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় কীথ-এর বই না পড়ে এসব লিখেছেন, একথা বলা যায় না। কীথ-এর বই থেকে তিনি নিজের বই-এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মনে হয়, সামনে বই খোলা রেখে উদ্ধৃতি সংগ্রহের কৃচ্ছ্র, কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভ্রান্তিবিলাসে গা ভাসিয়েছেন। দশকুমার চরিতের কথাই ধরা যাক। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় কথা-সাহিত্যিক। দশকুমার চরিত রচনার কথা তিনি নিজে একবার বলতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই গল্পের প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি ও দণ্ডীর সংস্কৃত কাব্যের রস পাঠককে প্রদান করবার জন্য তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের কথারম্ভ করেছেন—"এই রাজবাহন এবং তাঁর নয় মিত্র : প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, উপহারবর্মা, অপহারবর্মা, পুষ্পোদ্ভব, অর্থপাল এবং সোমদত্ত একবার দিগ্বিজয়ে বিনিষ্ক্রান্ত হলেন। পথে শবরাচারী মাতঙ্গ ব্রাহ্মণের সাহায্য করতে রাজবাহন সকলের অজ্ঞাতে চলে যান এবং সেই সময় সহচর মিত্রদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে।"

দশকুমার চরিতে কিন্তু আছে কুমার দশজন 'দিগ্বিজয়ে' নয়, ভাগ্যান্বেষণে বার হন; পথে যাঁর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় তিনি 'শবরাচারী' নন, প্রকৃতই কিরাত এবং তিনি 'ব্রাহ্মণ' নন, ব্রাহ্মণবেশী মাত্র।

* A. B. Keith : Classical Sanskrit Literature.
† A. B. Keith : History of Sanskrit Literature.
‡ A. B. Keith : Classical Sanskrit Literature.

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উৎস সন্ধানে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকার জগতে উপস্থিত হয়ে বলেছেন, "প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও ইহার (অর্থাৎ উপন্যাসের) ক্ষীণ সংকেত ও সুদূর ইঙ্গিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।...যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়, যেখানেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায় বা সামাজিক মনুষ্যের সম্পর্ক ও সংঘাত ফুটিয়া ওঠে, সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে।*

ছোটগল্পের উৎস সন্ধানে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহুদূর পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেছেন এক জোরালো সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে। তিনি লিখেছেন,—"কথা ও আখ্যায়িকা—ভারতীয় গল্প-সাহিত্যকে মোটের উপর দুভাগে ভাগ করা যায়।...আখ্যায়িকা ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ-বহুলতায় পৃথুল; কথা সংক্ষিপ্ত, একমুখি। অনেক সময় একটি আখ্যায়িকায় বহু কথা বিন্যস্ত—যেমন পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চাধ্যায়ে এক একটি সূচনাসূত্রে 'মণিগণা ইব' অসংখ্য কথা ঝকমক করে উঠেছে। আখ্যায়িকায় উপন্যাসের পূর্বাভাস, কথায় ছোটগল্পের সংকেত।" (সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃঃ ২১)

নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত। লেখক আখ্যায়িকা এবং কথার যে সংজ্ঞা বা বিবরণ দিয়াছেন তা তিনি কোথায় পেলেন, জানি না। আমাদের আলংকারিকেরা এ বিষয়ে নানা কথা বলেছেন।—কেউ বলেছেন—

"আখ্যায়িকোলব্ধার্থা প্রবন্ধ কল্পনা কথা।"

অর্থাৎ আখ্যায়িকা কবির অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী, আর কথা কল্পনাসৃষ্ট কাহিনী।

দণ্ডী আবার এ ভেদ স্বীকার করেন নি: "তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।" † অর্থাৎ কথা ও অখ্যায়িকা জাতিতে এক, নামে দুই।

কীথ দুটো পার্থক্যের কথা বিশেষ করে বলেছেন। তাঁর মতে আখ্যায়িকা মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত, কথা প্রাকৃতমূল; তাই দু'য়ে পার্থক্য। ‡ এছাড়া তিনি আরও একটি পার্থক্যের কথা বলেছেন,—"If we accepted the view of the theorists (e. g. Bhamaha) the distinction would largely turn on the fact that the Akhyaiyika possesses divisions called Ucchvasas, contains verses in Vaktra and Apavaktra here and there, and is narrated by the hero, while the Katha lacks these marks."**

অমরসিংহ তো আবার বলেছেন, কথা হল জটিল আখ্যায়িকা।

কথা-সরিৎ-সাগরের লেখক তাঁর গল্পগুলিকে 'কথা' বলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন এগুলি আখ্যায়িকা। (সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃষ্ঠা ২৬০) কোন গল্পগুলি যে লেখকের মতে কথা, এবং তা কি করে হলো ছোটগল্পের সংকেতময় তার বিশ্লেষণ উহ্য।

* শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—পৃষ্ঠা—২
† দণ্ডী: কাব্যাদর্শ।
‡ A. B. Keith: Classical Sanskrit Literature.
** Ibid.

কিন্তু এ হল মতের অমিল।

তবু বলব 'সাহিত্যে ছোটগল্প' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর পরে ছোটগল্পের সম্বন্ধে যে বই প্রকাশিত হয়েছে তা এ বইকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পথিকৃৎ। তাঁর ক্ষমতার ওপর প্রভূত আস্থা ও ভরসা নিয়েই তাঁর বইটা পড়েছি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সে আস্থার মূলে তিনি আঘাত দেওয়ায় একটু অনুযোগ জানানো গেলো এই আলোচনা প্রসঙ্গে।

হিরণ্ময় চৌধুরী

সমাজ সংস্কৃতি

চারণকবি সম্মেলন

পশ্চিমবাংলা চারণকবি সমিতির চতুর্থ অধিবেশন বীরভূমের নলহাটীতে ১৩ই এবং ১৪ই কার্তিক ১৩৬৮ (৩০শে, ৩১শে অক্টোবর '৬১) অনুষ্ঠিত হ'ল। এ অধিবেশনে উপস্থিত থাকা একটি অভিজ্ঞতা বিশেষ। প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশজন কবি তাঁদের দলবল নিয়ে আন্তরিক উৎসাহে সম্মেলনে এসেছিলেন। লোকশিল্প-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক প্রবক্তাগণ কবি-সমাজের নানাদিক নিয়ে চারণকবিদের সঙ্গে সেখানে একসঙ্গে আলোচনায় ব'সেছেন। সমিতির সম্পাদক প্রথিতযশা কবি শেখ গুমানী-দেওয়ান চারণকবিদের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং বর্তমান অবস্থার বিশদ আলোচনা করে লোকশিক্ষার এবং বিদগ্ধ মনের রসের জোগানদার এই চারণকবি সমাজের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য কিছু গঠনমূলক পরিকল্পনা তাঁর আছে। প্রাথমিকভাবে কাজে হাতও তিনি দিয়েছেন। মূলত তাঁর পরিকল্পনার ওপর উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত গভীর অথচ সহজ সুন্দর আলোচনা করলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে কবিসমাজের মূল্যায়ণের প্রয়াস পেলেন। তিনি বললেন, চারণকবিদের চারণকবি থাকাই উচিত, তাঁরা যেন ভুলেও তথাকথিত, অভিজাত কবি হবার চেষ্টা না করেন। ওকাজ করার লোক আছে, কিন্তু চারণকবিরা যে কাজ এতদিন ধরে সমাধা করে আসছেন তা' অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 'এতদিন ধরে' কথাটার মধ্যে এক বিরাট ইতিহাসের ইংগিত দিয়ে গেলেন। বস্তুত কবিগানের জন্মলগ্নে বাংলার সাহিত্য জগৎ এক ঘনান্ধকারপ্রায় অবস্থার মধ্যে ছিল। সপ্তদশ শতকের পর থেকে কবিগান বাংলায় প্রচলিত হল, তবে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একশো বছর বাংলা সাহিত্যের দরবারকে জমজমাট রেখেছিলেন এই কবি-সমাজ।

কবিগানের একটানা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন অনেক রথী মহারথী। গোঁজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, নন্দলাল, রামজী, হরুঠাকুর, নিতেবৈরেগী, ভবানী বণিক, নীলু-রামঠাকুর, ময়রা ভোলা, আণ্টুনী-হালহেড্, রামবসু এবং কালীঘাট-ভবানীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়গণ এক এক সময় কবিগানের এক একটি অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। মাঝখানে নতুন নতুন স্বাদ আনবার চেষ্টা করেছিলেন মোহন সরকার, লক্ষ্মী যোগী, রাম স্বর্ণকার, গুরো দুম্বো, মহেশ কাণা এবং ছিরিষ্টি ছুতোর। আজকের কবিসমাজ পুরোপুরি যে প্রাচীন ধারা অনুসরণ করবেন না এর ভাবী ইংগিত পূর্বসূরীদের কাব্য আচরণেই আভাসিত হয়েছিল। বাংলার প্রাচীন কবিসমাজকে এখনকার সংস্কৃত চোখ দিয়ে বিচার করলে তার আন্তর গুণ ফুটে ওঠবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে বিচার পদ্ধতির একটি মৌল ত্রুটির কথা

উল্লেখ করা প্রয়োজন। চারণকবির কবিগান যে কথাভিত্তিক এবং তা লিপিভিত্তিক সারস্বত-কর্মের সমগোত্রীয় নয়, এটুকু বিচারকালে অনেকেই স্মরণে রাখেন না। অথচ তাঁদের গুণগত বিচার সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের দ্বারাই সম্ভব। শ্রোতার শ্রবণইন্দ্রিয় এবং তজ্জাত অনুভূতি জয় করতে কবিগায়ককে কয়েকটি পথ বেছে নিতে হয় আর কবিগানের রচনা পদ্ধতিও মূলত শ্রুতিকে তৃপ্ত করতে প্রায় নিঃশেষিত।

প্রাচীন কবিগান রচনায় প্রথমে চিতেন এবং পরচিতেন, তারপর ফুকা, মেলতা ও মেলতার পর অন্তরা থাকত, অন্তরার শেষে দ্বিতীয় চিতেন। পরবর্তীকালে প্রায় 'হাফ-আখড়া'য়ের মত কবিগানেও দ্বিতীয় ফুকার পরই গান শেষ হয়ে যেত। যে বিষয় নিয়ে গান আরম্ভ হবে প্রথম থেকেই সেই বিষয়টি প্রকাশ করা এবং বিরুদ্ধমতে একেবারে সেটি গোপন রাখা এই দুই প্রথাই কিছু কমবেশী অবস্থায় শ্রোতার মনোরঞ্জনে নিয়োজিত হয়েছে। যে অক্ষরে চিতেনের শেষ হবে, পর-চিতেনের মিলও তার সমানাক্ষর হবে। ঠিক এমনি করে ফুকার প্রথম ও শেষপদে সমানাক্ষরে মিল এবং মেল্‌তার শেষপদের সঙ্গে মহড়ার শেষপদের সমানাক্ষরে মিল—কবিগানের এই রচনারীতি থেকে শুধু একটা সত্যই স্পষ্ট যে বাংলার কবিসমাজ লিপিভিত্তিক গঠনপ্রকৃতিতে আসেননি। এ ব্যাপারে তাঁদের ক্ষমতা ছিল কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক যে শ্রুতি-নির্ভর কাব্য সৃষ্টিতে বাংলার লোকায়ত জীবনকে তাঁরা স্পর্শ করেছিলেন, মাঝে কলাক্ষেত্রের সর্বজয়ী আখ্যা পেয়েছিলেন এবং আজও মাটির-কাছের-মানুষের শ্রবণইন্দ্রিয় মারফৎ রসের জোগানদারিতে অদ্বিতীয় স্থান নিয়ে আছেন।

কবিগানের মূল্য নিরূপণ করার এক বিশেষ ধরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—অনাবিষ্কৃত তথ্যই সেখানে প্রাধান্য পায়। এ ধরণের আলোচনায়, বলাই বাহুল্য, প্রত্নতাত্ত্বিকের মনোভাব স্পষ্ট। যেন ইতিহাসের একটি মৃত অধ্যায়কে আলোকিত করা হল। অথচ কবিগান আজও জীবন্ত এবং কে জানে হয়ত লিপিভিত্তিক অভিজাত কাব্যসাহিত্যের চাইতে তার ক্রিয়াকলাপ বেশী কল্যাণকর। বর্তমান বছরের চারণকবি সম্মেলন এই গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—নতুন তথ্য আবিষ্কার শুধু নয়, আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে কবিগানের উৎকর্ষ বিচার। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য, সাহিত্যের নতুন নতুন শাখা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কবিগান পূর্বের সেই মর্যাদার আসনে আর থাকেনি। থাকা সম্ভবও নয়, কিন্তু কবিগানের Rational সত্তাটিকে নিয়ে যেখানে সে আজ রসিক খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে তথাকথিত অভিজাতদের পাশপোর্ট মিলবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি-সংগীতকে এক বিশিষ্ট আসন দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও বাঁধনদার হিসেবে এক গৌরবজনক অধ্যায় রেখে গেছেন। তাঁর পূর্বে ও পরে যাঁরা কবি-সংগীতকে জনপ্রিয় ও রসগ্রাহী করে তুলেছেন সেই মহাজনদের আসরগাহনা এবং আজকের আসরগাহনার মূলে কিন্তু এখনও মিল আছে। গঠনগত কিছু কালানুযায়ী পরিবর্তন ছাড়া বাক্‌-নির্ভরতা আজকের কবিগানের গঠন প্রণালীতেও স্পষ্ট। আর এইখানেই সম্মেলনে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি, নিরক্ষর হলেই অরসিক বা অশিক্ষিত হয় না—আশ্চর্য সত্য।

সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্‌ থেকে কবিগান এমন একটি বিন্দুতে অবস্থান করছে যেখানে

অরসিক চিত্তে সঞ্চিত হয়েছে ঐতিহ্যবিচ্যুত স্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভঙ্গি, ইউরোপীয় অর্থাসক্তি এবং সাগরপারের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় হিমালয়প্রমাণ বিশ্বাস। আর এই অবস্থাই ছিল তথাকথিত নবযুগের সম্ভাবনার দ্যোতক। এতে শুধু যুক্তি নয়, বিশ্বাসও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল জনসমাজের মানস গঠনে।

আর এই যন্ত্রণাময় যুগ দুটি বস্তুকে সাহিত্যের দরবারে বললে ভুল হবে, বাজারে এনে হাজির করল, গদ্যভাষায় গ্রন্থ এবং প্রধানত কবিগান।

সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মানুষ ভাবকে সম্বল ক'রে, তীব্র রসবোধকে সম্বল ক'রে বৃহত্তর সহৃদয় রসিকচিত্তের সন্ধানে বেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন। অক্ষর পরিচয় তাঁদের বাধাস্বরূপ হয়নি আর তাছাড়া যথার্থ রসগ্রাহীর তো জাতবিচারই এক হাস্যকর ব্যাপার! কবিগান প্রায় আদি মুহূর্ত থেকে আর একটি বিশেষ বার্তা বহন করে, তা মানুষের বার্তা। দেবদেবী শুধু নয়, মানুষের কথাও যে সাহিত্যের কথা (সম্ভবত সাহিত্যের দরবারে তারাই প্রথম) প্রাচীন কবিগায়করা ঢোল কাঁসির উচ্চরোলের মধ্যে তা প্রচার করতে দ্বিধা করেন নি, এদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা শহুরে শিক্ষাভিমানীর শিক্ষাকেও বহুলাংশে আচ্ছন্ন করে রাখেন।

পরিশেষে নলহাটী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মনে হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"লোকশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থানে অভিজ্ঞ চারণকবিদের পরিচালনায় কবিশিক্ষাগার স্থাপন করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ চারণকবিগণ যাহাতে স্থানে স্থানে গমন করিয়া কবিগান করিয়া আসিতে পারেন তজ্জন্য স্থানীয় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক মারফৎ যেন অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হয়।…মোটকথা সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতিলাভের আশা পশ্চিমবঙ্গ চারণকবি সমিতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।"

কবিসমাজের তৎকালীন পৃষ্ঠপোষকরা আজ রূপ পরিবর্তন করেছেন। সরাসরি অস্তিত্বের প্রশ্নে চারণকবিরা তাই সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। সরকারী সাহায্য গ্রহণকারী কবি এবং সরকারের বেতনভুক প্রচারবিদের মধ্যে পার্থক্যটুকু স্মরণে না রাখলে মনে হয়, অস্তিত্ব রক্ষার প্রাথমিক প্রশ্নটিরই কোন সৎসমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিগানে দুর্ধর্ষ তার্কিকের সূক্ষ্মাগ্র বুদ্ধি এবং রসিকচিত্তের রসবোধ যেন হরগৌরী মিলনের প্রতীক। এখানে সরকারী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে রসের দিকটি চাপা পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা, আর তখনই বোধ হয় চারণকবির গাহনাকে মুজিয়মে পাঠাবার দিন এসেছে মনে হবে।

নিত্যরঞ্জন বসু

আলোচনা

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সিনেমা

The projection of the dialectic system of things
into the brain
into creating abstractly
into the process of thinking
yields : dialectic methods of thinking ;
dialectic materialism.—*Philosophy*.

The projection of the same system of things
While creating concretely
While giving form
Yields :—*Art*.

[A Dialectic approach to the Film-from : S. Eisenstein.]

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমালোচনায় প্রযুক্ত হতে আমরা দেখেছি। শুধু সাহিত্য নয়, নাচ, গান, এমনকি চিত্রকলায়ও। এই তত্ত্ব যে চলচ্চিত্র-শিল্পেও প্রযুক্ত হতে পারে এবং তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তার প্রমাণ যাঁরা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যতম বিশ্ববিখ্যাত রুশী চিত্র-পরিচালক সার্গেই মিহাইলোভিচ আইজেনস্টাইন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে, বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিরহস্য এক অদ্বিতীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত ও বিবর্তিত : প্রত্যেক (সত্তা বা) অবস্থা দুই বিরোধী শক্তির নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত হয়, এবং স্থিতাবস্থা ও বিরোধী অবস্থার সংঘাত-সামঞ্জস্যে দেখা দেয় একটি পরিণামী সমন্বয়; সেই সমন্বিত অবস্থা আবার রূপ নেয় স্থিতাবস্থার, তার মধ্যে দেখা দেয় বিরোধী শক্তিগুলি, আবার দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে সমন্বয়। এমনিভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে রূপ থেকে রূপে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

মানুষ যখন বিশ্বকে, জীবনকে, সভ্যতাকে এই দৃষ্টিতে দেখেও বিমূর্ত ভাবনার আশ্রয় নেয়, তখনই সঞ্জাত হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। এবং এই বিশিষ্ট দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে যখন সে কোন একভাবে মূর্ত করে তুলতে চায়, তখনই জন্ম নেয় আর্ট। ওপরের উদ্ধৃতি মাধ্যমে এই কথাই বলতে চেয়েছেন আইজেনস্টাইন। তিনি মনে করেন, আত্ম ও বিশ্ব সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিই যেমন সত্যতম জীবনদর্শন, তেমনি সত্যতম ও জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পদর্শনও। এই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি পৌঁছেছেন এই অনুসিদ্ধান্তে : 'আর্ট ইজ অলওয়েজ কন্‌ফ্লিক্‌ট্‌।' দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আর্টে রূপ নেয় কন্‌ফ্লিক্‌ট্‌এর, সংঘর্ষের। তাঁর মতে, এই অনুসিদ্ধান্ত কেবলমাত্র দার্শনিক প্রবচন নয়, অন্তত তিনটি প্রধান কারণে, অনিবার্য। প্রথমত, সামাজিক কার্য-কারণ : বস্তুজগতে ও মানবমনে বিভিন্ন শক্তির যে

বিরোধ, শিল্প তারই বিশ্বস্ত প্রকাশ-আধার। দ্বিতীয়ত শিল্পের স্বভাবগত কার্য-কারণ : বস্তুজগতে যা বিদ্যমান বা ঘটমান, আর্ট তাকে রূপান্তরিত করে নেয় অন্তর-বাহিরের যোগে, স্ব-স্বভাবে। এখানেও পাই দ্বন্দ্ব—বাস্তব-সত্য ও শিল্প-সত্যের দ্বন্দ্ব ; একটি, বস্তুর স্বরূপে অস্তিত্ব ; অন্যটি সৃষ্টি মাধ্যমে তার রূপান্তরিত শিল্প-শ্রী। তৃতীয়ত, এই দ্বান্দ্বিকতা শিল্পসৃষ্টির আঙ্গিকেও স্বতঃ। বিরতি ও গতি, পূর্ণ ও অংশের সংঘাতেই সাহিত্যের-শিল্পের রূপায়ণ। নাটকে দেখি, মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধির সংঘর্ষে ক্লাইম্যাক্স্‌এর আবির্ভাব ; ছেদ বাধা সৃষ্টি করে বলেই বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট হয় ; যতির বিরত আঘাত আছে বলেই ছন্দে ঢেউ খেলে যায় ; মানুষের সঙ্গে মানুষের কিংবা বৃত্তির সঙ্গে বৃত্তির সংঘাতে চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিল্পের এই আঙ্গিকগত সংঘাত-ক্রিয়াকে আইজেনস্টাইন বলেছেন দ্বান্দ্বিক এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে গেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'স্থাপত্য সংহৃত সংগীত' (আর্কিটেক্‌চার ইজ ফ্রোজেন মিউজিক) ; দৃঢ়কায় স্থাপত্যের বেধ এবং ললিত গীতির চঞ্চল ধ্বনি, দুয়ের সংঘাতে এখানে ফুটে উঠেছে আর্টের দ্বান্দ্বিক স্বরূপ।

মার্কসবাদী দর্শনকে আশ্রয় করার ফলে আইজেনস্টাইন যেমন একপক্ষের অজস্র প্রশংসায় বন্দিত হয়েছেন, তেমনি অন্যপক্ষের সহস্র বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছেন। এই বিতর্কে প্রবেশ না করে, এবং দর্শনকে আপাততঃ দূরে রেখে, শুধু নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায়, এবং একথা সকলেই বিনাতর্কে স্বীকার করবেন যে দ্বন্দ্ব শিল্পের প্রাণ ; অপিচ, দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে প্রকাশ ব্যাপারটাই আদৌ অসম্ভব। ছন্দ শুধু গদ্য-পদ্য বা গানে-নাচে নেই, ছন্দ আছে যাবতীয় শিল্পে—স্থাপত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, অক্ষরলিপিতে, গৃহসজ্জায়, এমনকি যন্ত্রেও। দুই বা ততোধিকের সংঘর্ষে-সমন্বয়ে, এই ছন্দ জেগে ওঠে, একবচনে নয়। একটি রঙে বা রেখায় ছবি হয় না, একটি ধ্বনি বা শ্রুতিতে গান হয় না, একটি অক্ষরে ভাষা হয় না, একটিমাত্র কাহিনীর অণুতে গল্প বা একটিমাত্র দৃশ্যের অণুতে নাটক হয় না। চাই একাধিকের সমাহার, কমপক্ষে দুটি ডাইমেন্‌সনের। উভয়ের পরিমিত পরস্পর-বিরোধিতায় জন্ম নেয় আর্ট, সে সুন্দর-সজীব হয়ে ওঠে। বৈপরীত্যের এই সামঞ্জস্য (যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সামঞ্জস্যের সুষমা') নিয়ে আসে ছন্দ (রেখায় বা রঙে, ধ্বনিতে বা গতিতে), এবং এই ছন্দিত দ্বন্দ্বই আর্টের জন্মভূমি।

আইজেনস্টাইনের শিল্পিমানস আর্টের এই দ্বন্দ্বমুখর ছন্দকে উপলব্ধি করেছে বারবার কৈশোরক মুকুলিকার সময় থেকেই। বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য বা দ্বন্দ্বের ছন্দ তিনি বোধহয় প্রথম উপলব্ধি ক'রে-ছিলেন অধীত বিদ্যাযন্ত্রের মধ্যে। স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন রঙ্গমঞ্চের (মায়ারহোল্‌ড্‌ সম্প্রদায় ও প্রলেট্‌কাল্ট্‌ থিয়েটারের) সংস্পর্শে এসে, যেখানে দৃশ্যের রূপকার থেকে পরিচালক পর্যন্ত তিনি হ'য়ে-ছিলেন। দ্বন্দ্ব নাটকের প্রধানতম রসস্তম্ভ এবং তাকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বিভিন্ন খণ্ডদৃশ্যগুলির বিরোধমূলক সমাবেশ প্রয়োজন হয়, দুটি দৃশ্যের (বা টুক্‌রো কাহিনীর) সংঘাতে পরবর্তী দৃশ্যের আগম সূচিত হয়। পরবর্তী প্রেরণা এল জাপানী 'কাবুকি থিয়েটার' থেকে। কাবুকি জাপানের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অভিনয়রীতি, এখানে নাচ-গান বাজনা-অভিনয়-মঞ্চ-পট-সজ্জা সব মিলিয়ে, সমস্তের সংঘাতে ও সমন্বয়ে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়। আইজেনস্টাইন এখানেও দেখলেন, সেই বিরোধমূলক সমন্বয়। এরও পরে, যখন তিনি জাপানী শব্দ শিখলেন, একই ছন্দকে অনুভব করলেন

জাপানী অক্ষরের চিত্রলিপিতে, চিত্রকলায়, এবং কবিতার চিত্রকল্পে। [তাঁর উদ্ধৃত জাপানী কবিতাবলীর মধ্যে একটিকে এখানে নিয়ে আসা যেতে পারে : এক নিঃসঙ্গ কাক/পাতাবিহীন ডালের ওপর/এক শারদ সন্ধ্যায়। এওতো ছবি—পশ্চাৎপটে শরৎকালীন সন্ধ্যা, মঞ্চের ওপর নিষ্পত্র শাখা, তার ওপর একটি একলা-কাক ; সব মিলিয়ে ধূসর ব্যথার ছন্দোময়তা।] অতঃপর রেনেশাঁস-চিত্রে ও সাহিত্যে এবং শেষে আইজেনস্টাইন ফ্রএড ও প্যাবলভের সাহায্যে প্রবেশ করলেন মানবচিত্তের অগম গহিনতায় ; সেখানেও দেখলেন—বিবিধ বৃত্তির বিরোধিতা ও সামঞ্জস্যের নিত্যলীলা। জীবনে, মনে ও আর্টে যে বিরোধ যে দ্বন্দ্ব নিত্য সত্য ও স্বতঃ প্রকাশিত, তাকেই তিনি খুঁজে পেলেন মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌এর ভাষ্যে, দার্শনিক যুক্তি ও সংহতিতে (বলা বাহুল্য, অক্টোবরের বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর সোভিএট রাশিয়া এই যোগাযোগের একমেব সেতু)। শিল্পত্ব যাঁর রক্তে ও চেতনায়, আর্টের দ্বন্দ্বকে তিনি উপলব্ধি করবেনই, সে যদি তিনি মার্কস্‌-বিরোধী হন, তবুও। আইজেনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য, অসংবৃত দ্বন্দ্ব-ছন্দকে তিনি পেলেন সুবিহিত তত্ত্বে ও দার্শনিকতার জীবননিষ্ঠ আশ্রয়ে। জীবনের সমস্ত দিকে ও শিল্পের সমস্ত শ্রেণীতে তিনি অনুভব করলেন বিরোধের সমন্বয় তথা সুষমার সামঞ্জস্য। দুই (বা ততোধিক) বিরোধী বিষয়কে একত্রিত করলে একটি নবতম বিষয় তথা বক্তব্য সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, সেই সৃষ্ট কম্‌পোজিসন স্বতঃ বাঙ্ময় ও ব্যঞ্জনাঢ্য হয়। যখন মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রে এলেন তিনি তখন এই অনুভবকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। বস্তুত, তাঁর কৈশোর-যৌবনের যাবতীয় অধীত বিদ্যা, অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞা সবকিছু অবারিত আত্মপ্রকাশের পথ পেল চিত্রপটের সামনে এসে। এবং স্বাভাবিকভাবে অনুভূত-উপলব্ধ 'দ্বান্দ্বিক সৌষম্য'কেও তিনি রূপ দিলেন চলচ্চিত্রের রূপালি পর্দায়, সিনেমাজগতে যার পারিভাষিক নাম—'মন্তাজ'। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এসে উপস্থিত হ'ল চলচ্চিত্রের আঙ্গিনায়। সেইসঙ্গে সূচিত হ'ল নতুন আঙ্গিকের ও শিল্পবোধের, যাকে আইজেনস্টাইন বলেছেন 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সিনেমা'।

॥ ২ ॥

চিত্রজগতে 'মন্তাজ' নতুন আগন্তুক নয়। বিভিন্ন সময়ে তোলা বিচ্ছিন্ন অথচ সংশ্লিষ্ট শট-গুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে কাহিনীর বা বক্তব্যের ক্রম-উন্মোচন হয়। শটগুলির দৈর্ঘ্য ও গতি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এ-গুলির সমষ্টিযোগে সমগ্র চিত্রটির ছন্দ-লয় ফুটে ওঠে। শটগুলিকে প্রয়োজনমতো পাশাপাশি সাজানো, তাদের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি করে চিত্র-কাহিনীর মধ্যে গতি ও দ্বন্দ্বের সঞ্চার তথা ছন্দের সৃষ্টি—এই পদ্ধতিকে এবং এতদসংশ্লিষ্ট গ্রন্থন-প্রক্রিয়াগুলিকে বলা হয় 'মন্তাজ'। আইজেনস্টাইনের হাতে এই যান্ত্রিক কলা-রীতি নতুনতর ও ব্যাপকতর অর্থে স্নান ক'রে উঠেছে। প্রচলিত সনাতন এপিক-রীতি পরিহার ক'রে তিনি ড্রামাটিক রীতি অবলম্বন করেছেন। সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে মন্তাজ হয়ে উঠেছে বহুকোণিক ও অসীম সীমানা-চিহ্নিত। যে বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য যাবতীয় শিল্পে, তাকে নিয়ে এলেন আইজেনস্টাইন মন্তাজের এই অর্থ-প্রসারণের মাধ্যমে। মন্তাজ অর্থ তখন, ছন্দের দ্বন্দ্ব।

আইজেনস্টাইনের বক্তব্য ছিল : মার্কসীয় দর্শনে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যে তত্ত্ব, আর্টের রাজ্যে

এসে সে হয় 'কন্‌ফ্লিক্‌ট', সংঘর্ষ। মন্তাজ হ'ল সেই কন্‌ফ্লিক্‌ট্‌ সৃষ্টির নবতম পদ্ধতি। এই উদ্দেশ্যে যে ড্রামাটিক রীতি তিনি গ্রহণ করলেন, তারও মূল কথা : একের সঙ্গে আরের সংঘাত এবং সেই সংঘাত থেকে একটি সমন্বয়ের তথা বক্তব্যের আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে যে-সব পূর্বসূরীদের তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও একইভাবে সংঘাত-সমন্বয়বাদী! উনবিংশ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত নিরীক্ষাবাদী চিত্রশিল্পী এবং প্রতীকী কবিদের মৌল বক্তব্য ছিল—'অসংগতির সৌন্দর্য' (বোদল্যেএর জার্নাল এবং রেনোয়ার ম্যানিফেস্টোতে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য স্মরণীয়)। আইজেনস্টাইনের মন্তাজ-রীতি অসংগতির সৌন্দর্য সর্বত্র না হলেও, বলা উচিত, 'বৈপরীত্যের সৌন্দর্য,' দ্বন্দ্বের ছন্দ যার মূল সুর।

আইজেনস্টাইন ছিলেন বস্তুবাদী শিল্পী। চিত্রকাহিনীকে বাস্তবিক করে তোলার জন্যে তিনি অকুস্থলে গিয়ে তথ্য ও চিত্র আহরণ করে অনতেন, সে সম্পর্কে পড়াশোনা করতেন। তাকে সুন্দর করার জন্যে উদ্‌ভাসিত করতেন দ্বান্দ্বিক ছন্দে প্রত্যেকটি শটকে। দ্বন্দ্ব তথা মন্তাজের সৌকর্যের জন্যে তিনি বিভিন্ন বৈপরীত্যের আশ্রয় নিতেন। যেমন, একঝাঁক সিঁড়ির ওপর একটি মানুষ পড়ে আছে; সিঁড়ির গতি রেখা চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে, একটু বেঁকে, মানুষটি পড়ে আছে তির্যকভাবে উত্তর-দক্ষিণে; যেন লম্বরেখা ও অবতলরেখার পরস্পর-ছেদী ছবি, তির্যকতার জন্যে অনেকটি গুণচিহ্নের মতো দেখতে। রেখা দুটি বিরোধী, সুন্দর সমাবেশে ছন্দমধুর হয়ে উঠেছে। এ দ্বন্দ্ব রেখাগত। তলগত দ্বন্দ্ব—একই শটে দুটি বিষয়কে উঁচুতে এবং নীচুতে রেখে। বেধের বিরোধ—স্থূলকায় ও কৃশকায়কে পাশাপাশি এনে। এইভাবে, গভীরতা, স্থান এবং গতির দিক থেকে নানাবিধ বিরোধের সৃষ্টি করা হয়েছে; আলো-আঁধার, জড়-জীব, সচল-অচলকেও পাশাপাশি বা ওপর-নীচে রেখে প্রত্যেকটি শটকে দৃশ্যময় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। দৃশ্যময়তা বললে ভুল হবে, দৃশ্যের গতি-ছন্দ-সৌন্দর্য সৃষ্টিই এই প্রয়াসের ও প্রসাধনের মৌল লক্ষ্য। আর এক ভাবেও এদের সৃষ্টি করা যায়, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের সাহায্যে। বিশেষ এক ভঙ্গিতে। হয়তো দুরূহতম কোণ থেকে ছবি তুললে জড়কেও মনে হয় সপ্রাণ। আইজেনস্টাইন তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন—বিষয় ও ক্যামেরার বিশিষ্ট চোখ; বিষয়কে পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে এবং তাকে নতুন করে দেখানো; ঘটনাকে প্রয়োজনমতো ধীর বা দ্রুত বা বিলম্বিত লয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বয়ংসম্পূর্ণ শট প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কথাও বলেছেন, যা সবাক চিত্রের অনুকূল—চিত্র ও ধ্বনির সহচারী সমাবেশ। চোখে যা দেখছি, আর কানে যা শুনছি। উভয়ের বিরোধী যোগফলেও সৌন্দর্যের-গতির সৃষ্টি হতে পারে। এই সহচারী ধ্বনি কেবলমাত্র সংগীতের ক্ষেত্রে নয়, সংলাপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দ্বন্দ্বে-বিরোধে-ছন্দে-গতিতে সৌন্দর্যে প্রত্যেকটি শটকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা—মন্তাজের এ হল প্রাথমিক পর্ব। অতঃপর শটগুলিকে গ্রন্থিত পরস্পর-সমন্বিত করার ক্ষেত্রেও তার সক্রিয়তা বিদ্যমান। অর্থাৎ শটগুলিও পারস্পরিক বৈপরীত্যে সমান্বিত। এই উদ্দেশ্যে ওপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলিও অনুসৃত হয়, সেই সঙ্গে থাকে—ক্লোজশট ও লংশট; সশব্দ চিত্র, তারপরেই নীরব চিত্র; সুদৃশ্য ছবি, মাঝখানে একটি বিধবা ছবি (এমন কি প্রয়োজন হলে আঁধার-পটও); দ্রুত শট, হঠাৎ গতিহীন শট; ইত্যাদি। তুলনীয় : রবীন্দ্রনাথের 'শাহজাহান' কবিতার সেই স্বনামখ্যাত অনুচ্ছেদ।

যার সুরুতে 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে তব কুঞ্জবনে বসন্তের মাধবী মঞ্জরী···,এবং শেষে 'বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল' ; সূচনায় উল্লসিত কোলাহল, অন্তিমে বিচ্ছেদের রিক্ত নৈঃশব্দ্য)।

মন্তাজের কর্ম-সমাপ্তি এখানেও নয়। শটগুলিকে পরস্পর-সম্বন্ধে বাঁধলেই হল না, তাদের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে একটি সামগ্রিকতাকে। আইজেনস্টাইনের দৃষ্টি খণ্ডে আবদ্ধ ছিল না, পূর্ণতায় সচেতন ছিল। সেই পূর্ণের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ছবি তুলতেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করতেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কাহিনীকে গ্রীক ট্র্যাজিডির মতো কয়েকটি মূল পর্বে বিভক্ত করে নিতেন। সহ-লিপির শিরোনামাও হত এই মতো। পর্বগুলি স্থাপত্যশিল্পের মতো পরস্পর-ঘনিষ্ঠ, যার সাহায্যে গতিমুখর কাহিনী উপনীত হয়েছে অনিবার্য পরিণামের মোহনায়। প্রত্যেক শট এই সমগ্রের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত ও পরিকল্পিত। একদিকে তারা আত্মনেপদী, অন্যদিকে পূর্ণতার অভিসারী। দ্বন্দ্বে-ছন্দে-লয়ে এখানেও মন্তাজ সক্রিয়। পূর্বগামী আলোচনাকে সংগ্রথিত করে নিলে দেখা যাবে, আইজেনস্টাইন ব্যাখ্যাত 'মন্তাজ' বহু-রূপী। প্রথমত, প্রত্যেকটি শট স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বকীয় আন্তর দ্বন্দ্বে উদ্ভাসিত ; দ্বিতীয়ত, শটগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা তথা বাহির-দ্বন্দ্ব ; তৃতীয়ত, সমস্ত শট মিলে এক সমগ্র বক্তব্যের পরিপ্রকাশ। আবার দ্বন্দ্বের আশ্রয়-ভূমি সব সময়ে সর্বত্র যে একটিমাত্রই হবে, তা নয় ; রেখা-তল-আলো-গতি এরাও পরস্পর মিলতে পারে। এবং ওপরে যে তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, তারা স্বভাবতই পরস্পর মিলে যায়। বিস্ময়কর সম্পাদনায় তথা গ্রন্থনায় সমস্ত-কিছু মিলে-মিশে সৃষ্টি হয় বিচিত্র বহুরূপী বহুকোণিক দ্বন্দ্ব-গতি-মুখর অপরূপ শিল্প তথা নিরুপম রস তথা অনুপম আস্বাদ।

॥ ৩ ॥

মন্তাজ প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের আরও দুটি কৃতিত্ব স্মরণীয় 'টাইপেজ' ও 'প্রতীক'। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জনতাকে এনেছেন। কিন্তু তারা যেন একঝাঁক জলস্রোত ; বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথও জনতাকে এনেছেন চার কি পাঁচজন মানুষকে একত্রিত ক'রে ; অথচ প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা ফুটে উঠেছে। জনতার মধ্যে থেকেও এই যে ব্যক্তির স্বকীয় সত্তা বা চরিত্রের অভিব্যক্তি, এর নাম 'টাইপেজ'। আইজেনস্টাইনের আঁকা একটি ছবির উল্লেখ করেছেন অনেকে— 'এক সারি লোক', দেড়শো লোকের এক জনতা, কিন্তু প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র চারিত্র অভিব্যক্ত। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রেও এই টাইপেজ-রীতি অনুস্যূত হয়ে আছে। এর জন্যে তিনি হাজার মানুষের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় মুখ ও দেহগুলি বেছে নিতেন। জনতার দৃশ্যে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য প্রকাশের অবকাশ থাকত। 'স্বতন্ত্র বক্তব্য' এই অর্থে যে সকলের প্রকাশভঙ্গি একইরকম হত না। একজনের চোখের ভাষা, অন্যজনের মাথা হেলানো, আর একজনের দৈহিক আক্ষেপ, আরজনের হাতের বা পায়ের সঞ্চালন—এমনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে চিত্রিত ভাবটি সম্পূর্ণরূপে ফোটানো (সত্যজিৎ রায়ের পরিচালন-রীতিতে টাইপেজের দায়িত্ব অনেকখানি)।

সাংকেতিক নাট্যে প্রতীক স্বয়মাগত। আইজেনস্টাইন এই অর্থে প্রতীকের সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত ও সুনির্বাচিত চিত্রকল্পগুলি পর্দার বুকে এমনভাবে ফুটে ওঠে যে, তারা

প্রায়শই এবং স্বতঃই প্রতীক হয়ে ওঠে। 'ব্যাট্‌ল্‌সিপ্‌ পটেমকিন' ছবিতে একটি দৃশ্য আছেঃ ওডেসার সিঁড়িতে সশস্ত্র সৈনিকেরা আক্রমণ করেছে নিরস্ত্র জনতাকে। চারিদিকে বিপর্যয় হাহাকার-কান্না; আর তারই মাঝে শিশুসহ একটি পেরাম্বুলেটর দ্রুতবেগে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। জনতার এলোমেলো গতি, সৈন্যদের গাণিতিক পদক্ষেপ, এবং তার মাঝে সুপারইম্‌পোজ্‌ করা দ্রুতগতি পেরাম্বুলেটর—সব মিলিয়ে একটি সুন্দরতম দৃশ্যময়ী চিত্রকল্প। সেইসঙ্গে প্রতীকও—মৃত্যুর মাঝে জীবনের, ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির সংকেত। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থের' উজ্জ্বল পংক্তিটি:

'জয় হোক মানুষের, ওই চিরজীবিতের, ওই নবজাতকের।'

মন্তাজ, টাইপেজ, সিম্‌বল ইত্যাদি প্রকরণের সাহায্যে আইজেনস্টাইন প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। যে ভাষার সাহায্যে বাস্তবকে ধরা যায় এই বিশিষ্ট শিল্পাধারে এবং প্রকাশ করা যায় গতি-ছন্দের সৌকর্যে। বাস্তবকে যথাযথ রূপদান নয়, চিত্রভাষার রূপায়ণ, যার ফলে বস্তু অধিকতর সত্য হয়ে উঠবে, ডাইনামিক বলে প্রতিভাত হবে। তাই তাঁর আলোচনায় 'ডাইনামিক রিয়েলিজ্‌ম্‌' (জঙ্গম বাস্তবতা) যুগ্ম-শব্দটি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে।

জঙ্গম বাস্তবতা নিয়ে আসার জন্যে আইজেনস্টাইন চিত্রগ্রহণের ঋজু পথ পরিত্যাগ করে খণ্ড-চিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। একটি বিষয়কে সোজাসুজি সবটা দেখানো নয়, একটু একটু করে দেখানো। যেমন একজন মানুষকে একেবারে সবটা না এনে এইভাবে শট তৈরী করা: কালো চুল; চুলের ঢেউ; চোখ; পেশী; ডানহাতের ভঙ্গিটুকু; নাচন্ত পা; ঠোঁটের হাসি; ইত্যাদি। এইভাবে খণ্ড-চিত্র রচনার পদ্ধতি আদিম মানুষদের মধ্যেও ছিল এবং এখনও আছে। আইজেনস্টাইন উল্লেখ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের, আমাদের দেশের সাঁওতাল-ওরাঁও-খোন্দ প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যেও এর পরিচয় সুলভদ্রষ্টব্য। [বুশম্যান ওখানে যায়; সাদা মানুষের কাছে দৌড়ে যায়; সাদা মানুষ তামাক দেয়; বুশম্যান ধূমপান করে; পাউচ ভরে নেয়; সাদা মানুষ মাংস দেয় বুশম্যানকে; বুশম্যান মাংস খায়; দাঁড়ায়; বাড়ির দিকে যায়; আনন্দে যায়; যায় আর বসে···] আইজেনস্টাইনের বাকভঙ্গিও এই জাতীয়—বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে উপস্থাপিত করা, একটু একটু করে, বিভিন্ন কোণ থেকে, পর-পর, পাশে-পাশে। তবে উপজাতি সুলভ সরলতা নিশ্চয়ই এখানে খুঁজতে চাইব না। যা ছিল সরল, এখানে তা ব্যঞ্জনাগভীর মণ্ডনশিল্প—খণ্ডচিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করে তারপর মনে মনে তাদের সমগ্রতায় গেঁথে নেওয়া। এই পদ্ধতির সৃষ্টি ও আস্বাদন ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্‌-এর এলাকাধীন। তা'বলে আইজেনস্টাইন তথাকথিক ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌দের মতো বিমূর্ত ভাবের শিল্পী নন। বাস্তবকেও তো আমরা সর্বদা সোজাসুজি দেখি না, নানাভাবে নানাদিক থেকেও দেখি। সেই দেখাকে শিল্পসুন্দর করে ছবিতে তিনি নিয়ে আসতে চেয়েছেন। এই রীতিকে তিনি বলেছেন ড্রামাটিক,

বিরোধের সুসামঞ্জস্যে ড্রামাটিক এক সময়ে লিরিক্যাল হয়ে ওঠে। চিত্র-ভাষা তখন স্বকণ্ঠে কথা বলে ওঠে, চলচ্চিত্র হয় ডাইনামিক প্রকাশ-শিল্প।

অনেক সমালোচক আইজেনস্টাইন নির্মিত ছবিগুলিতে দৃশ্যময়তা তথা চিত্র-সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পান নি। কিন্তু তিনি শুধু সুদৃশ্য ছবি আঁকাতেই নিবিষ্ট ছিলেন না, তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বাস্তবকে, তাকে দিতে চেয়েছেন গতি ও ছন্দ, যার প্রতিক্রিয়ায় দর্শকচিত্তে জাগবে ভাবের দোলা, বুদ্ধিবৃত্তি আন্দোলিত ও রসতৃপ্ত হবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও তিনি করেছেন এবং আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন সম্পাদনা-টেবিলে। প্রথমে গতির কথা, চলচ্চিত্রে যা অতি সাধারণ ও প্রাথমিক বিষয়। সেলুলএডের বুকজোড়া অচল ছবিগুলি দ্রুতধাবনে পটের বুকে সচল হয়ে ওঠে। দেখা যায়—মানুষ নড়াচড়া করছে, গাড়ী চলছে, কামান গোলাবৃষ্টি করছে। এগুলি বাস্তবানুগ ছবি। স্থিতি গতি লাভ করে, স্থাবর জঙ্গম হয়ে ওঠে, যদি ক্যামেরার চোখ ও মাত্রাজ্ঞান থাকে। যেমন তিনটি সিংহের মূর্তি আছে পাশাপাশি: একটি শায়িত, একটি জাগ্রত, একটি দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। নিখুঁত হিসেব করে যদি ঐ পাথরের সিংহমূর্তি তিনটির ছবি পরপর তোলা যায়, তাহলে জড়দেহে প্রাণ জাগবে। আমরা দেখব—একটি সিংহ শুয়ে রয়েছে, তারপর জেগে উঠল, শেষে উঠে দাঁড়াল। গতি সৃষ্টির এটি আরোপিত পন্থা এবং এই পন্থা আইজেনস্টাইন অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি বলেছেন, ছবির আবেগ সৃষ্টির কথা, সমাহৃত বিরোধী বিষয়গুলির সাহায্যে যা পরিস্পন্দিত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইন স্মরণ করেছেন ফ্রএড, বিশেষত প্যাবলভকে, এবং 'ভাবানুসঙ্গের' সাহায্য নিয়েছেন। একটি সহজ দৃষ্টান্ত: 'খুন'। ব্যাপারটাকে সোজাসুজি বা সাজিয়ে দেখালে বিভিন্ন এফেক্ট্ সৃষ্টি হবে; আবেশ জাগাবার জন্যে আরও সূক্ষ্মতায় যেতে হয়: একটা হাত উঠল, ছুরির ফলা, একটা ভীত মুখ, চোখ খুলল ভয় মাখিয়ে, দুটো হাতের পাতা টেবিল আঁকড়ে, ছুরি উঠল উঁচুতে, চোখ বুজে এল, ফ্ল্যাশ, এক ঝলক রক্ত, বিকৃত মুখ, নীচে পড়ল একটি-কি-যেন ইত্যাদি। এই পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক এবং দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে নিশ্চিতভাবে টেনে নিয়ে যায় ভয়-বিস্ময়-বীভৎসতার রাজ্যে। তবু এ-ছবি একলা। যেখানে বিরোধের সমাবেশ, সেখানে ভাবানুসঙ্গই একমেব সেতু এবং সেই সেতুপথে ভাবের-আবেগের প্রকাশ। যেমন 'স্ট্রাইক' ছবিতে দুটি ছবি পাশাপাশি: একদল মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এবং একটি ষাঁড়কে জবাই করা হচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ছবি দুটি বি-সদৃশ; কিন্তু হত্যা উভয়ের যোগসেতু এবং তখন মানব-হত্যাকারীদের কশাইয়ের মতো নির্মম বলে বুঝে নিতে একতিল দেরি হয় না। বরফ গলে নদী হচ্ছে, এই সংবাদ-চিত্রের মূল্য ও অর্থ ভূগোলের এলাকাধীন; কিন্তু কারখানার একদল শ্রমিক শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করে পথে নেমে এল, এই ছবির পাশে ঐ বরফ-গলা ছবিটিকে রাখলে দুয়ে মিলে এক নতুনতর অর্থ ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে (মাদার: পুডভকিন পরিচালিত)। চিত্তে ভাব স্বতঃ অতিসম্পন্ন হয় এরও পরে আইজেনস্টাইন এগিয়ে গেছেন, বলেছেন, তাঁর চিত্রসৌন্দর্যের লক্ষ্য—বুদ্ধিবৃত্তিকেও জাগ্রত ও আন্দোলিত করা। 'অক্টোবর' ছবির নায়ক কেরেন্‌সকী ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠছেন,

এটি বোঝাবার জন্তে কয়েকটি শট নেওয়া হয়েছে : কেরেন্‌স্‌কী সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, আর একটি একটি করে সহ-লিপি উচ্চারিত হচ্ছে—ডিক্‌টেটর, জেনারেলিসিমো ইত্যাদি। অর্থ পরিষ্কার। কিন্তু লক্ষণীয় : কেরেন্‌স্‌কী সমমাপের একই সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন! এর দ্বারা পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন, নায়ক ক্ষমতার শিখরে উঠেছে বটে, কিন্তু তদনুযায়ী তার যোগ্যতা নেই, তাই একই সিঁড়ি তার অবলম্বন, অথচ ক্ষমতাগুলি ও পদগুলি তো এক স্তরের বা এক ক্ষেত্রের নয়। এখানে ভাবানুসঙ্গ আমাদের সাহায্য করে না, তারও ওপারে বুদ্ধির-চিন্তার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একেই আইজেনস্টাইন বলেছেন, 'প্রজ্ঞার জঙ্গমতা' এবং এথেকেই উদ্ভূত হয়েছে তাঁর 'ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল সিনেমা'-র শিল্পভাবনা এবং শিল্পরসাস্বাদ।

[পদ্ধতিগুলি শিল্পের রাজ্যে নবাগত নয়। উপমাদি অলংকার তথা চিত্রকল্পের সাহায্যে সাহিত্যিক একই কাজ করে এসেছেন বহুদিন ধরে। তাদের পরিশোধিত ও চিত্রায়িত করে আইজেনস্টাইন স্পর্শ করতে চেয়েছেন জীবন ও মনকে, এবং আবেদন এনেছেন একই সঙ্গে দর্শকের চোখ-হৃদয়-মস্তিষ্কের কাছে। মন্তাজের এও আরেক লীলা। প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও এই জাতীয় মন্তাজ দ্রষ্টব্য : ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু-দৃশ্য আবেগের বেগে করুণ; দেবীর মৃত্যু-দৃশ্যের তাৎপর্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। 'দেবীর' প্রারম্ভিক দৃশ্য আবেগ ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতায় মিশ্ররসের বাহন, বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেই তিনটি শট—নায়কের কাঁধে শিশু-ভ্রাতুষ্পুত্র, একটি খাঁড়া চকিতে উঠল, আকাশের কোলে হাউই-ফাটা একঝাঁক আগুন; আগুন তো নয়, একঝলক রক্ত, ভাবানুসঙ্গে বলির পাঁঠার (চিত্রে অনুপস্থিত ছবি) নিয়ে এল (এখানে আবেগ সক্রিয়), সেই সঙ্গে ঐ শিশুপুত্রের মৃত্যুর সংকেতও ধরে দিল (এই সংকেত বুদ্ধি-দীপিত)।]

॥ ৫

মার্কসবাদী চিত্র-পরিচালক সার্গেই আইজেনস্টাইন কার্ল মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থকে চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা ভেবেছিলেন। অর্থনীতি-সমাজনীতির গূঢ় তত্ত্বগুলিকে তিনি রূপায়িত করবেন সাধারণের সহজবোধ্য করে। যদি একাজ তিনি করে যেতে পারতেন, তবে ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল সিনেমার চূড়ান্ত প্রকাশও হয়তো হত, বিমূর্ত চিন্তা ও মূর্ত রূপের, অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ ও কংক্রিটের মধ্যেকার ব্যবধান আরও অনেক কমে যেত, হয়তো থাকতই না, আর্টের রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিত। সংবাদটির মূল্য আরও একদিক থেকে, আইজেনস্টাইনের সৃষ্টিতে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব এতদ্বারা পরিমাপ করা যায়। এই তত্ত্বের মূল সূত্রকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'কে পরিণত করেছিলেন শৈল্পিক সংঘর্ষে; এই তত্ত্বের মূল সুর তিনি গ্রহণ করেছিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ও গণচেতনাকে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর ছবিগুলিতে। রাশিয়ার বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান, সমবায় প্রথা ইত্যাদি এগুলির বিষয়। স্বভাবতই স্থান ও কালে এরা সীমিত। কিন্তু তাঁর প্রতিভা উচ্চকোটির। তাই যা সাময়িক, তা (অনেক ক্ষেত্রে) সর্বকালীন যা একদেশের, তা সর্বদেশের হয়ে উঠেছে—চিরায়ত আর্টমাত্রেরই উদ্বর্তন এইভাবে ঘটে থাকে। দ্বন্দ্ব ও গতির যুগল ডানায় তিনি দর্শন ও প্রদর্শন করতে চেয়েছেন সুন্দরকে এবং মানবতাকে। এই লক্ষ্যে উপনীতির জন্তেই মন্তাজ, টাইপেজ,

প্রতীকের প্রয়োগ, বিজ্ঞান মাধ্যমে শিল্পের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি ক্রমবিবর্তিত হতে হতে এমন এক বিন্দুতে উত্তীর্ণ হয়েছে, যেখানে শিল্প সমূহের ঐকতানে স্থানকালের বাস্তব সাময়িকতা নিশ্চিহ্ন, যেখানে মহাজাগতিক নাট্যমুহূর্ত দিয়ে চলচ্চিত্রকে তিনি পরিণত করেছেন শিল্পের মহাসঙ্গমসমুদ্রে। তাঁর শেষ ছবি 'ইভান দি টেরিবল্, এই সঙ্গমসমুদ্রের রূপসী শতদল।

আদিম প্রস্তর সভ্যতায় জন্মলগ্নে শিল্প ছিল জীবনের সহগামী এবং 'বিচিত্রের ঐক্য'—এক আধারে নাচ-গান-বাজনা-কাহিনী-ছবি-মূর্তি-আলপনার অপরূপ সমাহার। তার পরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রূঢ়িক সমাজ যৌগিক হয়েছে, যৌগিক সমাজ বিবিধ শ্রেণীবিন্যস্ত হয়েছে, শিল্পও শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে। তবু আদিম সাযুজ্য এরা ভুলতে পারে নি, তাই আজকের কোন কোন শিল্পে এবং কোন কোন শিল্পীর সৃষ্টিতে এরা এখনও পরস্পর মিলিত হয়। যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে। আইজেনস্টাইন এই 'বিচিত্রের ঐক্য'কে দেখেছিলেন জাপানী 'কাবুকি থিয়েটারে'—যেখানে গান, বাজনা, অভিনয় পট, আলো সকলে স্বকীয়ত্ব বজায় রেখেও মূল বক্তব্যটিকে এগিয়ে দিচ্ছে পরিণতির অভিমুখে। একটি দৃষ্টান্ত। নাটকীয় চরিত্র বাড়ি চলে যাচ্ছে অনেক দূরে, চার স্তরে এটি দেখানো হয়েছে। প্রথম অভিনেতাটি এগিয়ে এল মঞ্চের সামনের দিকে (ক্লোজ আপ); দ্বিতীয়ে পশ্চাৎপট বদলে হয়ে গেল দূরের এক ফটক (লং শট); তৃতীয়ে কালো পর্দা সেইখানে (অর্থাৎ বাড়ি আর দেখা যাচ্ছে না); শেষে বাদ্যবৃন্দের সহযোগিতায় বাকি কাজটুকু নিষ্পন্ন হল। যথাক্রমে মঞ্চের স্পেস, পটচিত্র, সংকেত এবং সংগীতের চতুরঙ্গ সহযোগিতায় বিদায়-দৃশ্যটি ফুটে উঠল ধীরে ধীরে। মঞ্চ-স্থান, চিত্রকলা, গীতবাদ্য এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে বিরোধের মাধ্যমে সমন্বিত। এই বিরোধমূলক সামঞ্জস্যকে আইজেনস্টাইন নিয়ে এসেছেন চিত্রপটে। চিত্রকল্পের সমতালে তার দৈর্ঘ্য, বেধ, গতি, লয় ও আলোকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করেছেন, তেমনি শটগুলির সঙ্গে মিলিয়েছেন ধ্বনি-সংগীত-সংলাপকে সহ-লিপির ভাষাকে, এবং অভিনয়কেও। এখানেও মন্তাজ তাঁর বাহন, টাইপেজ ও সিম্বল তাঁর সহায়িকা (অশ্বক্ষুরধ্বনি যেন হৃদয়েরই পদধ্বনি ; নৈঃশব্দ্য উদ্বেগ-ব্যাকুলতার সংকেত)। 'ইভান দি টেরিবল্' ছবিতে বিবিধ শিল্পের এই একত্রিত সমাহার সর্বোচ্চ কোটিতে উপনীত হয়েছে। এখানে সংলাপ মিলটনী গদ্যকাব্যময়ী, অভিনয় 'স্টাইলাইজেশনের' চিত্ররূপ [স্টাইলাইজ্ড্ অভিনয় যাত্রার পরিশোধিত শিল্পমণ্ডিত রূপান্তরণ, তার সঙ্গে নাচের একটু ভঙ্গি ; রবীন্দ্রনাথ এবং স্ট্যানিস্লাভস্কীর প্রবর্তিত ধারায় এই রূপান্তরিত অভিনয়কলা স্বাক্ষরিত]। ছবিটি ভঙ্গিপ্রাধান্যে উজ্জ্বল, তবু এখানেই সমাহৃত হয়েছে স্থাপত্যের বেধ, চিত্রকলার রেখা ও রঙ, নৃত্যের ছন্দ, সংগীতের ধ্বনি, বিজ্ঞানের প্রয়োগনৈপুণ্য এবং শিল্পের সৃজনী প্রতিভা। সেই প্রতিভাতেও বিবিধের সমন্বয়—চ্যাপলিনের ইমেজ, ড-সিকার বাস্তববোধ, পাবস্ট্-এর মনস্তাত্ত্বিকতা, ককতোর কল্পভাবনা, ফ্ল্যাহার্টির স্পন্দিত আবেগ। আইজেন একাধারে কবি ও চিত্রকর, স্থপতি ও গীতিকার, প্রয়োগবিদ ও দ্বিতীয় প্রজাপতি।

মার্কসীয় দর্শনকে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছেন, এ তথ্যের মূল্য কম নয়। কিন্তু অন্তত আমার কাছে এই তথ্য একমেব নয়। আমি দেখি তাঁর মানবতা ও সৌন্দর্যজ্ঞান, তাঁর বিজ্ঞানময়তা ও শিল্পী-সত্তা। উপলব্ধি করি তাঁর চিত্রের বহুকৌণিক ও বহুবিচিত্র গতি-দ্বন্দ্ব-ছন্দকে,

নতুন রসাস্বাদে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। দার্শনিক বলবেন, এওতো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি; আমি বলব, শিল্পমাত্রেরই, তার সৃষ্টি ও আস্বাদের, এইই রীতি।

॥ ৬ ॥

কিন্তু রীতিরও বদল হয়।

জীবনের পালাবদলে রূপান্তর হয় সাহিত্যের-শিল্পের, যেমন তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার, তেমনি তার স্বাদ-প্রক্রিয়ারও। সভ্যতার আদিযুগে, ধ্রুপদী যুগে, মধ্য যুগে এবং আধুনিক যুগে তাই সাহিত্যের-চিত্রকলার-স্থাপত্যের, যাবতীয় শিল্পেরই বারেবারে ঋতুবদল ও রীতিবদল ঘটেছে। আধুনিকতার কেন্দ্র থেকে যাত্রা করে আমরা যতই সাম্প্রতিকের সীমানার দিকে এগিয়ে আসছি, এই অদল-বদল আরও ব্যাপক হয়ে উঠছে। অথচ আমাদের অনেকেই তার খবর রাখি না।

আজ-কাল-পরশুর কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধ বা নাটক নতুন আঙ্গিকে ও পরিবেষণে প্রকাশিত। কিন্তু আজকের মন সেই পুরনো সংস্কারে আজও লালিত হয়ে চলেছে। সেই সংস্কারবদ্ধ মন নিয়ে তাঁরা যখন সাম্প্রতিক শিল্পরচনাগুলির কাছে আসছেন, আস্বাদন দূরে থাক, বোধ্য বলেও গ্রহণ করতে পারছেন না তাদের। অপাংক্তেয় দুর্বোধ্য বলে হয় সরিয়ে রাখছেন দূরে, অথবা বোধমন্ততার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। গল্পকে তাঁরা এতদিনে পড়ে এসেছেন সোজাসুজি বর্ণনায়, কবিতাকে আস্বাদন করেছেন আবেগের ভাবুক স্পর্শ দিয়ে, প্রবন্ধকে বুঝেছেন সূচক মিলিয়ে-মিলিয়ে এবং নাটক দেখেছেন চোখ দুটি খোলা রেখে। কিন্তু আজকের গল্প বা কবিতা শুধু হৃদয় দিয়ে পড়লে হয় না, তার সঙ্গে চাই মননের সাহচর্য, আজকের নাটক গিরিশচন্দ্রের সুলভ ভাবালুতা পেরিয়ে এসেছে সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় ও প্রতীকে, চিত্রকলা ব্যঞ্জিত সংকেতে। পাঠককে দর্শককেও উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হতে হবে।

আইজেনস্টাইন কেবলমাত্র চিত্র-পরিচালক নন, চলচ্চিত্রের বণিক বা কারিগর নন, মননশীল আর্টিষ্ট (যেমন চ্যাপলিন, ফ্ল্যাহার্টি, কি কক্‌তো)। শিক্ষকতায়, আলোচনায়, প্রবন্ধরচনায় স্বগত বক্তব্যকে তিনি পেশ করেছেন, যেকোন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের মতো। এবং তাঁর উক্তিগুলি চলচ্চিত্রশিল্পের অলংকারশাস্ত্র। তাঁর ছবিগুলিও মননের সাক্ষ্য, বিমূর্ত চিন্তার সেখানে সচিত্র রূপ।

আজকের দর্শককেও মননশীল হতে হবে। টাইপেজ, সিম্বলের অর্থ-উপলব্ধি করতে হবে, মন্তাজের দ্বান্দ্বিক ছন্দের বিচিত্র লীলাকে অনুভব করতে হবে বোধি ও বুদ্ধি দুই মেরু দিয়ে। তবেই নব্য আঙ্গিকের এই বলিষ্ঠ শিল্পমাধ্যমকে অনুধাবন করা যাবে, এই নবীন শিল্পের রস আস্বাদ্য হয়ে উঠবে। অবশ্য আজও অধিকাংশ ছবি সনাতনপন্থী, সুতরাং দর্শক-দর্শিকার অসুবিধা অননুভূত। কিন্তু তার সমৃদ্ধি ঐ একমুঠো নবাঙ্গিকের ছবির এবং পরিচালকের মধ্যে। এবং তার প্রভাবে এই শিল্প এবং চলচ্চিত্রশিল্পী ক্রমেই আবেগের সঙ্গে বুদ্ধি আশ্রয়ীও হবে। দর্শক-সমাজকে প্রস্তুত হতে হবে সমভাবে, আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিরও অনুশীলন করতে হবে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সিনেমার সামনে এসে মনের দিগন্ত খুলে যাবে, প্রসারিত হবে, একবিঘৎ গণ্ডী ভেঙে গিয়ে দিগন্তে দেখা দেবে আকাশের ওপারে আকাশ।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

লিপটনের
লাওজী
চা
কম দামে
সেরা চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LLC-I BEN

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট, কলিকাতা-২৬

ফোন ঃ ৪৬।২২২২

শিক্ষায়তন বিভাগ

প্রতি বছর ইংরাজী 'মে' মাস থেকে নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হয়। 'এপ্রিল' মাস থেকে নূতন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের পাঁচ বছরের ও শিশুদের তিন বছরের শিক্ষাক্রম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান সতেরোটি ধারাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাসূচী ...দিষ্ট, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ...পত্তিক ও স্বরলিপি-পাঠ অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দ্দিষ্ট। ভরত নাট্যম, কথাকলি ও মনিপুরী পদ্ধতির সমন্বয়ে ...্যকলার শিক্ষাক্রম নির্দ্ধারিত। শিক্ষাসমাপনান্তে 'অভিজ্ঞান-পত্র' ও 'কৃতিত্ব-পত্র' দেওয়া হয়।

...ক্ষা-পরিষদ: শুভ গুহঠাকুরতা, সুনীল কুমার রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, ...ল নাগ, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বসু, হেনা সেন, মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদার ও লীলা দত্তগুপ্ত এবং আদিত্যসেনা ...কুমার, নন্দিতা রায় ও স্থিতি গুহঠাকুরতা।

...ক্ষাগ্রহণ ও ভর্ত্তির সময়: মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪-৮। এবং রবিবার সকাল ৮-১২ ও বিকাল ৪-৬।

সংস্কৃতি বিভাগ

সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের অনুরাগী যাঁরা, তাঁদের জন্য এই বিভাগটি সৃষ্ট হয়েছে। গত চোদ্দ বছর ধরে এই বিভাগের সদস্যদের জন্য নিয়মিত মাসিক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে যাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়াও অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত'র গান, নজরুল-গীতি, দ্বিজেন্দ্র-গীতি, লোকসঙ্গীত, শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণীর সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থাগার এই ...ভাগের সদস্যরা ব্যবহার করতে পারবেন।

...ক্ষিণী' পরিবেশিত সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানেও সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সদস্যদের জন্য বার্ষিক একটি ...মণেরও আয়োজন করা হয়।

...স্য-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট এবং বর্ত্তমানে স্থানাভাবের জন্য নতুন সদস্য গ্রহণ করা হচ্ছে না তবে নাম অপেক্ষার্থী-তালিকায় ...খলে যথাসময়ে সদস্য-তালিকাভুক্ত হতে পারবেন।

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুণীর পানাধার
দে' লো দে' হাতে তুলে।
—ওমর খৈয়াম
নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই
কেশচর্চায় অলিভ অয়েলের উপকারিতা স্বীকৃত।
ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারলে আছে সেই অলিভ অয়েল।
আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় ক্যান্থারল ব্যবহার করেন।
Kantharol
ক্যান্থারল
সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

ডানলপিলো
তোশক বালিশ কুশন
যে কোন
উৎসবের
দিনে
শোভন
উপহার

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৩.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সপ্তাহিক ॥ প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয়

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ নয়া পয়সা

খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর
গ্রহ রত্ন ?
এ দুরবস্থা
আপনার কখনো হবে না

এম বি জুয়েলার্স এণ্ড কোং
আসল গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী
১ বিবেকানন্দ রোড (চিৎপুর জং)
কলিকাতা ৭ (ফোন ৩৩-৫৭৮৫)
চন্দ্র মুক্তা
শুক্র হীরা
বুধ পান্না
মঙ্গল প্রবাল
রবি চুনী
রাহু গোমেদ
শনি নীলা

dynamic medium for promoting your sales.

ABC CIRCULATION

Jan. — June '61 — 87,040
July — Dec. '61 — 90,014
Jan. — June '62 — 1,00,921

MEMBER

2, ANANDA CHATTERJEE LANE, CALCUTTA-3

কালপুরুষ।
দ্বিতীয় বর্ষ । প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা
ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৬৯
সম্পাদক । বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষে পরিমল চন্দ্র কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১৯বি, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বর্ষ ।। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা
কা ল পু রু ষ
ভাদ্র ও আশ্বিন ।। ১৩৬৯

শিল্পের কথা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মানবশিল্পের (Art) সম্বন্ধে কতগুলো কথা জড়িয়ে আছে—যেমন রস, আনন্দ, সৌন্দর্য। মানবশিল্প বলতে আমরা বুঝি, কাব্য-নাটক-গীতবাদ্য-নৃত্য-চিত্র-ভাস্কর্য এই সব। আমার মনে হয়, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য একে অন্যকে জড়িয়ে আছে। সবই হৃদয়, মন, চেতনার বস্তু। বাইরে থেকে তাদের উদ্দীপনা আসে মাত্র, কিন্তু ভেতরেই তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। আমি একটি ছবি দেখলুম বা গান শুনলাম বা কবিতা পাঠ করলাম এই ছবি, গান বা কবিতা বাইরের জিনিস, তা আমার চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, মন দিয়ে ভেতরে এলো—ভেতরেই তার আস্বাদন চলল। চিত্তবৃত্তির (emotion) উপরই মানবশিল্পের ভিত্তি, তার উপরই তার সম্পূর্ণ দাবী।

রস কী বস্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকরা তা বলে গেছেন। অলঙ্কারিক মানে কাব্যশাস্ত্রের টীকাকার। আনন্দবর্ধন চিত্তবৃত্তি-বিশেষকেই রস বলেছেন। 'বিভাবত্বেন চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ।' বাইরের যে কারণে একটি ভাব মনে ক্রিয়মান হয়ে আস্বাদের অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত করে

তা-ই বিভাব। অভিনবগুপ্ত রসের বর্ণনা আরেকটু দীর্ঘ করেছেন: "শব্দসমর্পমানহৃদয়সংবাদ-সুন্দর বিভাবানু ভাবসমুদিত-প্রাঙ্‌নির্বিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ। রস একটা আস্বাদ্য রূপ। কিসের আস্বাদ? নিজের চেতনার আনন্দের আস্বাদ। সে চেতনা কেমন? যা প্রাক্‌নির্বিষ্ট রত্যাদিভাবের বাসা হয়ে সুকুমার। সে রত্যাদিভাব বিভাব অনুভাব থেকে সমুদিত। তার সৌন্দর্য আসে কবির শব্দসমর্পমান হৃদয়-সংবাদ থেকে।

রস-চর্বণে আমাদের যে আনন্দ হয় সৌন্দর্যের প্রতীতি তা থেকেই জন্মে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিস্টের মনে ছাড়া বাইরে নেই।" (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী)। ঠিক একথার জের টেনে বলা যায়—শিল্পীর সেই সৌন্দর্যবোধ যা শিল্পে সংক্রমিত হয়—তা-ই ভোক্তার মনে সৌন্দর্যবোধ দান করে। শিল্পী আর শিল্পভোক্তা বা শিল্পবোদ্ধা সমান-হৃদয়। তাই এমন কথা আমরা শুনতে পাই:

"Feeling is the final test of what we do and think as appreciators & creators of art." (The Challenge of Modern Art—by Allen Leepa).

রসমাত্রেই আনন্দের কারক। শিল্পী রসে উদ্বুদ্ধ হয়েই শিল্প তৈরী করেন। সে-রস প্রতিফলিত হয় ভোক্তার মনোমুকুরে। সে-রসাস্বাদনে সে আনন্দ পায় এবং এই অনুভূতি তার মনে জাগে যে শিল্পটি সুন্দর। চিত্তবৃত্তির অভিজ্ঞতাতেই সৌন্দর্য-জ্ঞান। তার বাইরে তা কোথাও নেই। বিভাবের মধ্যেই, রসের মধ্যেই সুন্দর আছে। আর বিভাব, রস সবই মানসিক ব্যাপার।

হৃদয়ের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ যেমন আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্তের কথায় পাই তেমনি চিত্রশাস্ত্রে তা লিপিবদ্ধ আছে: 'তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ।' অবনীন্দ্রনাথ আরো ছোট কথায় তা বলেছেন: 'যদি মন দুলালো তো সুন্দর হল।' এখানে বুদ্ধির কথা নেই, বিচারের কথা নেই—সরাসরি হৃদয়াবেগের কথা। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলতে পারে, "হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলানোতেই রস পাই।" রস আস্বাদ্য, আনন্দদায়ক এবং সুন্দর। শিল্পে এ-কথাটাই বড়ো, জীবনদর্শন, সমাজচিন্তা, হিতোপদেশ বড়ো কথা নয়। শিল্পীর হৃদয় রসমগ্ন, আনন্দময়, সৌন্দর্যলগ্ন অবস্থাতেই থাকে—বুদ্ধিজীবীর মতো সে বাইরে বেরিয়ে আসে না। "প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিম্বা সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়—শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু—অন্য কোথাও নয়। ('কবিতার কথা'—জীবনানন্দ দাশ)। চিত্রশাস্ত্র বলে, শিল্প হল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। যা নিয়ম রহিত তাকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে যাওয়া ভুল।

আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত 'স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার'কে যে শিল্প-রসের সঙ্গে এক করে দেখেছেন তা বহুযুগ আগেকার কথা। শিল্পে চৈতন্যের ভূমিকা মাত্র ইদানীং পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচকরা ধরতে পেরেছেন। তাই এলেন লিপা বলছেন,

"Artists brings to consciousness the meaning of many subconscious forces at work in all of us."

ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পর পাশ্চাত্য-শিল্পে এই চেতন-অবচেতনের দর্শন মিলছে তার আগে নয়। কিন্তু সংবিদ যে 'প্রাঙ্‌নির্বিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার' হতে পারে তার চর্চা অভিনবগুপ্ত এদেশে করে গেছেন।

অভিনবগুপ্তের এ-কথায় এ-ও বোঝাচ্ছে যে শিল্প অনুশীলনের বিষয়। অনুশীলন ব্যতিরেকে কারো সংবিদ এমন সৌকুমার্য পাবে না যাতে শিল্পের রস আস্বাদন করতে পারে।

শিল্পী যেমন সৃষ্টিশীল, শিল্পভোক্তাও তেমনি সৃষ্টিশীল। শিল্পের প্রয়োজন এই সৃষ্টিশীল মন গড়বার জন্যেই। মনে যে ভাব বসবাস করে তার নাম বাসনা। এই বাসনাকে আশ্রয় করেই মন রস-সমৃদ্ধ হয়। বাসনা অনুশীলনের ফল। একটি বালকের মনে এই বাসনা নেই তাই তার রসবোধও নেই। বাসনার ব্যাপারটাকে অভিজ্ঞতা নাম দিয়ে এও বলা যায়—শিল্পসৃষ্টি এবং উপভোগ একই বস্তু কারণ উভয়েরই ভিত্তি অভিজ্ঞতা।

কাব্য পাঠ, চিত্র দেখা, সংগীত শোনা ছাড়া এসব শিল্পে প্রবেশ করবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। বর্ণনা দিয়ে, বিশ্লেষণ করে শিল্প বোঝাবার রীতি আছে বটে, কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয় বলে আমার অন্তত জানা নেই। যা গিয়ে সরাসরি 'হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেবে— তার বিশ্লেষণ কী ভাবে চলতে পারে আমি বুঝিনে। শিল্প তার কাজ আপনি করে নেয়। তার আলোচনার আগেই আমাদের আবেগের গায়ে সাড়া পড়ে—কোনো না কোনো চিত্তবৃত্তির উদ্দীপনা হয়, আমরা আনন্দ পাই, বলি, সুন্দর। আলোচনা করে আমরা সুন্দরের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইনে। শিল্পেই সুন্দরের উপভোগের, আনন্দের ইঙ্গিত ধরা থাকে। তাই শিল্পী মাতীস বলেছেন:

"A work of art must carry in itself its complete significance and impose it upon the beholder even before he can identify the subject matter."

একটি গানের সুর কেন ভালো লাগে যেমন বুঝিয়ে বলা যাবে না, তেমনি একটি ভালো কবিতা বা ছবি কেন ভালো লাগে তা বুঝিয়ে বলা মুস্কিল হবে।

'সব মূরত বীচ অমূরত' কবীরের একথা শিল্পে বা ভাস্কর্যে প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে 'অমূরত'ই আমাদের আবেগের গায়ে দোলা দেয় বেশি। চিত্রে বা ভাস্কর্যে 'অমূরত' (abstract) যা আছে তা অনুকৃতি নয়, মনের দরবারে তাই তার আদর বেশি। যা অনুকৃতি তা ত ভাবের জন্মদাতা হতে পারে না। পৌরাণিক শাস্ত্রেও আছে: "সত্যবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা।" তেমনি কবিতায়ও বাচ্যের অতীত যা থাকে তা ধ্বনি হোক, ব্যঙ্গ্য হোক বা অলৌকিক রসই হোক আলঙ্কারিকরা তাকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। এ-ও অমূর্ত বলে মনের কাছে তার আদর। এ-ই রসাপ্লুত করে মন, আনন্দিত করে।

উদাহরণত রবীন্দ্রনাথের আঁকা 'রজনী গন্ধা' উল্লেখ করা যেতে পারে। রজনীগন্ধার বিম্ব তা যতোটা, তার ডাঁটা সাপের বিম্ব আনে তার চাইতে বেশি। যতোটুকু তা রজনীগন্ধা নয় ততোটুকুতেই তার আবেদন। কবিতারও এ ক'টি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

> "সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
> পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
> যখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
> সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

এর বাচ্যার্থ একটি সন্ধ্যার ছবি ফুটিয়ে তোলে—কিন্তু সে-সন্ধ্যা আমাদের মনে প্রবেশ করবার আগে একটি করুণ রস আস্বাদন করতে থাকে মন—তাই তার ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি। করুণ এখানে রস, তাই তার ব্যথা নেই, আনন্দ আছে। এ-কবিতা-পাঠে সে আনন্দ আমরা পাই। এ যদি সন্ধ্যার বর্ণনাই হত তাহলে কখনো তা স্মরণীয় কবিতা হত না।

সংগীতের বেলায়ও বলা যায় যে রাগ-রাগিণীগুলোর চিত্রমূর্তি আছে। কিন্তু সেই মূর্তির

সঙ্গে রাগ-রাগিণীর মিলনের সূত্র আবিষ্কার করা দুষ্কর। মূর্তিগুলোর ভাবভঙ্গিমা-নিরপেক্ষ যে হর্ষ-বিষাদ রাগরাগিণীগুলো আমাদের মনের তারে বাজিয়ে তোলে তা-ই লক্ষণীয়। এর কারণ বিশ্লেষণ করা যায় না। আমরা কি বলতে পারি কেন ভীমপলশ্রী করুণ রস বিতরণ করে? সুরের মতো মূর্তিই তৈরী হোক, তা একটা অমূর্ত ব্যাপার এবং তার আবেদন হৃদয়ে।

অমূর্ত বলতে আমি শূন্যতা বোঝাচ্ছি না, তারও একটা রূপ আছে, সে-রূপ তৈরী হয় মনে। দেবশিল্পের (nature) সঙ্গে সে-রূপের মিল নেই। মনের রূপ নিয়েই অমূর্ত শিল্পের (abstract art) জন্ম। যদি কোনো রূপই না থাকে তবে কী আশ্রয় করে চিত্তবৃত্তিতে রসের উন্মেষ হবে? অমূর্ত শিল্পের রচয়িতারা মনে করেন, তাদের শিল্পে মন আন্দোলিত হয় বেশি —রস, আনন্দ এবং সৌন্দর্য অমূর্ত শিল্পেই বেশি ধরা থাকে। অমূর্ত শিল্পের বিরোধীরা অবশ্য তাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। উইণ্ডাম লুইস তাকে 'প্লেথিং অব দি ইন্টেলেক্ট' বলেছেন। কিন্তু বস্তুত তা কি তা-ই? বুদ্ধি প্রয়োগ করে অমূর্তশিল্প বুঝতে হয় তা আমি মনে করিনে। তার আবেদন আমাদের চেতনে বা অবচেতনে—বুদ্ধির ক্ষেত্রে মোটেও নয়।

বিশ-শতকীয় শিল্পের বিপরীত ধারা প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন ভারতেও ছিল। অ্যারিস্টটল শিল্প-সাহিত্য সব কিছুকেই অনুকরণ বলতেন। এমন কি শিল্পের মধ্যে সব চাইতে যা অমূর্ত —সঙ্গীত—তাকে তিনি সবচাইতে অনুকৃতি-প্রবণ বলে গেছেন। হয়ত কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুনই তিনি এ-মত পোষণ করতেন। প্রাচীন ভারতের চিত্রশাস্ত্রকার কেউ কেউ জীবন্ত-প্রতিম চিত্রকেই চিত্র বলতেন। "সশ্বাসমিব (life-like) যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং।" কিন্তু বিশ শতক অমূর্ত, অবস্তুক-বিষয়ক, অচেষ্টামূলক, অতিপ্রাকৃত, প্রতীকী প্রভৃতি শিল্পনামের লক্ষণে যেসব চিত্রের জন্ম দিচ্ছে তাতে অনুকৃতির প্রশ্নই উঠে না। এই প্রত্যেকটি পদ্ধতিই মানুষের ভেতরকার জগতের ব্যঞ্জনা দিতে প্রয়াসী। যেহেতু প্রত্যেক মানুষ তার ভেতরকার জগতে আলাদা এসব শিল্পও পরস্পর মিল রহিত। এসব চিত্রে দর্শকের মন প্রসারিত হবার সুযোগ পায়। জানিত বিষয়ের সংকীর্ণ গলিতে মন বিচরণ করে না। আমরা যদি মনে করি, শিল্প মানুষের মনের স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি তাহলে অস্থায়ী দেবশিল্পের (nature) অনুকারী তাকে না হলেও চলে।

শিল্প-সৃষ্টির মূলে আছে অভিজ্ঞতা। কোন্ বস্তুর অভিজ্ঞতা তা-ই নিয়েই প্রশ্ন। দার্শনিক জন ডিউই বলছেন ঃ

It is mere ignorance that leads them to the supposition that connection of art and aesthetic perception with experience signifies a lowering of their significance and dignity. Experience in the degree in which it is experience is heightened vitality. Instead of signifying being shut up within one's own private feelings and sensations, it signifies active and alert commerce with the world ;"—(Art as Experience)

বিশ্বের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতায় যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা দিয়ে যে শিল্পীরা বিশেষ উপকৃত হতে পারবেন, মনে হয় না। শিল্পীর সংবিদে বিশ্ব-প্রবাহের যে ঢেউ এসে লাগে, তাতেই শোক হয়ে ওঠে শ্লোক, ঘটনা হয়ে ওঠে শিল্প। তাতেই আমরা আনন্দের এবং সৌন্দর্যের সন্ধান পাই। শিল্পী সংবাদপত্রের সাংবাদিক নয়, হৃদয়-সংবাদ-দাতা। আমি শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর (হসন্ত) সঙ্গে একমত, "Life-এর মধ্যে যারা আছে—ডুবে আছে, মশগুল হয়ে আছে, passionately

interested (আলডুস হাক্সলির কথা) হয়ে আছে, তারা আর্টের সৃষ্টি করে না, আর্টের সৃষ্টি করে তারাই যারা ভাবুক যারা নিরাসক্ত যারা মুক্ত ও অবন্ধন।"

শিল্পের দর্শন প্রণয়ন যিনি করেছেন সেই জন ডিউইর সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদীর মতের পার্থক্য হবে। শিল্পের দর্শন মানেই জীবনের সঙ্গে শিল্পের সক্রিয় যোগাযোগ দর্শানো। শিল্প-দর্শন-প্রণেতা ভাবতে বাধ্য যে জীবনের জন্যেই শিল্প। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদী মনে করেন, শিল্পের জন্যেই শিল্প। শিল্পের এ স্বাতন্ত্র্যকে দার্শনিক স্বীকার না করলেও শিল্পীমাত্রেই স্বীকার করবেন।

শিল্প কিসের জন্যে? এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ

"....it is the creation, it is the discovery of beauty. Art is for that alone and can be judged only by its revelation or discovery of beauty."

শিল্প যখন সৌন্দর্যেরই সন্ধানী তখন বলা যেতে পারে সৌন্দর্যের জন্যেই শিল্প। সৌন্দর্যের একটা সংজ্ঞা আছে ঃ "objectified pleasure"। বাস্তবিকৃত আনন্দই যদি সৌন্দর্য হয় তাহলে অভিনবগুপ্তের রসের বর্ণনা আজও অভ্রান্ত বলে মনে হয়—সৌন্দর্য ও আনন্দের ব্যাপারকেই তিনি রস বলেছেন। পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যতত্ত্বে রসের কোনো ধারণা নেই। কিন্তু ভারতীয় আলঙ্কারিকরা রস বলতে সৌন্দর্য, আনন্দ সবই বুঝতেন। রস-বিতরণের জন্যেই শিল্প এ ধারণা ভারতীয়। শিল্প যদি রসের আধার হয় তাহলে শিল্প শিল্পের জন্যেই—এ কথাতে ভুল নেই।

দার্শনিকরা বলেন, সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা কাল্পনিক। যার বাসা হৃদয়ে বা চেতনায় (সংবিদে) তার অভিজ্ঞতা বাহ্যিক হতে পারে না। কাজেই, শিল্প, যা সৌন্দর্যের আধার তা আমাদের অন্তর্জগতেরই প্রসারতা দেয়, বহির্জগতের নয়। শিল্পবস্তু জাগতিক বস্তু নয়—তা শিল্পবস্তু, তার অভিজ্ঞতা বিশ্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। মাতীসের আঁকা এক নারী-মূর্তি দেখে এক মহিলা বলেছিলেন, 'ও কি মেয়ে হয়েছে।' উত্তরে মাতীস বললেন, "ও ত মেয়ে নয়, ও হচ্ছে ছবি।" শিল্পের সঙ্গে জাগতিক বস্তুর মিল যাঁরা দেখতে চান, বা শিল্প-অভিজ্ঞতার সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার মিল তাঁরা ভ্রান্ত। শিল্পী শিল্প-সৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন —শিল্প-ভোক্তাও ঠিক সে অভিজ্ঞতাই লাভ করে থাকেন একটি শিল্প-বস্তুতে। কিছু যদি তার দুর্বোধ্য থাকে—তবে তা ত্রুটির বিষয় নয়। কোলোরিজ বলতেন, একটি শিল্পের সম্পূর্ণ ক্রিয়া উপলব্ধি করতে হলে কিছু তার অনুপলব্ধ থাকতে হয়। শিল্প-সৃষ্টিতে এই যে দুর্বোধ্য অংশ, তা থাকে শিল্প অবচেতন থেকে উৎসারিত হয় বলে। যদিও শিল্পকে ম্যাথু আর্নল্ড, "Pure and flawless workmanship" বলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তা শিল্পের বহিরঙ্গ সম্পর্কেই খাটে, অন্তরঙ্গ রসের সম্পর্কে workmanship কথাটা বেখাপ্পা মনে হয়। রস অলৌকিক, workmanship-টা নেহাৎই লৌকিক বস্তু। workmanship-টা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত হয়ে থাকে—কিন্তু রস বা সৌন্দর্য যখন উপলব্ধ হয় তা বস্তুত ঊর্ধে চলে আসে, কোনো সম্পর্কের ধার ধারে না।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা যে আমাদের বোধশক্তিকে প্রসারিত করে তার জন্যে অনেক দর্শনাভিলাষী শিল্পকে জ্ঞানের উপকরণ বলে মনে করেন। এই প্রবণতা অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে এসেছে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন কবিতায় দর্শনাংশই বেশি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা থাকলে এ-ধরনের মত শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হত বলে মনে হয় না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

জ্ঞানকে বরবাদ না করে কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা খানিকটা মেনে নেওয়া যায়ঃ "Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge." Knowledge-এর breath এবং finer spirit স্বয়ং knowledge নয়। বস্তুর সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে দার্শনিক সান্তায়ন বস্তুর যে 'essence' দেখতে পান, যা অবাস্তব—finer spirit অনেকটা তাই। অলৌকিক রসের ভিতর দিয়ে চেতনায় যে আনন্দের জন্ম হয় তার অনুভূতিই সুন্দর।

রস অলৌকিক কেন? চিত্তবৃত্তিতে যে ভাব জন্মায় তা লৌকিক এবং পরিমিত। প্রেম একটি ভাব এবং তা ব্যক্তিতে আবদ্ধ। তার রসমূর্তি শৃঙ্গার—সহৃদয়হৃদয়ে প্রেম যে বিভাবের জন্ম দেয় তা শৃঙ্গার রস। আলঙ্কারিকরা বলেন এ-রস 'সকল সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'—তাই লৌকিক নয়, অলৌকিক। রস অলৌকিক আরো এজন্যে যে এ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক মনে হবেঃ "পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ।" রস-মূর্তির একটা নিকৃষ্ট প্রতিশব্দ ক্রোচে-তে পাওয়া যায়ঃ 'Poetic idealization'। সান্তায়নের 'essence' বা 'finer spirit' কে রসের কাছাকাছি বস্তু ভাবা যেতে পারে।

শিল্পোপলব্ধিতে অভিজ্ঞতা একটা বড়ো জিনিস। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কে এসে অবিরত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে ফল সঞ্চিত হয় তা-ই অভিজ্ঞতা। ভারতের আলঙ্কারিকরা 'সহৃদয়' বলতে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন। অভিনবগুপ্তের 'সহৃদয়ে'র সংজ্ঞা এইঃ "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।" কাব্যানুশীলনের অভ্যাসে এমনই বিশদ হয়ে গেছে সহৃদয়ের মন যে তার বর্ণনীয় বিষয়ে তন্ময় হবার যোগ্যতা জন্মেছে। রসের জন্ম হয় এমন সহৃদয়ের মনেই—শিল্পসম্পর্কে যে অনভিজ্ঞ তার মনে নয়। শিল্পভোক্তার ভূমিকা শিল্পস্রষ্টার ভূমিকার চাইতে কম নয়। শিল্প-ভুঞ্জনে এবং শিল্প-সৃষ্টিতে একই রসের অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়।

রস, আনন্দ, সৌন্দর্যই শিল্পের সত্য বলে চিরদিন বিবেচিত হবে কিনা এ-নিয়ে এ-শতকে সন্দেহ উপস্থিত হবার কথা। দার্শনিক সত্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য শৈল্পিক সত্য বলে গৃহীত হবে কিনা তা নিয়েও কথা হতে পারে। শ্রীযামিনী রায় নিখুঁত পোট্রেট পেন্টিং করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি সে-কাজে তিনি সত্য খুঁজে পাননি। তাঁকে দেখা গেল বাংলার প্রাচীন পটুয়া চিত্রে ঝুঁকে পড়তে। আঙ্গিকের দিক থেকে পটুয়া চিত্রে রেখার গতি ও জোর অনস্বীকার্য। কিন্তু শ্রীযামিনী রায় কোন্ সত্যের জন্যে পটুয়া শিল্পে গেলেন তা দুর্বোধ্য রয়ে গেল। সত্যের দিকে ঝুঁকলে শিল্পীর জাত যায় না। যা সত্য তা-ই সুন্দর এমন কথা কীট্সের মতো শিল্পীও বলে গেছেন। সত্যের প্রতীতি মনে আনন্দ দেয়, কাজেই তাতেও রস এবং সৌন্দর্য আছে। কিন্তু শিল্পীর সত্য ভোক্তার কাছে ধরা না দিলে, শিল্পীকে খেয়ালি মনে করা ছাড়া আর কী উপায় থাকে? নিগ্রো-শিল্পের প্রতি পিকাসোর ঝোঁক কোন্ সত্যের সন্ধানে বোঝা মুস্কিল। বর্তমান অতিভুক্ত হয়ে গেছে বলেই কি শিল্পীরা অতীত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন?

এ-যুগের কবিতার বেলায়ও দেখি এলিয়টের মতো কবি উপনিষদ আর শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ঝুঁকে পড়ছেন। তাকে তবু খানিকটা বোঝা যায় কেন না তিনি বলে নিয়েছেনঃ "the truest philosophy is the best material for the greatest poet"। চিত্রশিল্পীর যা নয়, বাক্শিল্পীর তা হতে পারে। তাঁর রচনা থেকে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত বেরিয়ে আসে কিন্তু তার জন্যে কি এ-কথা স্বীকার্য যে বাক্শিল্পীকে দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হবে?

তেমনি আধুনিক চিত্রশিল্পীর একদল—সুররিয়্যালিস্ট—মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলো আত্মসাৎ

করে কোন্ সত্যে বা কোন্ রসে যে উত্তীর্ণ হচ্ছেন বোঝা যায় না। এ-কথাটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি থেকে শিল্প আজ আলাদা থাকতে পারছে না। জীবনের সুন্দর দিকও আজকের চিত্রে ও কাব্যে উপেক্ষিত। তাই এক আধুনিক বাঙালী কবি একটি সুদীর্ঘ পদ্যের শেষে বলেছেনঃ "এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই।" শৈল্পিক নিষ্ঠায় এ অনুভব আসে না। শিল্পী যখন স্বধর্মচ্যুত হয়ে জনসাধারণের স্তরে নেমে যান, তখনই তিনি এ-ধরনের উক্তি করতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের এ-কথাগুলো স্মরণীয়ঃ "......যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিম্বা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা রকম সমস্যার উদ্ঘাটন তাঁদের আমি এ-কথা বলতে চাই যে মানুষ......একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন, ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়,—যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে...।"

শিল্পের স্বাতন্ত্র্য যারা স্বীকার করে না তাদের আমি এ-কথাটা ভেবে দেখতে বলি যে শিল্পের যদি নিজেকে নিজের পুষ্ট করবার শক্তি না থাকত তাহলে অনৈতিহাসিক গুহাচিত্রের যুগ থেকে শুরু করে এবং আদিকবি বাল্মীকির 'মা নিষাদ' শ্লোক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তার বেঁচে থাকবার কোনো কারণ ছিল না। পরজীবী দীর্ঘায়ু হতে পারে না। শিল্পের নিজের ভেতর অফুরন্ত প্রাণশক্তি আছে বলেই এখনো তার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। সভ্যতা তার শিল্পেই রক্ষিত হয়। মিশর, সুমের, মহেঞ্জোদারোর সমাজ-ধর্ম অপসৃত হয়ে গেছে কিন্তু সুরক্ষিত আছে সে-সব সভ্যতার শিল্প। পরজীবী বস্তুর এ-সম্মান কেউ দেবে না। মানুষ যা দিয়ে সভ্য—তার চিত্তবৃত্তি—তার রূপায়ণ শিল্পে থাকে বলেই মানুষের ইতিহাসে শিল্প অমর।

মুক্তধারার থেকে পরিত্রাণ

পুলকেশ দে সরকার

মুক্তধারার পর রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে আবার কেন প্রতাপাদিত্যের জের টেনে পরিত্রাণ লিখলেন সে-খবরটি অজ্ঞাত। বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-পরিচয়ে বা রবীন্দ্রজীবনীতে তার কোনো হদিস নেই।

মুক্তধারার পর কবির নিজের জীবনধারায় অনেক ঘটনা বয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হচ্ছে বীরভূমের মরুভূমিতে নলকূপ বসিয়ে জল ওঠাবার চেষ্টা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার যে বিবরণ দিয়েছেন তা ভারী কৌতুকপ্রদ। আমেরিকা থেকে কিছু নলকূপের সরঞ্জাম এনেছিলেন। "বহু ইঞ্জিনীয়ার আসিলেন, যন্ত্রপাতি দেখিয়া শুনিয়া গেলেন; কিন্তু অতবড়ো কলকব্জা চালানোর মতো শক্তি বা বুদ্ধি কাহারও ছিল না। কয়েক বৎসর পর বরোদা স্টেট পরীক্ষাধীনভাবে জিনিসগুলি লইয়া গেলেন; কিন্তু সেখানে কেহ কোনো কাজে লাগাইতে পারিলেন না। তাঁহারাও ফেরত পাঠাইলেন—মাঝখানে পাঠানো ও আনার জন্য খরচ হইল কয়েক-শত টাকা। অবশেষে পুরাতন লোহার দরে সেগুলিকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।"১

তাঁর জন্মদিনে পঁচিশে বৈশাখ কবিতা লিখলেন। কবির মনে নির্লিপ্ত ভাব জাগছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা গেলেন। কবির বেদনা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভিকে বিদায় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ "You, in your adventure of truth, had sailed across trackless centuries reaching the India of ancient days, had gained access to her secrets which could never be pedant but only for lovers."২ কলকাতায় শারদোৎসব নাটকের অভিনয়ে কবি স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কবি পশ্চিম, দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফরে বেরোলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রম দেখতে যান; সবরমতী তখন নিখিল ভারত খাদি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মহাত্মাজী কারাগারে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করে যে বক্তৃতা দেন তা পরিত্রাণের রূপান্তরের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য; কেননা, প্রায়শ্চিত্তের চাইতেও পরিত্রাণে মুখ্যতর হয়ে উঠেছে ধনঞ্জয়। রবীন্দ্রজীবনীকার বলছেন, গান্ধীজীর আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকটির কঠোর সমালোচক হয়েও গান্ধীজীর প্রতি কেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সবরমতীতে তাঁর ভাষণই তার প্রমাণ। তিনি বলেছেনঃ

"প্রবৃত্তি মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক, এই 'সত্য' আপনারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

"ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগের অর্থ এই যে, মানুষের দেহটাই প্রকৃত জীবন নহে, আত্মাই প্রকৃত জীবন। পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা যাপন করি, এই জড় জগতেই কেবল জগৎ নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে জীবন লুক্কায়িত আছে, সেই জীবনের

১ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫
২ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮

জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের এই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর—অমর, অক্ষর ও অব্যয়।......

"......মহাত্মাজির বাণী শুধু আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই; তাহা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। প্রতি বিশ্বমানবের হৃদয়ে মহাত্মার জন্য রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" (জানুয়ারী ১৯২৩)৩

বিশ্বভারতীতে নানা বিদেশী শিক্ষক ও পণ্ডিত আসতে লাগলেন। বই এসেছে নানা দেশ থেকে। "বিবিধ ভাষা, বিচিত্র বিষয় অধ্যাপনার কতই না ব্যবস্থা হইয়াছে।"৪ বাংলার লাট লর্ড লীটনকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ নিয়ে কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য। কবি নজরুলকে 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করেন। তখন নজরুল কারারুদ্ধ (ফাল্গুন ১৩২৯)। রবীন্দ্রনাথ আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে সফরে বেরোলেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন ঃ

"ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে-মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি...খণ্ড দেশকালের বাহিরে ...আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।"

এবং "ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর......দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াসমাত্র। সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।......সাম্রাজ্য বন্ধনের দোহাই দিয়ে ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা।......বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। পাঁচটা বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না।......বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাহা একাকারত্ব (uniformity) আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি—তাই ঐক্য (unity)." ৫

শিলং থেকে ফিরে ভবানীপুরে কলকাতা সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্যের দুটি জবাব দেন।

(১) "বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের লেখকগণের দৃষ্টি গিয়াছিল মনের মুক্তির দিকে। আমাদের দেশে সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধন সেই ধর্ম যা প্রধানত আচারমূলক। বাহ্য আচারের জড় অভ্যাসে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চল ও অন্ধসংস্কারে দূষিত হইয়াছিল। এক অন্ধ তামস লোক হইতে মুক্তিলাভের ঔৎসুক্য ধর্ম-সংস্কারের প্রয়াসরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। বস্তুত তখনকার সাহিত্য বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহিত্য নহে, সাধারণ লোকের জ্ঞানোন্মেষের জন্য পাঠ্য-পুস্তকের সাহিত্য।

(২) "আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে তিনি মেসেজ দেননি, সেখানে উনি সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপ দান করেছেন। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এই জন্য সাহিত্য-সংসারে আমরা

৩ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩—১০৪
৪ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬
৫ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮

তাঁদেরই নমস্কার করি যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপরে সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন, যা দিলেন এ আর কেউ দিতে পারত না।" ৬

ইতিমধ্যে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯২১। এবং প্রচলিত নাম হল দ্বৈত শাসন। অর্থাৎ কতকগুলো বিষয় সংরক্ষিত, ইংরেজ তার মুঠো সেখানে শিথিল করেনি, কতকগুলো অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়—যেখানে ভারতীয়ের স্বায়ত্তশাসনের পাঠ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও মূল ক্ষমতা রয়েছে ইংরেজ কর্তাদের হাতেই। কংগ্রেস তাই প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের জের স্বরূপ এই শাসনতন্ত্র বর্জন করে। কংগ্রেসের যাঁরা নন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ সেই মডারেটরা এই শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্বও পেলেন। অসহযোগের উত্তাল ঢেউ প্রশমিত হলে প্রায় সর্বত্রই যখন আবার সহযোগিতা দেখা যেতে লাগল, স্কুল কলেজ কাছারিতে আবার লোকজনে ভরে গেল, তখন এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা-না-করার প্রশ্নটি আবার উঠল। দেশবন্ধু সি আর দাশ বা চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে এক স্বরাজ্যদল গঠিত হল। দাশসাহেব বললেন, আমরা to mend or end the constitution, হয় সংশোধন নয় বিনাশের মন্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য হল। দেশে no-changer (অসহযোগ নীতি পরিবর্তন বিরোধী) ও pro-changer (পরিবর্তনপন্থী) নামে দুটি দলের উদ্ভব হল।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত হল একটিমাত্র প্রোগ্রাম নিয়েই যে সবাইকে কাজ করতে হবে এমন কথায় তাঁর মন সায় দেয় না। তিনি বললেন, কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো দল যদি প্রবল হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাউন্সিলে যেতে দেওয়াই ঠিক এবং সেখানে তাঁরা যা করতে পারেন তাই করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করে তাকে ভাঙার চেষ্টার তিনি পক্ষপাতী নন; তার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ভালো।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসংগঠন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হবার যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দুদেরও তা থাকা উচিত; হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হতে চাইলে মুসলমানরা কেন তাতে বাধা দেবে?

রবীন্দ্রজীবনীকার বলছেন : হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিলে যে সমস্যার সমাধান হইবে না, একথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে লোকের অপ্রিয় হন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ মিলন ক্ষণিকের স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, ইহার দ্বারা স্থায়ী ফল ফলিবে না।

দেশের সম্মুখে স্বাধীনতার প্রশ্ন ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে, রাজনীতিকেরা অস্থির হয়ে পড়েছেন, একদল হিংসার পথ বর্জন করেছে; কিন্তু হিংসা বা বলপ্রয়োগের নীতি বর্জন করলেও যাকে বলে ঈর্ষা বা কৌলীন্যতা বর্জন করতে পারেনি। এমন যে 'রথ' সে কি স্বাধীনতায় পৌঁছোতে পারবে?

রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নিঃশক্তি করিয়াছে সেই ভেদ-ছিদ্র বন্ধ করিতে না পারিলে শনি যে সেই পথেই প্রবেশ করিয়া ভরা নৌকাডুবি করিতে পারে, সে সম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন। সমাজটাকে একটা ভেদ-বিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করিতে পারি তখনই—যখন তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি

৬ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১২

ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে। প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক তাঁহাদের সবুর সয় না, তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা পাইলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনি-আপনি ঘটিয়া উঠিবে। আপনি ঘটিবে একথা সর্বনেশে ফাঁকির কথা।"৭

হিন্দুমুসলমান সম্পর্কে তিনি বলছেনঃ

"মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতনের অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ের জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব।" ৮

রবীন্দ্রনাথ গুজরাটে গেলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে ফাল্গুন (১৩৩০) সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। (রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড)। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীনে গেলেন। সান-ইয়াৎ-সেন তখন বেঁচে। রবীন্দ্রনাথ সময়াভাবে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি, তাই এ' দুজনের সাক্ষাৎ হয়নি।

"তখন চীনের জাতীয় গবর্নমেন্টের প্রধান বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন মার্শাল TSAO KUN। ইনি ১৯১৭ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত চিহ্-লি প্রদেশের তুচুন ছিলেন। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। ইঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন বিখ্যাত সমরনায়ক Wu Pei Fu। ইঁহার চেষ্টায় মাঞ্চুরিয়া ও তিনটি প্রদেশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র চীন জাতীয় সরকারের (Kuo Ming Tang) শাসন মানিয়া লইয়াছিল—এমন কি সুদূর Szechuan ও বিপ্লবী Horzan প্রদেশদ্বয়ও Wu Pei Fu-র কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চীন-সফরে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেনঃ

প্রাচীন ভারতের সহিত চীনের যে সম্বন্ধ ছিল,—যাহার ক্ষীণধারা বিস্মৃতির অন্তরালে প্রায়বিলীন, তিনি সেই ধারা পুনর্প্রবাহিত করিবার সংকল্প লইয়া এদেশে আসিয়াছেন।

Age after Age in Asia great dreamers have made the world sweet with the showers of their love. Asia is again waiting for such dreamers to come and carry on the work not of fighting, not of profit making, but of establishing bonds of spiritual relationship. ৯

রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রাচ্যে উদীয়মান চীন বা জাপান এবং অপর দিকে প্রতীচ্যকে তৃপ্ত করতে পারল না। তারা তখন বৈষয়িক সমৃদ্ধি সুখের বা প্রাধান্যের জন্য পাগল।

জাপানে এসে তিনি বললেনঃ

"I have a deep love for you as a people, but when as a nation you have

---

৭ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮
৮ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯
৯ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৯

your dealings with other nations you also can be deceptive cruel and efficient in handling those methods in which the western nations show such mastery.

"নেশনের এই সমস্ত সৃষ্টি—ধ্বংসসাধনের ও ধনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি—কূটরাজনীতির প্রকাশ্য ও গোপন আচরণ—এই সবের মূল্য কী? ইহাদের সম্মুখে নৈতিকবন্ধন পরাভূত এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট। এগুলি গ্রহণ করিতে আপনারা প্রলুব্ধ হইতেছেন, অথবা আপনাদিগকে প্রায় বাধ্য করা হইতেছে। আপনাদের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া এশিয়ার সমস্ত জাতি গর্বান্বিত হউক; সে মহত্ত্ব পরজাতিকে দাস করিয়া ব্যথার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়, কেবলমাত্র নিজেদের সুখের জন্য অর্থ আহরণের উপর যেন তাহার ভিত্তি না থাকে।"১০

জাপানে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়।

ইতিমধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে তাঁর প্রতি তাঁরই উপযুক্ত অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। ইতিমধ্যে বরিশাল জেলার চরমনিয়া গ্রামে পুলিসের দুর্ব্যবহার নিয়ে দেশে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকার পুলিস বাহিনীর বার্ষিক মিলনোৎসবে বাংলার লাট লর্ড লীটন এক উক্তি করেন। সাময়িক পত্রিকাগুলো বলে, ঐ বক্তৃতায় ভারতীয় নারীর চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ কটাক্ষ আছে। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর লীটনের মধ্যে পত্রালাপ হয়। লর্ড লীটন তাঁর পত্রে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ভারতীয় নারীর প্রতি কোনো কটাক্ষ করতে চাননি; তথাপি যদি তাঁর বক্তৃতায় এমনতর ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে থাকে তিনি সে জন্য দুঃখিত।

রবীন্দ্রনাথ এবার গেলেন দক্ষিণ আমেরিকায়।

"বিদেশে যখন যাই, তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি, সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে-ডাক এসেছে, তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে......আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত, তাহলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম—কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক-পথেরই পথিক-মাত্র, আমি চালনা করতে পারিনে, চাইনে।"

১৩৩১ এর ৫ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন:

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হক বাঙালির জয়;
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে। ১১

১০ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮
১১ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৭

আমরা 'পরিত্রাণের' কাছাকাছি এসে পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে ইতালিতে আমন্ত্রণ পেলেন। "তখন ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনী।......এক-নায়ক শাসনের স্বরূপ তখন ইতালি ছাড়া য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় নাই।...মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত দলের প্রতাপে সবাই ত্রস্ত।...ফ্যাসিস্ত মতবিরোধী লোকের অভাব ইতালিতেও ছিল না। কিন্তু সেই সব লোকের সহিত রবীন্দ্রনাথের যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তদ্‌বিষয়ে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সুনিপুণভাবে করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যে শান্তি, আন্তর্জাতিকতা ও "ইউরোপীয় গুন্ডামির" নিন্দা করলেন তা ফ্যাসিস্ত সরকারের মনঃপূত হতে পারে না; হয়নি।

দেশে ফিরে এসে দেখলেন, চরকার বহুল প্রচলন হয়েছে এবং "শান্তিনিকেতনেই ৯০খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে—বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমস্তই দেখিলেন, শুনিলেন—কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।"

"এবার কবির জন্মদিন শান্তিনিকেতনে বেশ জাঁকাইয়াই হইল।"

গান্ধীজী এলেন শান্তিনিকেতনে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, ২৯শে মে ১৯২৫); চরকা ও খদ্দর নিয়ে আলোচনা চলল দুদিন; "বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই।"[১২]

১৩৩২ এর ২রা আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবাসদনের অর্থানুকূল্যের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর একটি ছবির নীচে ছাপার যোগ্য দুই পংক্তির এক কবিতা লিখে দিলেনঃ

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

প্রখ্যাত রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চরকার সুতায় জড়িয়ে পড়েছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ (শীল) চরকাবিরোধী বলে মৃদু তিরস্কার করলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত করলেন 'চরকা' ও 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধে।

"......দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি, আর মনে মনে বলছি স্বরাজ-জগন্নাথের রথ চলছে।......

"চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

"বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়।......

"......দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়।......

বলা বাহুল্য, এসব কথা সেকালের লোকের মনঃপূত হয়নি।

'স্বরাজ সাধন'-এ লিখলেনঃ

"খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়

১২ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২

যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুব সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না।...হিন্দু মুসলমানের মিলন হক বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়।...কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়।"

এক সীমান্তে চরকা, একেবারে পিছিয়ে, আর এক প্রান্তে যন্ত্র, একেবারে এগিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র সম্বন্ধে মুক্তধারায় যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটি তাঁর ভাষায় দাঁড়াচ্ছে এইঃ

"আমেরিকায় অবস্থান-কালে, যন্ত্রসংঘসমূহ (organisations) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (Mechanical) প্রকান্ড পদ্ধতি-পিন্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচন্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল এবং সে-সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়াছিলাম—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ব-বোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে,—কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য-সাধনে দ্বিধাহীন নির্মম গতিতে অগ্রসর হয়। যে-ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমণীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্ত-লোলুপ ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি ব্যাবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ! নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার আচরণ ও বংশগরিমায় ভদ্র! ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন এই সকল বিপুল যন্ত্রসংঘকে নির্বিচারে মানিতে শুরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মতো এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়-পৌত্তলিকতার (Fetish worship) প্রভাবে অন্য সব মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিনদিন জোগাইয়া দিতেছে।" ১৩

আমি বলেছি, ঋষিদৃষ্টিতে যন্ত্রসভ্যতার একটা অকল্যাণ দিকই উদ্ঘাটিত হল, এর কল্যাণ সম্ভাবনার দিকটি কি করে এড়িয়ে গেল? অথচ, এমনই আর এক ঋষি প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে, যন্ত্রসভ্যতার পূর্ণ ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে করতে একটা বিরাট প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন, অসীম প্রগাঢ় উপলব্ধি থেকে তিনি বলেছিলেন, অমানিশা কাটবে, বৈষম্য ঘুচবে, বিপ্লব হবে, সংখ্যালঘুর প্রাধান্য যাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্ত হবে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং তখনই প্রকৃত মানব-সভ্যতা শুরু হবে। তিনি কার্ল মার্ক্স।

রবীন্দ্রনাথের ঐ উদ্ধৃতি থেকে যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ভাব-ভাবনা যত স্পষ্ট বোঝা যায়, মুক্ত-ধারায় তা বোঝা যায় না।

এরই মধ্যে একদিন মুসোলিনীর দূত এল রবীন্দ্রনাথের কাছে।

ভারতীয় দর্শন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আহ্বান এল। কলিকাতা, ১৯২৬, ১৯শে

১৩ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খন্ড, ১৬৯-১৭০

ডিসেম্বর, ৪ঠা পৌষ, ১৩৩২। লখনৌতে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ এল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুরোধ এল। ময়মনসিংহের নানা জায়গায় অভ্যর্থনা হল। কুমিল্লা এবং কুমিল্লায় অভয় আশ্রম দেখেন। তারপর আগরতলা। চাঁদপুর। নারায়ণগঞ্জ।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারংবার তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাষায় বলেছেন। কিন্তু মুসলমানেরা যখন বাংলা ভাষাকে পর্যন্ত মাতৃভাষা বলে কবুল করতে চায় না এমন দাঁড়ালো, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ "চীনদেশে মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলেন নাই যে, চীনা ভাষা ত্যাগ না করিলে তাঁহাদের মুসলমানত্ব খর্ব হইবে। বাংলার মুসলমান কি বাংলাদেশে প্রবাসী?"

রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তান দেখে যাননি—এ তাঁর সৌভাগ্য। কিন্তু একটি দুর্ভাগ্য এই যে, একথা শুনে যাননি যে, বাংলা ভাষার জন্য মুসলমান তরুণেরা প্রাণ আহুতি দিয়েছে।

তিনি দেখে গেছেন—কলকাতায় ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা - দেখেননি ১৯৪৬ সালে The Great Calcutta Killing. তারপর হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের The Great vivisection of the Motherland এবং তাঁর সেই জালিনওয়ালাবাগের পাঞ্জাবে হানাহানি, রক্তারক্তি, নারীহরণ, নারীধর্ষণ। সেই ভদ্র নেতৃবৃন্দ আজও দুইরাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা।

অকস্মাৎ আবার রাজনীতি এসে পড়েছে। রায়তের কথা কিছু লিখতে হল।

"আজ যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলচে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তে থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, মাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আগে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।"১৪

রবীন্দ্র চললেন ইতালি।

রবীন্দ্রজীবনীকার বলছেন ঃ "চৌদ্দদিন রোমে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনী সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে এই জবরদস্ত লোকটি কবিকে খুবই আকৃষ্ট করে। এই কথাটি তিনি বহুবার অধ্যাপক ফার্মিকি ও সাংবাদিকগণের নিকট বলেন। কিন্তু তিনি ফ্যাসিস্মো সম্বন্ধে কোনো মতামত দেন নাই; তিনি বার বার বলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি বলিতে অপারগ। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টারের নিকট মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা ও ফ্যাসিস্মোর প্রশংসা প্রতিশব্দবাচক। সুতরাং ইতালির কাগজে পত্রে ঘোষিত হইতে লাগিল যে, রবীন্দ্রনাথ ইতালির বর্তমান অবস্থার ঘোর সমর্থক।" ১৫

সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ভুল করেননি। রবীন্দ্রনাথের মনের গঠনের এবং ভাবধারার মধ্যে এমন একটি জবরদস্ত লোকের স্থান আছে। জবরদস্ত লোকটি তাঁর মতামত থেকে পৃথক হয় না, পৃথক করে দেখা যায় না। যদি তাঁর ক্রিয়া প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত না হত তিনি জবরদস্ত লোকটিকে দৈত্য বলতেন। বলেননি, তার কারণ, ইতালিতে তিনি "আপাতদৃষ্টিতে" কিছু "নিন্দনীয়" দেখেননি; জবরদস্ত লোকটির জবরদস্তিও নয়।

রবীন্দ্রনাথ মধ্য ইউরোপে গেলেন।

১৪ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪

prevent her plying a practised hand in wielding her assassin's knife, carefully choosing for her victims who are already down."১৭

জাপান সম্বন্ধে বললেন:

"I have ever wished that Japan, in behalf of all Eastern peoples, will reveal an aspect of civilization which is generally ignored in other parts of the world. It should be greatly rich in the wealth of human relationship even in politics. The generosity in human relationship I claim as something special to the East."

ঠিক এমনি কোন এক সময়, এই কালে, রবীন্দ্রনাথ 'পরিত্রাণ' লিখলেন। রবীন্দ্রজীবনীতে তার কোথাও হদিস খুঁজে পেলাম না। সুতরাং এর অব্যবহিত পূর্বাপর ঘটনাবলী আমার অজ্ঞাত।

রবীন্দ্ররচনাবলীর ২০শ খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছাড়া সেখানেও আর কোনো খবর নেই। ঐ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আছে:

"পরিত্রাণ ১৩৩৬ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৩৪ সালের বার্ষিক শারদীয়া বসুমতীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল।

"পরিত্রাণ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পুনঃ সংস্কৃত রূপ; ইহার কোনো কোনো অংশ প্রায়শ্চিত্ত হইতে গৃহীত, অবশিষ্ট অংশ নূতন।"

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ নাগাদ মালয় প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতে সফর করেন। মাস তিনেক ছিলেন বাইরে। এই সফরকালে পরিত্রাণ লিখেছেন কিনা রবীন্দ্রজীবনীতে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। মাস তিনেক হিসেবে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন। বসুমতীর ১৩৩৪-এর শারদীয়া সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিকে বেরিয়ে থাকবে। হয়তো তখনই লিখে দিয়েছেন; কেননা, বউঠাকুরানীর হাট--প্রায়শ্চিত্তে কাঠামোটা ছিল, একটু শুধু অদল-বদল। রবীন্দ্রজীবনীতে আছে "পূর্ব দ্বীপাবলী হইতে ১০ কার্তিক ফিরিবার পথে কবি যে গান ও কবিতা রচনার ঝোঁকে ছিলেন, তাহার রেশ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া দেখা যাইতেছে।"

ফিরে এসে লিখতে হলে ১০ই কার্তিকের পর লেখা ছাড়া সময় তো দেখিনে। তাহলে শারদীয়া বসুমতী নিশ্চয় আরও পরে বেরিয়েছে। ঐ সময় ঋতুরঙ্গের খবর আছে, পরিত্রাণের খবর নেই।

যাই হোক গ্রন্থাকারে বেরোবার দু'বছর আগে কার্তিকমাসে লেখা বেরোয়, লেখা সম্ভবত ঠিক ঐ সময়েই--যদি আগে কোনো সময়ে, সফরে অথবা সফরের আগে না হয়ে থাকে।

যাই হোক, পরিত্রাণে মুক্তধারার প্রভাব পড়েনি, তাঁর স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্ত জাগরূক ছিল; বউঠাকুরানীর হাট—প্রায়শ্চিত্ত—পরিত্রাণ যদি একই জিনাস (জাতির) ধারা হয় তো মুক্তধারা আকস্মিক প্রজাতি।

কিন্তু বউঠাকুরানীর হাট থেকে প্রায়শ্চিত্ত যতখানি পৃথক, প্রায়শ্চিত্ত থেকে পরিত্রাণ ততখানি পৃথক। পরিত্রাণে ধনঞ্জয় অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে, যা প্রায়শ্চিত্তে গৌণ, বউঠাকুরানীর হাটে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

পরিত্রাণ

আমি ১৩৬১ সালের রবীন্দ্ররচনাবলীর ২০শ খণ্ড অনুসরণ করেছি।

---

১৭ রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬০

পরিত্রাণে কথোপকথন বউঠাকুরানীর হাটের মতো তো নয়ই, প্রায়শ্চিত্তের মতোও সহজ নয়। বিশেষ করে ধনঞ্জয়ের কথাবার্তায় কেবলই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। এ সাধারণের সহজবোধ্য নয়। কিন্তু ধনঞ্জয়ের আলাপ প্রধানত নিরক্ষর প্রজাদের সঙ্গেই। পরিত্রাণের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ধনঞ্জয় ও প্রজাদের নিয়েই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রজা । কিসের খবর ঠাকুর?

ধনঞ্জয় । দুঃখের দিন আসছে।

প্রজা । বল কি প্রভু?

ধনঞ্জয় । হাঁ রে, আমি ধরণীর কান্না শুনতে পাই যে।

প্রজা । কোথায় পালাব?

ধনঞ্জয় । পালাব না রে, তাকে বুঝে নেব—ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া—
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক-বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

সুতরাং, এসব প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের উপলক্ষ্য ধনঞ্জয় বা প্রজাগণ, লক্ষ্য একটি বিশেষ বক্তব্য। এই বক্তব্যের জন্য নিরক্ষর প্রজাদের মুখেও ধনঞ্জয়ের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

ধনঞ্জয় বলছেন ঃ

"আমি তোদের ডাকছি -সবাই আমার বুকের ভিতর আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখবি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানি।

"প্রজা । তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর সেখানে যাবার পথ পাইনে যে।

উত্তরে আবার তত্ত্বের গান। এবং "ঘুম যখন ভাঙবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।"

"প্রজা । ঘুম যে ভাঙে না।

"ধনঞ্জয় । সেই জন্যেই তাড়া লাগছে, নইলে দুঃখ আসবে কেন।"

আর এক টুকরো তত্ত্বগানের জের। এবং "অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুমরে মরিস।"

এও এক ধরনের কবিতা ও গান।

সুতরাং, চরিত্র নয়, কথাই এখানে আসল, কথাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। সে-কথাটি এই যে, রাজশাসনে প্রজাদের দুঃখ জমেছে প্রচুর, ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান, কিন্তু ভাষা পাচ্ছে না; ভয়ে চাপা হাহাকার অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরছে শোষিত বুভুক্ষু প্রজারা। প্রত্যেক ঘরে দুঃখও যেমন, একটা প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি। কিন্তু দুঃখ লাঘবের প্রতিকারের পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না, অথবা দুঃখ যে সবারই এমন এবং এই দুঃখ সর্বজনীন এ-বোধও তাদের নেই। সেই মূঢ় মূক ম্লান মুখে ধনঞ্জয় এসেছে ভাষা দিতে, ভগ্নজীর্ণ বুকে আশা ধ্বনিত করতে এসেছে। এই হচ্ছে নেতার কাজ। সবার দুঃখকে একত্র করা, তাকে শক্তি দেওয়া।

কি পথে আসবে সে প্রতিকার, সে শক্তি? পালাবার পথে নয়। যদি কেবলই পালাতে দেখে স্পর্ধিতের দম্ভ যায় বেড়ে। সে মনে করে এই স্বাভাবিক, এই চিরন্তন। স্পর্ধিতের দম্ভ

যদি চূর্ণ করতে হয়, তবে পালানোর পথে হবে না, দাঁড়িয়ে মোকাবিলার পথেই তা হবে। এই সংবাদ নিয়ে এসেছে ধনঞ্জয়। অর্থাৎ, সমাজের বেদনার একটি বিশেষ পরিণতিতেই নেতৃত্বের জন্ম; নেতা জনসাধারণের অকথিত কথার প্রতিধ্বনি করেন, তাই জনসাধারণ নেতার কথায় ওঠে বসে, মানে, নিজের মনের কথায় চালিত হয়। নেতা ডাকেন ওদের সবাইকে তাঁর নিজের মতো হতে, নির্ভয়ে বিপদোত্তীর্ণ হতে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে। কেননা, মৃত্যু সামান্য, মরবে না এমন প্রাণী নেই; কিন্তু অমর হতে পারে সেই যে বিপদকে, চরম-বিপদ মরণকে, তুচ্ছ জ্ঞান করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন তা ঘুমন্ত অবস্থার সামিল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে চমকে চমকে ওঠার মতো। ভয়ে কুঁকড়ে মরে থাকার মতো। সুতরাং, এ-ঘুম ভাঙতেই আঘাত আসে—রাজদণ্ডের অপ্রতিহত অবিরাম আঘাত—অবাধ পীড়ন। এই করে চেতনা জাগে। এইভাবে প্রেরণা জাগে প্রতিকারের। তারপর লাগে সংঘাত।

সেখানে রাজার পেয়াদার মার বা রাজশাসনের পীড়ন এদের চেতনা আনতে থাকে, যতদিন সে চেতনা না আসে, অচৈতন্য থাকে, তদ্দিনই উৎপীড়কের দিন। চেতনার অভাব, অধিকার বা স্বাধিকার বোধের অনুপস্থিতিই উৎপীড়ককে পীড়নে সাহায্য করে। সুতরাং, বাইরের অস্ত্র বা হাতিয়ার কিছু নয়, উৎপীড়িতেরা পড়ে মার খায় বলেই ওরা মারতে পারে, মারতে সাহস পায়। ধনঞ্জয় তাই বলছেন, "আমি এই কথা তোদের বলতে এসেছি—সংসারে তোরাই দুঃখ এনেছিস।"

জনসাধারণ বাইরেটা দেখে—দেখে রাজশাসন আর নিঃসহায় সহিষ্ণু প্রজাদলকে; এই সহিষ্ণু প্রজাদলের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে না; এটা দেখে না যে প্রজাদের সহিষ্ণুতা তাদের অন্তরের ভীরুতা মাত্র, এই ভীরুতার খবর জানে বলেই উৎপীড়কের অস্ত্র উদ্যত থাকে: এখানে বাইরেকার কোনো হাতিয়ার কিছু নয়, মানসিক বলটাই বড় কথা, সেইটিই আত্মমর্যাদার চেতনা;—তা জেগেছে এই খবর উৎপীড়ক যেদিন পায় সে হাত গুটোয়, হাতিয়ার সরায়, পিছু হটে।

তাই ধনঞ্জয় বলছেন: "মার খাবার জন্য যে তৈরি হয়ে আছে—মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেছে।"

অর্থাৎ পড়ে মার খায় বলেই কাউকে মারা সম্ভব। একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, একবার ইংরেজ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ইংরেজ মহিলা অপহৃতা হন, এর প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজরা আদিবাসীদের ওপর বোমা পর্যন্ত বর্ষণ করে। প্রতিকার হবে এইটে সাড়ম্বরে জানান দেওয়া। মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়, কোনো মুসলিম মহিলা দূরে থাক, কোনো মুসলিম পুরুষকে—সে যদি পকেটমারও হয় তাকে আঘাত করলে সমগ্র মুসলিম সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই ঐক্যবদ্ধতা বা সঙ্ঘবদ্ধতা হিন্দুদের মধ্যে নেই; তাই হিন্দু মেয়ে নির্বিঘ্নে প্রতিকারহীন অবস্থায় অপহৃতা হয়, হিন্দুরা পড়ে মার খায়। হিন্দুসমাজের শৈথিল্য সে কুফল ফলাবার চষামাটি।

অতএব সমাজের বাঁধন যদি এমন শিথিল হয় যে সেখানে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া প্রতিকারের চেতনা নেই তবে তাই হবে মারের ফসল ফলাবার উর্বর মাটি। এ কোন সাম্প্রদায়িক সমাজ হতে পারে, অর্থাভাব-পীড়িত সংগতিহীন প্রজাসমাজ হতে পারে, শুধুই লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত সমাজ হতে পারে।

প্রতিকার কি?

"প্রজা । আমরা কী করব বলে দাও।

"ধনঞ্জয় । আর কত বলব? বার বার বলছি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।"

ধনঞ্জয় এই মাভৈঃ বাণী দিতেই এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে এই কথাটির ওপরই জোর দিয়েছেন। মানসিক বলই আসল বল, হাতিয়ার নয়। দেখা গেছে, যার কোনো মনোবল নেই তার হাত থেকে মারাত্মক হাতিয়ার সরিয়ে নিতে পারেল সে নির্বিষ কীটের মতো কাতর হয়ে পড়ে। কিন্তু যাঁর মনোবল আছে তিনি অস্ত্র দেখেও ভয় পান না, নিরস্ত্র থেকেও দুর্বৃত্তের মোকাবিলা করতে দাঁড়ান। নিরস্ত্র অবস্থায় পাগলা কুকুরের মুখোমুখি হওয়া উচিত কিনা সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু হাতিয়ার হাতে থাকতেও বাঘ দেখে কাঁপতে শুরু করেছে, বা আক্রমণের মুখে হাতিয়ার নিয়ে পালিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অর্থাৎ, হাতিয়ার থাক না থাক মনোবলই মূল কথা। মনোবল থাকলে হাতিয়ার ছাড়া কাজ হতে পারে, মনোবল না থাকলে হাতিয়ারও নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

প্রজারা তো খুনে ডাকাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ধনঞ্জয় বলেন, "খুনেকে তোরাই খুনে করিস, ডাকাতকে করে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্।"

খুনে বা ডাকাত যদি জানে বিনা প্রতিরোধে যে খুন বা ডাকাতি করা যাবে না, তবে সেও সন্ত্রস্ত হয়। অপরের ভয় ও মানসিক দৌর্বল্যই ওদের সুযোগ।

সুতরাং, কার পদধ্বনি শুনেই প্রজারা আশঙ্কায় পালায়। রাজশাসনের প্রতাপে ওরা শুধু পালাতেই শিখেছে। ধনঞ্জয় এই পলায়নপর প্রজাদের ডেকে বলছেন ঃ

"ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই—বুক পেতে দিতে পারিস, বিপদ তা হলে নিজেই পিছন ফিরবে।"

ধনঞ্জয় এসেছেন এই আশ্বাসের বাণী নির্ভয়ের বাণী নিয়ে, পরিত্রাণে তাই তিনি সর্বব্যাপী। বউঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্য সর্বব্যাপী, দ্বিতীয় চরিত্র বসন্ত রায়; প্রায়শ্চিত্তে প্রতাপ সর্বত্র-গামী নন, দ্বিতীয় চরিত্র ধনঞ্জয়; মুক্তধারায় অভিজিৎ সর্বব্যাপী কিন্তু সমভাবে সর্বব্যাপী বিভূতি; পরিত্রাণে ধনঞ্জয় সূচনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত উপস্থিত থাকলেও তাঁকে সর্বত্রগামী বলা যায় না, প্রতাপের ভূমিকা এখানে বউঠাকুরানীর হাটের মতো সর্বব্যাপী না হলেও, মুখ্য এবং ধনঞ্জয়ের সূচনায় যে প্রত্যাশা উপসংহারে তা অনুপস্থিত, সূচনায়-উপসংহারে, সামঞ্জস্য নেই।

প্রথম দৃশ্যেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে খুল্লতাত বসন্ত রায় ও তাঁর আততায়ীরূপে নিযুক্ত পাঠানের সঙ্গে দেখা। বউঠাকুরানীর হাটের বসন্ত রায়ের নিজের যথেষ্ট মনোবল, ক্ষমাশীলতা ও নির্লিপ্ততা ছিল। কিন্তু মনোবলের প্রতীক ধনঞ্জয় এসে দাঁড়ানোতে বসন্ত রায়ের চরিত্রটি কিছু হ্রস্বতর হয়েছে। পাঠানের মতলবও "ফেঁসে গেল।" কিন্তু এখানে বসন্ত রায়ের বাজনাও নেই গানও নেই; পরিত্রাণে গানের প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন ধনঞ্জয়। বসন্ত রায় এখানে শ্রোতা।

যে-প্রতাপ খুল্লতাতকে হত্যার জন্য পাঠান পাঠিয়েছিল, সেই প্রতাপের কাছেই খুল্লতাত বসন্ত রায় যাচ্ছেন শুনে প্রজারা তাঁকে নিরস্ত করতে চাইল; ধনঞ্জয় প্রজাদের ধমক দিয়ে বললেন, "কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবিনে ভয়ে, অন্যকেও চলতে দিবিনে?"

অযাত্রা অর্থ যে যাত্রা করে না, যে নড়তে চায় না ভয়ে, গুটিসুটি বসে বাঁচতে চায়, যে জড়, ভয়ে জড়, শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে, ভয় ছাড়া আর কোনো বোধ নেই। এদের দিয়ে কোনো কিছু হবার নয়—অগ্রগতি তো নয়ই।

ধনঞ্জয় এদের আর একটি জবাব দিয়েছিলেন। ওরা ভীরু, ওরা জড়, কিন্তু ওদের নিষ্ফল

রাগ আরও কাতর করে তোলে। ধনঞ্জয় বললেন, রাগ হয় বলেই তো তোরা "সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস—না রাগতিস, তা হলে যে রাগে না তাকে দেখতে পেতিস।"

পৃথিবীতে এ তত্ত্বটি অবশ্য কোনো কাজের নয়। আমার ভেতর রাগের সঞ্চার না হতেও রাগী এসে আমায় শাসাতে পারে, আমার কোনো কথা বলার আগেই আক্রমণ হয়ে যেতে পারে। এর নামই aggression. ভারতবর্ষ আক্রমণ না করেও আক্রান্ত হয়েছে এবং এমন দুর্ভাগ্য আরও অনেক দেশের হয়েছে, অনেক সমাজের হয়েছে, সম্প্রদায়ের হয়েছে, ব্যক্তির হয়েছে। পাকিস্তানে যেসব হিন্দু মার খায় তারা রেগে গিয়ে রাগীকে দেখে না, তারা না রেগেই সেখানে থাকতে চায়। সুতরাং, ব্যবহারিক জগতে ধনঞ্জয়ের একথাটি অবান্তর।

এখানে বসন্ত রায় ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে পাঠ নিলেন। ভালবাসায় যে দুঃখ, যে কান্না, চলার পথে যে ব্যথা বসন্ত রায় তাই চেয়ে নিলেন। কোন্ আদর্শে, কোন্ লক্ষ্যে? শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য দুঃখবরণ, শুধু অশ্রুবর্ষণের জন্য কান্না, শুধু চলার জন্য চলে ব্যথা পাওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। দেশের জন্য ক্ষুদিরাম যখন দুঃখ সয়, দেশবাসীর দুঃখে যখন কাঁদে, সেই দুঃখমোচনে কাঁটার পথে যখন চলে তখন সে দুঃখ সওয়া, কান্না, চলার ব্যথা সার্থক। বসন্ত রায় ধনঞ্জয়ের কাছে এ দীক্ষা নিলেন কেন? লোকহিতায় জগদ্ধিতায় যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে তবে সে দুঃখ, সে কান্না, সে ব্যথা বিলাসমাত্র—এবং অকল্যাণকর অবাঞ্ছিত বিলাস।

বসন্ত রায়ের সব চাইতে বড় গুণ ক্ষমা। এই গুণের জন্য তিনি দুঃখ সইতে রাজী, কাঁদতে রাজী, পথ চলার কষ্ট মানতে রাজী। নাতিনাতনীকে ভালোবাসে সবাই, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপকে ক্ষমা করাই তাঁর ক্ষমাগুণের পরিচয়—প্রতাপকে বার বার বিরূপ জেনেও। একমাত্র ক্ষমাগুণ দিয়ে কাউকে বিচার করলে বসন্ত রায় নিঃসন্দেহে মহৎ, ক্ষমাগুণই একমাত্র গুণ নয় যা গোটা চরিত্রকে মহৎ করে তোলে। প্রতাপের উদ্যত ছুরিকাতলে একা মাথা পেতে দিয়ে কি করবেন বসন্ত রায়? বসন্ত রায়ের আত্মোৎসর্গের দীপশিখাকে শাশ্বত করার প্রস্তুতি কই জনমানসে? নিছক আত্মবিসর্জন আত্মহত্যারই নামান্তর। বসন্ত রায় তো রাগ করেননি, তবে তিনি কেন রাগী দেখলেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, প্রতাপ তো ক্ষমায় নম্র হল না। এই সেই aggression যা রাগদ্বেষহীন ক্ষমাশীল মানুষকেও আক্রমণ করতে পারে, হত্যা করতে পারে।

সুতরাং, ধনঞ্জয়-বসন্ত রায়ের এই কথোপকথন যেন দুই দুঃখবিলাসীর বৈঠকী আলাপ হয়েছে, যা বৈঠকেই সত্য, অন্যত্র নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বউঠাকুরানীর হাট ও প্রায়শ্চিত্তে বসন্ত রায়ের প্রথম হত্যা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ঘটনা আর পরিত্রাণে অব্যাহতি পাওয়ার ঘটনা এক নয়। পাঠানের স্বীকারোক্তি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু পরিত্রাণে ধনঞ্জয়ের উপস্থিতিতে ও ভিন্ন পরিবেশে বসন্ত রায়ের ফাঁড়া কাটল।

তারপর ধনঞ্জয়ের উল্লেখ আছে রাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর মন্ত্রীর মন্ত্রণালাপে। এ প্রায়শ্চিত্ত-মুক্তধারার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

এরপর যখন ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা মাধবপুরের প্রজারা তখন রাজার চণ্ডনীতির কথা জানাচ্ছে। তারা মার খেয়েছে। কিন্তু যে-পর্যায়ে এসে মার-খাওয়া ফলপ্রসূ হয়, ধনঞ্জয়ের বিশ্বাস, প্রজারা ততখানি মার খায়নি এবং মিথ্যা মানসম্ভ্রমজ্ঞান আছে।

এককালে জেলখানা আমাদের কাছে ঘেন্নার জিনিস ছিল, অবমাননার স্থান ছিল, বিশ্রী অপরাধ ছাড়া কেউ জেলে যায়, রাজদণ্ড লাভ করে এ আমরা ভাবতে পারতাম না। জেলখানাও

ছিল পীড়নের নরকস্বরূপ। একদিন এল স্বদেশীরা—সেই দুঃসহ কষ্ট, অপমান, অনাহার। ভদ্রলোকের ছেলেরা চোর-দাগীদের সমপর্যায়ে জেল খাটছে, কঠোরতর ব্যবহার পাচ্ছে, দেশের মায়েরা চোখের জল দিয়ে এ অপমান এ দুঃখ মোচন করে দিলেন। ভয় নেই, কষ্ট নেই, মান অপমান নেই। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি, আজকালের সিনেমা-ক্রিকেটপ্রিয় তরুণেরা সেদিন-কার দুঃখ অপমান ঘেন্না ভাবতেও পারে না। কেবলই কি রাজরোষ রাজদণ্ড। রাজকোপে পড়ায় সমাজের কোপেও পড়তে হয়েছে। দেশবাসীর কল্যাণে কাজ করেও দেশবাসীর সমাজে এক ঘরে ওরা হত। আজ তা কল্পনাতীত; সম্ভবত আমরাই তার শেষ সাক্ষী।

"ধনঞ্জয়।......এখনও সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে?......এখনও আরও অনেক বাকি আছে।"

অর্থাৎ যারা এগিয়ে এসেছে এ কথা তাদের উদ্দেশে। যারা এগোবে তাদের গায়ে ধুলো দেবে তারা যারা এগোয়নি বা এগোবে না।

কিন্তু এদের পেটে ও পিঠে জ্বালা ধরেছে শুনে ধনঞ্জয়ের আনন্দ হল। তিনি এই শুভক্ষণে রাজদর্শনে যাবেন ঠিক করলেন। প্রজারা ওঁকে একা যেতে দেবে না। বাকী কথা-গুলো প্রায়শ্চিত্তেরই পুনরাবৃত্তি। এ দৃশ্যটি দুটি একটি শব্দেব রদবদল ও ঘটনাপারম্পর্য বাদ দিলে প্রায়শ্চিত্তেরই অনুরূপ। ধনঞ্জয়কে বন্দী করা হল।

এ পর্যন্ত ঘটনা যা এগিয়েছে বা যেভাবে এগিয়েছে তা বিশেষ একটি প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। প্রায়শ্চিত্ত থেকে রাজশাসনের অসামঞ্জস্য বা বৈপরীত্য হিসেবে প্রজাবৃন্দের আবির্ভাব ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তধারায় এসেছে। কিন্তু পরিত্রাণেই বেশী করে এসেছে। কিন্তু ধনঞ্জয়ের নেতৃত্ব সম্পর্কে যে বিশেষ প্রত্যাশা তা পরিণতিলাভ করেনি। কারামুক্তির পর ওটি পথান্তরে গেছে। পরিত্রাণে একেবারে একটি নতুন ঘটনার বিন্যাস আছে; সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল। ওরা সব 'গণডেপুটেশনে' এসেছে। সোরগোল করে স্লোগান দিচ্ছে আমাদের দাবী মানতে হবে। রাজাকে গদী ছাড়তে বলছে না, বলছে "আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব", "আমরা এখানে না খেয়ে মরব।"

অর্থাৎ উপবেশন ধর্মঘট ও অনশন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সে, আজ থেকে ৩৫ বছর আগে, ১৯২৯ সালে, আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে যা সামান্য আহরণ করেছেন এ সংযোজনা তারই ফল। এটি ৩৫ বছর আগে শারদীয়া বসুমতীতে বেরোয়, আমি সেই হিসেবে ধরেছি, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ ধরিনি। অর্থাৎ তখনো ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন হয়নি—বড়রকমের আন্দোলনের মধ্যে—এবং এই প্রকৃতির গণ-আন্দোলনের মধ্যে—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেছে।

এই রকম একটি দৃশ্য এই পরিত্রাণে প্রতিফলিত। কিন্তু সেখানে রাজশাসনের "মৃদু লাঠি চালনা" নেই, গুলী নেই, গ্রেপ্তারও নেই। প্রহরীদের নরম কথায়ই একরকম ঠাণ্ডা হল। তারপর ওদের দাবী হল ওরা যুবরাজকে দেখে যাবে। তাই নিয়ে কলরব করল। দেখা হল, যুবরাজের আশ্বাসে গ্রামে চলে গেল। এইখানে প্রজাদের ভূমিকা শেষ।

কারামুক্তির পর রাজার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের কথা হল। রাজা মাধবপুরে যেতে মানা করলেন। ধনঞ্জয় বললেন, "সে কেমন করে বলি..."। কিন্তু যাননি। পথে দেখা উদয়াদিত্যের সঙ্গে আর এলেন বিভা। ধনঞ্জয়, উদয়াদিত্য, বিভা (সম্ভবত রামমোহনও) ওঁদের পথ-চলা শুরু হল।

সে পথ মাধবপুরের পথ নয়। বৈরাগ্যের পথ। প্রথম দৃশ্যের ধনঞ্জয়ে এ পরিণতি প্রত্যাশিত নয়।

প্রায়শ্চিত্তের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে পরিত্রাণের প্রথম দৃশ্যের অনেক তফাৎ। এই প্রথম দৃশ্যেই সপ্রজা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে পাঠানের, বসন্ত রায়ের সঙ্গে দেখা এবং ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটন। প্রায়শ্চিত্তে এ'দের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এখানে প্রজারাই বসন্ত রায়কে যশোহর যেতে মানা করছে। বসন্ত রায়কে প্রতাপাদিত্য হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন এমন গুজব ওরা শুনেছে।

প্রায়শ্চিত্তের প্রথম দৃশ্যে আছে সুরমা-উদয়াদিত্যের আলাপের মাঝে বিভা এল এবং বসন্ত রায়কে হত্যার ষড়যন্ত্রের গোপন সংবাদ দিতেই উদয়াদিত্য ছুটলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজামন্ত্রীর আলাপ এবং অকস্মাৎ খুল্লতাতের আবির্ভাবের ঘটনা বউ-ঠাকুরানীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণে অনুরূপ। পার্থক্য এই প্রায়শ্চিত্তে এই দৃশ্যেই প্রথম ধনঞ্জয়ের উল্লেখ হয় মাত্র; কিন্তু পরিত্রাণে প্রথম দৃশ্যে ধনঞ্জয়ের সশরীর আবির্ভাব। সুতরাং, এই দৃশ্যে ধনঞ্জয়ের উল্লেখ আচমকা নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বউঠাকুরানীর হাটের মতো তো নয়ই, প্রায়শ্চিত্তের মতোও পরিত্রাণে বসন্ত রায়—প্রতাপাদিত্যে অত কথা হয়নি। উভয়ের কোলাকুলি নেই। কাকাভাইপোর এই দৃশ্যটি সংক্ষিপ্ত ও ষড়যন্ত্রের কথা মনে রাখলে অনেক বেশী স্বাভাবিক। বউঠাকুরানীর হাটের প্রতাপ একেবারে সৌজন্যহীন নন, সেখানে উভয়ে কোলাকুলি ছিল এবং তারপর প্রতাপের প্রস্থান ঘটেছে। পরিত্রাণে সে বালাই নেই। প্রতাপের প্রকৃতি এখানে যেন তীক্ষ্ণতর ঃ

"বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান।

"বসন্ত। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই।

[প্রতাপ নীরব

প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ—তারপর বহুকাল সেখানে যাওনি।

"প্রতাপ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ঐ পাঠানকে ছাড়িস নে!

[দ্রুত প্রস্থান

প্রতাপের চরিত্রের সঙ্গে এই আচরণের সামঞ্জস্য আছে।

পরিত্রাণের তৃতীয় দৃশ্যটি হচ্ছে বউঠাকুরানীর হাটের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রথম দৃশ্য। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ, উদয়াদিত্য-সুরমা আলাপ।

বউঠাকুরানীর হাটের উদয়াদিত্যের বিষণ্ণ ভাবটি প্রায়শ্চিত্তে যতখানি কেটেছে, পরিত্রাণে তার চাইতে বেশী কেটেছে। এখানেও উদয়াদিত্য রুক্মিণী-কলঙ্কমুক্ত। উদয়াদিত্যের কথাবার্তাও অনেক মার্জিত।

এই দৃশ্যেই রমাই-ভাঁড় ঘটিত কেলেঙ্কারির উল্লেখ আছে—রামচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানাবার কথা নেই, বসন্ত রায়কে অনুরোধ করতে হয়নি, রামচন্দ্রের সভাদৃশ্য নেই, রামচন্দ্রের আগমন-সংবাদ, এমন কি, রমাই-ভাঁড়ের ক্রিয়াকলাপ নেই। একেবারে যেন গল্পের মাঝখানে। বিভা কেঁদে কেঁদে সুরমা-উদয়াদিত্যকে বলতেই ঘটনা প্রকাশ পেল।

বসন্ত রায় এলেন, গানও হল, কিন্তু ইনি বউঠাকুরানীর হাটের বসন্ত রায় নন। কথাবার্তার ধরন পৃথক।

বিভাকে রামমোহনের শাঁখা পরানোর ছোট্ট ঘটনাটিও পরে হয়েছে।

বিভা আবার এসে জানালো রমাই-ভাঁড়ের কেলেঙ্কারী রাজার কানে গেছে। পরিত্রাণে বিভার চরিত্রটি সুন্দরতর।

"বসন্ত। দিদি, ভয় করিস নে,......

"বিভা। ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি, কী লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যাপার তো আমি ভাবতে পারিনে। জন্মের মতো আমার যে মাথা ছোট হয়ে গেল।

"বসন্ত। এখন ও-সব কথা ভাবিস নে, আপাতত—

"বিভা। অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারও বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

প্রতাপাদিত্য স্বয়ং এসে উদয়াদিত্যকে কেলেংকারির সংবাদটা দিলেন, জানালেন, তিনি "কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার মুণ্ডু" কাটার জন্য লছমন সর্দারকে হুকুম করেছেন।

বিভাকে বললেন:

"প্রতাপ। তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কীরকম অপমান করেছে, তা তো জান?

"বিভা। জানি।

"প্রতাপ। আমি যদি তার প্রাণদণ্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি?

"বিভা। না।

"বসন্ত। দিদি, কী বললি দিদি! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে।

[বিভা নিরুত্তর

"প্রতাপ। খুড়ামহারাজ, মনে রেখো বিভা আমারই মেয়ে।"

বলাবাহুল্য, এই উদ্ধৃতাংশগুলো একান্তভাবে পরিত্রাণেই আছে, মুক্তধারায় থাকবার কথা নয়, প্রায়শ্চিত্ত ও বউঠাকুরানীর হাটেও নেই।

রামচন্দ্রের নৃত্যসভা দৃশ্যটিরও বহু পরিবর্তন হয়েছে। রামচন্দ্র স্ফূর্তি করছেন, রাম-মোহনের কথা বিশ্বাস করলেন না, উদয়াদিত্যের ধমকেও নড়লেন না, শেষ পর্যন্ত এলেন। তারপর মন্ত্রীর কাছে পালানোর সংবাদটা পাওয়া গেল। পরিত্রাণে রাজদণ্ড জানাজানির পর অন্তঃপুরে উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা প্রভৃতির পলায়ন আয়োজন, উদয়াদিত্যের প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে পলায়ন দৃশ্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বউঠাকুরানীর (সুরমার) ওপর প্রতাপের ক্রোধ, তার ওপর দোষারোপ, তাকে বিষপ্রয়োগের আয়োজন ও বিষপ্রয়োগের ঘটনাগুলোর বিশদ বিন্যাস আছে, মংগলার কথা আছে, রাজমহিষীর সংগে বামীর ষড়যন্ত্রের বিস্তার আছে। পরিত্রাণ ছাড়া আর কোথাও এমন বিস্তৃতি নেই। সুরমার মৃত্যু ঘটেছে অন্তরালে।

পরিত্রাণে সীতারাম-বসন্ত রায় যোগসাজসে উদয়াদিত্যের কারামুক্তির ব্যবস্থা সত্ত্বেও উদয়াদিত্য পালাতে অস্বীকার করলেন।

"উদয়। না, আমি পালাব না।

"বসন্ত। কেন দাদা।

"উদয়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারব না।...কারাগারের

বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।"

উদয়াদিত্যের চরিত্রে এটি নতুন সংযোজনা। পরিত্রাণেই উদয়াদিত্যের চরিত্র পরিচ্ছন্নতম।

তাঁর কথায় ধনঞ্জয়ের কথার প্রভাব।

"প্রতাপ। কী, তুমি যে মুক্ত দেখি?

"উদয়। কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার পুড়লেই কি কারাগার যায়।

আরও কথা আছে যা বউঠাকুরানীর হাট বা প্রায়শ্চিত্তের উদয়াদিত্যে কল্পনাও করা যায়নি। এখানে উদয়ের একমাত্র প্রার্থনাঃ "আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী যাব।" আর একটি প্রার্থনা বিভাকে তার "শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার অনুমতি চাই।"

পরিত্রাণেও মা-কালীর চরণস্পর্শ করে উদয়াদিত্য সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করলেন।

উদয়াদিত্যের দাদামশাই সম্পর্কে উদ্বেগ ছিল।

"বিভা। দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

"উদয়। তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনই দেখা হবে।

"প্রতাপ। না, দেখা হবে না। কোনোদিন না।

"উদয়। কেন, তাঁর কী হল?

"প্রতাপ। তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

"উদয়। না হতে পারে, কিন্তু এই চলে গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের—সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদা-মহাশয় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।"

এখানে দাদামশাই হত্যার নগ্ন দৃশ্য বা হত্যার সংবাদ নেই। এবং এর বেশী আভাসও নেই।

বউঠাকুরানী থেকে পরিত্রাণ অবধি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রুচির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিক থেকে পরিত্রাণ পরিচ্ছন্নতম। কিন্তু বউঠাকুরানীর হাটের সারল্য এতে নেই।

বাংলার লোক-নৃত্য

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

চৈত্রসংক্রান্তির সময় বাংলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠে—এই সময় বাঙালীর জাতীয় নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বলিয়া অনুভব করা যায়। এই সময়ই পুরুলিয়ার ছো-নাচ, বীরভূম বাঁকুড়ার ভক্ত্যানাচ, হুগলি-চব্বিশ পরগণার গাজন নাচ, মালদহের গম্ভীরা নাচ, দক্ষিণ বাংলার নীলের নাচ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোলান ও আলকাপ, ঢাকার কালীকাচ, পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানের ঢাকপাট ইত্যাদি বহুবিধ লোক-নৃত্যেরই অনুষ্ঠান হয়। ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উপরে যে সকল নৃত্যগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে নারীর কোন স্থান নাই। ইহাতে পুরুষই নারীর বেশ ধারণ করিয়া থাকে; ইহার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সর্বত্রই একক নৃত্য নহে, ইহাতে সমবেত নৃত্য বা সারী নৃত্যও আছে, শিবগৌরীর যুগ্মনৃত্যও দেখা যায়। এই নৃত্যে যে নারীর অংশ আছে, তাহা সত্য, কিন্তু ব্রতনৃত্য কিংবা কোন কোন কৃষি নৃত্যের মত ইহাতে নারী স্বয়ং অংশ গ্রহণ করে না।

চৈত্র সংক্রান্তি অনুষ্ঠানটি একটি সূর্যোৎসব, ইহাই বাংলার অন্যতম জাতীয় (national) উৎসব; এমন কি, দুর্গোৎসব অপেক্ষা সাধারণ জীবনের মধ্যে ইহার প্রভাব বেশি। দুর্গোৎসব সমাজের উচ্চস্তরকে প্রভাবিত করিলেও গাজনোৎসব বাঙালীর সাধারণ জীবনের স্তর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বাঙালীর সাধারণ জীবনের স্তরেও যে একটি সংস্কৃতিগত অখণ্ডতা গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল, বাঙালীর গাজনোৎসবই তাহার প্রমাণ। কিন্তু গাজনোৎসবের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও ইহার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইত, সেইজন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গাজন উৎসবের মূল লক্ষ্য কৃষিকার্য-মূলক, সেই অর্থে ইহাকে বাংলার প্রধানতম কৃষি উৎসব বলিয়া উল্লেখ করা যায়। দুর্গোৎসবের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ, বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া মিশিয়া গেলেও তাহাও মূলতঃ কৃষি উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষি উৎসবই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হইবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। গাজনোৎসব দুর্গোৎসবের মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া বিধিবদ্ধ (Codified) হয় নাই বলিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষিকার্যও বাংলার সর্বত্র একই অভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় না, প্রত্যেক অঞ্চলেরই বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব, সেই অঞ্চলে গাজনোৎসবের আচারগুলি যত জটিল, যে অঞ্চলে বৃষ্টির প্রাচুর্য সে অঞ্চলে স্বভাবতঃই তাহা তত জটিল নহে, সেই অনুযায়ীই ইহার অন্তর্ভুক্ত নৃত্যানুষ্ঠানটিও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, যে অঞ্চলে গাজনোৎসবের আচারটি নিতান্ত জটিল, সেই অঞ্চলে নৃত্যানুষ্ঠানটিও জটিল পরিচয় লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ যেমন ব্যাপক তেমনই জটিল, ইহার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার একমাত্র কারণ বাংলাদেশের মধ্যে পুরুলিয়াতেই কৃষিকার্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। সেইজন্য কৃষিকার্য সম্পর্কিত যে কোন অনুষ্ঠানই সেখানে অত্যন্ত জটিল পরিচয় লাভ

করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় গাজনোৎসবের মধ্যে যেমন কোন দুঃসাধ্য জটিল আচার নাই, তেমনই সেই অঞ্চলের নৃত্যানুষ্ঠানও কোন জটিল পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র ঢাকার কালীকাচের মধ্যে তাহার কতকটা জটিলতা দেখা যায়; কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে, সে কথা পরে বলিব।

গাজনোৎসবের মূল উদ্দেশ্য সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহের অনুষ্ঠান। আদিম সমাজ এ কথা বিশ্বাস করিত যে, সূর্যের সঙ্গে যদি ধরিত্রীর মিলন হয়, তবে ধরিত্রী শস্যপূর্ণা হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য যখন দ্বাদশ রাশির পথে সূর্যের একবার পরিভ্রমণ শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির সময় সূর্যের ধরিত্রীর সঙ্গে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া বিবাহের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কারণ, আদিম সমাজ বিশ্বাস করিয়াছে, সূর্যই ধরিত্রীর শস্যসম্পদের নিয়ামক, কেননা, সূর্য-তেজ দ্বারা রৌদ্র বৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, বন্ধ্যা ধরিত্রী কেবলমাত্র সূর্য-তেজ দ্বারাই শস্যসম্পদে ফলবতী হইয়া উঠে। সেইজন্য পৃথিবীর সকল কৃষিজীবী আদিম সমাজেই সূর্য এবং ধরিত্রীকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের অলৌকিকতা বোধ কিংবা অধ্যাত্মবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

যখন বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রভাব হইল, তখন এ দেশের সমাজে শিবই সাধারণ সমাজের প্রধান দেবতা (Supreme God) বলিয়া গণ্য হইলেন, কিন্তু তাহার পূর্বে সূর্যই যে প্রধান দেবতা ছিলেন, চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যোৎসবের ব্যাপকতা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। সমাজের উপর শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পর হইতেই বাংলার লৌকিক সূর্যোৎসব দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়; প্রথমতঃ ধর্মের গাজন, দ্বিতীয়তঃ শিবের গাজন। ধর্মের গাজনের মধ্যে লৌকিক সূর্য-পূজার আদি-রূপটি এখনও কতকটা প্রকাশ পাইলেও, শিবের গাজনের মধ্যে তাহা অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শৈব ধর্মের প্রভাব বশতঃ শিবই যখন সাধারণ সমাজে প্রধান দেবতা (Supreme God) বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন হইতে সূর্যোৎসবের নায়ক নায়িকা হইলেন শিব এবং গৌরী—ইঁহারাই যথাক্রমে সূর্য এবং ধরিত্রীর প্রতীক। লৌকিক নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিবগৌরীর নৃত্যই গাজনোৎসবের মূল বিষয় ছিল, এখনও কোন কোন অঞ্চলে তাহাই আছে, কিন্তু তথাপি নানাদিক হইতে তাহা প্রভাবিত হইয়া ইহার মৌলিক পরিচয়ও অনেকাংশে গোপন করিয়া দিয়াছে।

যে সময় বাংলা দেশে গাজনোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ই পশ্চিম বাংলার সীমান্তলগ্ন অঞ্চলে অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল এবং দ্রাবিড় ভাষী ওরাওঁ জাতির মধ্যেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা সহরুল বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপর হিন্দু পুরাণের কোন প্রভাব নাই বলিয়া ইহাদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানটির মৌলিক পরিচয়টি স্পষ্টতরভাবে এখনও অনুভব করা যায়। সেখানে শিব নাই, কিন্তু শিবের পরিবর্তে পাহান অর্থাৎ গ্রাম বা গোষ্ঠীর মোড়ল শিবের স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গেই ধরিত্রীর বিবাহের একটি প্রতীক অনুষ্ঠান হয়। বাংলার গাজনোৎসবে শিবের রূপসজ্জায় সূর্য এবং গৌরীর রূপসজ্জায় ধরিত্রী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহাদের উভয়ের নৃত্যানুষ্ঠানই এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। শিবের সঙ্গে তাহার অনুচররূপে ভূতপ্রেতগণ এবং গৌরীর সঙ্গে তাহার অনুচর ডাকিনী-যোগিনীগণ কখনও কখনও সমবেতভাবে কখনও বা এককভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। কখনও হর-পার্বতীর যুগ্ম নৃত্যও হয়, কখনও তাহাদের একক নৃত্যও হয়। নৃত্যের তালে তালে উচ্চরবে ঢাক বাজিতে থাকে। ঢাক বাদ্য ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব। চৈত্র সংক্রান্তির ঢাক বাংলা দেশের

একটি প্রচলিত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কালক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার অন্তর্ভুক্ত নৃত্যের প্রকৃতি বাহিরের দিক হইতে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। এই উপলক্ষে ঢাকা অঞ্চলে যে নৃত্য দেখা যায়, তাহা কালীকাচ বলিয়া পরিচিত। যদিও শিব-গৌরীর যুগ্ম নৃত্যও এই অঞ্চলের কোন কোন অংশে দেখা যায়, তথাপি এই অঞ্চলের চৈত্রসংক্রান্তির নাচের মধ্যে কালীকাচই নানাদিক হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অথচ চৈত্রসংক্রান্তির সময় কালী কিংবা কালিকাদেবীর আবির্ভাবের কোন কারণ নাই। কাচ শব্দের অর্থ অভিনয়ার্থ নটনটীর সজ্জাগ্রহণ; ইহাতে কালীর সজ্জা গ্রহণ করিয়া নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহা কালীকাচ বলিয়া পরিচিত। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে কাচ নৃত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কালীকাচ শব্দটিও তাহার মতই প্রাচীন। কালীকাচে কালীই প্রধানা নায়িকা। যথারীতি সজ্জা গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে শিবও আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু শিব নৃত্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না, বরং তাহার পরিবর্তে অসুর কালীর সঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। ইহা একটি যুদ্ধ নৃত্যের রূপ লাভ করে। যুদ্ধ সমাজের একটি অতি আদিম সংস্কার, বাহির হইতে যতই আমরা ইহার অবশ্যম্ভাবিতা কিংবা ভয়াবহতা ভুলিয়া থাকিবার প্রয়াস পাই না কেন, নানাভাবে ইহার ভাব আমাদের অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই জন্য লোক-নৃত্যের মধ্য দিয়া যুদ্ধের ভাবটি নানা ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। পূর্বেই বলিয়াছি, চৈত্রসংক্রান্তির সময় হইতে পুরুলিয়ায় যে ছো-নাচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাও যুদ্ধ নৃত্য, কালীকাচও তাহাই। কালীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধই কালীকাচের বিষয়; পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এ-দেশের সমাজে প্রচার লাভ করিবার পূর্বে হয়ত ইহাতে অন্য কোন লৌকিক বিষয়ই ছিল। কালীর সঙ্গে শিবের যুদ্ধ করিবার কোন অবকাশ নাই, সেই জন্য শিবকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখিয়া তাহার সম্মুখেই অসুরের সঙ্গে কালীর যুদ্ধ নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু শিব ইহাতে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেও তাহা দ্বারাও যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না, তাহা নহে—কারণ ইহাতে কোন কোন সময় দেখা যায়, শিব ধূলিতে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহার বুকের উপর একটি পাকা কলা আনিয়া স্থাপন করা হয়, তারপর কালী হাতে তরবারি লইয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া এক কোপে শিবের বক্ষোপরিস্থিত কলাটি কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন, শিবের বুকে একটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগিতে দেখা যায় না। কালীকাচের মধ্যে এই প্রকার কৌশল দেখানই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। ইহার মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলায় কিছুদিন পূর্বে পর্যন্তও চৈত্রসংক্রান্তির শিবের গাজন উপলক্ষে এক বীভৎস নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহা 'মড়া খেলা' বলিয়া পরিচিত, ইহা প্রকৃত মৃতদেহ লইয়া ভক্ত্যা বা গাজনে সন্ন্যাসীদিগের নাচ। সেই নৃত্যানুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনে গাজনে সন্ন্যাসিগণ শ্মশান হইতে সৎকারের জন্য আনীত শব কাড়িয়া লইয়া আসিয়া তাহা কাঁধে লইয়া ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিত। কান্দি প্রভৃতি স্থান হইতে মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করিবার উদ্দেশ্যে শব-যাত্রিগণ যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকিত, তখন পথিমধ্যে গাজনে সন্ন্যাসিগণ অতর্কিতে সেই শবযাত্রিদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের হাত হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া লইয়া যাইত। তারপর সেই মৃতদেহ লইয়া তাহারা নৃত্য করিত। এই নৃত্য কেবলমাত্র যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কিংবা মত্ততার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহা ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইহার মধ্যেও একটি রীতি নিয়ম অনুসরণ করা হইত। তবে সন্ন্যাসিগণ অনেক সময় মদ্যাদি পান করিয়া এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত বলিয়া সর্বদা সমবেত নৃত্যের রূপ ইহা লাভ করিতে পারিত না; তবে

ইহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল। বর্তমানে শবদেহ সর্বদা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া সন্ন্যাসিগণ অনেক ক্ষেত্রেই মৃতদেহের একটি নকল রূপ (dummy) তৈরী করিয়া এই কার্যে ব্যবহার করে, সুতরাং ইহার মূল অবলম্বনটি লুপ্ত হইয়া গেলেও আচারটি রক্ষা পাইবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। গাজনোৎসব কালক্রমে দেশীয় নানা ধর্মাচারের সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছিল, বাংলার যে অঞ্চলে যে লৌকিক ধর্মের প্রভাব ছিল সেই লৌকিক ধর্মের আচার দ্বারাই তাহা সেই অঞ্চলে প্রভাবিত হইয়াছে। সেইজন্য মূলতঃ উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলার গাজনোৎসব এবং ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্য বহিরঙ্গে নানা বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে।

এই সম্পর্কে মালদহের গম্ভীরা নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। গম্ভীরা মালদহের এক জাতীয় উৎসব, গীত এবং নৃত্য এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ ইহারও বহিরঙ্গে শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর নাম প্রচেষ্টা লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা মালদহের কৃষকেরই উৎসব, কৃষি কর্মের বাৎসরিক সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনাই এখনও ইহার মূল বিষয়। লৌকিক উৎসব মাত্রই নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ, সেই সূত্রে ইহাতেও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। গম্ভীরা নৃত্যে দেবদেবীর মুখোস ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ববর্তী একটি বিবরণী এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—'কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া বুড়ী শিব ইত্যাদি বিজ্ঞাপক মুখোস ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূত প্রেত কার্তিক খোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোস কাষ্ঠনির্মিত বা মৃত্তিকানির্মিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে কাষ্ঠনির্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত। সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতির মুখা গাড়িয়াও তাহাতে বর্ণ ফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকারেরা উক্ত মুখোসের শিরোভূষণ নির্মাণ করিয়া দেয়। নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গম্ভীরাগৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্মিত মুখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে, তাহারা বিজয়া দশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রকার পূজা-প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এ-দেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্বে যাহারা দেবদেবী, বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্ট হয় না। মুখার ঊর্ধ্বদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে রজ্জু বদ্ধ থাকে। সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ি বাঁধা হয়। ঘোড়া-নাচের ঘোড়া বংশনির্মিত এবং কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে জিন দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুক নাচও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভালুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শন বা পাটের চুল দিয়া সর্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভালুকের মুখো পরিধান করিয়া

থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। দুর্গা প্রতিমার মত তাঁহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। এক ব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্ত দ্বারা পশ্চাৎ হইতে ধরাইয়া নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডামুখা নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগর পার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। শিব-পার্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং এক হস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুড়া বুড়ী (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুকপ্রদ।' (হরিদাস পালিত- 'আদ্যের গম্ভীরা', মালদহ, ১৩১৯ পৃঃ ৪৭-৪৯)

পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যে শিব-প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিলেও রামায়ণ এবং মহাভারতের কোন কোন বিষয়ও তাহাতে স্থান লাভ করে, মালদহের গম্ভীরায় শিব-প্রসঙ্গই একমাত্র প্রসঙ্গ। এমন কি, ইহাতে যে নৃসিংহাবতারের নৃত্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়, তাহা মূলতঃ বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারের নৃত্য ছিল না, শিবের পত্নী চণ্ডীর আর এক নাম নারসিংহী, সংস্কৃতে তাঁহার একটি ধ্যানমন্ত্রও রচিত হইয়াছিল, এই নারসিংহীই ক্রমে বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ নৃসিংহাবতারে পরিণত হইয়াছিল, নতুবা চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যের মধ্যে কোথাও কোন বৈষ্ণব প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিতে পারে নাই—শিব-প্রসঙ্গ সর্বত্রই ইহার মুখ্য বিষয়। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, ছো-নাচের মুখোসের তুলনায় গম্ভীরা নাচের মুখোস অনেক নিকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, ইহার মুখোসগুলি নির্মাণের রীতিও স্বতন্ত্র। ইহাদের গঠন কৌশল দেখিলে মনে হয়, এই অঞ্চলে পুরুলিয়ার মত এমন ব্যাপক মুখোসের ব্যবহার কোনদিনই ছিল না; কালক্রমে বাহির হইতে এই রীতি আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া একটি ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা সমাজের গভীরতম প্রদেশে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার নৃত্যরূপ অত্যন্ত প্রাচীন, মুখোস ব্যতীতও যে কোন কোন সময় এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহারই ধারাটি মুখোস নৃত্যের পূর্ববর্তীকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোস নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই একক নৃত্য, কখন হরগৌরীর যুগ্ম নৃত্য, কিন্তু সমবেত নৃত্য নহে। নৃসিংহ নৃত্যে নৃসিংহের মুখোস ও বেশ পরিধান করিয়া একক নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঢাক বাদ্য এই নৃত্যের প্রধান অবলম্বন। দর্শকদিগের বিশ্বাস, নৃত্যকালীন নৃত্যকারীর উপর বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব হয়; সেই জন্য করজোড়ে ভক্তি বিহ্বলচিত্তে গ্রাম্যদর্শকগণ এই নৃত্য দেখিয়া থাকেন। ইহাতে মুখোসধারিণী কালীর নৃত্য হয়, কিন্তু ঢাকার কালীকাচের মত ইহাতে কালীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ হয় না, কালীর একক নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে মাত্র, সুতরাং ইহা আর যাহাই হউক, যুদ্ধ নৃত্য নহে। ঢাকার কালীকাচে যুদ্ধের অভিনয় হয় বলিয়া উহা যেমন জীবন্ত বলিয়া অনুভব হয়, ইহা তেমন হয় না। অল্পক্ষণ পরই ইহা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাতেও নৃত্যকারীর মধ্যে স্বয়ং কালীর আবির্ভাব হইয়া থাকে বিশ্বাস করা হয় বলিয়া ইহার বৈচিত্র্যহীনতা সাধারণ দর্শকদিগের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে না; ধর্মের ভাবই শিল্পের অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু ছো-নাচই হউক কিংবা কালীকাচই হউক, ইহাদের মধ্য হইতে ধর্মের ভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাদের শিল্পগুণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে। যেখানে ধর্মের বেড়াজাল, সেখানে বুদ্ধির মুক্তির অবকাশ নাই। সেইজন্যই তাহা অচিরেই

জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় মুখোস নৃত্যেরও তাহাই হইয়াছে।

শিব বা ধর্মের গাজন উপলক্ষে ভক্ত্যানাচ পশ্চিম বাংলার একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। ভক্ত্যা-নাচ ঢাকের তালে ভক্ত্যা, বালা বা সন্ন্যাসীদিগের সমবেত নৃত্য। নিয়ম পালন করিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সুতরাং যে-কেহ এই নৃত্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই নৃত্যে ভক্ত্যা-গণ বিশেষ কোন দেবদেবীর বেশ ধারণ করে না, কেবলমাত্র তাহাদের ভক্ত্যাবেশ অর্থাৎ গলায় উপবীত ধারণ ও হাতে একখন্ড বেত লইয়া সমবেতভাবে এই নৃত্য করিয়া থাকে। একটি প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়,—'বেত হাতে নাচে গায় উভয় হাত তুলি।' শিব কিংবা ধর্মঠাকুরের বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণই এই নৃত্যের স্থান। কোন নারী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, এমন কি, নারী যদি নিয়ম পালন করিয়া সন্ন্যাসিনীও হয়, তথাপি তাহার পক্ষে পুরুষের সঙ্গে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তবে একান্ত ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই নৃত্যও যথার্থ রঙ্গ-স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, নৃত্যকারী ভক্ত্যাগণ এখানে উপবাস করিয়া কিংবা হবিষ্যান্ন করিয়া তৈল বিনা স্নান করিয়া এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে; দেবতার মানসিক পূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং নৃত্যের যে শিল্পগুণ আছে, তাহা ইহার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই এবং আচার নৃত্যের (ritual dance) যাহা বিশেষত্ব, অর্থাৎ বিশেষ আচার লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নৃত্যানুষ্ঠানেরও যে অবলুপ্তি হয়, তাহাই ইহার পক্ষেও অপরিহার্য হইয়াছে। আচার নিরপেক্ষ স্বাধীন কোন ক্ষেত্র লাভ করিতে না পারিলে কোন শিল্পবস্তুই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, এইভাবে যাহা আচারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে নাই, আচার বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। গাজনের ভক্ত্যা নাচও আজ স্বাধীন নৃত্যরূপে বিকাশ লাভ করিতে না পারিবার জন্যই অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে।

জলতরঙ্গ

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে বৃষ্টিটা থামল। গন্তব্যস্থল ছিল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মণ্ডপ। সেখানে নাটকাভিনয়ে এক ভূমিকা গ্রহণের কথা তার। বাড়ী থেকে ধোপদুরস্ত কাপড় জামা পরেই বেরিয়ে ছিল অনুরাধা।

কিন্তু যত গোল বাঁধালে বৃষ্টি!—কাব্য নয়, যত অনাসৃষ্টি বহন করে নিয়ে এলো বৃষ্টিটা। এখন না বাড়ী, না অনুষ্ঠানে—মাঝপথে এক হাঁটু জলে হয় বাসের মধ্যে বসে থাকা, নয়ত হাঁটু অবধি কাপড় তুলে এক হাতে জুতো জোড়াটা নিয়ে জল ভেংগে রাস্তা হাঁটা।

বিরক্তি! ভারী বিরক্তি কিন্তু, কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল সে!

মেঘলা দিন। ভিজে ভিজে আকাশে দূরাগত বেদনায় ইঙ্গিতময় প্রতিচ্ছবি—নির্জনে একা একা ভাবা, কল্পনায় কাছে পাওয়ার চেষ্টা, তারপর এক রসের স্রোতে ভেসে যাওয়া—কিন্তু কোথায় বা তার সে অবসর, আর একান্ত ভাবনার দোসর ; যাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে ভাববে!

ব্যস্ত! সারাদিন ধরে অর্থ রোজগারের জন্য দাসত্ব। তারপরও জের যায় না। অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের চেষ্টা। আর সেই চেষ্টার জের টানা। তার জীবনটা শুধু অর্থ রোজগার আর তার জের টানার মধ্যেই আবর্তিত।

একা। বড্ড একা সে। বাসটার লোকগুলো কি অধৈর্য! বড্ড চিৎকার করছে—যায়েগা নেহি কেঁউ! কেঁউ! লোকটির উচ্চারণটা কানে আসতেই হাসি পায় অনুরাধার—মুখটা ফিরিয়ে মুচকি হাসে সে।

লোকটির স্বরটা পাড়ার সেই নেড়ী কুকুরটার মত। বেচারী খেতে পায় না! মরে যাবে দুদিন বাদে। তাদের গলির মধ্যে সব সময় কুঁকড়ে পড়ে থাকে। আস্তাকুঁড়ের খাবারে ওর যেন মন টানে না। চেষ্টা নেই খেটে হেঁটে খাবার খোঁজার। কাছে দিলে তবে মুখে তোলে—অদ্ভুত কিন্তু নেড়ীটা!

কি ঝামেলা বলুন তো, সব পণ্ড! ভাবলাম বাসে উঠবো আর নামবো—না, শালা একেবারে বসিয়ে দিলে।

বসাবে মশায় আরো বসাবে। একেবারে পথে বসাবে। সারা দেশটাকেই পথে বসাবে।

বাঙালীদের আর করে খেতে হবে না। অজাত বেজাতে এ বাঙালীদের শেষ করে দেবে।

আধা প্রৌঢ় হ্যাংলা লোকটার দিকে অনুরাধার চোখ যায়।

রাস্তায় জল জমছে এতে দেশকে টানছেন কেন মশায়?

কলিকাতা করপোরেশন নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কু-কর্মের জন্যেই। আজকের কর্ম পণ্ডের জন্য দায়ী করপোরেশন মশায়!—দেশ! জাতি, জাতীয়—যত সব!—খিঁচিয়ে বলে উঠলো সেই আধা প্রৌঢ় লোকটি।

"কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাংগা কুঞ্জবনে"—গুনগুন করে পেছনে কে যেন সুর ভাজছে। ঘাড়টা ঘুরতে চায় অনুরাধার। মন্দ হচ্ছে না।

ও দাদা একটু জোরেই হোক না।

কি যে বলেন!

বিনয়! হাসি পিল অকারণ অনুরাধার। আচ্ছা বিনয় করার মধ্যে বেশ একটা আবেশ আছে না?--চকিতে মনে পড়ে অনুরাধার সেদিনটাকে—

বা খাসা গলা তো আপনার! বেশ মাইক-ফিটিং, গান করেন না কেন আপনি—করবেন আমাদের জলসায়?

কি যেন বলেন!--লজ্জায় আনন্দে কেমন যেন মুখটা নিচু হয়ে গিয়েছিল।

দিদিটা ওমনি। জানো রাসুদা, দিদি কি ফাস্ট কেলাস এ্যাক্ট করে—একটা হিরোইন যেন, সেদিন—

এই বিল্টু......

ওকে বলতে দিন না। কি বলছিলে বিল্টু বলো।

বিল্টুটা বড্ড দুষ্টুমি করে কিন্তু। ছোট হবে তার থেকে কত; দু বছরও নয়। অথচ আজও ও তেমনি ছেলেমানুষ।

বরং কেষ্টটা কত রাসভারী। যেন ঐ প্রৌঢ় মানুষটির মত! প্যাকা প্যাকা ব্যাঁকা টেরা কথাগুলো ওর, সময় সময় বড্ড গায়ে লাগে।

মেয়েদের আর কি, দেহগুণে অনেক সহজ হয়েই ওরা আজকাল রোজগার করতে পারে।

মেয়েদের দেহ একটা সম্পদ!—বড় স্থূল। গায়ে বেঁধে।

আর আমরা, কেরানীর কাজ একটা যাও বা যোগাড় হলো, তাও বজায় রাখতে শতেক জ্বালা! হতম যদি মেয়ে, সবাই খাতির করে চলতো। বিনয় করে বড়বাবুও বলতেন· আজ হলো না বুঝি, আচ্ছা কাল first hour-এ করে দেবেন কেমন। আর আমাদের ক্ষেত্রে—

বড্ড বাজে বকিস কিন্তু তুই! ফাঁকিবাজরা কেবল কথা বলে। মা-র মৃদু ধমক।

তুমিতো মেয়েমানুষ, পুরুষের কি যে জ্বালা! তুমি কি বুঝবে মা, যদি বাবা বেঁচে থাকতেন তাহলে—

বাবা যদি বেঁচে থাকতেন। তাহলে সে কি এই ধিঙ্গি বয়স নিয়ে রুজি রোজগারে জীবনটাকে আবর্তিত করতো। হয়ত এতো দিনে—

আচ্ছা বিয়ে ছাড়া কি জীবনের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না!

মা বলে, মেয়েদের স্বামীই সব। স্বামী যার আছে তার সব আছে। যার নেই, তার স্বামী-বিহীন জীবন—মার চোখের জলের অর্থ অনেক। স্বাদ অনাস্বাদের মাপকাঠির অভাবে মার মন্তব্য স্তব্ধ।--কি বলবো তোদের। তোরা বড় হয়েছিস। রুজি রোজগার করছিস। সংসার এখন·তোদের। যেমন চালাবি তেমনি চলবো। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছার কি কোন মানে হয়।

মা তুমি রাগ করছো।

না রে।

তবে অভিমান।

না রে।

তবে?

তবে—মার বড় বড় চোখ দুটো মেঘলা আকাশের মত ভিজে স্তব্ধতায় স্থির হয়ে যেত।

কথাশূন্য অবস্থায় থাকলে মা সহজ হয়। তাই কাছাকাছি হয়েও দূরেই সে—অনুরাধা একটা জোরে নিঃশ্বাস ফেললো।

এই বৃষ্টি. কিন্তু গুমোট কাটে না। এই দেখেছো...ছিঃ ছিঃ আজকাল মেয়েদের লজ্জাসরম বলতে কিছু নেই! ঐ ভাবেই কি কাপড় তুলে—

দেখছেন কেন মশায়! দেখবেন আবার বিরূপ মন্তব্যও—

উনি দুড়ুও খাবেন তামুকও খাবেন কি না তাই·

ভদ্রলোক চুপ করেছেন। মুখও ঘুরিয়েছেন। অনুরাধা দেখলো.

রাস্তার জলস্রোতে দুটি তরুণ তরুণী স্রোতের বিরুদ্ধে নিজেদের সামলাতে গিয়ে কেমন যেন অগোছালো উচ্ছ্বাসে মেতে চলেছে। -বাঃ বেশত! খারাপটা কি! নাঃ, বুড়োদের নজর একটু স্থূল। ঠোঁটের কোনে হাসি ভাসে অনুরাধার। মনে পড়ে বিদ্যুৎলতাকে। বালাবান্ধবী। বৃষ্টি নামলে ও বৃষ্টি মাথায় করে ছুটতো। খেয়াল করতো না কোন বারণ। সংগী সে। আম-জামের সময় হলে তো কথাই নেই।

চ চ আর দেরী নয়।

বকবে যে!

বকুক গে। বকতে ভালবাসে কিনা ওরা শুধুই. আর আমরা বকুনি খেতে ভালবাসি চ. চ. দেরী করলে ছেলেগুলো সব কুড়িয়ে নেবে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতো বিদ্যুৎলতা বৃষ্টি ঝরা পথে।

সবুজ প্রান্তর। ছোট ছোট মেটে ঘর। খড়ের স্তূপ। ভিজে বাঁশপাতার গন্ধ। সন্ধ্যের ঝিঁ ঝিঁ শব্দ। প্রথম বর্ষার পিচ্ছিলে কি কাদাই না মাখতো বিদ্যুৎলতা আর সে!—

চকিতে মনে পড়ল মার ভর্ৎসনাঃ বিয়ে হলে মুখপুড়ি শ্বশুর ঘরে কি এমনি দাসিপনা করবি!

হাসত বিদ্যুৎলতা।—বিয়ে বিয়ে খেলবি!··চুপি চুপি কৌতুকে নাচতো ওর ভ্রূভঙ্গি।

জ্যা! বিয়ে বিয়ে খেলা আমার ভাল লাগে না।

আমারও। আমার কি ভাল লাগে জানিস!

কি রে?

বনে বনে ঘুরবো। আর ক্ষিদে পেলে করমচা· বঁইচ. ডাসফল. প্যায়রা, আমজাম আর গেঁড়ো লেবু খেয়ে নেবো। তারপর রাতের বেলায়......

থামলি কেনরে? রাতের বেলায় কোথায় থাকবি. বাঁশবাগানে?

তাতো বলবি, আমি যেন শাকচুন্নি! তোর মত আমার ভয় নেই। সোজা চলে যাবো উত্তর মাঠের ফকিরবাবার দাওয়ায়। ওখানে ফকিরবাবার গান শুনতে শুনতে আর চাঁদ তারা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়বো।

ফকিরবাবা তোকে কিন্তু বড্ড ভালবাসে।

হুঁ। সেইজন্যেই তো ওর দাওয়ায় শুয়ে থাকতে মন চায়। স্যাকরাপিসি বলে যাসনে, ও তোকে মন্তর দিয়ে ভেড়া করে দেবে।

সত্যি দেয় না কি!

ধ্যেৎ ও পিসির মিথ্যে কথা। ভয় ধরাতে চায়। পিসি কি ভাবে জানিস?

কি ভাবে?

ভাবে আমি যেন ছোট্ট খুকিটি-ই আছি! খিলখিলে হাসির সঙ্গে বিদ্যুৎলতার পায়ের মলের আওয়াজ উঠতো। —মনে পড়ে অনুরাধার। কিন্তু এ কি বিশ্রী অবস্থা হলো, আবার বৃষ্টি নামলো যে! কলকাতাটা কি ভেসে যাবে? যদি যায়, যাক না। কিন্তু না একা একা থাকলে বড্ড বাজে ভাবনা আসে। আচ্ছা অনুষ্ঠানের কি হলো? —নিশ্চয় বন্ধ, হয়ত অনেকে পৌঁছাতে পারেনি। কিম্বা পেল্ট্ করে সাজঘরে জলাতঙ্কের বিরক্তি ভোগ করছে সবাই।

কামনা আর প্রেম। একটি পুরুষ কামনা করলেন নারীর মনে সার্থক হয়ে উঠবেন। বিয়ে হলো। কিন্তু নারীটি কামনা করলেন অন্য একজন নবাগত পুরুষকে। একথা জানলেন স্বামীটি। তারপর স্বামীটির মানসিক দ্বন্দ্ব। শেষে চাইলেন তাঁর প্রেমিকার প্রেমের সার্থকতা। তাই স্বামীত্ব ত্যাগেই প্রেমিকার নব প্রেমের সিদ্ধি। মাঝে আর অন্য এক নারী চরিত্রের অবতারণা। দ্বিতীয় নায়কের প্রথম প্রেমিকার ভূমিকাই তার। ব্যর্থতার কান্না-অভিনয় নাকি সে মর্মস্পর্শী করে—হাসি পেলো অনুরাধার। কি বিচিত্র! জীবনটায় প্রেমের কোন জোয়ারভাঁটা নেই অথচ— শুধু টাকা, আর, আর সুনাম।

নাম করবে সবাই ; বলবে অনুরাধা দেবীর অভিনয় অপূর্ব। গানও খাসা।

না তুমি ফিল্মে নামলে একটা মার্ক রাখবে—বিল্টুর রাসুদাই বলে। রাসুদাই শখের থিয়েটারে তাকে চান্স দিয়েছিল। তারপর নাকতলা থেকে টালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ থেকে কালীঘাট, সেখান থেকে অফিসপাড়ায়, এখন সর্বত্রই সে অভিনয় করে গান গেয়ে বেড়ায়, ফিল্মে নামা হয়নি। গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়েও হয়নি। তবু অভিনয়ের বাজারে তার সুনাম আছে। টাকার দক্ষিণা পঁচিশ থেকে তিরিশে উঠেছে। সপ্তাহে একটা না একটা কল তার বাঁধা আছেই। আর এক মাঝামাঝি সওদাগরী দপ্তরে টাইপের চাকরীও আছে। খরচা কিন্তু তবু মেটে না। ধার পড়ে। বাড়ীভাড়ার মোটা অংশ তাকে বহন করতে হয়। দাদার এক ছেলের পড়ার খরচ, বিল্টুর হাত খরচ আর সংসারের নিত্য খরচেও তার অংশ বেশী। —তুই না দিলে কে দেবে বল খুকি! সংসারটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো।—মার এই সাংসারিক কাতরতার কাছে তার সব বিরক্তি যেন স্তব্ধ।

এ পোড়া স্তব্ধ মনের একটা আশ্রয়ও যদি থাকতো? —কাঁপলো অনুরাধা বাসের জানলায় মাথাটা রেখে।

বৃষ্টির ছাট্ আসছে যে! জানলাটা কি বন্ধ করে দেবো।

অনুরাধা চোখ ফেরালো। পরিষ্কার এক তরুণ পুরুষ মুখ। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। রংটা ঈষৎ শ্যামলা। চোখ টানে। কিন্তু পরিবেশ? চেতনা ওকে সংযত ভদ্রতার হাসি জোগালো —থাক না বেশ তো লাগছে।

তাই থাক। আমি ভাবলাম আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে।

না ঠিক আছে।—আর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে অনুরাধার চোখ। তারপর ও মুখ ফেরালো আবার রাস্তার দিকে। ঘোলা জলে থৈ থৈ করছে রাজপথ। কালো, পিচের চিহ্ন নেই। সিমেন্টের পেভমেন্ট নজরে মেলে না। শুধু জল আর জল। মোটর, ট্রাম, বাস—সব স্তব্ধ।

বৃষ্টিটা আরো হবে নাকি মশায়?

কি করে বলবো বলুন, তবে উপস্থিত তো আবার জমিয়ে আসছেন।

কি করে ফিরবো ?

কেন ভেসে ভেসে !

ভেসে ভেসে কি যাওয়া যায়।

যায় বইকি ভাসতে জানা চাই।

ও সব হেঁয়ালীর কথা। যাক বিড়িই খাওয়া যাক্।

তাই খান্।

প্রৌঢ় লোকটি এবার পকেটে হাত ঢোকালেন, তারপর বিড়ি দেশলাই-এ মনোযোগ দিলেন।

কিন্তু এমনি ভাবে কতক্ষণ আটকে থাকা যায়।

আটকা থাকতে তো আপনাকে কেউ বলেনি। মুক্ত আপনি, চান কি মুক্তকচ্ছ-ও হতে পারেন, তারপর সোজা নেমে হাঁটা দিন না যেখানে খুশি।

বললেন বেশ। যাবো সেই শ্যামবাজার, এই জল ভেঙে যাওয়া সোজা ব্যাপার কি না— এ এক ভাল বিপদ হল !

বিপদতারিণীকে শরণ করুন এখন, যাতে বাসের মধ্যে জলস্রোত না আসে,

ঠাট্টা নয় মশায়, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি আছেন আর সব দেখছেন। যা পাপ, রসাতলে যাবে না! দেখুন না আগামী মাসের ২২/২৩ নাগাদ কি ঘটে। দৈবকে তাচ্ছিল্য করবেন না মশাই। দৈব সাংঘাতিক !

তাচ্ছিল্য করলাম কোথায়। শরণ করতে বলাটা কি.........।

থাক না মশাই। বেশ তো সুর ভাজছিলেন—

সুর আর কোথায় !

অনুরাধা দেখল মাঝবয়েসী লোকটি কেমন যেন অন্যমনা হয়ে গেল। হয়ত কিছু মনে পড়ে গেছে, হয়ত কোন বেদনা, কে জানে! মানুষের মন তো, কোন কথায় বাজে, কোন কথায় সাজে—কে জানে !

বিদ্যুৎলতাকে কত দিন বাদেই তো তার আজ মনে পড়লো। সেই গ্রাম ছাড়ার পর কত ঘটনায় ঘুরে ফিরে আবার সেই গ্রামের স্মৃতিতে ফিরে বাল্যসখীর স্মরণ—

নদী মধুমতীর ধারে দুপুরে খরা রোদের হলকা মেখে বিদ্যুৎলতার সঙ্গ—কি জাদু দিয়ে ও ভুলিয়ে নিয়ে যেতো। দিন গুলোতে জরে মজে বিদ্যুৎলতাই একমাত্র সত্য হয়ে থাকতো। অন্য সব শূন্য, বিদ্যুৎলতাই সত্য। অদ্ভুত কিন্তু—ভাবতে ভাল লাগে অনুরাধার।

ফকিরবাবা আছো না কি !

কে গো মা কি এলি, আয় মা আয়।

সদাহাস্য মাথা পাকা চুলদাড়িতে ভরা বৃদ্ধ মানুষটি অনুরাধার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

তোমার দোরেই এলুম ফকিরবাবা, বড় রোদের তাত !

বেশ করেছো মা। ছেলের কাছে আসবে বইকি।

কিছু আছে নাকি খাবার দাবার ?

আছে বইকি মা, তোমার জন্যে সব আছে। দাঁড়াও।—কথা শেষে বুড়ো ফকির সাহেব কুঁড়ের মধ্যে যেতেন।

দেখলি তো অনু, বুড়ো আমাকে কিরকম ভালবাসে।

ভালবাসি গো মা ভালবাসি, তোমায় না ভালবেসে কি থাকতে পারি—এস মা এস, নাড়ু খাও আগে, তারপরে এই রইলো প্যায়রা।

নাড়ু কিসের গা।

ক্ষীরের। আজ যে গোয়ালপাড়া গিয়েছিল তোমার ছেলে,—নাও খাও।—ফকিরবাবার সুমিষ্ট স্বরটা আজও কানে বাজলো অনুরাধার। উঃ কত বছর পর—প্রায় পনেরো, না ষোলো হবে। ষোল বছরে কত বিচিত্র পরিবর্তন। ঘটনা ঘটে গেছে অনেক। কিন্তু তার মনের মধ্যে লালনীয় দিনগুলো তো আট থেকে বারো বছরই। ঐ কটা বছরে বিদ্যুৎলতা, ফকির সাহেব, নিতাই স্যাকরা আর আর—ও সেই যে বাঁশি বাজাতো একা একা বটতলায় বসে, সেই ক্যাবলাকান্ত। অদ্ভুত বাজাত ক্যাবলা। কার কাছে শিখেছিল জানতে চাইলে ও বলতো—

কে আর শেখাবে গো আমায়, আমি তো বুনোদের ছেলে। বাপটা মরে গেলে ঐ ফকির-বাবাই বাপের মত বললে, এই কুঁড়োতে থাকবি। যা মন চাইবে করবি। ফকিরবাবার আশ্রয়েই থাকি, ভিক্ষে মাগিনে, দিলে না করিনে। যা জোটে তাই খাই। বাঁশিটা একদিন দিলে ফকির-বাবাই। বলে এটা তোকে দিলুম বাবা আমার, ঠিকমত ফুঁ দিস্। দেখবি ঐ তোর সব।

মধুমতীর তীরে বটতলায় ক্যাবলা আপন মনে বাঁশি বাজাতো। খেয়াঘাটের পারাপারের যাত্রীরা একটু না একটু দাঁড়াতো। শুনতো। মন হলে কিছু দিয়ে যেতো। ও দেখতো না কি দিল না দিল। কত দিন তো সে আর বিদ্যুৎলতা ওর হুঁস্ করিয়েছে। বেলা যে অনেক হলো। খাবে না নাবে না বুঝি।

ফকিরবাবা তো আসেনি। ডাকেনি।

তাই বুঝি বসে আছো ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে।

ও হাসতো, উদাস ম্লান। কিছু বুঝতে পারতো না সে—মনে হতো শুধু ও ক্যাবলাকান্ত। গ্রামের লোক, গঞ্জের লোকও ওকে ক্যাবলাকান্তই বলতো। কিন্তু ওর বাঁশি শুনতো মন দিয়ে। শুধু ফকিরবাবাই ওকে কেবলঠাকুর বলতো।—কেন বলত?

বিদ্যুৎলতা কিন্তু উত্তর করতো না এ জিজ্ঞাসায়। শুধু বলত, ভালবাসে কিনা তাই বলে।

ভালবাসলে বুঝি ঠাকুর বলে?

হ্যাঁ বলে রে, ডাকার কোন স্থির আছে না কি, মা তোকে যখন আদর করে তখন কত নামে ডাকে বলত—অনু, রাধু, রাধে, রাধী- চ বোকা মেয়ে!

বিদ্যুৎলতা তোর যখন বিয়ে হবে তখন কেমন করে এইসব ছেড়ে থাকবি? মন কাঁদবে না তোর?

আজকের মন থাকবে কি তখন! ফকিরবাবা বলছিল, বে হলে কুমারী মন থাকে না! যদি থাকে কান্না পায়। সে দিন শুনলি না ফকিরবাবা গাইছিল,

'বন্ধুর বাড়ী, আমার বাড়ী মধ্যে ক্ষীর নদী।
উইড়্যা যাওয়ার সাধ ছিল, পাংখা দেয় নাই বিধি...।'

আমি বিয়াতে বসবো নারে! হাসত অদ্ভুত হাসি বিদ্যুৎলতা। তারপর বলত,

পরের বাড়ী বরের বাড়ী, ও বাড়ীতে যাস্ না,
মনে মনে মানত করি কেটে যাবে বাস্না।

বাসনা কাটা যে গেল না। পরের বাড়ীই তো রয়ে গেলাম বরের বাড়ী না গিয়েও—কাঁপা কাঁপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে আসে অনুরাধার বুক চিরে।

আজ কোথায় বা তার বিদ্যুৎলতা, কোথায় সেই বুড়ো ভালমানুষ ফকিরবাবা, কেবলঠাকুরের বাঁশির স্বর আর সেই সবুজ প্রান্তর, মধুমতী নদী -স্বপ্নের মত আবছা আবছা মনের একান্তেই ওদের অস্তিত্ব। সেই বারো বছরের ছোট্ট মনটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে আজ তার কাছে। হঠাৎই অনুভব করলো অনুরাধা। এই বাসটা অচল না হলে, কলকাতার রাস্তায় এমন হাঁটুভোর জল ন জমলে হয়ত এ অনুভব আসত না।

এমন রসের নদীতে সই গো
ডুব দিলেম না।
নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই
সই পাই না ত' ঘাটের কিনারা। –

দাদা একটু ঝেড়ে কেসে হোক না কেন!

যিনি গাহনা ধরেছিলেন তিনি বোধ হয় নিজের সম্বন্ধে সজাগ হলেন, তাই সুরটাকে অচিরাৎ গুটিয়ে আনলেন।

যাই বলুন মশায়, সত্যিকারের পল্লীগীতির মত জিনিস নেই!—আহা দেশটা যদি না ভাগ হতো!

আক্ষেপ করে আর কি করবেন। বেশত চলছে কন্ধকাটা হয়ে। পল্লীর ধারের কাছে না গিয়েও তো পল্লীগীতি শুনছেন!--কম সৌভাগ্য না কি।

এতো ভেজাল।

আরে মশাই ভেজাল কিসে নেই, সবে ভেজাল, ভেজাল ছাড়া এখন সবই জঞ্জাল!

কলিকাল। তার ওপর কলিকাতা শহর—জাত না খোয়ালে পাত্তা নেই। বেজাতে কলিকাতা-বাসীর বড় আসক্তি।

এ কিরকম কথা হল আপনার মশাই!—সেই তরুণ যুবকটি যেন—অনুরাধা দেখলো অ'ড়ে, হ্যাঁ সেই—মনটা তার ওদের কথাবার্তার দিকে সজাগ—

গানের ব্যাপারে ধরুন না কেন, আজকাল ছেলেরা দেখি তো বম্বেমার্কা বাইসকোপের সুর ভাজে, কালোয়াতী যদিও বা করে তাও শুদ্ধ ভাবে নয়। আমাদের কালেও সমাজে কালে খাঁ মার্কা গান চলতো। কিন্তু তার পাশে পাশে বাংলা টপ খেয়াল, টপ্পা, কীর্তনের রেওয়াজ কমতি যেতো না। আধুনিক কালে যে সব সুরের বজ্জাতি আবিষ্কার করছেন আপনারা তাতো কাপড় তুলে খেমটা নাচের অধম—শুনলে মনে হয় পুরোনো জমিদার হই! হাঁক ছাড়ি—পঁচিশ ঘা। জাত থাকলে কি এতো বেয়াদপী সহ্য হত। বেজাতে হেস্তনেস্ত গেছে। চাই কি প্রাণও যাবে। গ্রাম মরছে তো, বাচবে কি। শুধু যন্ত্র মশায় যন্ত্র! যন্ত্রের মত আহারবিহার তথা কৃষ্টি! যন্ত্রবৎ হয়ে বাঙালী শুধু অর্থকেই প্রধান করেছে। পয়সার জন্যে বাড়ী-ঘর ইজ্জত—সে খোয়াচ্ছে। কলকাতায় আর বাঙালীদের বাস করতে হচ্ছে না মশায়!

যন্ত্রযুগে যন্ত্রের মতই তো সব হবে। আপনারা ঢিলেঢালে গুরুগম্ভীর মেজাজে ছিলেন তাই বিশ্রী লাগছে। আমরা এখনকার কালে মোটর-বাস-ট্রাম-প্লেন তথা এ্যাটমের মেজাজে গড়ে উঠছি তো, সুতরাং ভালই লাগছে। এই দেখুন না, বাসের মধ্যে স্তব্ধ গতিতে বসে কেমন যেন অসহায় বোধ করছি। আর বাঙালী বাঙালী করে চিৎকার করলে তো কিছু হবে না। ভারতবাসী হিসেবে ভাবতে হবে। বাঙলা আর কতটুকু! মানুষ আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য গ্রহে যাবার কথা চিন্তা করছে, এখন জাত জাত করে আর কি হবে! শুধু গতি চাই, গতিই প্রধান।

সত্যি মশায়, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। কিন্তু যাবো কি করে!

যাবো কি করে—অনুরাধার মনও তরুণ যুবকটির কথাটায় সচেতন হয়ে ওঠে। সত্যি ত যাবে কি করে সে—

হাতঘড়ির দিকে নজর করল মন ব্যস্ত হয়ে—প্রায় পৌনে সাতটা। না শোটা নিশ্চয় আরম্ভ হয়ে গেছে। হয়ত দ্বিতীয় দৃশ্য। এর পরেই তার অভিনয়-দৃশ্য! হয়ত শেখরবাবু খুব রাগ করছেন, কিংবা মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো নিয়ে দুটো হাত দিয়ে টানাটানি করে নিজের অসহায় ভাবের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছেন।

হাসি পেল অনুরাধার, ও মুখ টিপে হাসলো আপন মনে।

অমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে বুঝি—তরুণ যুবকটি যেন তাকে উদ্দেশ করে বলল।

চকিতে অনুরাধার মন সংযত স্বরে জবাব জুগিয়ে দিল,—না না আপনার কথায় নয়, অন্য এক প্রসঙ্গে।—বলে সে মুখটা ঘুরিয়ে নিলো রাস্তার দিকে। ঘোলা জলের দিকে দৃষ্টি ঘুরলো। একটা প্রশ্ন এলো ঐ যুবকটি সম্পর্কে—বড় গায়ে-পড়া ভাব! নজরটা নিশ্চয় তার দিকে ঘুরে-ফিরে রাখছে ছেলেটি। হ্যাংলা পুরুষ! চেনা আছে।

তেরোর শেষ থেকে আর আজ ছাব্বিশের কোটায়—ও দৃষ্টিকে চেনা আছে তার। বিশেষ করে শখের থিয়েটারের অভিনেত্রীর পেশায় ওই হ্যাংলা ছেলেমানুষী দৃষ্টি দেখে দেখে গা-সওয়া হয়ে গেছে। হ্যাংলামি করে করুক, কিন্তু গায়ে না পড়ে—অনুরাধা সচেতন নিজরে সম্বন্ধে বরাবরই।

সেই প্রথম, রাসুদার ক্লাবে, নিতাই না কি যেন নাম, বড়লোকী চালে চলতো, তিন পাঁচ মার্কা সিগারেট খেতো, কথ্যয় কথায় চপ-কাটলেট চা অর্ডার দিতো—সেই ছেলেটার কথাগুলো বড্ড গায়েপড়া নেকানেকা,

অনুরাধা দেবী আপনাকে একটু পেঁৗছে দিতে পারি?

বিস্ময় লাগতো প্রথম প্রথম। ব্যাপারটা কি, রাসুদা পাকা মানুষ, তাই বলত, বেশত দাঁড়াও না তিনজনেই যাওয়া যাবে। ছেলেটা যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হতো, মনমরা হয়ে চুপচাপ একটার পর একটা সেগারেট টেনে যেতো।

না, রাসুদা বড্ড ভালমানুষ। কিন্তু কি হয়ে গেলেন অভাবে অভাবে। ক্লাব, অভিনয়, সংসার সবেই যেন অনাসক্তি। সন্ধ্যের পর হলেই সস্তা মদে চুর হয়ে পাড়ায় গোল করেন। সেদিন তো মুখোমুখি দেখা। ভয় ধরে গিয়েছিল তার।

অনুরাধা না! বাঃ দিব্যি হিরোইন হিরোইন লাগছে। অভিনয় ছিল বুঝি। আমি কিন্তু হিরো—নট, ইন্ আর করতে পারলাম না। যাক্ যাক তোমরাই আমার সব। ভাল হোক, শুভ হোক, দর্শনীয় হোক—আমি দূর থেকে তোমার মঙ্গল কামনা করি অনুরাধা।

একদিন বাড়ীতে আসবেন কেমন।—চুপি ভীরু স্বরে বলে অনুরাধা পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করেছিল। মাতাল মানুষ। যদি অস্বাভাবিক আচরণে তাকে লজ্জা দেয়, এই ভয়।

আচ্ছা রাসুদা যদি তার অতি নিকট আত্মীয় হত, যদি নিত্য এক ঘরে বাস করতে হত তা হলে—শিউরে উঠল অনুরাধা এ চিন্তা আসতেই।

না, সে সহ্য করতে পারতো না। যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই সানসাইন ক্লাবের কালী-বাবুর ঐ দোষের জন্য ওদের ক্লাবে অভিনয় করতে প্রথম প্রথম কত দ্বিধা এসেছিল তার। ক্লাবটা ছাড়ার কথা মনে হয়েছিল। কত অনুরোধ—

কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন না, টাকার জন্য কি?

না না টাকা তো আপনারা ভালোই দেবেন।

তবে যাতায়াতের জন্য কি, তা রিহার্সালের দিন ট্যাক্সি করে চলে আসবেন, ভাড়াটা আমরা—

ও জন্য নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারেই।

আপত্তি না থাকলে—। ভদ্র বিনয়ী মানুষের মতই স্বর কালীবাবুর। কিছু বলতে মুখ সরে না।

চলুন তাহলে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—। সানসাইন ক্লাবের নাট্যকার তথা প্রধান অভিনেতা কালীবাবুর আহ্বানে নিশ্চুপ হয়েই আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছিল ক্লাব ঘর থেকে। তারপর অনেকখানি পথ কালীবাবু কোন কথা বলেনি। সেও না। তারপর এক সময় কালীবাবু ছেলে-মানুষের মতই তার হাতদুটো চেপে করুণ স্বরে বলে উঠেছিল,

দয়া করে আপনাকে বলতেই হবে, কেন আসবেন না আমাদের ক্লাবে।

কুণ্ঠাজড়িত স্বরে সে জানিয়েছিল, মদের গন্ধটা আমার মোটেই সহ্য হয় না।

ও, বাঁচালেন। আমি ভাবছিলাম...যাক্ ভাবনার কথা। আপনি ও ভয় করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি আপনার আর অসুবিধা হবে না।

অবাক গেলেছিল অনুরাধার। রাস্তার অল্পালোকে কালীবাবুর মুখের দিকে নজর যেতেই তার মনে হয়েছিল, মানুষটা মোটেই খারাপ নয়।

আগামী শনিবার আসছেন তো তাহলে?

ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল সে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

মনে করার কারণ আপনারই ছিল। বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। কি জানেন ভুল হয়ে যায়। ভুলে থাকার জন্য সময় সময় বড় মারাত্মক ভুল করে বসি। যাক্ আপনার বাস এসে গেছে, উঠে পড়ুন, শনিবার অবশ্য আসবেন কিন্তু।

আসবো। সহজ মেজাজেই সেদিন সে বাসে উঠেছিল। কালীবাবুর সম্পর্কে ভয়টা কেটে গিয়েছিল। সত্যি লোকটি বড় ভাল। মদ খান বটে। কিন্তু পরে যতবারই অভিনয় করেছেন ভদ্রলোক তার সঙ্গে কোনদিন ঐ কটু গন্ধ তাকে বিরক্ত করেনি। ক্লাবের অন্যান্য সভ্যদের দু' একজন একটু যারা ঠোঁট-কাটা, তারা কালীবাবুর এই সহজ অবস্থাটা নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, দু'একটা টিকাটিপন্নী যে তার কানে আসেনি এমন নয়ঃ

বুড়ো কালে কালদা বোধহয় বধ হলেন!

আড়ে অনুরাধা দেখেছে মাণিকচন্দ্রকে ; লোভী চোখদুটো চেহারার তুলনায় বড় বিশ্রী স্পষ্ট। ধারণাটা বিরূপই করে—নিজের পার্টের কাগজগুলোর দিকে চোখ নামিয়ে রেখেছিল অনুরাধা।

বাজে কথা না বলে মাণিকচন্দ্র পার্ট বল দিকি।

পার্ট বলা সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। উচ্চারণ অস্পষ্ট। কালীবাবু কিছুতেই মাণিকচন্দ্রকে বাগ করতে পারেন না। রেগেও যেতেন মাঝে মধ্যে।

লোহা ঘসোগে যাও!

কালদা পাঁচজনের সামনে অমন করে গাল দিও না—ফোলামুখে মাণিকচন্দ্র আপত্তি জানাতো।

হাসতো সবাই। সেও।

নন্দিতা ফোড়ং দিতো,—পাট্‌টা একটু ওনার মতই করে নিন না কালীবাবু—তাহলে গোল মিটে যায়।

গোলমেটানো অত সোজা হলে অভিনয় বলে একটা কথা জন্মাতো না। যাক মাণিক বাড়ীতেই মুকস্ত করে নিও। এ্যামেচারের কি যে জ্বালা!

এ্যামেচারের দলে পেশাদার অভিনেত্রীদের কি কম জ্বালা!—হাসতে হাসতে একদিন অনুরাধা কালীবাবুকে বলেছিল।

জ্বালা নেই আবার। আপনাদের শতেক জ্বালা, ফেউদের নিয়ে নিত্য হাঙ্গামা, উপরি ন্যাকামিও সহ্য করতে হয়। তারও পর অন্য চিন্তা। অভিনয়ের, বাড়ীর ইত্যাদি। যাক্ এক-দিন আসবেন না গরীবের বাড়ীতে। আমার মেয়ে আছে একটি। কোন এক ঝোঁকে ওকে বলেছি তোমার এক মাসিমা আছেন সেখানেই গিয়েছিলাম। তাই রোজই বায়না ধরে—নিয়ে চল আমাকে। ক্লাবে ওকে আনতে আমার ঠিক......যাবেন?

বেশত যাওয়া যাবে।—একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরেই বলেছিল। আচমকা আহ্বান—মনটা সেদিন পাশকাটাতে চেয়েছিল তার।

—চিনে বাদাম বাবু, ঠান্ডামে গরম, গরম মে ঠান্ডা।

এই চিনে বাদামওয়ালা।

অনুরাধার নজরও ডাকের সঙ্গে ছোটেঃ বাদামওয়ালাটা হাঁটুর ওপর জলভেঙ্গে চলেছে মাথায় বাদামঝুড়ি নিয়ে—

বাসে উঠে আয়।—ফর্সা তরুণ চশমা পরা লোকটা না ইচ্ছে করেই একটু পিছনের কাছে স্পর্শ রাখছে। অনুরাধা পিটটা রেস্টারের কাছ থেকে আড়ষ্ট হয়েই সরিয়ে নিলো।

আইয়ে বাবু গরমা গরম!

এক আনা দে দিকি।

ছটাক কত?

আট নয়ে পয়সা বাবু। কেতনা বাবু?

বললুম তো এক আনা। এক আনাই বাড়তি।

আমাকে দাও তো ছ নয়া পয়সার।

সেই ছেলেটি, যে মাঝে মধ্যে তাকে দেখে দেখে কিছু ভাবছিল, ও যেন কিনতে চায়। কিন্তু একটা সঙ্কোচ আসছে যেন।—কিসের জন্য? বোধ হয়......না বাজে চিন্তা, দূর ছাই! অনুরাধা আবার রাস্তার দিকে মুখ ঘোরালো রেস্টারে পিঠটা আলগা করে ছেড়ে দিয়ে।

দে বাবা চাট্টি বেশী করে দে, কখন যে সচল হবে ঠিক নেই, পেট চোঁ চোঁ করছে—

বহুত দিয়া বাবুজী। দো রুপেয়া সের হ্যায়। বহুত কিম্‌তি চিজ বাবুজী......

সবই কিমতি, কমতি শুধু জানটুকু—দে বাবা যা খুশি।

খুব জল না রে চার দিকে?

ব...হু...ত বাবু!—বিল্কুল পানি হি পানি, সব কুছ বন্ধ—বাচ্চা লোগোঁকা বহুত তকলিফ। একটো স্কুল কা গাড়ী থোড়া আগে মে পড়া হ্যায়—তোনি তোনি বাচ্চো সব আটোক্ হ্যায়।

আহাগো। বেচারীরা বড়ই বিপদে পড়েছে—বুড়ো মানুষটি বলে উঠলেন।

সত্যি কি অন্যায় বলুন দিকি স্কুল কর্তৃপক্ষের। কি দরকার বৃষ্টিতে গাড়ী বার করবার। এতটা জল হবে ভাবতে পারেননি তাঁরা। আপনি কি ভেবে চিন্তে বেরিয়ে ছিলেন?

আমি ঠিক সে কথা বলছিনে...মানে বৃষ্টি মাথায় করে না বেরুলে এমনি বন্দী হয়ে থাকতে হতো না বাচ্চাগুলোর। কচি মন, ক্ষিদেও পেয়েছে বেচারীদের......

কচি মন—কথাটা কানে বাজে অনুরাধার। চকিতে কালীবাবুর মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কালীবাবুর মেয়েটিরও বেশ কচিমন। বেশ মেয়েটি! মা মরা, কালীবাবুর এক দূর সম্পর্কে আত্মীয়াই আছেন বাড়ীতে। তিনি ওকে দেখাশোনা করেন। অদ্ভুত সব কথা, কিন্তু কি সহজ সুন্দর—ঠিক যেন বিদ্যুৎলতা!

তুমি বুঝি রাগ করেছো মাসিমণি—

না না রাগ কেন করবো। এইতো তোমায় আদর করছি। নরম তুলতুলে গালটা নিজের গালের সঙ্গে এক করে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল অনুরাধা। অপূর্ব এক আমেজ কিন্তু —গাটা কাঁটা দিয়ে উঠলো—ঠাণ্ডা জানলার রড্‌টার স্পর্শ গালে লেগেছে বোধহয়—দেহচেতন মনটা শরীরটাকে ঠিক করে বসতে সাহায্য করল ওকে।—না আরাম করে বসা যাক্‌। দেরী তো হবেই। যে রকম বৃষ্টির ধারা হয়ত রাত বারোটাও হতে পারে।

মাইজী বাদাম লিবে।

ছেলেটা তার কাছে কিছু বিক্রী করে যাবেই। উত্তর না পেয়ে আবার বলে ওঠে হিন্দুস্থানী দেহাতি ভাষায়—লিও না মাইজী ছটাক ভর—

অনুরাধা মুখ ফিরিয়ে দেখলো বাদামওয়ালাকে—তারপর ঈষৎ হেসে বলে ওঠে—আচ্ছা দাও এক আনার।

এক ছটাক মে মৌজ করনা মায়ী- খালি বৈঠন সে হায়রানি হৈলবা—দে দেই ছটাকভর?

তুমি যে নাছোরবান্দা দেখছি। আচ্ছা দাও তোমার খুশিমতই। ঈষৎ হেসে হাতব্যাগটা খুলে অনুরাধা পয়সা বার করতে করতে বলে ওঠে, কত দাম তোমার এক ছটাকের?

যায়দা নেহি। আট নয়ে পয়সা।

এই নাও।

আপ লিজিয়ে।......

পেছনে সীটে বাদাম ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে কথা আসে কানে—

বর্ষার দিনে ভাজাভুজি বেশ লাগে না?

বিশেষ করে ইলসা আর খিচুরী মানে ফিস্‌ফাস্‌।

দূর মশায় আমি ঠিক ক্ল্যাসিক খাওয়ার কথা বলছি না। বলছিলাম চলতি পথে—মানে অন্ রুট্।

ও! আমি ভাবছিলাম—আর মশায় ভেবেই বা করুম কি! টাটকা গঙ্গার ইলসা চোখেই পড়ে না আজকাল। সেদিন বাগবাজারের ঘাটে যদিবা নজর করলাম—বলল কি জানেন—তিনটার দাম পঁইতিরিশ টাকা! শুইন্যা মশায় বাপের নাম শরণে আনলাম। তা জেলের পুত কইলকি জানেন, কইল, আপনাদের জন্যে এ মাছ নয়। যাগো মাইনা হাজার টাকা, তাগোর জন্য। বলেন তো মশায় কি রকমটা কাল পড়লো। বাঁচুম ক্যামনে কন্ তো?

বাঁচুম ক্যামনে কন্ তো! কানে বাজল কথাটা অনুরাধার।

একটা বাদামের খোলা ভাঙ্গার শব্দ কানেও আসে। আঙ্গুলের নোখ বড় থাকলে বড় অসুবিধে—কিন্তু দর্শনীয় যে! নেল পালিশ—টুকটুকে লালের ছোপ্। ঠিক পাকা করমচা যেন —উঃ কি করমচাই না খেতো, লবণ নেই তাতে কি—বিদ্যুৎলতা সত্যিই অদ্ভুত।

কিন্তু কোথায় আছে সে? আজও কি ফকিরবাবা বেঁচে আছেন?—বোধহয় আছেন। কিন্তু বিদ্যুৎলতা?

সেই শেষ দেখা। হিন্দুস্তান পাকিস্তান—ভাগাভাগির আগে—দাঙ্গা! সেই দাঙ্গার এক ধাক্কা সামলে বাবা আতঙ্কিত স্বরে মাকে বললেন সে-রাতে—

মনে পড়ে অনুরাধার। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে যেন হঠাৎ বলে উঠলেন, আর থাকা গেল না। দেশ ছাড়তেই হবে।

কোথায় যাবে তাহলে?

কোথায় কে জানে! উপস্থিত কোলকাতায় টালিগঞ্জে ব্রজেনের বাসায় তোমাদের তুলি। তারপর একটা যা হোক......

জমি জায়গা, বাড়ীঘর—এ-সবের কি হবে?

ফাঁকা পড়ে থাকবে, শ্যাল কুকুর আর সাপের বাসা হবে। মানুষ নাই গো মানুষ নাই! মানুষ থাকলে কি মানুষের এমনি খোয়ার হয়! প্রাণ বাঁচানোই এখন বড় কথা।...

—প্রাণ বাঁচাতে হবে! ওরা মারবে যে!

বিদ্যুৎলতাকে সকালে বলতেই ও হেসে বলেছিল, মারলেই হল নাকি! মন নেই বুঝি ওদের। দেখিস নে মা একবার মারলেই দুবার আদর করে তোকে—চ কেবলঠাকুরের কাছে যাই। ওর জ্বর হয়েছে কাল। ফকিরবাবাও নেই। ভিন গাঁয়ে গেছে। ক'দিন বাদে এ-গাঁয়ে আসে আবার দেখ। চ দিকি।

এই খুকি কোথায় যাস্!—যাস্ না কোথাও। বড় গোলমাল।—মার বারণ মনে পড়েছিল যেন।

আমি যাবো না ভাই, তুই যা, মা বকবে। বাবাও কেমন যেন হয়ে গেছেন।

আমার ত মা নেই ভাই! বাবা খালি মা মা করে আর বড়মার থানে পড়ে থাকে। স্যাকরা পিসি দুটো ভাত দেয় খাই। রাতে স্যাকরা পিসের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

স্যাকরা পিসে বলছিল, রাখে হরি মারে কে। হরির ইচ্ছে হলে ঠিক বাঁচবো।—আমি ভাই কেবলঠাকুরকে দেখে আসি। তুই থাক।—বিদ্যুৎলতা তার ঝাকড়া চুল নাচিয়ে ছুট দিয়েছিল উত্তর মাঠের দিকে—

চোখে ভাসছে। স্পষ্ট। মনে পড়ে অনুরাধার বিরস বদনে ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়ীর অংগনায় তুলসী তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল সে। বাবা বোধহয় বেরুচ্ছিলেন, তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে এগিয়ে এসেছিলেন—

তোর মা বুঝি বেরুতে বারণ করেছে তোকে। অভিমান করিসনে মা। বড় ভয় কিনা চারদিকে। বাবার কণ্ঠস্বরটা কত নরম—আশ্রয়ের মত। আকরণে কেঁদে উঠেছিল সেদিন মনে পড়লো অনুরাধার।

কাঁদিসনে মা আমার। তুই কাঁদলে আমিও যে কাঁদবো রে! আদর করে চোখের জল মুছিয়ে বাবা আপন কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন—

ছিচকাঁদুনির নাকে ঘা! বিল্টুটা ছোট, কিন্তু বরাবরই কেমন চেংড়া। কিছু হল না ওর। আড্ডা আর আড্ডা। আজও বেকার। বাবা কিছু বললেই মা ওকে প্রশ্রয় দিয়ে বলত, ছেলেমানুষ ওর কি অত বুদ্ধিশুদ্ধি আছে!

বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হবে!—এ কথা শেষে চুপ হয়ে যেতেন বাবা। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে এক সময় গুনগুন স্বরে গান ধরতেনঃ

আমার মন অসার সংসার মাঝে
কেবলমাত্র গুরু সার,
গুরুর নাম নিয়া মন ভুইলা রইলি
তারে ভজলি না একবার।—ও মন রে
গুরু তোরে কৃপা করে
যে নাম দিল কর্ণমূলে
ভজলি না একবার!

—বাবার গলায় উদাস বেদনার সুরটা কান্নার মতই বাজতো কানে- কেঁদে ফেলতো অনুরাধা। পালিয়ে যেতো বাড়ীর অঙ্গন থেকে।

মধ্য ইংরাজী স্কুলের মাস্টার মশায় ছিলেন বাবা। অন্যায়ের মুখোমুখি হলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

ছেলেদের মধ্যে নিজেকে পাননি—বুঝতো অনুরাধা বাবার কষ্ট। কলকাতায় মাস্টারীর যোগাড় নেই। অভাব। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের ক্ষিদের জ্বালা। মার তিরস্কার মনে পড়ে অনুরাধার—

রেফিউজি অফিসে যাইলে তো উপায় একটা হইত।—বইসা থাকলে ভগবান দিবেন খুব!—আমার জ্বালাতনের শেষ নেই। মাইয়্যা মানুষ হইয়া কি শ্যাষে পয়সা কামানে বাইর হমু।—রাগলে মার নিজের গ্রামের ভাষায় মুখ ছুটতো। যশোরের মেয়ে নয়, ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে মার বাপের বাড়ী। দেশে থাকলেই ছিল ভাল! রেফিউজি হইয়া আর সবাই ঘরদুয়ার বানাইয়া লইল। আর আমাগো—হায় রে ভগবান—কারে বলছি আমি! দেওয়ালেরে? বরাত সকলই বরাত!—মার উচ্চস্বর শুনলেই বাবা বেরিয়ে যেতেন পথে।

বস্তী বাড়ীতে আরো পাঁচজন ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে থেকেও কেমন যেন আলাদা লাগতো নিজেদের। উচ্চস্বরে কথা যেন এখানে মানায় না তাদের—মনে হতো অনুরাধার। তাই মার ওপর রাগ হতো বাবাকে উচ্চস্বরে ভর্ৎসনা করলেই।

বড়দা সবে পাশ দিয়েছে একটা। ব্রজেনকাকার দৌলতে বড়দা এক মাড়োয়ারীর গদীতে বেরুচ্ছে। চল্লিশ টাকা মাইনে। কুড়ি টাকা মাকে দেয়। বাকী কুড়ি টাকা নিজের খরচা। যাতায়াত। টাইপ শেখা। জলখাবার।

বাবার কোন কাজ নেই। দুটো ছাত্র পড়ানো আছে শুধু। মাঝে মাঝে মা দাদাকে গহনা বের করে দেন, চুপি চুপি কি বলেন আড়ালে, দেখে সে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না। বিরস মুখে ঘরের একটা কোনে বই নিয়ে বসতো সে। সঙ্গী নেই। ভাল লাগা নেই। সেই সব বিস্বাদ দিনগুলো কি সাংঘাতিক!—শিউরে উঠল অনুরাধা মনে পড়তেই।

কি কষ্ট করেই না দিন গেছে। কাপড় নেই বেশী। জামাও তেমনি। রাস্তায় বেরুলে লোকগুলো কি বিশ্রী ভাবে দেখতো—স্কুলে ভর্তির দিন থেকে কেমন যেন লজ্জা করতো রাস্তা চলতে ছেঁড়া সেলাই করা জামা কাপড়ে। পরিষ্কার সুন্দর সুন্দর সব পোশাকে, শাড়ীতে তার ক্লাশের মেয়েরা স্কুলে আসতো। আর তার দিকে চাইলেই বেশীর ভাগ মুখ কেমন যেন বিরূপ হয়ে

যেতো—সেই মেয়েটি!—বিনতা নাম ছিল মেয়েটির। পাঞ্জাবীদের মতন শালোয়ার পরে স্কুলে আসতো। ঝি বই বয়ে আনতো। তাকে দেখলে মুখটা কুঁচকে বলতো—

যত সব বাঙাল এসে জুটেছে!—ওর ঐ ঘৃণা-সূচক অবজ্ঞা মনে বাজতো তার। উপায় নেই। নালিশ জানাতে ভয় হয়। যদি বলে, মাইনে দিতে পারে না সময় মত আবার নালিশ হচ্ছে! —চোরের মত মুখ বুজে স্কুলের ক্লাসে বসে বসে পড়া শুনতো, নয়ত নিজের পড়ায় ডুবে থাকার চেষ্টা। বাড়ীতে ফিরেও সঙ্গীহারা। স্কুল থেকে ফিরে বাসনমাজা, তারপর বাটনা। অবসরে হয় বই পড়া না হয় ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা। শুধু বাবা এলে বাবার কাছে কাছে। বাবা যেন সব বুঝতে পারতেন। বলতেন, আয় মা তোকে একটু পড়াই। বিল্টু কেষ্ট—এরা তো সব লায়েক হয়ে গেছে। আয়, কি পড়া আছে রে?

লণ্ঠনের আলোটা যতই ম্লান হোক না কেন ও সময় বড় উজ্জ্বল করতো তার মনকে। পড়তে বসতে দেরী করতো না সে। পড়ানো মধ্যে বাবা বেশ তৃপ্তি পেতেন। ভালো লাগতো। বাবাকে খুশী করতেই ওর মনটা বড্ড ব্যস্ত হতো ও সময়। একটা বছর ঐভাবে। তারপর নাক্‌তলার এক স্কুলে বাবার মাস্টারী জুটতেই খানিকটা নিশ্চিন্তি।

বাড়ীবদলও হলো। আস্তে আস্তে সহর যেন তার কাছে সহজ হয়ে আসে। ভাল লাগে। শাড়ী আসে। পছন্দ অপছন্দ জিজ্ঞাসায় তার মতামত মর্যাদা পায়। জামার নতুন নতুন কাট্ দেখে নিজে বানিয়ে নিতে উৎসাহ বোধহয়।

সঙ্গীও জোটে। পারমিতা, অনুস্তা, সুপ্তি—এরা কেউ ঢাকার, কেউ ফরিদপুর, কেউবা এই টালিগঞ্জেরই—কিন্তু এখন এরা সবাই কলকাতার। সিনেমায়, ফ্যাসানে, ব্যস্ততায়, লেখাপড়ায়, চিন্তায়, কাজে অকাজে এখন সম্পূর্ণ অন্যধরনের তারা সবাই। মিল থেকেও নেই সেই যশোর, খুলনা, ঢাকা, বরিশালের সঙ্গে। আদব-কায়দা, চলন-বলনে কাজে-অকাজে তারা এখন কলকাতার —বস্তী থেকে কোঠা, কোঠা থেকে প্রাসাদ—শুধু দেখানো আর দেখা!—ব্যস্ততার কাছে দূরত্ব নেই। নাকতলা শ্যামবাজারের হামেশা যোগাযোগ! মধ্যে ডালহৌসী কলকাঠি নাড়ছে—

কাজ চাই!—অ্যাপলিকেশন করুন, কোয়ালিফিকেশন কি? টাইপ, আবার সর্ট্‌হ্যাণ্ডও! দরখাস্ত করুন। সময় মত জানানো হবে।

তাকেও জানাতে হয়েছিল বইকি।

বাবার তখন শেষ অবস্থা। অর্থাভাব। ইণ্টারমিডিয়েটে কয়েক মাস শুধু। তারপর বড়দা মেজদার মৃদুগুঞ্জন—আর পড়ে কি হবে! একটা চাকরীর চেষ্টা করুক না। সংসারের দায় কি শুধু আমাদেরই!

মনে লাগে। দাদারা এর মধ্যেই আমরা তোমরা করতে আরম্ভ করেছে। আর নয়।

. বাবা তুমি কিছু ভেবো না। চাকরীর চেষ্টাও করি আর পড়িও। কাজের জন্যই পড়ি কেমন!

কথা নেই। ছলছলে চোখ দুটোয় নিরুপায় বন্দীত্বের জ্বালা!

গাটা শিরশির করে অনুরাধার। উপায় নেই উপায় নেই; ব্যস্ততা আজকের মানুষকে পারিবারিক আশ্রয় শূন্য করেছে—গতির দ্রুততায় একা একা অবস্থানে ব্যক্তিগত আশ্রয় তাকেও খুঁজতে হবে নৈলে অস্তিত্ব বিলোপ। বড় কর্কশ, বড় নগ্ন। কিন্তু তবু অব্যর্থ সত্য—নিজের ব্যবস্থা নিজেকে করে নিতে হবে। স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিচ্ছে আজকের সমাজ—ঘরকে লালন করার জন্যে নয়, গতিবেগকে আরো দ্রুত করার জন্যে; আরো তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাওয়ার জন্যে। হয়ত

স্মৃতিও থাকবে না, হয়ত মনও অর ভাবতে বসবে না শুধু গতি, গতি,—সমস্ত গতিবেগই অস্তিত্ব!

না না এমনি করে ভূতের মত কতক্ষণ বসে থাকা যায়। উঃ!—একটা কর্কশ চিৎকার কানে বাজল অনুরাধার।

অসোয়াস্তিতে লোকটি বাসের পা-দানির কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। হাঁটু ভোর জল—ঝপাৎ করে একটা জোলো শব্দ কানে এলো অনুরাধার—

কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকটার! কাপড়টা না গুটিয়েই নেমে পড়ল গা! এতই যদি ব্যস্ত বাবা, এতক্ষণ বসেছিলে কেন বাপু—যত সব বেআক্কেলে! এই জন্যেই ত পৃথিবীর এত অশান্তি! —বুড়ো মানুষটি মন্তব্য করে নিজের খেয়ালে।

অনুরাধা হাসে এ মন্তব্য শুনে—কি আশ্চর্য! গতি—অভ্যস্ত মানুষ গতিমন্থর হলে কি সাংঘাতিক পরিণতি!—হয় পাগল, না হয় জিনিয়াস—

যে যাই বলুক বেশ অদ্ভুত যুক্তি কিন্তু কালীবাবুর। লোকটি মজাদার কিন্তু!

—দেখুন অনুরাধা দেবী, আমি নাটক কেন করে বেড়াই জানেন, জীবনটাকে ভোলার জন্যে, স্রেফ ভুলে থাকার জন্যে আমার নাটক নিয়ে মেতে বেড়ানো।

আপনার কথার মানেটা ঠিক কিন্তু ধরতে পারলাম না।—অনুরাধা জিজ্ঞাসা করেছিল স্বাভাবিক কৌতূহলে।

কালীবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে উঠেছিলেন, নিজের জীবন সম্পর্কে মমত্ব এখনকার কালে বড় পাজি জিনিস। জানেন তো আমি বিবাহিত। শুধু বিবাহিত বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। বিবাহ অনেক মানুষই করে থাকেন নারীদেহে ভোগের জন্যে। আমি কিন্তু বিয়ে না করেই বিবাহিত। খুকুমণিকে দেখেছেন তো, ওর মা কে ছিল জানি না। তবু ওর মা ছিল, আর আমি মনে মনে তাকে আমার স্ত্রী ভেবেছি। খুকুমণি আমার পিতৃরস জাগিয়েছে। এক পেন্টার বন্ধুকে দিয়ে কল্পিত এক সুন্দর নারীর পোর্ট্রেট করিয়েছি। দেখেছেন বোধহয় সেদিন আমার ঘরে। খুকুমণি জানে ঐ তার মা।—এ মিথ্যে, সবই মিথ্যে। তবু এ সত্য নয়কি? বলুন তো এ নাটক যার জীবনে প্রাত্যহিক সে নাটক নিয়ে মাতামাতি করবে না তো কি করবে!

কোথায় পেলেন খুকুমণিকে?—বিস্ময় রেমাঞ্চে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল সে কালীবাবুকে।

রাস্তায়। এক নেড়ী কুকুর ওকে লেহন করছিল। মদ খেতাম না। ওকে বাড়ী আনলাম। ওর রক্তিম স্পন্দন আমাকে সেদিন নেশা করতে ইঙ্গিত দিয়েছিল। এক হাতে দুধে ভিজানো তুলো ওর মুখে দিয়েছি, আর এক হাতে মদ ঢেলেছি নিজের গলায়।—আশ্চর্য লাগছে বুঝি! লাগবেই লাগবেই; ঐ জন্যেই নিজের কথা বলি না। এই প্রথম আপনার কাছে—যাক্ আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে না তো?

না না দেরী আর কি এমন হচ্ছে। আচ্ছা খুকুমণি যদি কোনদিন—

খুকুমণি যদি জানতে পারে তার জন্ম-রহস্যের কথা, এই বলতে চান তো?—ঝোঁক ছিল লম্বা মানুষটির কথায় কিন্তু উত্তাপ ছিল না।—ও যখন জানবে তখন ও নাটক করতে শিখে যাবে। নাটককেই জীবন বলে জানবে! এই ধরুন না, আপনার জীবনের কোনটা সত্য আপনি এক নিমেষে ভাবতে পারেন, না বলতে পারেন? নিশ্চয় পারেন না। বাড়ীতে মা আছে বলছিলেন না? মার কথা বাড়ীতে রাস্তায় কাজের মাঝে—হয়ত সব সময়ই মনে হতে পারে, যদি আপনি মা কাতর হয়ে

পড়েন। আবার যদি আপনার অভিনেত্রী জীবনটাকে মনে মনে ভাবতে থাকেন তো দেখবেন, এক্লাবে "জনরব", ও ক্লাবে "স্থলপদ্ম" ইত্যাদি নাটকে আপনার চরিত্রের পীড়ন চলেছে। আর সেখানে আপনি কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনও বা প্রেমের তীব্র অনুভূতির স্পর্শে আপনি থরথর করে কাঁপছেন—অথচ এগুলো কোনটাই তো সত্য নয়!—কথা শেষে সেদিন হেসেছিলেন কালীবাবু মৃদু।

আর সে? বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কালীবাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল। মনটা বারে বারে সেদিন বলে উঠেছিল—সত্যিই তো, সত্যিই তাই।

আজও সেদিনের মত কানে বাজতে লাগল সত্যিই তো!

ঝুরঝুরে কয়েকটা শব্দ কানে এলো অনুরাধার।—

বাদামগুলো যে পড়ে গেল আপনার!

চকিতে সজাগ মন সিধে হয়ে চোখ ফেরালো, সেই ছেলেটি। নাঃ বড্ড বিরক্ত করে তো।—নিশ্চয় এখনও নারীসঙ্গ করেনি। এত কৌতূহল যখন—

একটা লঘু সুরের আলপনা লিখে গেল এ কথা অনুভবে। মৃদু হেসে একবার চাইলো অনুরাধা ছেলেটির দিকে, তারপর মাথাটা ঈষৎ নিচু করে পায়ের কাছ থেকে বাদামগুলো কুড়তে চেষ্টা করলো।

—আরো বোধহয় ঘন্টা খানেক দুর্ভোগ আছে কি বলেন মশায়!

তা হবে! কিন্তু রাতে আজ হরিমটর মশায়। অথচ ক্ষুধার কিঞ্চিদপি তাপ অনুভব হচ্ছে। একটু গরম চা-ও যদি পাওয়া যেতো। কলসীর চা হলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু গরম চাই। একটু নজর করবেন তো মশায় ধারে যখন রয়েছেন।

আচ্ছা ধার জিনিসটা বেশ! চপল তরুণ যুবকটি আলতো করে বললে।

অনুরাধা এবার স্থূলভাবে দাঁত দিয়ে বাদামের খোসা ভাঙতে চেষ্টা করলো। সৌখিনতা অচল এস্থলে। খাদ্য গ্রহণ দৃশ্যতঃ স্থূল হলেও গ্রাহকের রসনাকে সূক্ষ্মরসাবিষ্ট করবেই। নচেৎ তা অখাদ্য।

বাদামভাজা মন্দ লাগছে না তো। ক্ষিদে পেয়েছে—আশ্চর্য কি, সেই কখন খাওয়া হয়েছে! খেয়ে তৃপ্তি হয়নি। বিশাখা বৌদির রান্নার হাত নেই। মার নিরামিষ তখনও হয়নি। বিশাখা বৌদি কি রকম যেন—এ্যাঃ পচা!—ইয়াক্ থু থু!

ঠিক দুপুর বেলার মত। এমন পেঁয়াজ দিয়েছিল তরকারীটায়—খেতে ইচ্ছে হয় না! রান্নার কোন জ্ঞানগম্মি যদি থাকে। অথচ সংসার করছে। ছেলেমেয়েও শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচটি—কিন্তু কি বিরক্তি! মারধোর, সময় মত নায়ানো খাওয়ানো ঠিক থাকে না। শুধু অভিযোগ—এমন বোকামী কেউ যেন না করে বাবা। প্রেমের মাথায় মারো ঝাড়ু—বিয়ে নয়তো চাক্রানীর কাজ!—হাড়মাস কালি করে দিলে!

কানে আসে প্রায় অনুরাধার। এ সব শুনলে দুঃখ হয়, রাগও ধরে! আর তখন হয়ত নিজের কথায় ফিরে গিয়ে আপন মনেই সান্ত্বনা খোঁজে—বেশ আছি! ভ্যাগিস্ প্রেম বা বিয়ের ঝামেলায় নিজেকে জড়াইনি! তবু বিশাখা বৌদির জীবনটা অনেক আক্ষেপ নিয়েও যেন সহজ!—নোংরা কিন্তু নিশ্চিন্ত—গা ঘিনঘিন করে উঠলো একটা উক্তি মনে পড়তেই অনুরাধার।

সেদিন সকালে কলতলায় একটু দেরী হতে না হতেই বৌদির তাড়া—এত দেরী করছো কেন ঠাকুরঝি!—সকালেই যে গুনগুনানি গো—বলি ব্যাপার কি?

একটু সহজ আনন্দের আভাস ছিল কণ্ঠে। কিন্তু তাতেও আপত্তি কিংবা জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা ছাড়া কি কোন কথা নেই। সাড়া না দিয়েই আরো কিছুক্ষণ ঘেরা কলতলাটা আটকে রেখেছিল সে।

—পাঁচজনের সংগে মানুষের বাস হলে একটু মানিয়ে গুনিয়ে নিতে হয়!—বলি দরজাটা খোলই না। আমি তো পরপুরুষ নয় গো, মেয়েমানুষ!

কথা বললে আরো কথা বাড়বে। তাই ভিজে কাপড়জামাটা ঠিক করে নিয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলে বিশাখা বৌদি স্থূল হেসে বলেছিল, রাতে তো কারোর পাশে শোও......

বৌদি!—চিৎকার করে উঠেছিল সে বেশ উচ্চকণ্ঠে।

বাবা রে বাবা ঠাট্টা করারও উপায় নেই!

এ-ধরনের ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।—আর দাঁড়ায়নি। সোজা মার ঘরের দিকে এগিয়েছিল।

কি হয়েছে রে খুকু?

কিছু না মা! আর কথা না বলে গুম হয়ে ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মনটা পরিচ্ছন্ন রুচির তাগিদে সাময়িক অপরিচ্ছন্ন হয়ে বিশাখা বৌদি সম্পর্কে ঘৃণিত লজ্জায় অনেক কথা বলে উঠেছিল। শিক্ষা পেলেও যা না পেলেও তাই। পাড়া গাঁয়ের ভূত কোথাকার! আবার প্রেমে পড়েছিলেন উনি,...দাদারও আমার...। দাদাও একটা জন্তু বিশেষ তো। ভ্যাগিস একটা চাকরী জুটেছিল নৈলে—

তুই এতো তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছিস কেন রে খুকু?

একটু কাজ আছে।

খেয়ে যাবি নে! খেতে আসবি তো? মার স্বরটাও যেন ভীত। হয়ত আশংকা: রোজগারী মেয়ে, যদি বাড়ীর সংগে সম্পর্ক না রাখে, যদি হোটেল কিম্বা অন্য কোন জায়গায়—না না এ সব কি বাজে কথা ভাবছে সে। সারা দিন অভুক্ত থাকবে সে তাই মার এই জিজ্ঞাসা। মার মনে এ সব আসবেই বা কেন। ভাবনায় মাথাটা আরো যেন ধরে গিয়েছিল। সদ্য স্নান করেও সে ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

কিরে কথা বলছিস্‌নে কেন, তোর হল কি!

হবে আর কি। সময় পেলে খেয়ে যাবোখন এসে। একটু তাড়া আছে তাই—

আসিস কিন্তু।

আচ্ছা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। তারপর অনির্দিষ্ট পথচলা—হাতঘড়িতে তখন আট-টা। অফিস তার দশটার পর। সাড়ে দশটায় পেঁাছোয় সেখানে রোজই। যাওয়া তো যাক্‌—ট্রামে উঠে বসেছিল আর কিছু না ভেবে। একটু ভীড় কম। লেডিস সীটে একটায় বিশাখা বৌদির মত এক বিবাহিত নারী। ইচ্ছে করেই আগের সীটে বসেছিল সে কোনটায় ঠেস দিয়ে। রাসবিহারীতেই বোধহয়—

আরে আপনি যে, এত সকালে কোথায় চললেন? দীননাথবাবু; শেখরবাবুদের ক্লাবের সভ্য। ভদ্রতার হাসির রেখা ঠেঁাটের কোলে রেখে বলতে হয়—একটু কাজ আছে!

আমাদের ওখানে কবে আসছেন?

সময় করে যাবোখন সামনের সপ্তাহে, শেখরবাবুকে বলবেন কেমন।

আচ্ছা।—আরো একটু ঘেঁষে তার সীটের কোণ ধরে কেন দাঁড়িয়ে রইলেন দীননাথবাবু। সে যদি বসতে বলে তার পাশে, এই আশায় এক নজর দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার বলে উঠেছিল সেদিন, ভদ্রলোক বোধহয় আশা করছেন বসতে বলবে সে; এ ভাবনায় হাসি পেলেও বিশাখা বৌদির প্রাতঃকালীন ইঙ্গিতটা মনে উঁকি দিয়েছিল। আর তৎক্ষণাৎই তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। খালি যখন—

আশপাশ নজর করে দীননাথ এক তৃপ্তিসূচক হাসি হেসে বলেছিল, লেডিস্ সীট কিনা তাই একটু......কতদূর যাবেন?

আপাততঃ ধর্মতলা। তারপর ডালহৌসী যাবার ইচ্ছে আছে।

নাটক কেমন হবে মনে হয়?

ভালই।

আচ্ছা ফিল্মে নামছেন না কেন আপনি?

ভাবিনি ও সম্বন্ধে এখনও।

সুন্দর অভিনয় করেন কিন্তু আপনি, আর ক্যামেরা ফিটিং ফেস্ আপনার, আমার এক বন্ধু আছে এক স্টুডিওতে, যদি—

সময় হলে বলবো বইকি! কেমন যেন অভিনয়সুলভ ভাবালু স্বর আর দৃষ্টিতে দীননাথকে স্তব্ধ করেছিল অনুরাধা।

আশ্চর্য কিন্তু, তার ঐ দৃষ্টি আর কথার শেষে দীননাথ হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটু স্পর্শের প্রত্যাশায় ওর শরীরের সমস্ত স্বাভাবিকতা দ্রুত স্নায়ু কম্পনে ধূসর হয়ে উঠেছিল।

আজ এ-কথা মনে পড়তেই অনুরাধার হাসি পেল। কত দুর্বল পুরুষের মত নারীর সঙ্গের কাছে! ঐ ছেলেটি দীননাথের মতই হয়ত। আড়ে আর একবার দেখল অনুরাধা ছেলেটিকে। আর চকিতে মনের প্রশ্ন উঠলো,

কি করে ছেলেটি, বয়স বোধহয় ২২।২৩ হবে। চুলগুলো কিন্তু ফ্যাসন করে কাটা। দারিদ্র্য খুব নেই। বোধহয় আর্টসের ছাত্র কিংবা নতুন কেরানী। বাড়ীতে বাবা মা নিশ্চয় আছেন। বাবা Bank কিংবা Chamber-এর আওতায় কোন সওদাগরী অফিসে চাকরীও করতে পারেন। অধ্যাপকও তো হতে পারেন?—আচ্ছা ওর সঙ্গে নিশ্চয় এখনও কোন মেয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। হলে অমনতরো হ্যাংলামিতে দ্বিধা আসতো।—ছেলেমানুষ, নেহাতই অপরিণত মন—এ-বাদামটা বেশ লাগছে।

আমরা তাহলে এখন কজন রইলাম বসে?

রাম দুই তিন—

গুনছেন, গুনুন, কিন্তু হিসেব করে গুনবেন।

আপনি দেখছি আষাঢ়ে মার্কা কথা ছাড়ছেন।

শ্রাবণের ধারার মত কি বর্ষণ হলো মশায়। এ নেহাতই ভরা আষাঢ়। যদিও আজ ১৯শে শ্রাবণ।

আগামী ২২শে শ্রাবণ তাহলে পরশু।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামী পরশুর পরদিন সকালে সমাজের মানিগুণীরা নিমতলায় যাবেন। সেখানে কবিগুরুর উদ্দেশে পুষ্পস্তবক, মাল্য ইত্যাদি অর্পণ করে তর্পণ করবেন। তারপর সংগীত, নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান মারফত আমাদের বৈকালিক জনচিত্তের তৃপ্তি সাধনের সংগে ঐ মহামানবের তিরোভাব দিবসটির স্মরণীয় প্রচারে তৎপর হবেন শিল্পী সমাজ।

বেশ বলছেন তো মশায়; আপনি দেখছি কোন বিশেষ ধারার বক্তা।

বক্তা বা আলোচক নই মশায়। স্রেফ রেডিও! দিনরাত মশায় বাড়ীর আশপাশ এবং বাড়ীতে আপনার ঐ ধারাবিবরণীর জ্বালায় যৎকিঞ্চিৎ অভ্যাস আর কি—

বেশ বেশ! মন্দ কিন্তু কাটছে না।

তা কাটছে না বটে, তবে আগে এবং পরে দুটো বিন্দুর টানা পোড়েনে মন মাঝে মাঝে বড্ড উচাটন হচ্ছে যে!

ভদ্রলোকটি বেশ রসিক ব্যক্তি তো, বেশ হাসাতে পারেন--অনুরাধা ঘাড়টা পিছন দিকে ঈষৎ ফেরালো—

ঐ টাক মাথা মাঝ বয়েসী ফর্সা মানুষটি—চেহারাটিও একটা টাইপ--ভাল কৌতুক অভিনেতা হতে পারেন কিন্তু!—

এই ধরুন না কেন, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু দৃষ্টিটা ও'র তার দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে ধাক্কা খেলো। তাকে দেখলেন একনজরে অনুরাধা এবার সংকুচিত হয়ে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলো।

কি বলছিলেন বলুন না?

বলছিলাম এক থিয়েটার দেখতে যাচ্ছিলাম। অবশ্য পাশে। থিয়েটার না হয় দেখা হলো না। যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের কাছে এই বৃষ্টি আমার অনুপস্থিতির কারণ বিশ্বাসযোগ্য হলেও হতে পারে। ভবিষ্যতে কিন্তু গৃহিণীর দুশ্চিন্তার কারক হতে হবে ভেবে মাঝে মাঝে মনটা উচাটন—

আবার হাসি!—বেশ কয়েকজনের হাসির সংগে তারও হাসি—মুখ নীচু করে হাসিটা গোপনে তৎপর হল অনুরাধা।

ও পাশে হঠাৎ কে যেন আবার উচ্চস্বর তুললে—

ও দরদী আগে জানলে পরে
তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না-রে—

বেমানান! মাত্রাজ্ঞান রাখা উচিত। কিন্তু আমরা কত নিরুপায়! কিছুতেই মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখতে পারিনে। দৈব ও পুরুষকার মেলানো বড় শক্ত ব্যাপার।

ও মস্ত সাধনার জিনিস!

তা বটে, তবে সাধনার শোধনও প্রয়োজনীয়।

তন্ত্রের কথা বলছেন বুঝি! বেশ বেশ--ভারী মেজাজী জিনিস কিন্তু মহাশয়।—বৃদ্ধ মানুষটির উৎফুল্ল স্বর।

অনুরাধার চোখটাকে আবার টেনে নিয়ে গেল ঐ ছেলেটির পাশে বৃদ্ধের মুখের ওপর।—ছেলেটা কিন্তু তখনও ঐ—নাঃ বড্ড বেহায়া!

তন্ত্রটন্ত্র ঠিক বুঝি না আর বলছিও না। বলছিলাম আমাদের বর্তমানিক অবস্থা—তন্ত্রের

যে সাধনা করছি অর্থাৎ এইভাবে ঘণ্টা কাবার করে গতিবিহীন মোটরবাসে বসে থাকার শোধনের কথা—মানে বাড়ী যাওয়া চেষ্টা না করলে সেই মৎকথিত গৃহিণীর দুঃশ্চিন্তার কারণই সিদ্ধ হয়ে উঠবে যে! কি করা যায় বলুন তো?

আবার হাসি ওঠে।

বৃদ্ধটি চুপ হয়ে মুখ নীচু করে বোধহয় পকেটে বিড়ি খুঁজতে থাকলেন।

অনুরাধার চোখ একবার ওদিকে ঐ টাক মাথায় লোকটির দিকে নজর করে আবার রাস্তার দিকে ফিরে গেল। এক ঝলক হাসি সামলাতে মুখ চাপা দিতে হয়। ভিজে হাওয়ার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি মুখমণ্ডলে স্পর্শ রাখলো। টুপ টাপ শব্দও কানে বাজলো। কয়েকটা তরুণ ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ করতে করতে তাদের বাসের গায়ে দু-একটা শব্দ তুলল। একজন শিস দিলে। কলকাতার শিস্—একটা কদর্য ইঙ্গিত আছে ঐ শিস্‌টার!—জারজ আশ্রয়হীনদের মত।

শেখরবাবু একদিন রাগ করে পার্ট বোঝাচ্ছিলেন—চরিত্রটা আগে বোঝো; ভাষার উচ্চারণ মনে মনে মিলিয়ে নাও রামবাগান আর কলাবাগানের মিশ্রিত ধ্বনি—সে লিয়ে লে! বাট্ দিচ্ছিস্ মাইরি—জান কবলু—মোসি তোর দিব্বি;

এমনি এক নীচের তলার মানুষদের জীবননাট্যের একটা চিত্র। ঐ শিস্‌টা;—না বড্ড অন্যায় হয়ে গেল, বাড়ীর কাছ থেকে ট্যাক্সি নিলেই হত।

অনুরাধার মন অসোয়াস্তি বোধ করে।—কালই দেখা করতে হবে, মাপ চাইবে সে শেখর-বাবুর কাছে।—কি করবো বলুন, অমন বৃষ্টি আমি জন্মেও দেখিনি। কয়েক ঘণ্টা আটক! শেখরবাবু বুঝবেন নিশ্চয়। বিশ্বাসও করবেন। হাজার হোক শিক্ষিত অভিজাত বংশের ছেলে।

বৌটি কিন্তু বেশ শেখরবাবুর। স্বামীকে সন্দেহ নেই, অনুযোগ নেই। নিজের গান-বাজনা আর গানের ওস্তাদ নিয়ে দিন কাটায় ভদ্রমহিলা। ব্যবহারও চমৎকার—

আপনি কিন্তু ভাই বেশ দেখতে!

তাই বুঝি।

হ্যাঁ, দেখবেন কুড়ি বছর আরো যেন ধরে রাখতে পারেন এই রূপটাকে। মৃদু হাসির সঙ্গে বুদ্ধি দীপ্ত ভঙ্গি ভদ্রমহিলার। কথা বলতে ইচ্ছে করে আর শুনতে আরো বেশী করে ইচ্ছে যায়। বিশাখা বৌদির মত রসিকতা নয়। ওর কথার রস দূরে ঠেলে দেয়। কাছে টানে না।

শেখরবাবু স্ত্রীর কথায় কথা বলতে বলে।—ধরা যায় বুঝি!—না জানার ভঙ্গিতে কথায় ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে করেছিল অনুরাধার সেদিন।

—যায় বইকি! যদি রাঁধিব বাড়িবো ব্যাঞ্জনও করিব, হাঁড়ি ছোঁবনার ভঙ্গি রপ্ত করা যায়।

বাঃ বেশ বললেন তো আপনি!

—আমি কি বলি, উনি যে বলান! সরস হাসির সঙ্গে ভদ্রমহিলার দৃষ্টিটা শেখরবাবুর মুখের ওপর এক পলক ছুঁয়ে আসে।

—শেখরবাবুও আপনার প্রশংসা করার সুযোগ পেলেই করেন কিন্তু। শেখরবাবুকে আপনি তো খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন?

—তা করতে হয়। নৈলে অনাথিনী হয়ে যে পথে পথে ভাগ্যের পেছু পেছু ছুটতে হবে। মানলে যদি দু দণ্ড শান্তিতে সুর পাওয়া যায়, না মেনে অ-সুরকে ডেকে ইহকাল নষ্ট করি কেন!

—আচ্ছা আপনি গানও তো ভালবাসেন না?

হ্যাঁ।

তাহলে সময় পেলে সোজা চলে আসবেন না আমার ওখানে।

যাবো।—কথা দিয়েছিল অনুরাধা সেবার অভিনয় শেষে। কিন্তু আজও যেতে পারেনি। —জিব কাটলো অনুরাধা—না বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে! এবার একদিন সত্যি যেতে হবে শেখরবাবুর বাড়ী। বাড়ীটা ও'দের বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। কত নম্বর যেন? ভুলে মেরেছে—ছ্যা কি লজ্জার কথা!—আপশোস করে ওঠে অনুরাধার মন। অমন আত্মীয়সুলভ ব্যবহার, অথচ যোগা-যোগ ঠিকমত রাখতে পারে না সে। তারই বা দোষ কি! একটার পর একটা কাজ। অবসর কোথায়! শুধু অর্থ রোজগারের জন্য সময় ব্যয়। জীবনটার আর কি কোন মানে নেই?—বিয়ে করলে?—

কি হতো আর! তার মত মেয়ের ভাগ্যে বড় জোর বিশাখা বৌদির বিবাহিত জীবনটা জুটতো—শুধু পীড়িত দেহকামনায় ক্লান্ত জের টেনে আবার দেহকামনার লালন। কিছু সন্তান-সন্ততির তথাকথিত জননী-নামার্জন। কিন্তু সে তো মাতৃ-রসাস্বাদনের চরম হত্যারই পুনরাবৃত্তি হতো। হয়তো দেহটাই বড় হয়ে উঠতো। ওর ক্ষুধা মেটাতে মেটাতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো মনের সজীবতা।

তবু কি প্রয়োজন নেই? অনুভব করেনি কি সে—মনের সামনাসামনি হয়ে কে যেন তাকে প্রশ্ন করলো।

কে, ও কে?—ইচ্ছা। যৌবন ইচ্ছা। একটি বলিষ্ঠ পুরুষ দেহ। তার ইস্পাতসুলভ পেশীর আলিঙ্গনে নিজের সব উত্তাপের পরিসমাপ্তির চিন্তা কি আসেনি মনে?

এ-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য উত্তাপের ঝলক এলো যেন অনুরাধার সারা দেহে। নিজেকে কেমন যেন পীড়িত বোধ করল সে। দেহটা সীটের কোনটাকে আশ্রয় করে কুঁকড়োতে চাইলো—ও একটু বেমানানভাবেই পা দুটো সীটের ওপর তুললে। তারপর মন নিজের তাগিদেই হাঁটু মাথা এক করে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করতে ব্যস্ত হলো। অন্ধকার! মনের এ-অন্ধকারে আপাততঃ কোন রূপ নেই। তবু ওর ভাষায় এক অপরূপ রূপের অস্তিত্ব—একা একা কথা বলে অনুরাধা। ইচ্ছে হয় ওকে আঁকড়ে ধরতে। রূপ দিতে। হয়ত এটাই তার একান্ত সুপ্ত বাসনা। এ-বাসনা আলোর লজ্জায় লজ্জাবতী। অন্ধকারে ঠারে ঠোরে ইঙ্গিতে তাকে নিয়ে খেলা করে—একটা জোর গরম নিঃশ্বাস তার হাতের ওপর স্পর্শ রাখলো। মাথা তুললো অনুরাধা, তারপর ধূসর চাহনিতে চারপাশ একবার চাইলো—

ঐ ছেলেটার মুখ না?—ঝাপসা॥ স্পষ্ট নয়।

—মুখ ঘুরিয়ে আবার রাস্তার দিকে চাইলো অনুরাধা। তারপর দৃষ্টিটা ঘোলা জল থেকে উঠে শুক্লা সন্ধ্যার ভিজে গম্ভীর আকাশের গায়ে স্থির হলো। কানে এলো পাশের সীটের যাত্রীদের মৃদু আলাপন—আগুন খেলে আংরা জন্ম নেবে। লুটে পুটে খাচ্ছে। থাক। তবে ও-আগুন খেলে—

পেছনের সীটে কে যেন ঘেঁষে বসলো। মাথার খোঁপায় একটা হাতের কোনের মৃদু ধাক্কা পেলো অনুরাধা।

দুঃখিত!—আবার সরে গেল যেন গা ঘেঁষে বসা লোকটা।

দেহ চেতনাটা কি শুধু মেয়েদেরই?—প্রশ্ন জাগে।

—না পুরুষদের লজ্জা আছে। আর সে লজ্জা দেহ চেতনা থেকেই।

আজ কিন্তু মনটা তার বড় যেন বিচার করছে। ভাবছেও।

কেন?

হয়ত অবসর কিংবা বয়সটা বাড়ছে।

বয়স?

বয়স? খুব বেশী হলো কি? ২৬ সবে। আজকাল তো অনেক মেয়েই তিরিশ পেরিয়ে বিয়ে করছে।

সেদিন আলিপুরের মঞ্জুলিকাদির বিয়ে হয়ে গেল। চল্লিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ছেলেটির বয়স পঁচিশ।

কেন বিয়ে করলে ছেলেটি বুড়ি মঞ্জুলিকাকে?

বোধহয় বাড়ী আর মাসান্তে মোটা মাইনেটার জন্যে।

বিশাখা বৌদির সুবাদে আলাপ মঞ্জুলিকাদির সঙ্গে। নিমন্ত্রণটাও সেই উপলক্ষেঃ

যেও কিন্তু ভাই। তোমরাই তো সব। কে আর আছে আমার। মা বাবা কাশীতে। ভাইটাও বিদেশে! তোমরা একটু খেটে খুটে দিয়ে এসো ভাই।

—আমরা নিশ্চয়ই যাবো গো মঞ্জুদি। তা পাত্রটি কেমন দেখতে? নিজের পছন্দ নিশ্চয়? বয়স কত—বিশাখা বৌদি সেদিন চোখ মুখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

পাত্র ভালই রে—ফাঁক ফাঁক দাঁতগুলো বের করে হেসে বলেছিল মঞ্জুলিকা সেন—দেখতে শুনতে খারাপ হবে না। আচ্ছা আসিস কিন্তু তোরা।

নিশ্চয়।—সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিশাখা বৌদি চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, চল্লিশ বছরে বিয়ের হুঁস, বাবারে বাবা, কালে কালে কি হলো!—তা ঠাকুরঝি একটা কিছু...

তাতো ব্যবস্থা করতেই হবে। নিমন্ত্রণ যখন।—

যাচ্ছো কোথায়। দাঁড়াও না একটা কথা বলি কানে কানে!

সেই সব কথা তো...শুনবো পরে—একটু কাজ আছে এখন...

সত্যি ঠাকুরঝি তুমি যেন কি। এদিকে কত চরিত্রের অভিনয় কর আর নিজের চরিত্রে আসতে অত সঙ্কোচ কেন? কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে নিজের কথা বলতে, রসের গালগল্প করতে তুমি অমন এড়িয়ে যাও কেন বলতো?

সত্যি বৌদি কাজ আছে। একটু তাড়া আছে। ফিরে শুনবো।

তোমার ফেরা তো! রাত এগারোটার আগে নয়। তখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাবো কোন দুঃখে গো। না, আমার কি মানুষ নেই।—সাপ-ব্যাঙ যাই হোক একটা আছে তো,—ওর দাম অনেক তখন। তুমি কি বুঝবে ঠাকুরঝি, বরের পাশে যদি শুতে...

এই বৌদি। একটু আস্তে কথা বল না, বাচ্চাগুলো রয়েছে যে।

থাক না। কি এমন বললাম যে বাচ্চারা শুনলে ওদের মন নোংরা হবে? ও ধরনের নীতি-বাদিনী হয়ো না, এখন থেকে বিধবা পিসীর মন করো না ঠাকুরঝি, পরে নিজেই কষ্ট পাবে। খুলে মেলে কথা বলবে, শুনবে--তবেই তো! তা না, যতসব সৌখিন ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাব্যি করে মনের কথা বলবে,—বৌদি তোমার বিবাহিত জীবনে স্মরণীয় দিনটি একটু শোনাবে!—সৌখিন নেকামি দেখে আজকাল বড্ড গা জ্বলে।

তুমি বুঝি প্রেমের ন্যাকামি করনি লেকের ধারে?

সে এক দিন ছিল! তখন কি জানতাম এতো মজা, এত জ্বালা আছে এ জীবনে। জানতাম

না বললেই তো স্বপ্নের মত কথা বলতাম! এখন জেনেছি, মজেছি, জ্বলেছি তাইতো—খোলাখুলি বলতে চাই! হেলা করে যতই বল না তুমি, আমার কালচার নেই, তবু বলবো সব কালচার গুলে খাওয়া হয়ে গেছে আমার!

বিশাখা বৌদির কথাগুলো কিন্তু অনেক আন্তরিক। ঘাড় নেড়ে এড়ানোর জন্যে নিজের কাজে চলে গেলেও মনে দাগ কাটে। বিশাখা বৌদি অনেক সোজা, অনেক ভালো! মমতাও আছে নিশ্চয় তার জন্যে; ভাবে নিশ্চয় তার ভালোর কথা?—কে জানে! কিন্তু সময় সময় এমন করে—

সেদিন খেতে বসার সময় পিন্টু আবদার করলো—

আমি একটু দুধ খাবো মা।

না পিন্টু—ও পিসিমার।

আমি খাবো, দুধ দা—ও। পিন্টু বায়নার সুর তুলতেই বিশাখা বৌদি সোজা উঠে দু-চার চাপড় পিঠে কষিয়ে ধমক দিলে—হতভাগা দুধ খাবে; যেমন বাপ পেয়েছো তেমনি তো নোলায় জুটবে!—বাপকে গিয়ে বল্ না রোজগার বেশী করতে!

প্রচ্ছন্ন এক ঘৃণার ইঙ্গিত—অভাব-পীড়িত স্ত্রী তার স্বামীকে ঘৃণা করছে!—কি অসহ্য! কিন্তু সেকি মানুষ নয়, সে কি আত্মীয় নয়?

না। বুক চেরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।—না না গায়ে মাখতে নেই, মাখলেই যে মিশতে হয়।—মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।—মনে পড়ে ছবিটাঃ

অপুষ্ট বাচ্চা—পিন্টুটার চোখে মুখে সদ্য ঘুম-কাড়া বিরক্তি।—তবু ও নিশ্চিন্ত আরম্ভে প্রয়াসী। দুধে ওর রুচি। সামনে দুধের বাটিও দেখেছে। তাই বায়না।

—মার বিরক্তি। রাগও ঘন হয় পরিশ্রান্ত দেহের জন্য।—ঘুম তারও পেয়েছে—বিস্ফোরণটা তাই—অদ্ভুত সিচ্যুয়েশন; মূক অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণই কম বিরক্তিকর ব্যাপার। তারও ভাল লাগছে না। ক্লান্তি, সারা দিন খেটে তারও ঘুম পেয়েছে। তাই নিজের মত করে চুপচাপ খাওয়া শেষ করে দুধটা রেখে উঠে পড়ছিল সে।

তখনই বিশাখা বৌদি কথার সুরে বিরক্তি রেখে বলে উঠেছিল, দুধটা পড়ে রইলো কেন, ওটা খেয়ে যাও।

পিন্টুকে দাও, ও খাক্।

না, পিন্টুর খাটুনি অনেক কম। তোমার পরিশ্রম অনেক বেশী -রোজগার করে আনতে হয় তোমাকে।

এ সব কথা বলো না বৌদি......ভাল লাগে না, কষ্ট হয় শুনলে।

ভাল না লাগলেও তোমায় খেতে হবে ঠাকুরঝি। হাতটা সজোরে চেপে ধরেছিল বিশাখা বৌদি।

তারও বিরক্তি আসে, একটা জোর আসে কোথা থেকে যেন—সবেগে বিশাখা বৌদির হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে সে সোজা চলে গিয়েছিল কলতলায়।

কানে এসেছিল,

দয়া, দয়া করছে যে হতভাগা ছেলে, দয়ায় বাঁচবি হতভাগা ছেলে কোথাকার!—যেমন বাপ তার......

ছুটে এসেছিল তখনই অনুরাধা—একি করছো বৌদি, বাচ্চাটাকে শুধু শুধু মারছো কেন?

কে'ন মারছি এ কথা তুমি বুঝবে কি করে—বিয়ে করেছো তুমি যে বলবো! বলবো না। বেশ করছি মারছি, আরো মারবো—আমার যত খুসি, গর্ভযন্ত্রণা আমারই ছিল যে!

কি হয়েছে,—নীরব মানুষটিও সচকিত হয়ে উঠেছিল। বড়দা রান্নাঘরের দরজার কাছে ঐ সময় এসে বলে উঠেছিল, স্বরটা একটু নমনীয় করলে ক্ষতি কি!

আর যায় কোথা; বাড়ী মাথায় করা স্বরে বিশাখা বৌদি দাদাকে তেড়ে গিয়েছিল—নমনীয়! মাথায় ঝাড়ু তোমার, কি বুদ্ধি! ঐ বুদ্ধি নিয়ে গলায় দড়ি দাওগে! বোন রোজগার করে আনবে বিয়ে থা না করে। আর উনি ভোগরাগ আরতি চালাবেন তাতে, বলিহারী যাই রে! যাও যাও দেহফলারের ফলকে বাঁচাতে চাও তো রোজগার বাড়াও গে। যা আয় করো তাতে দেহভোগের বিলাস মানায় না!— ঝাড়ু মারো অমন স্বামীগিরির! বেরোও আমার সামনে থেকে—

দাদা সরে যাওয়ার আগে সে নিজেই মাথা নীচু করে ফিরে গিয়েছিল লজ্জায়। তারপর ঘরের মধ্যে এসে বিছানা নিয়ে একা একা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল সেদিন।

মা ছিলেন জেগে। কিন্তু আশ্চর্য কিছুই বললেন না! নিশ্চুপ হরিনামের ঝোলায় জপ পরিক্রমায় তৎপরই ছিলেন। বিশাখা বৌদি আরো কিছু সময় চিৎকার করেছিল একা একাই। দাদা পিণ্টুর বোধ হয় বিস্ময়ে, কি ভয়ে—কে জানে—আর টু শব্দ শোনা যায়নি।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তার ঘুমতে সেদিন, পরের দিন খুব সহজ লাগেনি মনটা ঘুম ভাঙার পরও।

ক্লান্তি। ভাল না লাগার একটা মেজাজ।

বেলা হলো অনেক। উঠে পড়।—সহজ গলা মার।

ভাল লাগছে না।

জ্বরটর হয়নি তো?

না মা না, এমনিই ভাল লাগছে না—

সত্যিই একটা দিন আসে যেন কিছুই ভাল লাগে না। সময় সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত চুপচাপ একা একা বসে থাকতে ভাল লাগে।

অনুরাধার চকিতে মনে হলো, আজকে কিন্তু বেশ গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠা থেকে হঠাৎ ক্ষান্তি দিলো বৃষ্টিটা। আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দোবো মেপে—

হয়ত বৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু, অনেক ভাবে দেয় বলেই ছেলে-বয়সের মনটা বুড়ো বয়সে অনেক সময় জেগে ওঠে। ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে করে।

বিশাখা বৌদি এখনও হুড়োহুড়ি করতে চায়। অতো রাগ, অতো ক্ষোভের মধ্যেও বিশাখা বৌদি হিহি করে হাসে তাকে ভিজিয়ে দিয়েও—

কি হচ্ছে বৌদি! কাল যে বেরুতে হবে ঐ কাপড়েই।

না শুকুলে বেরুবে না! একটু না হয় আরাম করো না আজ খোলামেলা দুষ্টুমিতে। আনন্দে একপাক্ ঘুরে নেয় বিশাখা বৌদি।

আড়ষ্ট থেকে সেও তো ঐ বৃষ্টির মধ্যে বিশাখা বৌদির চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে হুটোপাটি করেছিল সেদিন।

বুড়ো বয়সে কি! পল্টুটা পাকামি ভঙ্গিতে মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে ছাতা মাথায় বেরুতে যাচ্ছিল—

হঠাৎ তার গায়ে এক ঘটি জল ছুঁড়েছিল বিশাখা বৌদি: আমরা ভিজছি তুমি না হয় আমাদের সঙ্গে ভিজে গেলে—হি হি উচ্চ হাসি শুনে মাও সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে রোয়াকটায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর ঐ অবস্থা দেখে বিস্ময়তৃপ্ত হাসি হেসে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে মালা জপতে জপতে।

তৃপ্ত হয়েছিল সেদিন অনুরাধা। বিশাখা বৌদির বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভবিদ্বেষের চিহ্ন ছিল না সেদিনটায়। কোন আড়ষ্টতাই আসেনি। সহজ লেগেছিস। কিন্তু আবার তো সেই রুগ্ন চেহারার ভঙ্গিটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

কে জানে, বিশাখা বৌদি একথা নিশ্চয় মনে মনে ভাবে আমার রোজগারের ভাগিদার পিন্টুরা থাকবে কেন। ছিঃ ছিঃ এ-কথা কি কোন সময় ভাবতে পারে, না না এ কথা ভাবা যায় না, অমানুষেরাই ভাবে।

নিজের স্বার্থ মানুষ দেখবে বৈকি, অপর স্বার্থকে অনাত্মীয় করে নয়। এ বিশ্বাস আজও আছে। কিন্তু এ কি বলে বোঝানো যায়! এ কথা মনে হতেই অনুরাধা একটু সহজ হয়ে বসল। তারপর নিজের খেয়ালে ঘড়টা নেড়ে মনে মনে বলেছে, না না যায় না। আচরণই প্রমাণ। সত্যিই তো, তার আচরণই প্রমাণ করবে! হয়ত ম্লান চেতনে নিজের স্বার্থটাই প্রধান। হয়ত তার আচরণে অমন ভাব ধরা পড়েছে বৌদির কাছে—হতে পারে! সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল এবার অনুরাধা। তারপর হাঁটু থেকে মাথাটা তুলে ঘোরালো পশ্চিম দিকে, লম্বাসারির সীটের সেই ছেলেটির দিকে দৃষ্টিটা গেল।

এবার স্পষ্ট। বোকা ফর্সা মুখ। কিন্তু থকথকে কামনা ভরা চোখ। একটু ইন্ধন জোগালে ফেটে পড়বে। অনুরাধার মন লঘু দুষ্টুমির রেখায় ছবি করতে চায়—চকিতে শাসনও আসে—না না ও সব করে নতুন ঝঞ্ঝাট ডেকে কোন লাভ নেই।

দেহকে উপলক্ষ্য করে সেতুবন্ধন না করাই ভাল।

কিন্তু করছে তো আজকাল। জ্যোতিকণা, সুদেষ্ণা তো স্পষ্ট গলায় বলতে দ্বিধা করে না—দেহটাই সব, ওর জন্যেই সব কিছু। ওর আনন্দে সব আনন্দ।

নোংরা পরিবেশ থেকে আসেনি ওরা নাটকের জগতে। শিক্ষা পেয়েছে কিছু। স্কুলের শেষ পরীক্ষাও দিয়েছে ওরা কেউ কেউ। কলেজেও তার মত কেউ কেউ গেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী না পড়ুক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্ম অনুসরণ না করুক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর ভাঁজে। সিনেমার গানও গায়। আবার পান্নালালের কাওয়ালী গীতেও মজে উঠে ঐ জ্যোতিকণা, সুদেষ্ণারা। ওরা সৌখিনতা আর অর্থকামনার জন্যে সখের থিয়েটারে পার্ট নেয়। যাত্রাদলেও কেউ কেউ অভিনয় করে। আবার ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিম, প্রিয়তোষ, সত্যসাধনদের সঙ্গ অনেক সত্য। ট্যাক্সিতে ঘুরতে বের হয় ওরা জোড়ায় জোড়ায়। রাত গভীরে বাড়ী ফেরে পুরুষ সঙ্গের আবেশ নিয়ে! বলতে সঙ্কোচ নেই। পুরুষ সঙ্গীকে বোকা বানানোর গল্প করতে ইনিয়ে বিনিয়ে ভালওবাসে বেশী,—কুমারী বিলাসে বিলাসিনী থেকে এয়োতির ছিটে ফোঁটা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—ওদের ক্লান্তি নেই। ভাল লাগে বোধ হয়।

তারও যে ভাল লাগে না এমন নয়, তবে লজ্জা করে রুচির কাছে। মনে পড়ে সুদেষ্ণার কথা:

জানো ভাই, বধ করতে একটু বদমায়েসি করতে হয়—সুদেষ্ণা তির্যক চাহনি হেনে তাকে একদিন বলেছিল সান সাইন ক্লাবে বসে ফিস্ ফিস্ স্বরে।

নতুন কেউ বুঝি বধ হলো? সেও ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠেছিল।

নতুনেই তো মজা। চলো না একটু চা খেয়ে আসি। যাবে?

চল। উঠতে হয়েছিল একা একা মেয়েলী কথা শুনতে। পুরুষ মানুষদের সামনে ঠিক—

স্মার্ট কিন্তু সুদেষ্ণা। রংটা ময়লা। কিন্তু জেল্লা আছে। লম্বা পুরুষেটা দেহ ওর—যৌবনকে খুলে মেলে দেখার চেষ্টার ভঙ্গিতে শাড়ী ব্লাউজ পরে। থাকে দমদমের এক কলোনীতে। বেশীর ভাগ সময়ই ট্যাক্সি চেপে যাওয়া আসা করে। পয়সা যোগায় ওর পুরুষ বন্ধুরা। চাকিতে অনুরাধার কানেতে পিঁপড়ের মত মৃদু সরসরে সুদেষ্ণার কথাগুলো বাজলো,—পার্ক স্ট্রীটে এক হোটেলে কাল রাতে সে ভাই কি কাণ্ডই না করলে ঐ বোকা প্রদীপটা। কাঁচা পয়সা কামাচ্ছে তো খুব এখনও! হুস্ কম তাই পয়সার। বললাম, সামান্য খাও।

কি খাওয়া?

লাইমজীন! দাঁড়াও বলছি, আগে চলো খোপে গিয়ে বসি।

তারপর রেস্তরার খোপ। ছোট্ট পাখা, গুনগুনে একটা আওয়াজ। আরাম করে বসে সুদেষ্ণাকে প্রশ্ন করেছিল সে, প্রদীপটি কে?

আমার এক বন্ধু! কয়েক বছর আগে এক জলসায় আলাপ হয়েছিল। ব্যবসাদার। আবার সৌখিনও। তবে মেয়েমানুষে বড্ড আসক্তি!

আচ্ছা সুদেষ্ণা, এ সব করতে ভাল লাগে?—আচমকা প্রশ্ন করেছিল সে।

কোন সব?

মানে বিভিন্ন পুরুষ মানুষদের সঙ্গে অযথা একা একা ঘুরে বেড়ানোর কথা বলছিলাম আর কি।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সুদেষ্ণা, তারপর আচমকা হেসে বলে উঠেছিল, অভিনেত্রী জীবন যে! এর সাথেই তো নাটক করি ভাই—

কি দেবো।—তাদের খোপের মধ্যে ওসময় বয় উঁকি দিয়েছিল।

চা তো দেবেই। আর, কি দেবে ভাই তুমিই বল না?—সুদেষ্ণা বলে উঠেছিল।

যা হোক।

যা হোক আবার কি, একটা কিছুর নাম করো। কেক্ নিশ্চয় নয়, আচ্ছা দুটো চিংড়ির কাটলেট নিয়ে এসো খোকা।

ফাউল খান না।

না, ফাউল নয়, চিংড়িই।

রেস্তরার ছেলেটা চলে গেলে সুদেষ্ণা মুখ ভেংচে বলে উঠেছিল—ফাউল না হাতী, দেবে পায়রা!

পায়রা!

হ্যাঁ। পায়রাই, গোলা পায়রাগুলো ফাউল হিসেবে চলছে—ফাউললোভীরা ফাউল নামেই সন্তুষ্ট। দোকানদাররা মোটা লাভ তুলবে অথচ সস্তা দিতে হবে, তাই পায়রা চলছে ফাউল হিসেবে বুঝলে এবার! দিনকাল এখন ভেজালের! সবেই ভেজাল আমাদের মনেও। ভাল-বাসি কিনা তাই বুঝি না। কেউ যদি সঙ্গ চায়, আমার যদি খারাপ না লাগে, যদি সময় থাকে তার সঙ্গে সময় কাটাই। প্রদীপকে সময় সময় আমার বেশ লাগে। তবে মাঝে মাঝে বড্ড উত্যক্ত করে বেশী মাত্রায় খেলেটেলে।

তুমিও মদ খাও ?

ঠিক খাই না, তবে একেবারে ছুঁচিবাই নেই! মাঝে মধ্যে সঙ্গীর অনুরোধ রাখতে হয় বৈকি। যখন যেমন, তখন নিরুপায়!—অসরল হাসার চেষ্টা ছিল সুদেষ্ণার।

বাড়ীতে কেউ জানে ?

না।

তোমার মা আছেন ?

আছেন, কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন অনুরাধা ?

এমনিই। যাক বলো, তোমার প্রদীপের গল্পই বল।

গল্প তেমন কিছুই নয়, তবে সেদিন ট্যাক্সিতে বড় বেকায়দায় ফেলেছিল। বড় দেহ লোভী হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই আর বাগমানাতে পারিনে- সবে সন্ধ্যে রাত, রাস্তায় লোক গিজ্ গিজ্ করছে, ট্যাক্সিতে অমন করে জড়ালে—

লজ্জা করছিল বুঝি ?

থমকে গিয়েছিল একটু সুদেষ্ণা। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করছিল যেন। ম্লান হেসে বলে উঠেছিল,—লজ্জা! তা বোধ হয় হবে, অতো আলো, অতো লোক—উষ্ণতা আসেনি, লজ্জাতেই থাকতে পারিনি। জোর করে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থামিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি একটা রিকসায় উঠে পড়েছিলাম।

প্রদীপ আসেনি!

না। ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও রাস্তার লোক দেখে, নৈলে ঠিক টেনে নিয়ে যেতো।

কাঁপা কাঁপা স্বরে তখনই টেবিলে কনুই রেখে সুদেষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে অনুরাধা জিজ্ঞাসা করেছিল—দেহটা নিয়ে সঙ্গীরা যখন টানাটানি করতে চায় তখন কি তোমার ভয় করে, না রোমাঞ্চ লাগে ?—অদ্ভুতভাবেই সেদিন সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে।

সুদেষ্ণা বলেছিল,—দুটোই হয় ভাই।

দেহ দিয়েছো কোনদিন—চুপি চুপি গরম নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করেছিল অনুরাধা।

হ্যাঁ।—মাথাটা কেমন যেন নীচু হয়ে গিয়েছিল সুদেষ্ণার।

কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চুপ। তারপর এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস-লাঞ্ছিত হাসিরেখ ঠোঁটের কোনে রেখে সুদেষ্ণা বলেছিল, ঘৃণা করবে তো এর পর থেকে আমাকে!

না না ঘৃণা করবো কেন শুধু শুধু তোমাকে।

কেনই বা করবে না। হাজার হোক এক ধরনের নোংরামি করছি তো!

মনে কর বুঝি নোংরামি ?

ঠিক মনে করি না, আবার করিও। দেখ ভাই অনুরাধা আমার ক্ষুধা আছে ; কিন্তু পরিবেশ আমাদের সোজাপথ দিলে না। আমার কি ইচ্ছে নেই ঘরসংসার করার ?—কান্না, রীতিমত কান্নার মতই সুদেষ্ণার কথাগুলো কানে বেজেছিল সেদিন।

মায়া লাগে। ইচ্ছে হয় ওর ঘর বেঁধে দিতে। কিন্তু সে তো ইচ্ছে। বাস্তবে ?

নানা জ্বলা ভাই! বাড়ীতে সবাই টাকা চায়। অভাব তাদের। কিন্তু আমার অভাবের কথা নিয়ে কেউ ভাবে না। তাদের ক্ষিদে আছে। আমি আমার সব কিছুর বিনিময়েই অর্থ রোজগার করে তাদের ক্ষিদে মেটাই। কিন্তু আমারও তো ক্ষিদে আছে—এ কথা কে শোনে ভাই। তাইতো সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। এ-কথা শেষে সুদেষ্ণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

ম্লান হেসে বলে উঠেছিল, নিজের ক্ষিদের খাদ্য রাস্তার বিভিন্ন দোকান থেকেই খুঁজে নিই ভাই। বলতে লজ্জা কি নিজের জনের মানুষের কাছে, এ দেহটার ভাই সৃষ্টি ক্ষমতা নেই। বন্ধ্যা করে নিয়েছি। সুতরাং দেহভয়ও নেই। যে মানুষ আমার দেহের টানে কাছে আসে, তাকে আমার ক্ষুধার সামগ্রী মনে হলে প্রশ্রয় দিই। নৈলে দীননাথকে যেমন কান মুলে চড় মেরেছিলাম এই সেদিন তেমনি—আবার হেসে উঠে সুদেষ্ণা খিলখিলে হাসি।

অবাক লাগে অনুরাধার। কত সোজা করে নিয়ে চলেছে সুদেষ্ণা জীবনটাকে। কিন্তু জ্বালা? জ্বালা তো ওরও কম নেই! একটার পর একটা মানুষকে ও প্রশ্রয় দিয়ে কাছে ডাকে। তারপর নিজেকে ভয়ে পালাতেও হয়। কিন্তু কতদিন পালাবে সুদেষ্ণা, কতদিন?

সত্যিই কতদিন এভাবে চলবে?

যত দিন চলে,—ম্লান হেসেছিল সুদেষ্ণা। চোখটায় মধ্যবিত্ত সুলভ মলিন দৃষ্টি। বড়লোক হবার বাসনায় ব্যর্থ এক অভিনেত্রীর চোখ—ভাল লাগে সুদেষ্ণার ঐ অসহায় ভাবটা!

চিংড়ি কাটলেট!

দাও। স্যালাড এত কম কেন? সুদেষ্ণা ম্লান চেতনতা থেকে নিজের মনকে সরিয়ে হঠাৎ খাদ্যরসিকার মতন খাবারের প্লেট কাছে টেনে ব্যস্ত স্বরে বলে উঠেছিল, আর দেরী নয়, তাড়াতাড়ি খোকা দুটো চা। শেখরবাবু হয়ত এসে গেছেন। বড্ড কড়া মাস্টার কিন্তু—নাও, এই যে মরিচ। ভেজায় অল্প ঝালটা ভাই বেশ।

হুঁ!—চকিতে অনুরাধার নুনঝালটার খেয়াল হলো, সজাগ হয়ে খুঁজলো সে।—নাঃ না পড়ে গেছে। যাক্—

আবার মুখ গুঁজলো অনুরাধা হাঁটুতে। মাথা ভার লাগছে যেন। সোজা হয়ে আর কতক্ষণ বসা যায়?

ভাল লাগছে না বাসের লোকগুলোর মুখ দেখতে। বড় আবোল তাবোল করে দেয় মনটাকে দৃষ্টিগুলো। সুদেষ্ণার মত বেপরোয়া হলে......?

না পারবে না সে। কি লাভ নতুন নতুন যন্ত্রণা কুড়িয়ে। বেশ আছে সে আপাততঃ। ভবিষ্যতে?

ভবিষ্যতের কথা কি করে ভাববে! কি হবে না হবে মানুষ বলতে পারে? হয়ত এমন তো হতে পারে, সেদিন যেমন সুদেষ্ণাই বললে,

আচ্ছা অনুরাধা আমাকে খুঁচিয়ে তো অনেক শুনলে আমার সম্বন্ধে। এবার তোমায় দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবো, বলবে তো?

বলো না কি বলতে চাও।—তবু ভয় করছিল তার। কি বলবে সুদেষ্ণা, বড্ড ঠোঁটকাটা।

কাটলেটর একটা অংশ চিবোচ্ছিল, ওটা গলাধঃকরণ করে তির্যক স্বরে বলে উঠেছিল,—তুমি কারোর প্রেমে পড়নি তো?

মুখটা নিচু করে বলেছিল সে—না।

তবে, নিজের কাছে অমন লজ্জাবতী কেন ভাই? তোমার নিজের কথা কিছু কি নেই?

আমার কথা, এমনকি শোনার আছে!—ম্লান হেসেছিল সে।

আমার কিন্তু মনে হয়, তুমি নিশ্চয় একজনকে— ধরো কালীবাবুকে ধরাধরিই বা কেন, সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করি, সান সাইনের কালীবাবুকে কেমন লাগে তোমার।

ভালই। বেশ ভাল মানুষ। সেদিনের আলতো কাঁপা নিজের স্বরটার কথা মনে পড়তেই ঈষৎ উষ্ণতা অনুভব করল অনুরাধা।

সুদেষ্ণা বিচারকের ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল,

হুঁ।

হুঁ মানে?

ঐ ভাল লাগাটাই তোমার সব।

ধ্যেৎ, কি যে বল!

বুঝি ভাই, নিজে উঞ্ছপনা করি বলে কি আসলি চিজ্ চিনি না। চিনি ভাই চিনি।

একটা মানুষকে ভাল লাগাটা কি খারাপ শুনি?

ভাল লাগাটা খারাপ হতে যাবে কেন দুঃখে, ভাল লাগে বলেই তো ভালবাসে মানুষ। আর ভালবাসলেই দূরকে কাছে টানতে ইচ্ছে করে। নিজের করতে ইচ্ছে করে। মনটা সব সময় তখন ছট্‌ফট্ করে সেই দূরের মানুষটাকে কাছে পেতে—ইচ্ছে হয় তার কাছে নিজের সব দিই। এই—মন, প্রাণ সবই।

বাঃ সুন্দর বলছো তো সুর করে; কোন নাটকের ডাইলক ভাই, কোথায় মহলা দিচ্ছো? প্রসঙ্গ পাল্টাতে নয়, সুদেষ্ণার কাছ থেকে আরো শুনতেই বলেছিল সেদিন।

হ্যাঁ ঠিক তাই।

আরো শুনতেই তো চেয়েছিলাম—সুদেষ্ণা বলুক অনেকক্ষণ ধরে বলুক। বেশ বকতে পারে ও মিষ্টি করে। মনটা তার ম্লান চেতনে লুকিয়ে এই কামনাই করেছিল সেদিন—মনে পড়ে অনুরাধার।

সুদেষ্ণা সচকিতে বলে উঠেছিল, যতই পাশ কাটাও ভাই, আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি! তুমি নিশ্চয়ই কালীবাবুর প্রেমে পড়েছো!

না। দৃঢ় স্বরে বলে উঠেছিল সে।

না প্রেমে ঠিক সে পড়েনি। প্রেমের উপসংহারের নমুনা নিজের বাড়ীতে সে প্রতিদিন দেখছে। এই গতিমুখর জীবনে প্রেম অর্থাভাবে ব্যর্থ। মিলনে তখন দাসত্বটাই বড় হয়ে ওঠে। জীবনটাকে বোঝা বিশেষ মনে করে না বিশাখা বৌদি?

সুদেষ্ণাকে তাই বলেছিল সে-দিন—প্রেমে পড়ার বয়স পেরিয়ে এসেছি ভাই। এখন ঘরে পিসীমা, মাসিমা হয়েই দিন কাটাচ্ছি। আর বাইরে তো অভিনয় করি অজস্র লেখা চরিত্রে। কাছের মানুষদের খাবার খোঁজার কিছু দায়িত্ব ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক বহন করতে হিমসিম খাচ্ছি ভাই। এর ওপর আর তোমার ঐ শাকের আঁটিটা নাই বইলাম। বেশ আছি।

চুপ করেই ছিল সুদেষ্ণা। চা দিয়ে গেলে নীরবে তারা চায়ে চুমুক দিয়েছিল। আর ঐ উপলক্ষে মনে মনে সব ভাবনাকে পিছে ফেলে কি যেন খুঁজেছিল সে।

অন্যমনা। হয়ত অবসরে মন আকাশটার মত শূন্য। আর সেখানে তারালোক, নক্ষত্র-লোকের বিচিত্র সমাবেশ। একটা নীল রং-এর অদ্ভুত অনুভবের আমেজ!—এটাই সব থেকে যেন কাম্য।

ক্ষতি কি, যদি ঐ অনুভব ভাসতে ভাসতে যে কোন এক মুহূর্তে একটি মানুষের নিজস্ব রূপের সামনাসামনি আসে, যদি সেখানে তার মন কেদারায় আলাপ করে?—ক্ষতি আছে কি? না কোন ক্ষতি নেই।

খুকুমণি সোনামণি, লক্ষ্মী মেয়ে ঘুমোয় দেখি—আদর করে চুমা দিয়ে লালন করছে তো কোন বাধা নেই ঐ একরত্তি ফুটফুটে প্রাণটাকে।—

কালীবাবুর বাড়ী অনেক দিন যাওয়া হয়নি—হঠাৎ মনে হল অনুরাধার। না একদিন যাবে। যদি না দেখা হয় ক্ষতি নেই। খুকুমণিকে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে আসবে। তারপর দিন হয়ত সকালে উঠেই কালীবাবুকে ও বলবে,

বাপী মাসিমা এসেছিল কাল। অনেকক্ষণ ছিল। আমায় গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেছে—

কালীবাবু ওর নরম নরম ঝাকড়া চুলগুলো নিয়ে আদর করতে করতে হয়ত বলবে, কোন গানটা শোনালেন তোমার মাসিমা।

সেই যে, খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ী সংগে যাবে কে—সেই গানটা—

বাঃ আমি কিন্তু বাদ পড়ে গেলাম।

কেমন জব্দ, যেমন আসো না সময়মত। আচ্ছা বাপি, তুমি এত কাজ কর কেন?

কাজ!—হ্যাঁ মামণি কাজই বটে!

কালীবাবু এ-কথা শেষে অন্যমনা হয়ে কি যেন ভাবতে বসবে।

কিন্তু কি ভাববে কালীবাবু?—তার কথা কি?—গায়ে একটা শিরশিরে কাঁপন অনুভব করলো অনুরাধা।

- আপনার বুঝি শীত করছে। জানলাটা বন্ধ করে দিন না। ভিজে হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

আবার বিরক্তি। ছেলেটার কোন সভ্যতা জ্ঞান নেই—মাথাটা তুললো অনুরাধা। তারপর রাগত দৃষ্টিতেই ছেলেটির দিকে তাকালো—

মুখটা নীচু করেছে। সহ্য করতে পারে না তার দৃষ্টিটা। না, সাহস নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে মজা পাচ্ছে যে—বড্ড নোংরা লাগে কিন্তু ঐ চরিত্রের লোকগুলোকে।—গাটা ঘিনঘিন করে উঠলো অনুরাধার এ-কথা মনে হতেই।

ওপাশে আবার কে যেন টপ্পার সুর ভাজছে।

—টপ্পা! বাবা গাইতেন বেশ সে রাধানগরে গ্রামের বাড়ীতে। বেশ ছিল কিন্তু তারা। ছবির মত পরিষ্কার দিনগুলো—

কি যে হয়ে গেল!

আক্ষেপ করে আর কি হবে। দিন কি এক রকম যায়। পরিবর্তনটাই স্বাভাবিক—এ চিন্তা শেষে অনুরাধা আবার ঘাড়টা তার সীটের জানলাটা দিয়ে আকাশের দিকে ঘোরালো—

আকাশটায় এখনও বাদলার ঘোর কাটেনি। কে জানে এখনও কতক্ষণ থাকতে হবে। অনেক লোকই নেমে গেছে। আর হয়তো জনা-পনেরো মানুষ আছে এ-বাসে। সেই টাক মাথায় ভদ্রলোকটি কি আছে এখনও—অনুরাধা পিছন দিকে মুখটা ফেরালো,

হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ঝিমচ্ছে!—বোধ হয় ঘুম কাতুরে।—স্ত্রীকে কিন্তু ভয় করেন ভদ্রলোক। ঠিক দাদার মত।

বেচারী দাদা! বড্ড নিরীহ মানুষ কিন্তু। বিশাখা বৌদির ভয়ে চোরের মতই বাড়ীতে থাকে। লেখার নেশা আছে দাদার। আর ওটা যেন বিশাখা বৌদির সতীন। বড্ড রাগ কিন্তু

বৌদির, ছেলেমেয়েগুলোকে মেরে মেরে হাড় ভেঙে দিচ্ছে। প্রতিবাদে কিছু বললে, আমার তোমার প্রশ্ন তুলবে বিশ্রীভাবে।

কিন্তু দাদা? দাদা তো বলতে পারে?

বলবে কি করে, বড়জোর দেড়শো টাকা রোজগার যে। অথচ দেড়শো টাকা আজকের কলকাতায় একটা রিক্সাওয়ালার রোজগার। কিন্তু রিক্সাওয়ালার সুবিধে যে তার নিজের খরচা খুব কম; হয়ত ফুটপাতে কি রিক্সার খাটালে থাকে। ছাতু খায়। টাকা জমায়। দেশে জমিজোতে খাটায়। ছেলে বৌ সেখানে ভালভাবেই খেতে পায়। দুধও জোটে বাচ্চাদের।

কিন্তু তার দাদার বাচ্চাগুলো ভালকরে দুধ খেতে পায় না। পাঁচটা বাচ্চা অন্তত পক্ষে ২॥ সের দুধ চাই। দাম ২ টাকা আট আনা, খাঁটির। মাসে ৭৫ টাকা—যোগাতে পারে না দেড়শো টাকার কেরানী।

বৌ গাল দেয় তাই—নিকম্মার আবার লেখা, ঝাড়ু মারো অমন ভাল কথার মুখে!—চুরি কর, গাঁট কাটো—যে করে পারো রোজগার করো—উচ্চস্বরে বিশাখা বৌদি তার দাদাকে ভর্ৎসনা করে। অনুরাধা রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পায়। লজ্জায় কান চাপা দিলেও তার নিরীহ দাদার কথা মনে হয়।

দাদা কিন্তু নিশ্চুপ। সভ্যতা, শিক্ষা, শিল্পবোধের জমাট নীরবতা—অনুরাধা বুঝতে পারে। কষ্ট হয়, বড় কষ্ট। কিন্তু মুক্তির উপায়?

নেই।—ভেঙে যাবে। ঘর সংসার সব ভেঙে যাবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ আজকে পারিবারিক-বোধশূন্য হতে ইশারা করছে—ঘর সংসার সব পুতুল খেলার মত লাগছে আজকের মানুষের কাছে। বাইরে আজ মোহ অনেক। সংসারে মায়া নেই, মমতা নেই। ভালবাসা প্রেম বল, সব মিথ্যে। পারিবারিক আশ্রয় সংস্কার বিশেষ যেন আজ আশপাশ চারিদিকে।

মানুষ আজ বোঝে শুধু টাকা। টাকা হলেই সব হবে। মেয়েমানুষ কেনা যায়, পুরুষ কেনা যায় আজ টাকায়—এ-ধারণায় কি ঘর সংসার রচনা হয় এই রসালো মাটিতে?

না না কিছুতেই নয়। এখানে রাস্তায় ট্যাক্সিতে সুদেষ্ণাদের মত যুগল মিলনের চরম অবস্থা যুদ্ধের হাওয়া এনে দিলেও, এ-মাটিতে তা বিষের মতই জ্বালায় বিবস করে! আনন্দময় সংসার রচনা কারেন্সী নোটের বান্ডিল ছুঁড়ে হয় না। আর করা যায় না।—অনুরাধার মন দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে উঠলো।

না এখন আর তার দ্বিধা নেই। বাবা মায়ের দাম্পত্য জীবনটা অর্থাভাবে তো এমন করে তিক্ত হয়নি কোনদিন। হয়ত দাঙ্গা না হলে, দেশ বিভাগ না হলে গ্রামের বাড়ীতে ঐ বুড়ো বুড়ী পরম আরামে দিন কাটাতে পারতেন। শাক-অন্ন অম্লান বদনে গ্রহণ করতে দেখেছে সে বাবাকে।

ছবিটা মনে হল তার—শান্ত এক পবিত্র মুখ—ভাল লাগে অনুরাধার। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

বাবার মন খানিকটা যেন দাদা পেয়েছে। তাই বোধহয় এত নীরব।

না, দাদার জন্যে বিশেষভাবে তাকে টাকা রোজগার করতেই হবে।

আবার টাকা—

এই তো টাকার বিরুদ্ধে ভাবলে, মনের ভেতরটায় কে যেন চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে। অনুরাধা একটু চমকালো—

সত্যি তো! একটু আগেই টাকার শ্রাদ্ধ করেছে সে।

কিন্তু উপায় কি? কাঁটা তুলতে কাঁটা চাই-ই! যেমন করে হোক সে টাকা ঘ'ুটে আনবে?

সুদেষ্ণার মতন কি?

না সুদেষ্ণার মত নয়। সুদেষ্ণাতো হার মেনেছে ওদের কাছে—ঐ সব অর্থজারজরা ওর কোমল মনটাকে পিষে দিয়েছে। সুদেষ্ণা আজ ক্লীবত্বে ভগ্ন। সুস্থ বঙ্গললনার চরিত্র ওতে নেই—

তবে কার মতন?

নিজের মতন করে। যেমন করে সে এতদিন চলেছে, সেই মন নিয়েই চেষ্টা করবে দাদার সংসারটাকে নিজের করে সুস্থ সবলভাবে রচনা করতে। আলাদা নয়।

—পিন্টু, বুলা, অশেষ, আনন্দ, কৈরীদের একটা সুস্থ পরিণত মনে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে সে।

নৈলে কি যে হবে। হয়ত সুদেষ্ণা, হয়ত প্রদীপের মতন—

না না সহ্য হবে না। ওরা তাদের নয়, ওরা এ মাটির নয়। ওরা এদেশের নয়—ওদের রক্তে বিষ! চিন্তায় বিষ!

—যদি বিশাখা বৌদি বাদ সাধে?

রুখে দাঁড়াবে সে। দরকার হলে সামনাসামনি কোমর বেঁধে স্পষ্ট করেই বলবে, আমাদের তোমাদের টাকা টাকা করো না। দাদা যা রোজগার করে তাতে তোমার একার দিব্যি চলে যাবে। তুমি একা একা না হয় থাকগে। ছেলেমেয়েগুলো তো তোমার একার নয়। আমাদের রক্তের ধারাও ওদের শরীরে। সুতরাং ওদের ওপর আমাদেরও দাবী আছে। আমাদের সবার খুশির মতই ওদের গড়ে তুলবো। যাও বেশী বাজে বকো না। বেশ করবে ওরা আমার রাখা দুধ খাবে, আমার জিনিসপত্তর নষ্ট করবে, এলোমেলো করে করুক। গুছতে হয় তুমি গুছুবে বৌদি—কান্না পেলেও বলবে সে, নিশ্চয় বলবে বিশাখা বৌদিকে—

বাড়ীতে কিন্তু ভাবছে। একটা বরাত ছিল, সেটাতো হলোই না উপরন্তু কি ঝামেলা—জয় শ্রীহরি! এ কি ব্যবস্থা করলে। বুড়ো মানুষ যাই কি করে!

কোথায় যাবেন আপনি?

যাবো বাবা সেই বনহুগলীতে।

তবে তো একটু একটু অসুবিধেই হবে আপনার।

সেই কথাই তো ভাবছি বাবা।

আবার ভাবনার সুর কাটলো অনুরাধার। মাথাটা হাঁটু থেকে তুলল সে। তারপর সোজা হয়ে বসলো।

নাঃ জড়তাটা এখন অনেক কমে গেছে। বৃষ্টি এখনও টিপ্‌টিপ্‌ করে পড়ছে। আচ্ছা কর্পোরেশনের ধাঙগরগুলো কি ধর্মঘট করেছে? না বোধ হয়। এমনি বের হয়নি। মাগ্গীভাতার ঠান্ডা লড়াইও হলে হতে পারে।

যাক্ গে ওসব ভেবে কি হবে! কাত করে হাতের ওপর মাথাটা রাখল অনুরাধা।

কিন্তু আবার যেন বিরক্তি বোধ করছে সে। অসোয়াস্তি লাগছে। কি করবে সে? জলে নেমে পড়বে কি? কিন্তু তাতে লাভ! টালিগঞ্জে হেঁটে পৌঁছতে কত সময় লাগবে। বৃষ্টিতে

কাছটা—ওরে বাস, নিশ্চয় এখন একগলা সমান—নাঃ অসম্ভব। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনুরাধা আপন মনে বলে, তা হলে জল কমুক রাস্তার আগে, তারপর যা হয় করা যাবে।

কিন্তু তেষ্টা পাচ্ছে যে। চায়ের তেষ্টা। থাক্ আর চা খাবার জন্যে কাপড় ভিজিয়ে লাভ নেই—আর একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা আগের ভাবনার সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করে।

কি যেন ভাবছিল? বাড়ীর কথা না? হ্যাঁ, তাদের সংসারের কথা। ভালো কথা মাকে বলতে হবে তার দুধের ভাগটা কমিয়ে দাদার ছেলেদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে।

মা হয়ত বলবেন, তোরও তো খাওয়া দরকার, অত খাটিস্। ঘি দুধ একটু না পেটে পড়লে —পোড়া মাছ তো জোটেই না। মাছ! যারা ফেলে ছড়িয়ে খেয়েছে তারা আজ—কি বাজারই না হলো! বিল্টু বলছিল, ৫ টাকার কম ভালো পোনা পাওয়া যায় না আজকাল। সে যাক্, যে কথা বলছিলাম, তোর দুধ বন্ধ করলে তো চলবে না।

না চললেও চালাতে হবে মা। পিণ্টু বুলাদের গড়ে ওঠার বয়স এখন। এ বয়সে দুধ না পেটে পড়লে চিরকালটা ওরা রুগ্ন হয়েই বেড়াবে।

মা হয়ত এবার চুপ করে যাবেন না, হয়ত মনে মনে কষ্ট পাবেন। মায়ের প্রাণ তো!

নাঃ এ কষ্ট মা পেলেও সে টলবে না। আর বিল্টুকে বলতে হবে, অমন বাউণ্ডুলের মত না বেড়িয়ে ভাইপো ভাইঝিদের দুদণ্ড নিয়ে পড়াতে বসতে তো পারিস।

হয়ত বিল্টু শুনবে না। কলকাতার মেজাজে আছে। পার্টী করে আবার। কিন্তু কি ছাই করছে হতভাগা, নিজের ঘরে শতছিদ্র, মাঠে হাটে লেক্‌চার দিয়ে বেড়াচ্ছে। দল হচ্ছে না ছাই হচ্ছে! হাতী হবে! দেশটা তো অভাবে কন্ধকাটা করেছিস দল পাকিয়ে! দেশ ভেঙ্গেছিস্, ভাষা নিয়ে মানুষের মাথা ভাঙ্গছিস, আবার সামনে গদী কাড়াকাড়ির জন্য ভাঙ্গবি।

স্বাধীনতার স্বাদ কি বুঝবি দিদি! বড্ড পাকা পাকা ভঙ্গি বিল্টুর।

আচ্ছা যদি কোন এক ছুটির দিনে, বিল্টুকে সে যদি আপন মনে বলতে থাকে, মিছিল! দলের মিছিল! গা জ্বলে যায় বাপু। নিরীহ লোকগুলো কে মেড়া মনে করে ঐ সব দল পাগলা মনগুলো! মানবিক, মানবিক করে মানুষ জড়ো করবে, কিন্তু মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসার—এ সব মানবিক বোধগুলোকে ওরা কোন মূল্যে দেয় কি? দিলে পরে ওঁদের নিজেদের পরিবারও সুস্থ হয়ে বাঁচবে যে! হতভাগাদের বাড়ীর কোন কাজ করতে হলেই বেজার!

এ কথা শেষে হঠাৎ যদি সে বিল্টুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, আচ্ছা পিণ্টু বুলাদের আজ থেকে তুই একটু পড়াবি? না পড়ালে তোর দলের দাদাদের কাছে খেতে যাবি বুঝলি!

সত্যি সত্যি এ কথা বললে বিল্টুটা যদি বাড়ী ছেড়ে দেয়! আশঙ্কায় বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল অনুরাধার!

না সে বড্ড দুর্বল। অত কড়া হওয়া তার পোষাবে না। তার চেয়ে মিষ্টি করেই না হয় বলবে, বিল্টু ভাই, বড় দাদার অবস্থার কথা তো জানিস, মেজদাকেও চিনিস, আর আমার খবরও রাখিস তো—

ও হয়ত কথার ওপরই বলবে, ভনিতা না করে খুলে বল না।

বলছিলাম মাস্টারী করতে কিছুক্ষণ।

না, ও সব আমি পারবো না।

না পারলে তো চলবে না ভাই, নিজের ভাইপোরা বাদর হয়ে উঠবে এটা নিশ্চয় তুই চাস না?

বিল্টু হয়ত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে এক সময় বিশ্রীস্বরে বলবে, জন্ম দেয় কেন,

দেখছে না দেশের অবস্থা, যত সব বাদরের—না না আমার সময়টময় নেই। তোর অবসর থাকে তুই পড়াস্‌গে।

সে যদি মলিন মুখে চুপ করে চলে যাওয়ার ভান করে! তা হলে? হাসি পেল অনুরাধার এ দৃশ্যটা কল্পনা করতেই। নাঃ তাকে বিল্টু কিন্তু খুব ভালবাসে!

হয়ত বিল্টু বিকৃত সুরে বলে বসবে, রাগ হয়ে গেল অমনি! কি এমন বললামরে তোকে দিদি।

তবু যদি সে কথা না বলে......

বিল্টু হয়ত রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বলবে, নাটক করে করে আজকাল দেখছি বাড়ীতেও নাটক করছিস—নাঃ নাটকই দেশটাকে—না থাক বাড়ীটার কথাও চিন্তা করতে হবে! নাটক ছেড়ে যখন তুই বাড়ী নিয়ে পড়েছিস!

তবুও নীরব যদি থাকে সে।

না, জ্বালিয়ে মারবে দেখছি সবাই মিলে—এই বলে সত্যিই হয়ত বিল্টু বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর সেও হয়ত অভিনয়ের মহলা দিতে বেরিয়ে যাবে বিকেলে।

তারপর রাতে ফিরে সে যখন বসবে তখন বিশাখা বৌদি হাসি হাসি মুখে চুপি চুপি স্বরে বলবে, একটা খবর আছে ঠাকুরঝি ভাই!

কি খবর, মনে মনে সে আঁচ করেই থাকবে, খবরটা বিল্টুর।

আজ সূর্যিঠাকুর পশ্চিমে উঠেছিলেন গো, বিল্টু ঠাকুরপো—আর কথা শেষ হবে না, হাসবে হিহি করে বিশাখা বৌদি।

বৌদি যেন কি! মজা পেলেই হিহি শব্দ; আশ্চর্য লাগে তার।

হাসবে, না বলবে তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে—

বলছি বাবা বলছি, শোন বিল্টু ঠাকুরপো আজ বুলা পিন্টুদের নিয়ে পড়াতে বসেছিল! তুমি বুঝি কলকাটি...।

সেও হাসবে তখন; তবে উচ্চস্বরে নয়, মৃদু! বাঃ বেশ লাগছে কিন্তু অনাগত এই চিত্রটি ভাবতে—অনুরাধা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ভালবাসবে বলে ভাল বাসিনে—

বাঃ বেশ ভাঁজ আছে তো গলায়! সেই ভদ্রলোকটি বোধহয়। হ্যাঁ ঐ টাক্ মাথাটাই নড়ছে। রসিকজন। যেমন কথা বলছিলেন তখন—! অনুরাধা আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। তারপর নিজের মনের কথায় ফিরে যেতে চাইল। কি ভাবছিলো যেন—

বাড়ীর কথা। হ্যাঁ এবার সে বেশ জোরের সঙ্গেই চেষ্টা করবে। বাড়ীতে ফিরতে তার ভাল লাগাতে হবে। তেমনি পরিবেশ রচনা করবেই। অন্তত দাদার জন্য—

সেই দাদা, চকিতে গ্রামের দিনগুলো মনে পড়ে অনুরাধার,

দেশে থাকতে দাদা তাকে কি ভালই না বাসতো! কোন কিছু পেলে তাকে না দিয়ে খেতো না। একবার তার জন্যে যশোর শহর থেকে লাল টুকটুকে একটা পুতুল, একটা হাসিখুশি বই কিনে এনে বলেছিল, অনু তোর জন্যে আনলাম! খেলা করিস আর পড়িস কেমন—

দাদার সেই মোলায়েম হাসিটা আজও চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠলো।—চোখটা বুজে আসে অনুরাধার।

দাদা আজকাল কেমন যেন নির্জীব, চোরের মত মাথা নীচু করে যায় আসে। বড় একটা কথা বলে না—কেন, কেন? অর্থাভাব কি?

যদি তাই হয়, সে রোজগার করে এনে দেবে। এ নীরবতা সে ভাঙ্গবেই, আবার মুখর করাবে দাদাকে—না বৌদিকে বারণ করে দেবে সে, খবরদার বৌদি দাদাকে তুমি বিরক্ত করো না। দাদার যা খুশি তাই করুক। তোমার অসুবিধার কথা আমাকে বলবে। লেখাপড়া করা নিয়ে দাদাকে অমন তিন সন্ধ্যে ধমক দেবে না। লেখে লিখুক।

বৌদি যদি না শোনে তার কথা? না না শুনবে। নিশ্চয় শুনবে। বিশাখা বৌদিতো বাংলা দেশের মেয়ে, বাঙালী ঘরের বৌ—নিশ্চয় শুনবে বুঝবে যদি সে তার সমস্ত কথায় আচরণে বৌদির জন্য দরদ রেখে ঠিক মত বলতে পারে।

এ চিন্তা শেষে কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলল অনুরাধা। মন বড় ভিজে উঠেছে তার। অফুরন্ত রসের স্রোতে যেন বান ডাকছে। শিরায় শিরায় সে রসের স্রোত—অনুরাধার সমস্ত দেহমনে হঠাৎ যেন স্রোতের উচ্ছ্বাসে মুখর হতে চাইল। চকিতে অনুরাধার মনে হলো, এমন করে সে যেন এই প্রথম ভাবলো। এই প্রথম চেতনে সে পরিবার রচনা করলো—

আবার প্রথম কবে যে দিন তার দাদার কণ্ঠে আনন্দমুখর ডাক শুনবে, সেই ছোটবেলার মতন—

এই অনু, অনু আছিস না কি?

ছুটে বেরিয়ে আসবে সে নাটকের পার্ট ফেলে।

কি ব্যাপার দাদা!

ব্যাপার ভালই রে। এই নে, দেখতো কেমন হয়েছে চেহারাটা!

কি, বই বুঝি। বাঃ বেশ সুন্দর প্রচ্ছদ তো—আরে এ যে তোমার বই!

দাদা হাসবে মেঘমুক্ত নীল আকাশে উজ্জ্বল একঝলক মিষ্টি রোদের মত। সে মুখটা আজ অনুভব করতে পারছে অনুরাধা—অপূর্ব!

পড়িস কেমন।

মৃদু সলজ্জ হাসি রেখা ঠোঁটের কোণে রেখে সে শুধু ঘাড় নেড়ে বলবে, আজই শেষ করে ফেলবো!

রাত জাগবি!

ক্ষতি কি।— তার দাদাভাইয়ের লেখা যে!

দাদা দাদা—মনের ভেতরটায় এ কি কাতরতা আজ! এ স্রোতের কাতরতা যেন সব কিছু অন্তরায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিছু সময় গেলে অনুরাধার আবার চেতনা ফিরে এলো এক আনন্দ আবেশ নিয়ে—

চমক লাগলো কিন্তু পরক্ষণেই; বিশাখা বৌদির মাথায় আধাঘোমটা দেওয়া রান্নার পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখখানা ভেসে উঠতেই—

কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বিশাখা বৌদি। দাদার আনন্দমুখর স্বর শুনেই।

দাদা হয়ত ঐ সময় একবার বৌদিকে দেখে তার দিকে ফিরেই বলবে, পড়িস তাহলে কেমন।

আচ্ছা।

এ কথা শুনে দাদা চলে যাবে ধীরে ধীরে।

বিশাখা বৌদি এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে তার কাছে। তারপর একটু বেঁকা স্বরে বলবে, কি হাতী ঘোড়া আনলে গো বোনের জন্যে—দেখি না।

সে কপটতা করেই বলবে, লক্ষ টাকার একটি মানিক!

ইস্! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, আরশোলা আবার পাখী। ভনিতা রাখো, দেখি কি জিনিসটা!

দূরে থেকেই দেখবে সে রঙীন বইয়ের মলাট।

বই : অঃ!—পিছন ফিরে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ বিশাখা বৌদি।

ব্যস্ত স্বরে সে বলবে, শোন বৌদি শোন-ই না! একটা কথা আছে।

কি কথা বল, চচ্চরিটা ধরে যাবে।

যাক্, এ বইটা কার লেখা জানো!

কার?—চেরা বিরক্তিসূচক স্বরেই হয়ত-বা বলবে।

উচ্ছ্বাস ভরেই সে বলবে,—ধর যদি তোমার মনের মতন কোন লোকের হয়!

আমার মনের মত লোক তো যম। যমের লেখা পড়তে পেলে আর কিছু চাইনে, যাক্ এখন তোমার সংগে রঙ্গরস করার সময় নেই। অনেক কাজ। যম স্বয়ং তার লেখা নিয়ে পড়তে এলেও আমাকে থামতে বলতে হবে, এই বলে বিশাখা বৌদি তরতর করে রান্না ঘরের দিকে রওনা দেবে।

আর সে? তখন হাসবে হঠাৎই, ঝরনার মত হবে সে হাসির বেগ।

বিশাখা বৌদি অবাক হবে। থমকে দাঁড়াবে আর ভাববে, ঠাকুরঝির আজ হল কি!

অনুরাধার মন এ অনুভবের আমেজটা ধরে রেখে বলে ওঠে; বেশ হয় যদি এমনতর ঘটনা ঘটে! চকিতে মনটা সজাগ হয়েই প্রশ্ন করল, কবে হবে! এমন দিন কি সত্যিই আসবে না আমাদের?

এ প্রশ্নের সংগে সংগে ওর দেহটা, শিথিল ভাবটা কাটিয়ে টান হয়ে উঠলো। দৃঢ় সুরে ভেতর থেকে কে যেন বললে,

হতেই হবে। তার সব শক্তি দিয়েই ঐ অনাগত দিনটাকে মূর্ত করে তুলবেই তুলবে। তার অভিনয়ের সুনাম আছে। ঐ নামটাকেই, হ্যাঁ ঐ নামেই আরো শক্তি সঞ্চয় করবে। নানা চরিত্রে, নানা পরিবেশে সে সার্থক করবে ঐ নামটাকে। ঐ নামই দেবে তাকে অনেক অনেক টাকা, আর ঐ টাকায় সে দেবে তার দাদার মুখে হাসি, পিণ্টু বুলার নতুন চরিত্র। যেমন করেই হোক নাম তাকে করতেই হবে।

না আজ বড্ড বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল! আজকের অভিনয় হয়ত তার জন্যেই বন্ধ হয়ে গেল কিনা কে জানে! শেখরবাবু কি ভাবছেন তার সম্বন্ধে? আচ্ছা একটা টেলিফোন করলে—

এখন আর টেলিফোন করে লাভ কি! যা হবার তাতো হয়ে গেছে। কটা বাজলো? অনুরাধা ঘড়ি বাঁধা বাঁ হাতটা ঈষৎ তুললো, সাতটা চল্লিশ—নাঃ আর ভেবে কোন লাভ নেই! অনেক রাত হয়ে গেছে। যাক্ কালই দেখা করা যাবে শেখরবাবুর সংগে।

কটা বাজল মা তোমার ঘড়িতে?

স্নেহ-স্বরে জিজ্ঞাসা, অনুরাধা মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সেই বুড়ো মানুষটি!—৭০ এর কাছাকাছি বয়স হবে।

স্বরটা একটু তুলে অনুরাধা জবাব দিলো, সাতটা চল্লিশ।

অনেক রাত হল যে! কি করে যাবো; স্বরে অস্থির কাতরতা: বুড়ো মানুষ। হয়ত অনেক দূর যাবেন।

নাতিটার অনেক জ্বর দেখে এসেছি তাই চিন্তা হচ্ছে মা ; শ্রীমধুসূদন তোমার ইচ্ছা যে কি আছে...হ্যাঁ মা তুমি কোথা যাবে?

শ্যামবাজারে যাবার ছিল, অনুরাধা উত্তর দিল আস্তে করে।

শ্যামবাজারেই বাড়ী বুঝি?

না।

তবে?

একটু দরকার ছিল, বাড়ী আমার টালিগঞ্জে।

টালিগঞ্জ! সেও তো অনেক দূর এই দুর্যোগে তোমারও তো মা দুর্ভোগ।

মৃদু হেসে সে বলল, দুর্যোগে সবাই পড়েছি আমরা।

এমন বৃষ্টি অনেকদিন বাদেই হল, প্রভুর কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, সেই দাংগার পর একবার যেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছেন ঠিক। হয়েছিল বটে, সে কি বীভৎস ব্যাপার মশায়, লাসগুলো জল পেয়ে দুর্গন্ধে সারা কলকাতা শহর মহাশ্মশানকে হার মানিয়েছিল মশায়—কোণের ছিমছাম সুট পরা ছিমছাম চশমা চোখে মানুষটি বলে উঠল।

সবই মায়ের ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর করছেন—বুড়ো মানুষটি এবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন: অনুরাধার কানে বাজল।

এবার তাঁর ইচ্ছেয় রকেট বোম বাস সব একেবারে ঠাণ্ডা। জয় মা কালী। সেই ছোকরাটি কথাটা ছুড়ে চারদিক চাইল। হয়ত তারিফের আশায়—অনুরাধার হাসি পায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ! একটা মোটর হর্ন একবার বেজে থেমে গেল।

কিন্তু আর কোন সাড়া নেই। ঝিমধরা নীরবতা। টিপ টিপ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ কানে আসে শুধু। তারপর একটু জোরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার চিরচিরে আওয়াজ একটা কানে এলো অনুরাধার—শহরে ঝিঁঝিঁ শব্দ!

শুনছেন মশায়, ও মশায় ঘুমলেন বুঝি?

কিছু বলছেন নাকি! রোগা লোকটি সজাগ হয়ে উঠলো।

কতক্ষণ আর বসে থাকবেন, নিমন্ত্রণে যাওয়া মাথায় রেখে এবার চলুন ভিজে নেয়ে বাড়ীই ফিরি। বাড়ী এখনও পেঁছালে কিছু খাদ্য পেলে পেতে পারি। নৈলে যে হরিমটর! দাঁতে দাঁত দিয়ে রাত কাটাতে হবে।

লোকটা নিশ্চয় পেটুক।—হাসে অনুরাধা মুখটিপে—খালি খাবার কথা।

আরো একটু বসুন না।—কথা শেষে ঘুমকাতুরে লোকটি আবার বোধ হয় চোখ বুজলো।

আপনার কি মশায় ঘুমতে একটু জায়গা পেলেই হলো। ঠাণ্ডা পেয়েছেন আর বসতেও জায়গা জুটেছে—ঘুমবেন বইকি! আক্ষেপ করে রোগা লোকটি বলে উঠলো।

ঘুমের মত জিনিস আছে! আচ্ছা যদি কুম্ভকর্ণ হতাম!—এবার একটা হাসির শব্দ উঠলো, দুচারজন হেসে উঠল ঐ কথায়। অনুরাধা এবার মুখে রুমাল চাপা দিলো।

থেমে গেল হাসিটা একটু পরেই। লোকটা আবার বললে, এর চেয়ে সিনেমা দেখলে ভাল ছিল।

খাও দাও সিনেমা দেখ মনের আনন্দে—কি কল করেছে কোম্পানী! এ যেন ঢালাইয়ের ছাঁচ! —আহা এমন ছাঁচে পয়সা ঢালতে পারলেই এ জীবন স্বরগ সমান!—চটুল স্বরে বলে উঠল সেই হ্যাংলা দৃষ্টির যুবকটি।

রাগ ধরে অনুরাধারঃ নিশ্চয় ছেলেটা চ্যাংড়া বেকার। হয়ত বসে বসে বাড়ীর অন্ন ধ্বংসায় আর মিথ্যে অজুহাতে মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সিনেমা দেখে বেড়ায়। অবসরটা রোয়াকে চ্যাংড়ামী করে ইয়ার বন্ধুদের সংগে। মেয়েদের দিকে দৃষ্টিটা তাই অমনি লোভাতুর; জঘন্য!

অনুরাধা মুখটা বিকৃত করে ঘুরিয়ে রাস্তায় দৃষ্টিটা নিয়ে গেল।

ঘোলা জলে বিদ্যুৎ আলো। চিক্ চিক্ রূপোলী ঢেউ তুলছে মেঘলা হাওয়া। কখন ঠান্ডা শির শিরে, কখন দমকা আছাড়ে শব্দ তুলছে—অনুরাধা এক দৃষ্টে চেয়ে রইল রাস্তার ঘোলা জলের দিকে, তারপর এক সময় তার মনের মধ্যে ভেসে রইল সেই ছোট বেলার দেখা মধুমতী।

হাঁটুমুড়ে সে আর বিদ্যুৎলতা চুপি চুপি বটতলায় বসে মধুমতীর জলতরংগ শুনতো। কেবলের বাঁশির সুরটাও থেমে যেতো এক এক সময়।

মধুমতী—সত্যিই মধুর মত মিষ্টিই ওর চেহারা, ওর ডাক্। বড় মধুর করে তাদের ডেকে বসাতো, শুনাতো ওর গান, কুলকুল, ছলাৎ ছলাৎ!

মাঝিগুলোর দাঁড়ের আঘাতে ও যেন কষ্ট পেতো, মনে হতো ওকে যেন চাবুক মারছে।

বিদ্যুৎলতা বলতো, মধুমায়ের আমার বড় কষ্ট! মাঝিগুলো শুধু পাল তুলে যেতে পারে না? —বিদ্যুৎলতা এমন কাতর স্বরে বলত ও যেন সত্যিকারের মধুমতীর মেয়ে।

বিদ্যুৎলতা সত্যি-ই হয়ত মধুমতীর মেয়ে। মার কাছ থেকে ও আজও নড়েনি। আজও হয়তো সে মায়ের কাছে কাছে আছে।

কেমন আছে বিদ্যুৎলতা? কেমন দেখতে হয়েছে—হয়ত অনেক সুন্দর হয়েছে আগের থেকে বিদ্যুৎলতা। ডাগর ডাগর চোখের চাউনি আরো চঞ্চল মধুর। আজ তেমনি হয়ত তেমনি গাছ কোমর বাঁধা শাড়ীতে উত্তর মাঠের দিকে ছুটে চলে।

বড় ইচ্ছে করে ওকে দেখতে। কিন্তু দেখার তো কোন উপায় নেই! কত বাধা। শয়তান-গুলো কত বাধা দিয়েছে চুপি চুপি রফা করে—অনুরাধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

তবু যদি সুযোগ খুঁজে একবার যেতে পারে দুচোখ ভরে দেখবে সে তার বিদ্যুৎলতাকে।

হয়ত খেয়াঘাটের সেই বটতলায় তাকে প্রথম দেখবে। বসে বসে আপন মনে হয়ত পেয়ারা চিবোচ্ছে। দৃষ্টিটা মধুমতীতে। নৌকাটা ঘাটে ভিড়লে ও একবার চোখ ফেরাবে। নতুন কে এলো যেন !

তারপর তারও দৃষ্টি যাবে ঐ বটতলার দিকে—একটা টুকটুকে ফরসা রঙের মেয়ে একরাশ রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়িয়ে তাকে যেন বিস্ময়ে উপচিয়ে দেখছে!

চিনবে কি? না বোধ হয়। সেও মুচকি হাসবে একটু। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে বটতলার দিকে।

বিদ্যুৎলতা একটু আশ্চর্যই হবে। হয়ত ভাববে, সোজা দিক না ধরে এমন অসরল পথে আসে কেন ঐ দুম্বো মেয়েটা!

আরো কাছাকাছি হলে ও হয়ত কথা ছুঁড়বে—এ দিক পানে রাস্তা নাই গো। ও দিকটায় দিয়ে যাওগা না কেন। সোজা দিক পাবে।

সে কিছু বলবে না। শুধু এগিয়ে যাবে বিদ্যুৎলতার সামনাসামনি।

বিদ্যুৎলতা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকবে তার দিকে। তারপর!—

বুকটা নাচছে যেন তরতর শব্দে মধুমতীর স্রোতের মত—

সে থমকে দাঁড়াবে বিদ্যুৎলতার ডাগর চোখে তার দৃষ্টি মিলিয়ে।

চিনবে কি?

না। হয়ত বলবে, কি দেখছো গা হাঁ করে অত! আমি কি সং, তুমি বুঝি এ গ্রামে এই প্রথম এলে?

সে হাসবে মৃদু। তারপর ঘাড় নেড়ে জানাবে, হ্যাঁ।

এ গাঁয়ে কোথায় আসছো? কে আছে এখানে তোমার?

তোমার কাছে। তুমি-ই আছো আমার এখানে।

ধেৎ, বাজে কথা কেন বলছো। আমি তোমার কে যে আমার কাছে আসবে, আমায় চেনো তুমি?

চিনি বৈকি, তুমি বিদ্যুৎলতা।

নাম জানলে কি করে বল শিগ্গী করে, নৈলে—

নৈলে বুঝি কাদা ছুঁড়বে।

হ্যাঁ: একেবারে ভূত করে দেবো এমন যে কুটুম বাড়ীর লোক হাসবে!

তুমিই তো কুটুম আমার।

আবার চালাকি! ডাকবো পুরুষ মানুষকে। জানো না এখানকার মানুষকে।

জানি বইকি।

কি জানো?

তোমাকে জানি, কেবলকে জানি, ফকিরবাবাকে জানি, আর আর একটি মেয়েকে জানতুম তার নাম যেন অ দিয়ে—দুষ্টু চাহনিতে অপলক চেয়ে থাকবে সে বিদ্যুৎলতার মুখের দিকে। হয়ত দেখবে বিদ্যুৎলতার চোখে ছলছল করছে একটি নামের স্মরণ আভাসে,

কি দেখছো অমন করে বলত?

তোমাকে গো, তুমি যদি ছোট বেলায় আসতে!— আমার এক সঙ্গীর মত!

চিনতে পারছ না বুঝি!

চিনেছি বইকি, তু-মি, তু-ই তো সেই অ-নু-রা-ধা? বড্ড কিন্তু সৌখিন, ঠিক বিধি যেন!— কেমন করে এলি, তোদের খবর ভাল তো; বাবা—মা—দাদা, সোনাদা বিল্টু—এরা সব কেমন আছেরে!

সবাই ভালো, খালি বাবা নেই!—

নেই, চলে গেছেন বুঝি! বড় কষ্ট লাগছিল তো তাই মায়ের বাড়ী বেড়াতে গেছেন— ভাবিস বুঝি বাবাকে খুব?

সে ঘাড় নেড়ে জানাবে, হাঁ। তারপর হয়ত জিজ্ঞাসা করবে সে, ফকিরবাবা কেমন, স্যাকরা কাকা, কেবলঠাকুর সব ভাল আছে তো?

হ্যাঁ সব ভাল এখানে—আয়, পেয়ারা খাবি, এইনে, কাদাকে ভয় করবি না তো রে—বিদ্যুৎলতা হাসবে মন্তার মত।

না, তাহলে চ এদিক্ দিয়েই যাই—কাপড় নষ্ট হবে, দামী জামা কাপড় যে তোর!

হোক্ গে, চ—

শুনছেন, শুনতে পারছেন—

কে—চমকে উঠল অনুরাধা একটা ডাকে!

না! সুরটা ছিঁড়ে দিলে আবার। চোখ মেলে দেখলো বাস যাত্রী ক'জনকে। এক নজর সে দৃষ্টি ঘুরে সামনের লম্বা সীটে গিয়ে পড়ল—সে বলছে! ঐ ছেলেটার চোখের চাহনি বড় অস্থির—

আপনার হাতব্যাগটা নীচে পড়ে গেছে যে।

তাই বুঝি, স্বপ্নাবিষ্ট আলতো স্বরে বলে উঠল অনুরাধা।

ঐ যে ওখানটায়, ঠিক করে তুলে রাখুন, পার্স বলে কথা—বাসে কিছুই বলা যায় না।

হ্যাঁ কিছুই বলা যায় না, মৃদু হেসে অনুরাধা তার হাতব্যাগটা হেঁট হয়ে তুলে নেয়।

ছেলেটা কিন্তু বড় আদেখলেপনা করছে—মেয়েদের দেখলেই যেন ছট্‌ফট্ করে। মুখটা? কত যেন গোব্যাচারী। অনেকটা মঞ্জুলিকা সেনের বরের মত!

আশ্চর্য, আজকাল বিয়ের যেন কোন শ্রীছাঁদ নেই! কি কালই হল! কোথায় ছাব্বিশ বছরের ছেলে আর কোথায় চল্লিশ বছরের মেয়ে—অদ্ভুত! মঞ্জুলিকা সেনের সে কি আদিখ্যেতা। যেন ঐ বর, তাই বটে। ছেলেটা তো বাঁদরের মত, মঞ্জুলিকা যা বলছে তাতেই দাঁত বের করছে—

কি করে গো তোমার বর, বিশাখা বৌদি এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল মঞ্জুদিকে।

কি আবার করবে, কিছু আমি করতে দিলে তো—টিপে টিপে হেসে বলেছিল মঞ্জুলিকা সেন।

তবু চাকরী টাকরী, মাষ্টারী বা ব্যবসা—

মাষ্টারী করে একটা! আর করতে দেবো না—চটুল ভাবে হেসেছিল মঞ্জুলিকা তার ঈষৎ ফাঁকওলা দাঁত বের করে।

তাই বুঝি, বেশ বেশ—বিশাখা বৌদি তাকে আড়ে চোখ টিপেছিল।

বর কেমন লাগছে বল দিকি!

ভারি সুন্দর কিন্তু।

ইচ্ছে হচ্ছিল কথা বলতে, তবু চুপিচুপি বিশাখা বৌদির দিকে ফিরে সেদিন বলেছিল সে—তোমার বোনের বাপু ক্ষমতা আছে।

তা আছে।—ক্ষমতা না থাকলে কি একটা মানুষকে বাঁদরের বুদ্ধি ধরাতে পারে।—বিশাখা বৌদির মুখটা আরো ছুটবার আশঙ্কায় সে চুপিচুপি স্বরে বলেছিল, এই বৌদি আস্তে, বাড়ী গিয়ে হবেখন।

তা হলে এখুনি চল আর ভাল লাগছে না। এই বলে বিশাখা বৌদি উঠে দাঁড়িয়েছিল,

কিরে বিশাখা উঠলি কেন?

শরীর ভাল বোধ হচ্ছে না। চলি মঞ্জুদি, তোমার বর দেখা হল তো!

না খেয়েই যাবি ?

আর একদিন এসে হবে, বৌদির শরীর সত্যিই খারাপ।

শরীর খারাপ যখন তখন জোর নেই। তা আসিস কিন্তু সময়মত একদিন।

আসবো ; চল ঠাকুরঝি—বিশাখা বৌদি আর দাঁড়ায়নি।

রাস্তায় ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে তর সয়নি বৌদির। গুম হয়ে হন হন করে হেঁটেই বাড়ীর দিকে এগিয়েছিল।

সে-ই জোর করে মাঝে থামিয়ে একটা ট্যাক্সিতে হাজরা থেকে টালিগঞ্জের বাড়ীতে ফিরিয়ে এনেছিল সেদিন বিশাখা বৌদিকে।

আর বাড়ীতে ফিরেই গজগজ শুরু করেছিল,

টাকা, টাকার লোভে ঐ বাঁদরামী করলে ছোক্‌রাটা। বিয়ে তো নয়, ঘুষ নিয়ে একটা বুড়ীর বাঁধা কুকুর হল!—আবার শিক্ষিত, পাশ দিয়েছেন বাবু—অমন পাশের মাথায় খেংরা!—আমার যদি কোন সম্বন্ধ-সুবাদ থাকতো তো মেরেই বসতাম!—যাই আবার পিণ্ডির যোগাড় করি নেমন্তন্নের মাথায় মারো ঝাড়ু!—

তারও শরীর মনটা বিশ্রী লেগেছিল সেদিন, শুয়ে শুয়ে মঞ্জুলিকাদের ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে চাইলেও বারে বারে মনে হয়েছিল।—মঞ্জুলিকা সেনেরই বা এ মতি কেন হলো? কুমারী মন কি বুড়ো কালে এমনি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসে ?

তারও কি—না না এসব কল্পনার অতীত তার কাছে। আত্মহত্যা বরং ভাল তার কাছে এ উঞ্ছবৃত্তির চেয়ে।

উঞ্ছবৃত্তি! হ্যাঁ, ঐ ছেলেটাও ঐ ধরনের উঞ্ছ প্রয়াসে বিলাসী—হতভাগাগুলো প্রবৃত্তিকে সংযত করতে শেখেনি? শিখবে কি করে! বাড়ীতে তো মন নেই। খালি—

না বড্ড বাজে কথা ভাবছে সে। ছেলেটি ও প্রকৃতির নাও হতে পারে—অনুরাধা জোর করে মনকে শাসন করতে চাইল যেন—

ওর দোষ কি! ওর সমাজ, শিক্ষা, পরিবার, সব মিলিয়ে ওর মন। সেই মনের ছাপ যদি ফেলে তো নিরুপায়।

হয়ত ও জানে না ও কি করতে চলেছে। জানা থাকলে ও নিশ্চয় সংযত ব্যবহার করতো, এ চিন্তার শেষে মনটা বেশ তৃপ্তি পেল অনুরাধার। একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাত-ব্যাগ তার বাঁ পাশে রেখে কোণটায় হেলে বসল।

তারপর মাথাটা কাত্‌ করে দিলে রেষ্টারে। পেছনের সীটটা খালি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক দুজন একটু আগে ঝপ ঝপ শব্দ তুলে চলে গেছে—খেয়াল করেনি সে।

সামনের সীটে গরদের পাঞ্জাবী পরা মানুষটি কিন্তু তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে—মাথাটা ঈষৎ তুলল অনুরাধা, আড়ে দেখল সে—হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেখছে তাকে।—

কিন্তু কেন? সে কি সুন্দর বলে, না শুধু ভরাট দেহের সবল একটা মেয়ে বলে ?

হয়তো দুটোই সত্যি। আজ সত্যিই কি সুন্দর সে ?—লজ্জা লাগে কেমন যেন নিজের রূপের কথা ভাবতে।

তবে হ্যাঁ মন্দ লাগে না যখন সে আয়নার সামনে একা একা প্রসাধন করে—

বেশ লাগে নিজেকে দেখতে। চোখের দৃষ্টিটা একটু নমনীয় করলে সত্যিই আমেজ লাগে। রংটা বিদ্যুৎলতার মত না হলেও বেশ ফর্সা—নাকও খারাপ নয়—একটু লম্বা। চুলও কম নয়।

তবে ইদানীং বড্ড উঠে যাচ্ছে।—যা ভেজাল তেলে! বিশ্বাস হয় না বিজ্ঞাপনে। তবু ঘন একরাশ চুল চিরুণী দিতে তার বেশ সময় যায়। আপিসের জন্য ভাল করে যত্ন নেওয়া হয় না। কোন মতে একটা আলগা খোঁপা বাঁধে সে।

ছুটির দিনে মা কিন্তু ঠিক বিনুনী বেঁধে দেবে—আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই। বৌদি আবার ট্যাসেল ব্যবহার করে—ঐ বিঁড়েটা তার ভাল লাগে না। এমনিই ভাল। মার কিন্তু খোঁপা বাঁধার হাত ভাল। বেশ নকসা করে মা।

মা—মা হয়ত ভাবছে, এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মেয়েটা বেরুলো, কখন ফিরবে কে জানে!

হয়ত মা আজ পাঠ শুনতে যায়নি। নিত্য অভ্যাস এখন মার ভাগবত পাঠ শোনার। বাড়ীর কাছে পিঠেই এক ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য পাঠ হয়। . মা রোজ সেখানে যাবেই। আজ হয়ত যায়নি, ঘরে বসে তুলসী মালা জপছে।

পিণ্টুরা পড়ছে কি?

না এতক্ষণে ওদের চোখে ঘুম নেমে এসেছে। বেশ ঠাণ্ডা আছে। ঘুমবে ওরা গুঁড়িমুড়ি মেরে।—বিশাখা বৌদি এখনও রান্নার পাঠ চালাচ্ছে! দাদা খুব সম্ভব বাড়ীতে লিখছে। বিল্টু বস্তীতে পার্টী করছে। মেজদাটা বোধ হয় সিনেমায়। বড্ড সিনেমা দেখে মেজদা। সিনেমায় অভিনয়ের একটা সুযোগ করে দিতে পারে দীননাথ—

হাসি পেলো দীননাথের কথা মনে হতেই। নিজেরই ঠিক ঠিকানা করতে পারলো না বেচারী—অথচ ও সকলের সুযোগ করে দিতে চায়। আশ্চর্য,

দীননাথের মতি স্থির নেই। পাঠ করতে করতে মাঝে আবার স্টুডিওর ভালমন্দের খবর দাবী করতে আরম্ভ করছে। আবার জলসার পাণ্ডাগিরিতেও আছে দীননাথ।

সুদেষ্ণা কিন্তু ওকে পেয়ে অনেক কাজ গুছোয়।—মেয়েটার মনে কোন দরদ নেই যেন। খালি সুযোগ নেবার তাল—

আর দীননাথ জোহুকুম।—মেয়েমানুষ ভালকরে একটু কথা বললে ও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়—বেগারের ভূত চাপে ওর মাথায়।

সুদেষ্ণা, দীপ্তিরা অনেক আজেবাজে কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নেয়। তার কিন্তু বিশ্রী লাগে এভাবে একটি মানুষকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে। দীননাথের জন্য কি ওরা কিছু করে?

কেন একটু সঙ্গ, একটু মিষ্টি হাসির সঙ্গে ওর প্রসংশাই যথেষ্ট। ঐতেই গলে যায় দীননাথ।

শেখরবাবু কত রাগ করে। ধমকও শুনেছে—কি যে কর দীননাথ, মেয়েদের দেখলে অতো ন্যালবেলে হয়ে যাও কেন বলতো?—অভিনেতা হতে গেলে একটু সংযম চাই বুঝলে।

সুদেষ্ণা, দীপ্তি মুখ টিপে টিপে হাসে দীননাথকে ও ভাবে শেখরবাবু কিছু বললেই।

দীননাথ কিন্তু মুখ বুজে ধমক খায়। কিছু প্রতিবাদ করে না। ক্লাবের বাইরে কিংবা শেখরবাবুর আড়ালে চুপি চুপি মেয়েদের ফরমাশও শোনে। বলে কিছু হয় না। না বুঝলে, না খেলে—এ ধারণা শেষে অনুরাধা দীননাথের প্রসঙ্গ এড়াতে চাইলো—

ও সব ভেবে তার কি লাভ! ক্লাবে থাকাকালীন তার কাছে তো ঘেঁষে না। সুতরাং—তবু পুরুষ মানুষের ঐ ধরনের মেয়েলী ভাব তার অসহ্য!

কিন্তু সে আজ এত বিচার করছে কেন পুরুষত্বের?—এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার চোখের সামনে কালীবাবুর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা ভেসে উঠলো—

হ্যাঁ পুরুষের মতই চেহারা! ইচ্ছে করলে যে কেন মেয়েকে কালীবাবু তার সবল পেশী-বন্ধ করতে পারেন। আর পয়সাও আছে। অর্থলোভাতুর মেয়েদের কাছে আকর্ষণ করার মত আর্থিক ক্ষমতাও যথেষ্ট। তবু কি নির্মল, কি পবিত্র স্বভাব! মন আপনা থেকে নুয়ে আসে। মদের গন্ধও সে নোওয়া মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করলেও দুর্ভাবনা দেয় না!

কত থিয়েটারের মেয়েই তো এসেছে কালীবাবুর সংস্পর্শে। কিন্তু ওরা কেউ কি বলতে পারে কালীবাবু খারাপ। কত লোভী মেয়ে দেখেছে সে নিজেও--একটু গা ঘেঁষে নরম চাহনি দিয়ে কাছে ডাকলেই কত! পারে না, কেউ বলেনি এমন কথা।

সুদেষ্ণা কি কম চেষ্টা করেছে নাকি?

অবশ্য সুদেষ্ণাই বলে, বড্ড কড়া; কত চেষ্টা করলুম ভাই কিছুতেই ভেজে না।

আচ্ছা সুদেষ্ণা সেদিন কালীবাবুর সংগে তার--

না না সে-ই—, ভালবাসার ইংগিত করছিল কেন?

সুদেষ্ণা কি সত্যিই তার কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে, না এমনি বাজাচ্ছিল?

বোধ হয় বাজাচ্ছিল।

হয়ত কোন মতলব আছে।

নাঃ, একটু সজাগ হয়েই চলবে সে। সান সাইন ক্লাবে মহলার সময় ওদের সামনে সজাগ হতেই হবে। নৈলে সুদেষ্ণারা তাকে খেলো করতে পারে। বড্ড মতলববাজ মেয়ে ও। আচ্ছা সুদেষ্ণা না হয় নিজের মতলবেই ও কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু তার মনে কি.. ......?

এ ভাবনাটাকে সম্পর্ক করতে পারে না অনুরাধা। এক সলজ্জ ছেদের কামনায় সে নিজের দেহটাকে সিধে করে বাসের চারদিকে দৃষ্টি বুলতে চাইলো।

পালাতে চাইছো বুঝি!

পালাবো কেন, কি জিজ্ঞাসা করছো, কি উত্তর আশা করো।

ভালবাসো না?

ঠিক বুঝি না।—অনুরাধা সীটের কোনটায় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। বুকটা নাচে দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে।

বোঝো, ন্যাকামি করে কি সত্যটাকে লুকোনো যায়? স্বীকার করতে দোষ কি!

স্বীকার করে লাভই বা কি।

কি লাভ চাইছো তুমি? দ্বিধা কেন, বল বিয়ে করবে কালীবাবুকে?

সম্ভব নয়।

কেন?

পারিবারিক দায়িত্ব অনেক। তা ছাড়া খুকুমণি আছে।

পারিবারিক! কার পরিবার; তোমার কি?

পরের বোঝা কি ভূতের বোঝা নয়? আর খুকুমণিকে মায়ের মত—

না না, নিজের মা ভাই ভাইপোরা আজও অনেক প্রিয়। অনেক কাছের ওদের ভালোর জন্য সারা জীবনটা এমনিভাবে কাটতে কোন দুঃখ নেই, বরং তৃপ্তি পাবো, শান্তি পাবো। আর খুকুমণিকে নিজের শরীরের কাছাকাছি না রাখতে পারলেও তার মনের কাছেই খুকুমণির স্থান আছে যথেষ্ট!

এ তোমার আত্মবঞ্চনা নয় কি?

দোহাই তোমার তুমি চুপ করো, আমার মনের শান্তি কেড়ো না—অসোয়াস্তিতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো অনুরাধা সীট ছেড়ে।

উঠলেন কেন, জল ভেঙেই যাবেন বুঝি?

চশমা পরা ঐ ছেলেটির কথাটা কানে যেতেই অনুরাধা সম্বিৎ ফিরে পেল। সামাজিক মনটা তার সজাগ হয়ে বললে, না। এমনি বেকার একঘেয়ে বসে থাকতে পারে নাকি মানুষ!

সত্যি আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।—ছেলেটি তার চোখ থেকে দৃষ্টিটা নামিয়ে বললে।

অনুরাধা নিজের সীটের কাছ থেকে একবার বাসের পাদানির কাছে এগিয়ে গেল।

নাঃ বাসের পাদানির প্রায় দুটো পেঁটা পর্যন্ত জল উঠেছে। নামলেই একাকার। জুতোটা হাতে নিতে হবে। খালি পায়ে কত কি ফুটতে পারে, হাজা হতে পারে। হাজার কথা মনে হতেই অনুরাধার গাটা ঘিনঘিন করে উঠল—

বিশ্রী গন্ধ! মার একবার—নাঃ বাবা, নেমে কাজ নেই যা হয় হবে। না হয় সারারাতই বাসে থাকবে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। একজন পরিচিত কেউ সঙ্গে থাকলে মন্দ হতো না? মাঝে মাঝে কথা বলা যেতো—

কালীবাবু যদি এ-বাসে—নাঃ বড্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে, ঠিক নয়, মনটাকে বাগ না করলে—সব গোলমাল!—

কন্ডাকটার দুজন বেশ ঘুমচ্ছে।—বেচারীদের বড্ড খাটুনি! ফালতু বিশ্রাম মিলেছে। ঘুমচ্ছে কিন্তু বেশ! একজনের নাকও ডাকছে!—হাসি পায় অনুরাধার—নাকেমুখে ঘুমন্ত ডাকটা শুনলেই হাসি পায় তার। দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে—নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করে।

একবার মেজদার নাকে একটা কাগজ পাকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে গিয়ে বড্ড মার খেয়েছিল ছোট বেলায়—মনে পড়তেই অনুরাধার হাসি পেল। নাঃ, ছোটবেলায় সেও কম দুষ্টুমি করেনি।—পিন্টু বুলাদের দুষ্টুমির চেহারা অবশ্য অন্যরকম—বড় ভাঙে ওরা জিনিসপত্তর; বড্ড ঝগড়া-মারামারি। তাদের ও বয়সে অনেক ঠান্ডা ছিল!

ট্যাক্সিও হয়ত মিলবে না!—হতাশ একটা স্বর কানে আসতেই মুখ ঘোরালো অনুরাধা।

সেই স্যুটপরা ছিমছাম টান-হয়ে-বসা লোকটি। বেশ স্মার্ট চেহারিটও—একবার তার দৃষ্টিটা ছিটকে ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল পরিক্রমা করে এলো।

ভারি বিপদে পড়ে গেছেন কিন্তু ভদ্রলোক। কোন উপায় নেই। দামী স্যুট্ নিশ্চয় ভিজবেই। আর তখন ভদ্রলোকটির স্মার্টনেশ একেবারে গেঁয়ো ভূতের মতই—বেশ মজা লাগে। ব্যস্ত ছিমছাম মানুষগুলো যখন প্রাকৃতিক বিপত্তিতে বেসামাল হয় বিকৃত ভঙ্গি করে—হাসি পায় অনুরাধার।

—নাঃ সীটে গিয়েই বসা যাক বাবা, খেয়ালের মাথায় হেসে ফেললেই ভদ্রলোক হয়ত ভাববেন তাকে দেখেই হাসছে,—তখন আবার উল্টো বিপদ! কাজ নেই এখানে দাঁড়িয়ে—

অনুরাধা আস্তে আস্তে নিজের সীটের কাছে ফিরে এলো। তারপর হাতব্যাগটা খুলতে সচেষ্ট হলো—নাঃ আরাম করে বসা যাক্, কতক্ষণ আরো বসে থাকতে হবে কে জানে!

ও গো নদী আপন বেগে পাগল পারা—

গানের একটি কলি কানে বাজল অনুরাধার।

—না বেশ সুর আছে গলায়—রবীন্দ্র সংগীতে দরদ না থাকলে কেমন যেন বিশ্রী লাগে! তারও তো গানের গলা আছে। শিখেছিলও কিছুদিন রবীন্দ্রসংগীত।

শেখরবাবু ক্লাবে শোধবোধ নাটকে তার গানের গলা শুনে বলেছিল, নিয়মিত শিখুন না অনুরাধা দেবী। বলেন তো আমার স্ত্রীকে বলতে পারি। মাঝে মাঝে যেতেও তো পারেন আমাদের বাড়ীতে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে যখন আলাপ আছে।

তা আছে।—হেসে বলেছিল সে।

শিখুন, অমন সুন্দর গলা রয়েছে! নষ্ট করবেন না।

কিন্তু সময় কোথায়?—সলজ্জ হেসে বলেছিল সে।

করে নিতে হবে। ও দেশের আর্টিস্টরা কিন্তু এ-সব ব্যাপারে চৌখোশ। নাচে গানে অভিনয়ে সমান ধার—তবেই তো আর্টিস্ট! আপনার অনেক গুণই আছে। একটু সময়নিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে অনুশীলন করুন দেখি. পাঁচ বছর বাদে নিজের ওয়েট নিজেই বুঝতে পারবেন।

সময়নিষ্ঠা, একাগ্রতা—একটা শিল্পীর জীবনে অবশ্য প্রয়োজন। অনুরাধা নিজেও বোঝে। কিন্তু বুঝেও অবুঝ হতে হয় তাকে। টাইপিস্টের চাকরীটা তার শিল্পীজীবনে কত সময় নিয়ে গেছে। ঐ সময় যদি পেতো সে—

না আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। ভগ্ন চালায় বাস। চালের খড় জোটাতে জোটাতে যেটুকু ধরা যায়—

এ-কথাটা কিন্তু বেশ ভাল!—কে যেন বলেছিল. তার মনে কি হঠাৎ এলো?

না, বাবা বলতেন মাকে মাঝে মাঝে। সেই রায়নগরে দাওয়ায় বসে বসে বাবা যখন গানে তন্ময় হয়ে যেতেন, তখনই মা মাঝে মধ্যে বলতেন. গানটাকেই ভাল করে শিখলে তো পারতে—

বাবা হাসতেন মৃদু. তারপর বলতেন. ভগ্ন চালায় বাস, চালের খড় জোটাতে জোটাতে যেটুকু ধরা যায়—

হেঁয়ালীর কথা বাপু তোমার আমি বুঝি না।

বাবা আর কথা বলতেন না তখন। চুপচাপ সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আবার একটা গানে ভেসে যেতেন—

একবার বিরাজ গো মা হৃদিকমলাসনে!—

এ গান কত মধুর লাগতো। আচ্ছা এ সব গান, সুর এখনকার গায়করা গায় না কেন?

হয়ত রস পায় না! বিপদে না পড়লে আজকাল কারো ধর্মে কর্মে মতি হয় না। তবু যেন ভীড় জমছে ঠাকুরবাড়ীগুলোতে!

মাঝে মাঝে মার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীতে পাঠ শুনতে গিয়ে দেখেছে অনেক তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েকে। বেশ ভক্তি ভরেই পাঠ শুনছে। গোঁসাই ঠাকুরটি বেশ রসিয়ে বলেন কিন্তু। শুনতে বেশ লাগে। মাকে নিজের ভাললাগার কথা বলতেই মা উৎসাহ পেয়ে বলেছিলেন. যেতে পারিস তো; ভাল ভাল কথা শুনলে পরকালের কাজ হয়। তাছাড়া অনেক কুচিন্তা কমে।

পরকাল! দাঁড়াও মা আগে ইহকালটাই তোমাদের মত বয়সে নিয়ে যাই!—ঠাট্টার ছলেই বলেছিল সে।

এ-কথায় মার মুখভার।—তোদের সবটাতেই কেমন যেন ঠাট্টা! বিশ্বাস নেই! সেই জন্যেই তো এত অশান্তি।

কে জানে হয়ত তাই। মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে। তাই সদগুণও অর্জিত হচ্ছে না। বাইরে কত উন্নতি, কিন্তু অন্তরে?—নোংরা, ছোট বয়স থেকে নোংরামি শিখছে। শিখবেও। চারদিক অসুস্থ। ভেজাল, ব্যাভিচার, স্বার্থপঙ্কিল সমাজ এখন কলকাতার! ছোটদেরই বা দোষ কি?—

সেদিন যখন বুলাটা খবরের কাগজ দেখছিল—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—

খবরের কাগজ আর ছোটদের পড়তে দেওয়া উচিত নয়।

বুলাটা সেদিন কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে আইন আদালতের ফলাও-করা সেই বাপ মেয়ের কেচ্ছার খবরটা...।—কি বীভৎস! কি লজ্জা—খবরটা কাগজে না ছাপালে কি চলতো না?

কান্ডজ্ঞান না হয় ছোটদেরই নেই। কিন্তু বুড়োদের?—খবরের জ্ঞানীগুলোর কি বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই—লজ্জা করে না বুঝি ঐ খবরে মনযোগী দেখতে নিজের ছেলেমেয়েদের!

রাগে অনুরাধার শরীরটা রি রি করে ওঠে।

নাঃ কাগজ কেনা বন্ধ করে দেবে। কি হবে ঐ কুৎসিত খবর পড়ে। কি জ্ঞানের অধিকারী হবে আজকের শিশুরা? হয়ত ঐ সব শিশুরা ভবিষ্যতে মানুষের শ্রদ্ধা সম্পর্কের সংস্কারটা হারাবে। বাবা মা শব্দগুলো শুধুমাত্র ধ্বনি হিসেবেই ব্যবহার করবে—

নাঃ এ সব ভাবলে মাথার ঠিক থাকে না—অনুরাধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে এ চিন্তা সরাতে চাইলো।

—"আমি স্তব্ধ চাঁপা তরু গন্ধ ভরে তন্দ্রাহারা
ওগো নদী আপন—"

এ গানটা তার ভাল লাগে, আর রায়নগর গ্রামটা, সেই সংগে মনে পড়ে যায়। সেই মধুমতী, সেই চাঁপা গাছের গন্ধ, সেই বিভোরতা...

—নাঃ এবার গানটা একেবারে বেসুরো গাইছে! দরদ নেই—অনুরাধা মুখ ফিরিয়ে দেখলো—

সেই ফর্সা ছেলেটা, যে তাকে পিট্‌পিটে চোখে দেখছিল এতক্ষণ,—ও-ই গান করছে।

শিখলে তো পারে ভালো করে। গলাটা ভাল হতে পারে কালে। মনের উগ্রতাও কমবে তাতে।

বলবে না কি?

পাগল না কি—আর বলবেই বা কোন অধিকারে? কেন, শ্রোতা হিসেবে।

দরকার কি! তার চেয়ে নিজের কথা ভাবলে কাজ হবে, না হয় চোখ বুজে ঘুমোও—অনুরাধা মনটাকে স্থির করতেই চোখ বুজলো আবার মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে।

কিন্তু স্থিরতা পায় না মন। আশপাশের কথাগুলো ধাক্কা দেয় মগজে—

চালের দামও বাড়ল। চব্বিশ-এ দাঁড়িয়েছে। হয়ত পঁচিশ হবে।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দও কানে এলো।

সত্যি সাধারণ মানুষকে আর বাঁচতে দেবে না—অনুরাধার মনও বলে ওঠে।

আলুও তো বারো আনা কিলো।—জোয়ান স্বরটা কানে এলো।

ঐ আর এক গেঁড়াকল মশায় ভূতে কিলোচ্ছিল তো তাই সর্ষের শরণ। কেন বাপধনরা, আমাদের হিসেব কি খারাপটা ছিল—ছোটবেলা যদি শুভঙ্করীর আর্যাগুলো ভালো করে রপ্ত করা যায়, তা হলে—টাকাকড়ির চলতি হিসেবে গড়গড়ে গড়িয়ে যেতে পারা যায়। আমরা মশায় বুড়োমানুষ, ঐ ধারারই পক্ষপাতী। পাঠশালের হিসেবেই এতকাল কাটিয়ে এলাম।

আপনাদের কথা আলাদা মশাই। আমাদের এখন নিজস্ব Foreign Exchange-এ জমা খরচা করতে হচ্ছে। আপনাদের তো ও সব জাতীয় বালাই ছিল না—

বুড়ো মানুষটির আর কথা নেই। হয়ত মেজাজ পাচ্ছেন না। নয়ত নিজের কথায় ডুবে গেছে মন।

—অনুরাধার দৃষ্টিটা আবার ফিরে গেল আলোচনা যে দিক থেকে আসছিল সেই দিকে—

হ্যাঁ, বুড়োমানুষটি চোখ বুজে কি যেন ভাবছেন। আর ও'র পাশের লোকটি একটা সিগারেট ধরালো।

চকিতে অনুরাধার মনে হলো, ছেলেরা বেশ সহজে নেশা করে নেয়। কিন্তু মেয়েরা?—মেয়েরা বড়জোর পান জর্দা কিংবা দোক্তা পান। তাও কুমারী মেয়েদের ইচ্ছে হয় না। দাঁতে কালো কালো ছোপ পড়ে। নৈলে পান খাওয়াটা মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে একটু জর্দা নিয়ে খেতে বেশ লাগে- মুখে বেশ রস থাকে। পান একটা খেতে পারলে মন্দ হতো না এখন।—কিন্তু উপায় নেই! ইচ্ছেগুলো মনে মনে সারা ভালো—হাসি পেলো অনুরাধার এ কথা মনে হতেই।...

ও দাদা, ও কনডাক্টার সাহেব গাড়ী কি সত্যিই চলবে না।

সাড়া নেই। ঘুমচ্ছে।

শুনছেন, ও ভাই—

আচ্ছা লোক তো আপনি, লোকটা একটু আরাম করছে—

ডিউটির সময় আরাম কি মশায়—শুনছেন- হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বোধ হয় ডাকছিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি।

কী ব্যাপার?

গাড়ী কি এখনও যাবে না।

না। দেখতে পারছেন তো স্টার্ট নিচ্ছে না।

জল তো অনেক কমেছে।

কমেছে তো ড্রাইভারকে বলুন—লোকটা আবার ঘাড় গুজলো কোণে। ঘুমের মেজাজ, কথা ভাল লাগছে না।

ড্রাইভার সায়েব, ও মশায়, আপনিও ঘুমচ্ছেন নাকি?

বৃদ্ধটি সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আর পারছেন না চুপ করে বসে থাকতে।—অনুরাধার মায়া লাগে।

শুনছেন, ও ড্রাইভার সায়েব,

চিল্লাচ্ছেন কেন অত মশায়, কান আছে, কি বলতে চান বলুন না।

গাড়ী কি চলবে?

না।

কেন?

গাড়ীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা তাই চলবে না মশায়। নেমে যান না বসতে ভাল না লাগে। বলে তো দেওয়া হয়েছে।—ড্রাইভারটি আবার স্টিয়ারিং-হুইলে মাথা রাখলো।

অনুরাধা এবার বৃদ্ধটির মুখের দিকে চাইলো—নাঃ ভদ্রলোকের মুখখানা বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। আর কথা নেই মুখে।

ও কি, কাপড় গুছোচ্ছেন কেন? বোধ হয় নেমে যাবেন—

যা হয় হবে নেমে তো পড়ি—বৃদ্ধ মানুষটি বাসের পা-দানির দিকে এগিয়ে গেলেন—

তারপর ঝপ্, ঝপাৎ!—

নেমে পড়লেন তাহলে ভদ্রলোক! কি আর করবেন বুড়োমানুষ একা বসে থেকে! আর সকলকেই শেষ পর্যন্ত নামতেই হবে, আগে আর পরে—জয় শ্রীহরি! আমি কি করি, আমাকে যে বেলঘরিয়া যেতে হবে!

রাতও হচ্ছে।

এক কাজ করুন না, কোনমতে শিয়ালদা পর্যন্ত চলে যান না।

তুমি তো বলে খালাস বাবা, শক্তি থাকলে কি বসে থাকতাম। ৭৫ বছর বয়সে এই জল ভাঙলে আর বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারবো কি—

তাহলে অপেক্ষা করতে হয়।

অপেক্ষাই তো করছি বাবা, শ্রীহরির ইচ্ছা যা তাই হবে!

অনুরাধার মন ভিজে লাগে; বেদনায় শির শিরে কাঁপন দেয় শরীরে—চকিতে মনে হয়,

ঐ বৃদ্ধ মানুষটি হয়ত আজ বাড়ী যেতে পারবেন না, হয়ত সারারাত অভুক্ত থাকতে হবে! প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও'র বাড়ীর লোক চিন্তিত।

আচ্ছা তারও বাড়ীতে নিশ্চয় মা ভাবছেন, হয়ত বিশাখা বৌদিও। নাঃ, এবার তাকে সত্যি সত্যিই বাড়ী যাবার কথা চিন্তা করতে হয়—রাত ক্রমশঃ বাড়ছে! বাসের লোকজনও কমে আসছে। রাতে বাসে কাটানো—নাঃ মোটেই উচিত হবে না। তাহলে হেঁটে হেঁটে অন্ততঃ কালীবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত পোঁছতে পারলে একটা উপায় হয়।

তারপর বেশী রাতের দিকে জল নিশ্চয় নেমে যাবে, তখন একটা ট্যাক্সিতে ফিরলেই চলবে। উপস্থিত আর কিছুক্ষণ না হয় অপেক্ষা করা যাক্,

এ ভাবনা শেষে অনুরাধা মাথাটা সীটের কোনটায় ঠেস্ দিয়ে আবার চোখ বুজলো।— ক্লান্তি, বড় অসহায় ক্লান্তি—

শরীরটা এবার যেন ঝিমোতে চাচ্ছে। ঘুমের আমেজের মত। হাত পা ছড়িয়ে শুতে ইচ্ছে করে।

জলো হাওয়া। বেশ লাগছে, আঃ—

অনুরাধার মনটা আর কথা বলতে চাইছে না। হাওয়ার আমেজে মনটাও নিশ্চুপ।

কিছু সময় গেল। অস্পষ্ট ঘুম! অন্য এক বিশেষ অস্তিত্বঃ না জড় না চৈতন্যঃ কিছু নেই, আবার আছেও। আশপাশের কথাগুলো বিড় বিড় করে কানে আসে। কিন্তু কোন ছোপ রাখছে না। ঘুমটা যেন চেতন মনটাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে।

অনুরাধা একবার চেষ্টা করলো চোখটা চাইতে। কিন্তু তাও কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। আবার আপনা আপনি বুজে এলো চোখদুটো। গাঢ় ঘুমের প্রস্তুতি যেন সম্পূর্ণ। দেহমন শ্লথ। কোন সাড় নেই পরিবেশের প্রতি। সহজ আয়াসের জন্যে মাথাটা বাঁ দিকে হেলাতেই অনুরাধার এলো খোঁপাটা খুলে গেল। একরাশ কালো এলোচুল রেস্টারের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

খেয়াল করে আর গুছিয়ে নিলে না অনুরাধা নিজের চুলগুলো।

বাসের যাত্রী আর মাত্র জনা-দশেক। বাকী সব নেমে গেছে।

অনুরাধার সামনের সীটের তিনজন পুরুষ যাত্রী। একবার দেখলে অনুরাধার ঘুম ঘুম

মুখমণ্ডল, এলানো কেশরাশি। সব মিলিয়ে অনুরাধার সারা দেহটা ওরা নিজের নিজের মত করে দেখে নিলো, ভেবেও নিলো কিছু। কিছু কথা আরম্ভ হলো ঃ

গাইয়ে ছেলেটি, যে অনুরাধার পড়ে যাওয়া ব্যাগটার কথা স্মরণ করিয়েছিল, সে কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল শুনুন—, বৃদ্ধ লোকটি বাধা দিলেন হাতটা চেপে ধরে, চুপি চুপি বল্লেন,

ঘুমতে দিন না, ডাকছেন কেন?

পাশে ব্যাগটা ওভাবে ফেলে—

কেউ নেবে না মশায়। আপনি চুপ করে পাহারা দিন না কেন চিৎকার না করে;—ব্যংগ স্বরে বললেন ঐ সীটের আর একজন যাত্রী।

ছেলেটি চুপ করে রইল। কিছু বললে না। মুখখানায় রাগের আভাস রাখলো ওর স্পর্ধিত যৌবন।

ওর দৃষ্টিটা মাঝে-মাঝে চক্ষুলজ্জার সীমা অতিক্রম করে অনুরাধার দেহটায় ঘোরাফেরা করতে থাকলো।

বৃদ্ধের পাশে সুশ্রী প্রৌঢ় লোকটি বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আজকাল মশায় নারী পুরুষের মধ্যে অপরিচিতির সম্ভ্রমটা একেবারে অনুপস্থিত।

তা যা বলেছেন। এই বলে বৃদ্ধটিও চোখ বুজলেন। কথা আরও বলতে ইচ্ছে করছে না। অনেকদূরের যাত্রী, অথচ অগাধ জলে পড়ে আছেন। আলোচনায় মন নেই।

দুধারে লম্বা সীটগুলোতে ছাড়া ছাড়া যাত্রীদের মধ্যে বা দিকের কোনে সেই স্যুটপরা ভদ্রলোকটিও অনুরাধাকে লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ ভদ্রলোক উঠে পড়লেন নিজের সীট থেকে। কিছু সময় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর অনুরাধার সামনে সীটে সেই সৌখিন ছেলেটির পাশে এসে বসলেন।

চুপচাপ। কিছু সময় কথা নেই বাসের যাত্রীদের।

শব্দ আছে। জলের শব্দ। টুপটাপ জলের ওপর, বাসের মাথায়। শব্দ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের, —নাক ডাকার আওয়াজ।

একটা মোটরহর্ণ আবার চমক দিলো যাত্রীদের।

স্যুটপরা ভদ্রলোকটি হর্ণের শব্দের সংগে সংগে ছেলেটির পাশ থেকে একবার উঠে দাঁড়ালেন অনুরাধার দিকে দৃষ্টি রেখেই।

ছেলেটি রেগে উঠছিল ক্রমশঃ। কিন্তু প্রকাশের সূত্র ঠিক করতে পারে না।

স্যুটপরা ভদ্রলোকটি একটু এগুলেন অনুরাধার সীটের কাছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে ছেলেটি এসময় একবার তাকালো—বৃদ্ধটি চোখ বুজেছেন।

ঘাড় ফিরিয়ে নিলো ছেলেটি। এখন প্রতিবাদ করবে কে, আমার বেলায় বাধা—একথা ছেলেটি চোখ দুটোয় বলতে চাইলো।

স্যুটপরা ভদ্রলোক অনুরাধার সীটের রেলিংয়ে হাত রাখলেন।

ছেলেটি অস্বোয়াস্তিতে তার নিজের মাথার চুলে পাক দিতে দিতে বোধ হয় মনের গতির সমতা রাখে—কি করবে স্যুটপরা লোকটি এখন?

শুনছেন?—স্যুটপরা লোকটি অনুরাধাকে ডাকলেন।

ঐ ডাকের সংগে সংগে ছেলেটি চমকে কেঁপে উঠলো।

অনুরাধা একটু নড়লো শুধু।

শুনছেন?—স্যুটপরা লোকটি আবার ডাকলেন।

অনুরাধা এবার চমকে চোখ মেললো—

একি? এই ভদ্রলোকটি তার সামনে কেন, কি ব্যাপার?

কিছু যদি মনে না করেন—বিনয় সুরে স্যুটপরা লোকটি বলে উঠলেন।

অনুরাধা এবার সিধে হয়ে বসে চোখ মুছে নিলো। তারপর পরিবেশ-চেতনায় সে ভদ্র হাসি ঠোঁটে রেখে বলল,

হাওয়াটা ঘুম ধরিয়ে দিয়েছিল। আমাকে কিছু বলতে চান বুঝি? বেশত বলুন।—

এ কথা শেষে অনুরাধা নিজের চুলগুলো গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট হল।

স্যুটপরা ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ একটা প্রয়োজনেই আপনাকে বিরক্ত করলাম।

অনুরাধা একরাশ বিস্ময় নিয়েই এবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল—

অপরিচিত লোকটির কি প্রয়োজন হতে পারে। অনুরাধা মনে জিজ্ঞাসু উঁকি দিয়ে পরিচ্ছন্ন ভদ্রতায় বললে, না না বিরক্ত আর কি এমন—বলুন না কি বলতে চান?

স্যুটপরা ভদ্রলোকটি মুখে হাসির রেখা টেনে বলে উঠলেন,

আপনি আমায় না দেখলেও আমি আপনাকে কয়েকবার দেখেছি। অবশ্য এ বাসেই নয়, বাইরেও। এই কার্ড দেখলেই বুঝতে পারবেন কি প্রয়োজন। এটা রাখুন। এতে আমার নাম ঠিকানা আছে। আগামী কাল কিংবা পরশু অবশ্য সকাল ১০টার মধ্যে, আগ্রহ থাকলে দেখা করবেন, কেমন। অচ্ছা আজ চলি, নমস্কার—স্যুটপরা ভদ্রলোকটি এ কথা শেষে নমস্কারও দিতে দুটো হাত একবার তুললেন।

অনুরাধাও যন্ত্রবৎ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্রতিনমস্কার জানালো। স্যুটপরা ভদ্রলোকটি এবার এগিয়ে গেলেন বাসের পাদানির কাছে। তারপর ঝপ করে একটা আবার জলো আওয়াজ বাস যাত্রীদের কানে এলো।

স্যুটপরা ভদ্রলোকটি বাস থেকে নেমে গেলেন।

অনুরাধা ঘাড় বেঁকিয়ে লক্ষ্য করলে ভদ্রলোকের যাওয়াটা।—ভদ্রলোক তা হলে সত্যি চলে গেলেন। কার্ডটা দেখলেই বুঝবেন—

কথাটা মনে হতেই অনুরাধা কার্ডটা দেখবার জন্যে ঘাড় ঘোরালো—

ডিমের খোলার মত সাদা একখান কার্ড—

অনীম রায়, ফিল্ম ডাইরেকটার। সাদার্ন এভিনিউ।

চমক লাগে মনের মধ্যে অনুরাধার।

আহা ভদ্রলোক চলে গেলেন—ব্যস্ত হয়ে সে ঘাড় ফেরালো।

না! অনেক এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু কি ব্যাপার, নিশ্চয় নতুন কোন বই করছেন, একটা রোল!—রোমাঞ্চ অনুভব করল অনুরাধা—

অদ্ভুত লাগছে কিন্তু!—নঃ কাল সকালেই যাবে।

কিন্তু এই ওয়েদার যদি না কাটে, তা'হলে পরশু ভদ্রলোক তো বলে গেলেন।—

অনুরাধা নড়ে চড়ে বসল।—

ছেলেটা কি বিশ্রী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে দেখছে—

ঘুমতে পারছে না বুঝি—অনুরাধার দৃষ্টিটা ঘুরে এলো ছেলেটার দিক্ থেকে ঠোঁটে হাসির রেখা নিয়ে।

নাঃ কার্ডটা ভাল করে রাখা যাক্—

এ কথা মনে হতেই অনুরাধা তার ব্যাগটা পাশ থেকে ব্যস্ত হয়ে নিলো। তারপর কার্ডটা সযত্নে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো।

অনীম রায়, অনীম রায়—অনুরাধার মন গুনগুনে সুরে নামটা কয়েকবার স্মরণ করল।

হ্যাঁ কয়েকটা ছবি করছেন ভদ্রলোক। নামও আছে!

আচ্ছা তাকে কি কোন নায়িকার ভূমিকা দেবে—মনের মধ্যে কে যেন আলতো করে প্রশ্ন উঠালো।

হয়ত একটা সাইড রোল পেলেও পেতে পারো—

যাওয়া যাক্ তো, সামনাসামনি হলে বোঝা যাবে।

কিন্তু এখন আর কিছু ভাল লাগছে না যে! এবার উঠবেই সে। কাপড় ভেজে ভিজুক।

কালীবাবুর বাড়ীতেই উপস্থিত যাবে।

কালীবাবু নিশ্চয় বাড়ী আছেন। না থাকলেও ক্ষতি নেই। চেনা জানা।

খুকুমণি নিশ্চয় ঘুমচ্ছে—বেশ মিষ্টি লাগে ওকে ঘুমন্ত দেখতে!

না আর দেরী নয়—কালীবাবুর সঙ্গে দেখা হলে একটা পরামর্শও করতে পারবে—নিশ্চয় উৎসাহ দেবেন। হয়ত হেসে বলবেন,

রূপালী পর্দায় কেমন দেখায় সেই অপেক্ষায় থাকলাম। আপনার অভিনয় সার্থক হোক!—

বেশ সুন্দর মানুষ কিন্তু! উনি প্রশংসা করলে সুখকর লজ্জা নিয়ে চুপচাপ শুনতে বেশ লাগে—

এ চিন্তা শেষে অনুরাধা একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর হাতব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

যাচ্ছেন বুঝি!—ছেলেটা উৎসুক হয়ে চাইলো।

হ্যাঁ, আর বসে থাকলে বাড়ী ফিরতে পারবো না কিনা—লঘুস্বরে এ কথা বলে মৃদু হেসে অনুরাধা বাসের পাদানির কাছে এগিয়ে গেল।

অন্য যাত্রীদের সজাগ দৃষ্টিগুলো অনুরাধাকে সামনে রেখে এগিয়ে গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত অনুরাধা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়ালো পাদানির কাছে। জুতোটার দিকে একবার চাইল সে—

না থাক্, নষ্ট হয় হোক—কাপড়টা ঈষৎ বাঁ হাত দিয়ে তুলল অনুরাধা। তারপর—

ঝপ!—আর একটি জলো শব্দ বাস যাত্রীদের কানে পৌঁছালো।

উঃ কি ঠান্ডা!—

ঝপ ঝপ শব্দ তুলে জল ঠেলে এগিয়ে চলল অনুরাধা উত্তর দিকে।

কবিতাগুচ্ছ

কৃষ্ণ ধর

স্বপ্ন চূড়া

আমাকে স্বপ্নের চূড়া থেকে ঠেলে দিল কেউ
কেউ যেন ফেলে দিল আচল উচলে ডেকে নিয়ে।
স্বপ্নের ভিতরে আমি অন্যমনে অপেক্ষায় আছি
একটি বেহালা হাতে করে। কেউ যেন ঠেলে দিল
স্বপ্নের চূড়া থেকে, ঠেলে দিল, কেউ যেন ফেলে দিল
ওই অচল উচলে ডেকে নিয়ে, ফেলে দিল কেউ অকস্মাৎ।

পরিশ্রান্ত হয়ে আমি তাহাকে খুঁজেছি আশে পাশে
করুণতা মেখে নিয়ে প্রতীক্ষিত সেই চোখ দুটো
হয়তো বা মগ্ন ছিল অন্য কোনো স্বপ্নের ভিতরে
অথচ খুঁজেছি আমি তাহাকেই বারবার পরিশ্রান্ত হয়ে
আশে পাশে সেই দুটি চোখ যার মগ্ন হয়ে আছে পদ্মদলে।

নিজেকেই চিনিনি আমি একাগ্র চিন্তার বিভোরতা
গায়ে মেখে সকরুণ চোখের গল্পই পড়ছিলাম
চৈত্রদিনে অবিশ্রান্ত রৌদ্রে পুড়ে, ঝড়ে উড়ে আমি
মনের কাহিনীগুলি পড়ছিলাম, ভাংগা বেহালা হাতে করে।

সে কিছুই বলেনি তখন, রাগী তরুণ দলের মতো
চৈত্রের পাতাগুলি এলোমেলো তর্ক জুড়ে দিল
তাই তার কথাগুলো শুনিতে পাইনি আমি, চৈত্রদিনে
একাকী মাঠের দিকে মুখ করে, স্বপ্নগুলি খুঁজি
যাহারা অনেকদিন বিসর্জিত নির্ঝরের জলে।

পরিণয়ের শোভাযাত্রা

শাদা ঘোড়ার পিঠে জরীর পোশাক পরে একটি যুবক
উজ্জ্বল রাত্রির সংগে মিলিত হতে যাচ্ছে সৈনিকের মতো।
তেজস্বী সে নিশ্চয়ই তার চোখে চিকচিক দুরাশার আলো
দিনটাকে বাড়িয়ে নেয় মস্ত এক উৎসবের বোলে,
শাদা ঘোড়ার পিঠে অনন্তকাল এই শোভাযাত্রা।

কখনো নম্র চিবুকে জমে স্বেদবিন্দু, অলিখিত
করুণার ছবি, প্রতিবিম্ব জলাশয়ে, বৃক্ষলতা
বনের সংলাপ, কখনো হিংস্র পাহাড়, পরাজিত
ঝর্নার জল, শোভাযাত্রা চোখে দেখে সুরভি ছড়ায়
বুনো গোলাপ, অভিষিক্ত যুবকেরা খোঁজে পবিত্রতা।
পরিণীত হতে যাচ্ছে যুবককে সামনে রেখে
চড়াই উৎরাই ভেঙে, কন্যাকে দেখেনি তারা কেউ
শুনেছে তাহার কথা, তার চোখে বিকেলের আলো
আশ্চর্য যাদুর মতো প্রক্ষিপ্ত স্মৃতির অলিন্দ যেন
জীবনের উদ্যানকে ভরে রাখে অজস্র সম্ভারে।

যে দিনটাকে পিছে ফেলে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে
তাহার করুণ মুখ মন কাড়ে, স্মৃতি, স্মৃতি স্মৃতি
হৃদয়ে শিশির জমে, মুখগুলি ভীড় করে আসে
হাওয়াতে অনিন্দ্য স্বর, [ছন্দের] মৃদঙ্গ বাজে যেন
প্রেম ও অপ্রেমে তার হৃদয়টা ভীষণ উন্মুখ।

বিস্মিত পাহাড়

নদীর দুরন্তপনায় ঘুম ভেঙে প্রবীণ পাহাড়
চমকিত মেঘের আড়ালে খোঁজে কার
চোখের ভ্রমর ভাষা। পৃথিবীর বুকে
হেঁটে যায় দোলনায় শায়িত শিশুর মতো
নদী খোঁজে অতল সাগর।

পাহাড় জানতো না তার বক্ষে আজ পূর্ণিমার
জ্বালা। অফুরন্ত জ্যোৎস্না নিয়ে বনস্থলী
এমন উতলা
হবে তার হরিণীরা যৌবনের অসামান্যতায়।
অর্জুন শিমুল শাখা মণিবন্ধে জীবনের রাখী
বেঁধে আজ বসে আছে চৈত্রের আশায়।

নদী তার ঘুম ভাঙাল উজ্জ্বল রোদ্দুরে
পাখিরা হারিয়ে গেল, পাহাড় অবাক
নিজের শরীর ভেঙে পবিত্রতা খুঁজে
অতঃপর বিনিদ্র মৈনাক॥

তু তু নামে সেই কুত্তাটা

সন্তোষকুমার ঘোষ

॥ এক ॥

তু-তু ছিল কুকুর, একদিন একেবারে কুত্তা হয়ে গেল। কী করে হল, সেই গল্পটা শোন।

দেখতে ভারী বদখত ছিল কুকুরটা, তদুপরি বোকা। জন্মাবধি ঠ্যাঙ কমজোরী বলে কস্মিনকালে তুরন্ত বা দুরন্ত হতে সে পারেনি, ফলে আপন দলে-মহলে একদম পাত্তা পেত না। গলাও বেজুত, তার কেঁউ কেঁউ কখনও ঘেউ ঘেউয়ের মত শোনায়নি।

একা বসে থেকে থেকে দিবারাত্র হা-হা করে শ্বাস টানত কিনা—সে এক রকম আলসেই হয়ে গিয়েছিল। তার সার ছিল শুধু ওই লকলকে জিবটা।

লেজ গুটিয়ে আড়চোখে এদিক ওদেক চাইত আর রাগে গরর্ গরর্ করত। খুব হিংসা ছিল তার, বুঝলে, আর একেবারে ন্যাংটো লোভ। তার ভিতরে ওই লোভটাই যা জোরালো ছিল।

কুকুরযোনির চরম চরিতার্থতা তো কারও না কারও পোষ্য হওয়া, সেরা বকশিষ তো বকলস? ওর চেনা-জানা বিস্তর কুকুর সেই সপ্তম স্বর্গে চড়ার সুখ পেয়েছিল। তাদের কাছে ও ঘেঁষতে পেত না, দূর থেকে দেখত আর জ্বলে পুড়ে মরত। জ্বলুনি পুড়ুনি দিয়েই একটা স্বপ্নও তৈরি করে নিয়েছিল। কোন্ হাটে ঘুন্টি-শিক্লি ইত্যাদির কেনা-বেচা চলে সে জানে না। আহা, কোন ফিকিরে যদি সেই হাটের ঠিকনা পেয়ে যেত, তবে ঘুন্টি আর শিকলি না বাগিয়ে সে কিছুতে ফিরত না। তারপর? নিজেকে ফিরি করে ফেরা আর শক্ত কী। ঘুন্টি নিয়ে দোরে-দোরে ঘুরেছে আর—'পরিয়ে দেবে? দাও না!' বলে আবদারের ঢঙে ঘাড় তুলে ধরেছে, নিজের এই ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার সে ভেবেছে, হিসেব নেই।

কেউ পরিয়ে দেয়নি।

বোকা কুকুরটা নিজেকে আবার চালাকও ভাবত কিনা, তাই তার নাকালের শেষ ছিল না। একবার কী হল জানো, নোলার জ্বালায় অস্থির হয়ে ধর্মকর্ম ভুলে গিয়ে সে ঘিয়ের জারায় মুখ দিতে গেল।...পাপ, পাপে মৃত্যু। মরণ অবশ্য হল না তবে চটপট লোম উঠে গেল বেবাক, ঘেয়ো চামড়ার লালচে লজ্জায় সে আর বের হতেই পারত না।

শৈশব কেটে কৈশোর এল, কৈশোরও অবশেষ। কালে কালে এ-কুকুরও কিন্তু যৌবনে ধন্য হল, সে আরও কষ্ট। হাঁপানির হা-হা টানটা বেড়েছে, গলা হরবখত শুকনোই থাকে, চোখ কেন-যে সকাল-সন্ধ্যা জ্বলজ্বল জ্বলে।

উপরন্তু তার একটা উপসর্গ দেখা দিল যে—কী করে ধারণা হল তার ছিরি ফিরেছে, চেহারায় এসেছে চেকনাই, আর রোঁয়া যেন দু' চারগাছি করে ফের গজিয়েছে। শুধু কি তাই, সেই রোঁয়ার তলায় এত যে গরম, এ কিসের?

ফল আর কিছুই না, সবই তো তার কল্পনা, শুধু তার ছোঁক ছোঁক স্বভাবটাই গেল না।

আগে তবু ভয় ডর ছিল, সেটাই শেকল টেনে রাখত, অধুনা রোঁয়ার ছোঁয়া পেতে না পেতে সাহসও মাথা চাড়া দিল।

করত কী, গন্ধেগন্ধে সর্বত্র সে. ঘুরঘুর করত, যত্রতত্র মুখ দিত। হাঁড়ি ঠেলত আস্তে আস্তে, যেই সরা গড়াত, তখনই ডুব। এ-ছাড়া এঁটো বাসনকোসন চাটতে তার জুড়ী ছিল না। জন্মান্তরের পুণ্যবল, ধরা পড়তে পড়তেও কতবার সে ফসকে গেছে।

তবু, বললে তোমরা কি বিশ্বাস করবে, আসলে সে বেশির ভাগ উপোসীই থাকত। বয়সের ধর্মে চতুরতা যেটুকু সে উপায় করেছিল, সে-বিদ্যের দৌড় সরা ঠেলা পর্যন্ত। বড়জোর কখনও-সখনও সে জিভ্ ঠেকাত, খেতে ঠিক মন যেত না। শোঁকাতে সাধের সিকি মিটিয়ে সে ভাবত, বাস্, আর চাই কী, খুব একচোট খাওয়া হয়ে গেল।

মানুষ নয়, তাই ঢেকুর উঠত না।

যেন কতকটা জেদের মত, নেশার মত। যা কিছু ঢাকা আছে, চাপা আছে তাকে খোলা চাই। যেই দেখা হয়ে গেল অমনই পিত্তি-পতন, তখন নাক ঠেকিয়ে সুড়সুড়িই ঢের। আর, একবার যা চেখেছে, দু'বার সে হাঁড়িতে তার মাথা গলত না। নেশাছুট দশা, চুর-চুর ভাব চুরমার।

খিদে আছে, কিন্তু খাওয়া নেই। সে নিজেই অবাক হয়ে ভাবত, একি অরুচি, না কোন একটা রোগ। ভাবতে ভাবতে সে ক্রমশ একটি দার্শনিক কুকুরে পরিণত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছিল, কম বয়সে সেই যে ঘিয়ের ভাঁড়ে মুখ ঠেকিয়েছিল না, সেটাই কাল হয়েছে, সেই বিষম অভিজ্ঞতাই স্মৃতিসার হয়ে ওর ভিতরে জুজুবুড়ির মত জাঁকিয়ে বসেছে, দেউড়ি আগলাচ্ছে দু'হাত বাড়িয়ে, কোন কিছু গলতে সে দেবে না।

ষোল আনা ইচ্ছের আট আনা আস্ফালন আর দু'আনা পূরণ? আস্তাকুঁড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন সে ভাবল, দূর দূর এ-সব কোন কাজের কথা না। এই জুজুর ভয় ভাঙতে যদি না পারি তবে সে নিজেকে বলল, আমার নামে মানুষ পুষো।

॥ দুই ॥

ভাঙতে গিয়েই সে জোর জব্দ হল। সজাতি মাদী-মদ্দদের কাণ্ডকারখানা দেখে আগে তার ঘেন্না হত, এবার ভাবল চেটে চেটে এই ঘেন্নাটা মুছে দিই। আসলে অপারগতা বলে কিছু তো আমার মধ্যে নেই, যেড়া যা, তা শুধু মনে। নইলে যে-শরীরে এখন জুত পাচ্ছি, তাকে খোরাক দেব না?

এই না ভেবে সে একদিন চনমনে রোদ্দুরে টনটনে হয়ে সটান সদর সড়কে, যেখানে খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি, মাখামাখি, গা-শোঁকাশুঁকি বে-কামাই চলে, সেখানে হাজির হল।

প্রথমে তফাত থেকে দেখছিল সে। একটু পরে মিলনে-বিপন্ন একটি মিথুনকে তাক করে সোজা ধেয়ে গেল।

॥ তিন ॥

ছুটছিল, ছুটছিল, ছুটছিল, এমন ছোটা সে জীবনে ছোটেনি। অন্য সময় লিকলিকে ঠ্যাঙগুলো খালি ন্যাংচায়, আজ তারা বেইমানি করল না। আগাড়-পগাড়-ভাগাড় কিছু সে মানছিল না, এক একবার দম নিচ্ছিল, আড়চোখে চাইছিল পিছে, দেখছিল শত্রুরা কতদূর।

সজাতি জোয়ানেরা ওর পিছু নিয়েছিল।

ফারাক যখন মোটে কয়েক বিঘত জমি, তখনই বরাতজোরে সে একটা পাঁচিল পেয়ে গেল, গুরুর কৃপায় টপকাতেও দেরি হল না।

ভিতরটা বাগানের মত, গাছে আগাছায় ভর্তি, পাঁচিলটা তারই সীমা, ও-পাশে তখনও দুষমনেরা গলা মিলিয়ে ওকে দুয়ো দিচ্ছে।

দিক, ওর নাগাল ওরা পাবে না। ধুকপুক কলজেটাকে স্থির হতে সময় দিতে সে তখন লম্বালম্বা ঘাসের ঝোপে কাত হয়ে শুয়ে গা ঘষে আরাম আদায় করছিল।

তারপর হল্লা যখন থামল, আকাশ থেকে ঘাস অবধি কানা রাতের কানাত পড়ল, তখন মুখ তুলে কুকুরটা হাওয়া শুঁকে শুঁকে ঠিকানা ঠাহর করতে চেষ্টা করল।

চলে আসার চিচিং চিরতরে বন্ধ, সে জানত। আস্তাকুঁড়ের সমাজে জলচল কোনকালে সে ছিল না, নিজের গা-চাটার অধিকার নিয়ে ছিল। গণ্ডি পেরোতে গিয়ে তাও ঘুচল।

পা-মাড়ানোর চাপে তৈরি রাস্তাটা তার চোখে পড়েছিল, এই চৌহদ্দির মধ্যেই, রাস্তাটা যে-ফটকটার গায়ে গিয়ে শেষ সে সেদিকে এগিয়ে চলল।

দোতলা বাড়িটাকেই সে কতক্ষণ ধরে দেখল, শুঁকল, মুগ্ধ হয়ে। ঘুরে ফিরে, নানা দিক দেখে। না, এখানে আর কোন কুকুর নেই। কোঠাবাড়ির একটা দিকে ঝিল, ঝিলের কিনারায় ঝাউ সারবন্দী, জলে হাঁস। এক-একটা হাঁস আর একটার বুকে বুক দিয়ে জল কাটছে। কাছে গিয়ে সে টের পেল একটা হাঁস আর একটার ছায়া। সে তো কুকুর, কুকুর জলে নেমে সাঁতার দিলে আর একটা কুকুরও তার বুকে বুক দিয়ে কি সাঁতার কাটে? সে সাহস তার ছিল, না, জলেই কখনও নামেনি, অতএব কূলকিনারা না খুঁজে সে ফিরে কোঠাবাড়ির ফটকের পথ ধরল।

॥ চার ॥

তাকে দেখে ঝি মাগী ঝাঁটা উঁচিয়েছিল, একটা চাকর বেটা 'এটা কেটা রে' বলে রুখে উঠেছিল, কিছু গেরাহ্যি না করে সে সোজা ঢুকে গেল একটা ঘরে, ঘরের পর ঘর পেরিয়ে ঠকঠক একটা দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

কেউ তাকে খুঁজে পেল না। আপদ গেছে বলে ঝি যখন ঝাঁটা নামাল, চাকরটা ফের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোন শুরু করে দিল, সে গুটিগুটি বেরিয়ে এল তখনই।

চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল একটি মেয়ে, সাদা শাড়ি, সাদা গা, সাদা পা, বোধহয় সেলাই করছিল, সে মুখ তুলে চেয়েই আঁতকে উঠল। এই মুখের ভাব কুকুরটা বিলক্ষণ চেনে, এর মধ্যে ভয় আছে আর আছে ঘেন্না। ও যে ওকে ভয় পেল, ঘেন্না করল, এতে সে খুব ব্যথাই পেল। তবু সামনের দুই থাবা আর সাহসে ভর করে চোখ দুটি স্থির রেখে যতক্ষণ পারে, সে চেয়েই রইল। বোধহয় অমানুষী এক রকম করুণ আওয়াজ করে সে বলতে চাইছিল, আমাকে তুমিও ঘেন্না করবে? পায়ে পড়ি, তা কোর না। চেয়ে দ্যাখ, আমি ভয়ঙ্কর নই, দলপালানো অসুখী একটা জন্তু মাত্র! ঘেন্নার কাজ কিছু করিনি, যদি করেও থাকি তো স্বভাবের দোষে বশে। স্বভাব তো না যায় মলে!'

ভাষা না বুঝুক, তার চোখে এমন কোন কাতরতা নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল, যার জন্যে নিশ্চিন্ত মেয়েটি হঠাৎ সেলাই ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, "আয়, আয় এদিকে আয়। এই পায়ের কাছটায় বোস্, তোর বলার কথা কী আছে শুনি।"

পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গিয়ে, কুকুররা যেমন বসে, কুকুরদের যেমন বসা উচিত তেমনই গুটিসুটি সভ্য হয়ে বসল।

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মায়াবতী মেয়েটি তখন বলছিল, তোর নাম কী-রে! তোর নাম কি খেঁকি, তোর নাম কি নেড়ি! অ্যাঁ, নেড়িকুত্তা নাকি রে তুই। তা যাই হোস, আমি তোকে 'তু-তু' বলেই ডাকব।'

সুখে অস্থির হয়ে কুকুরটা তখনও প্রার্থনার মত করে বলছিল 'তাই ডেকো তুমি, যে-নামে খুশি, সেই নামে। আমাকে কেউ নেয়নি, তুমি নাও। একটু শুধু থাকতে দাও। আমার গায়ে ঘা আছে, কিন্তু ঘেন্না কোরো না। দেখো, এই ঘা শুকিয়ে যাবে। দ্যাখো, আমি অনেক হাঁড়ি, অনেক আস্তাকুঁড়ে মুখ দিয়েছি বটে, কিন্তু ভিতরে কিছু নিইনি। তোমার আশ্রয় পেলে, সব ভুলে যাব, ভালো হব, তুমি দেখে নিও।'

মনে মনে বলতে বলতে দিশাহারা কুকুরটা টের পেল, ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি তার ঘাড়ের গোড়ায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অসহ্য সুখে সে কাঁপছিল, কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটির পায়ের পাতায় মাথা কাত করে ঘুমিয়েও হয়ত পড়ত। কিন্তু তখনই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সেই মেয়ে, পাশের ঘরে গেল।

সেটা বুঝি কলঘর, একটু পরেই জলের ঝঝার আওয়াজ। যে-হাত ওর ঘাড়ে বুলিয়েছিল, সেই হাতটাই কি ধুতে গেল মেয়েটি?

'তু-তু' নামে সুখাবিষ্ট কুকুরটা আবার আহত হল। আবার নিজেকে ধমক দিয়ে বলল, আমি বড় সন্দিগ্ধ, ছিঃ। সেই ঘিয়ের ভাঁড়ের ব্যাপারের পর থেকেই এরকম হচ্ছে। সব ভাঁড় তো এক নয়।

॥ পাঁচ ॥

দু'দিনেই কিন্তু তু-তু বুঝে নিয়েছিল, মেয়েটি ভারী মজার। ভাতের থালা নিয়ে বসে, খায় খায়, আর আড়চোখে চায়; চিবিয়ে চিবিয়ে চুষে চুষে থালার পাশে থাকে থাকে কাঁটা আর হাড়ের পাহাড় বানায়।

ওকে কিন্তু ডাকে না।

আশায় আশায় তু-তু কদিন পাতের কাছে ওৎ পেতে রইল। থালায় জল ঢেলে মেয়েটি উঠে যেত মুচকি হেসে, তখনও ডাকত না। তার পরপরই দাসী আসত সকড়ি মুক্ত করতে।

অথচ তু-তু একটু ইসারা, হেলনো একটি আঙুলের অপেক্ষায় ছিল। ও একটা তুড়ি দিলে উপোসী তু-তু পাতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

থালাবাসন অবশ্য কলতলায় থাকে ডাঁই-করা, সেখানে যেতে তু-তুর সাহস হয় না, দস্যি দাসীটাকে যে ভীষণ ডরায়, তা-ছাড়া তার রুচিও নেই।

মেয়েটি ডাকবে, সাধবে তবে খাবে, তু-তু বোকার মত এই পণ করেছিল।

অভিমান? সংকোচ? লজ্জা? তোমরা অবাক হচ্ছ, এ-সব গুণ কুকুর পাবে কী করে।

পায়। আপন দুঃখে আপনা-আপনি যে দার্শনিক হতে পেরেছিল, মানুষের কাছে থাকার সুখে একটু-একটু মানুষী ভাব স্বভাবও সে পায় বৈকি!

আবার, কুকুর বলেই না না ডাকতেই শেষ পর্যন্ত মানের বালাইটুকুও বিসর্জন দিয়ে একদিন সে পাতের দিকে এগিয়েও গেল। ঘেন্না, ঘেন্না, মুখ দিল সেই কাঁটার পাহাড়ে।

ওর রকম-সকম দেখে মেয়েটি রোদ্দুরে ছুরির ধার যেভাবে ঝলসে-ঝলসে হাসে, সেভাবে হাসল।

তবে বকল না। তারই তৈরি কাঁটার পাহাড় ধীরে ধীরে ধসছে, চুপ করে দেখল। তু-তু কুকুর তো—তাতেই খুশী। না খেয়ে খেয়ে তখন তার পেট-পিঠ আরও চিমসে, ঘিয়ে-ভাজা শরীর আরও কালি।

তোমরা বুঝতেই পারছ, এক ধরনের মরা তু-তু ইতিমধ্যেই মরেছিল, নইলে মেয়েটির মুখের দিকে সে চেয়ে থাকত না।

তু-তু মরতে ভয়ও পেয়েছিল। নইলে বাছবিচার বাদ দিয়ে কাঁটার পাহাড়ের দিকে চোর-পায়ে এগোত না।

প্রথম যেদিন এগোল, সেদিন বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে মেয়েটির বড় নখ, সেই নখ তু-তুর পিঠে ফুটিয়ে দিয়ে যাদুজানা কুহকিনী ওকে আদর করল। তু-তু স্পষ্ট শুনেছে মেয়েটি বলেছে, 'আহা-রে, আহা-রে। এ ক'দিন আসিসনি কেন রে তুই। না খেয়ে হত্যা দিবি ভেবেছিলি নাকি। হ্যাঁরে, আমি কি দেবি! তোর জন্যে আমি কাঁটার পাহাড় জমিয়ে রাখতুম—তা সে-ই তো এলি।'

নখের খোঁচা খেয়ে শিরশিরে শরীর তু-তু তখন কৃতজ্ঞ চোখ তুলে তাকাত। সে এতদিন যা চেয়েছে, খুঁজে ফিরেছে, সেই সরু শিকল আর বকলসে বাঁধা ঘুণ্টি মেয়েটির হাতে দেখতে পেয়েছে।

কুকুরের কল্পনা!

॥ ছয় ॥

এর পর থেকে তু-তু দেখল, মেয়েটি মাছের কাঁটা সবটা চিবোয় না, মাংসের হাড় পুরো চোযে না, মাছের ছিটে মাংসের ফোঁটা লেগে থাকতেই পাতের পাশে রাখে। তু-তুর দিকে দুষ্টু-দুষ্টু ভাবে চায়, হাতে আস্তে আস্তে তালি বাজিয়ে ডাকে।

ছলছল চোখ, তু-তু তখন বলতে থাকে, 'পুষেছ যদি বাঁচতেও দাও, আমাকে আর মেরো না। আর, দয়াময়ী, পায়ে পড়ি, তোমার ধবধবে গায়ে যদি আমার রোঁয়া লাগে, অমনই যেন ধুতে ছুটো না।'

তোমাদের এই কথা বলে এই পরিচ্ছেদটা শেষ করতে চাই যে, ঘৃতপানে একদা ম্রিয়মাণ সেই কুকুরটা চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে, নখের খোঁচা আর পায়ের চাপ পেয়ে, আদরে আর আস্কারায় ক্রমশ চাঙা, এবং আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠছিল।

* * *

"ওর নাম তু-তু। আমি রেখেছি।" মেয়েটি বলছিল "ও এখানে থাকে। আমি পুষেছি।"

ঘর্ঘরে গলাওয়ালা লোকটা, যে বলেছিল 'এটাকে আবার কোথা থেকে জোটালে' সে তখন আরও রেগে গিয়ে বলল 'ঘেয়ো, নেড়ি, নোংরা? ওকে দূর কর।'

মেয়েটি তবু চটল না, গলার পর্দা চড়িয়ে লোকটার সঙ্গে পাল্লা দিল না। একটু হেসে ডাঁটাসুদ্ধু-পদ্মের মত ওর হাত তুলে শুধু বলল, 'ব্যস্ত কী।'

তু-তু অবশ্য কথাগুলোর মানে বোঝেনি। লোকটাকে দেখছিল। এ কে, এ কে, কোথা থেকে এল, সে ভাবছিল, ঠাওরাতে না পেরে শেষে মেয়েটির দিকে তাকাল।

খাটে বসে মেয়েটি তখন পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। যেমন হাসছিল, তেমন হাসতেই থাকল, তু-তু সুতরাং জবাব পেল না।

॥ সাত ॥

ঝি-চাকরে বলাবলি করেছিল বটে 'আজ বাবু টুর থেকে ফিরবে' কিন্তু তু-তু তা-তো আর বোঝেনি! তবে আজ একটা কিছু যে হবে তু-তু আগে থেকেই টের পেয়েছিল। লোকটা তো এল বিকেলে, সকাল থেকেই সাজো-সাজো। ঘর ধোয়া মোছা। ঝি-চাকরে মিলে শোবার ঘরের আসবাবপত্র তচনচ করে হুলুস্থুলু বাধিয়েছিল। এরই মধ্যে তু-তু সামলাতে না পেরে বারান্দাতেই একটা কুকীর্তি করে নিজেই লজ্জিত ছিল। ঝিটা তার মাথায় যে একটা বাড়ি মারল তাতে সে রাগ করেনি। দোষ যখন করেছে, সাজা পেতে হবে বৈকি। কিন্তু করুণাময়ী কী বলে সেই ভয়ে সে আরও এতটুকু হয়ে ছিল।

ভাগ্য ভাল, মেয়েটি টেরও পেল না। সে যে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ডুরে শাড়ি কতভাবে পরা যায়; ঘুরে ফিরে তাই পরখ করছিল।

সাদা শাড়ি বরাবর সে যেটা পরে, সেটা পায়ের কাছে লুটোচ্ছিল; আদর কাড়তে তু-তু মাঝে মাঝে যেমন লুটোয়। ঘুরি-ফিরির ঝোঁকে মেয়েটির গোড়ালি সাদা শাড়িটা মাড়িয়ে দিচ্ছিল। শাড়িটার দুর্দশায় তু-তু দুঃখ বোধ করল। এগিয়ে গিয়ে দলাপাকানো শাড়িটার এখানে-ওখানে শুঁকল সে, যেন সান্ত্বনা দিল।

শেষ পর্যন্ত যে শাড়িটা পছন্দ করল মেয়েটি তার রঙ গোলাপী, কিন্তু তার বাছাই করা জামাটার রঙ ঘোর লাল। আর লাই পেয়ে আরও লাল যে ফুলটি মেয়েটির মাথায় উঠল তু-তু তাকে হিংসে করল।

মৃদু কুঁ-কুঁ করে তু-তু আপত্তি জানাতে চাইল। গরর্-গরর্ নয়, তু-তু ভদ্র হয়ে গিয়ে অবধি কুঁ-কুঁই করে।

'পালা, পালা। যা বলছি, চলে যা। আমি এখন শাড়ি বদলাচ্ছি, তুই তাই চেয়ে দেখবি নাকি রে।' মেয়েটি বলেছিল ভ্রূভঙ্গি করে, থাপ্পড়ের ভঙ্গি নকল করেছিল।

তু-তুর কথা কিন্তু সে রাখল না। গোলাপী আর গাঢ় লাল সেই শাড়ি আর জামা পরল তো পরলই।

তু-তু আর কী করে, তু-তুরা কী-ই বা করতে পারে, প্রতিবাদ জানাতে শুধু উঠোনের মাটি খানিক আঁচড়াল। কেঁউ-কেঁউ করার মত গলার জোরও সে এরই মধ্যে যেন খুইয়ে বসেছে!

ঝিটা তটস্থ হয়ে দাঁড়াল, চাকর ছুটে গিয়ে মাল নামিয়ে আনল, কোন দিকে দৃকপাত না করে লোকটা গ্যাটগ্যাট করে ঢুকে গেল ঘরে।

মূক ছায়াছবির ভাবভঙ্গি থেকে আমরা যতটা বুঝি, আন্দাজ করি, তু-তু ততটাই বুঝছিল। সংসারের রীতির তালিম তখনও তার পুরো হয়নি, হলে জানত, বাড়ির বাবুদের বুট এই রকমই মেজাজী আওয়াজ তোলে।

প্রথমেই তো বাবু খেপে গিয়েছিল তু-তুকে দেখে, সে-কথা তোমাদের আগেই বলেছি। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে দৌড়ে ঢুকতে গেল বাথরুমে। একটা তেপায়া টুল ছিল, দেখতে পায়নি, তার

ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল। পায়ের এক ঠোক্করে টুলটাকে দিল দূরে করে।

শপশপে মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে যখন বেরিয়ে এল তখনও রাগে গরগর করছে।

তু-তু দেখছিল। (রাগে তোমরাও তবে মুখ দিয়ে আমরা যে শব্দটা বের করি সেটাই বের কর, সে ভাবছিল আর তার ভাষায় বলছিল 'ধিক্!' আমরা কুকুর, তাই মানুষ হতে পারি না। তোমরা মানুষ কিনা, তাই কুকুর হতে খুব পার।)

॥ আট ॥

ভেজানো দরজা দেখে তু-তু চুপ্‌সে গিয়ে চুপ করে ছিল। ভিতরে কী ঘটছে টের পাচ্ছিল না।

একটু পরে চাকরটাকে খাবারের ট্রে হাতে ঢুকতে দেখে ভরসা ফিরে পেল। খাবার সাজিয়ে দিয়ে চাকরটা বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু কবাট ফের টেনে দিতে ভুলে গেল বলে তু-তু আহ্লাদিত হল।

চা খাওয়া শেষ হতেই বাবু লাফিয়ে উঠল, চুল আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে বলল, 'চলি।'

তু-তু বোঝেনি, তোমাদের সুবিধার্থে বাবু আর মেয়েটির কথার খানিক তুলে দিচ্ছি।

মেয়েটি বলেছিল, 'সে কী? এই এলে, কদিন পরে, তেতে পুড়ে, এক্ষুণি ফের কোথায় যাবে তুমি?"

"যেতে হবেই। পথ ছাড়। বলিনি তোমাকে, কাজ আছে?"

"না যেতে পাবে না" মেয়েটি ফুঁসছিল "আজ ছুটি নাও, বরং আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোও। আজ কতদিন একা একা এ-বাড়িতে বন্দিনী হয়ে আছি, জানো!"

"কেন, সংগী তো জুটিয়েছ।" বাবু বলল শ্লেষ মিশিয়ে।

"হ্যাঁ।" মেয়েটি ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে বলল ধীরে ধীরে, "বাড়িতে তুমি তো থাকোই না, টুরে টুরে বছর কাবার। কী করি, তাই কুকুর-বেরাল নিয়ে সময় কাটাই।"

তু-তু দেখল, দরজা আগলাবে বলে যে দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, সেই হাত দু'টি আপনা থেকেই নেমে গেল। আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে খাটের উপরেই পা গুটিয়ে বসতে দেখে তু-তুর বুকটা হু-হু করছিল। লোকটা তো বেরিয়ে গেছে, সে কি যাবে ভিতরে। ঈশ্বরীর—তারই ঈশ্বরীর—চোখে যে জল!—সে যাবে না!

(ঈশ্বরী, আমার ঈশ্বরী, তু-তুর মন তুমি জানো না। তার ধারণায় তুমি অলৌকিক। পায়ের পাতা দুটি পাড় দিয়ে মুড়ে রেখেছ কেন। ওই পায়ে একবার মাথা রাখতে পেলে তার সব ঘা সেরে যায়, এই অসম্ভব তুকে তু-তুর বিশ্বাসের কথা তুমি কি জানো!)

ভাবাবেগে তু-তু তখনই একটা বাড়াবাড়ি করে বসল।

মেয়েটি একবার চোখ মেলে ওকে দেখেছিল বুঝি, বলেছিল 'আয়-আয়', তু-তু সে-ডাকে তীরের মত ছিটকে গেল ভিতরে।

'আয়, আয়, এখানে বোস্।'

এতক্ষণ নিজের খাবার সে ছোঁয়নি, সেগুলোই ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে থাকল মেঝেয়, তু-তুর থাবার ঠিক সামনে। নিমকির টুকরো, ফ্রাইয়ের ছিবড়ে, ফুলুরি।

তু-তুর তখনই মাথা খারাপ হয়ে গেল। তার সামনে ছড়ানো খাবারের দিকে চেয়েও দেখল

না, থাবা তুলল, ওপরে, আরও ওপরে, অবশেষে পিছনের পা দ্'টির ভরও ছেড়ে দিয়ে সোজা প্রতিমার কোলে উঠে হাত থেকে খাবার যেন কেড়ে নিতে চাইল।

গা সিঁটিয়ে উঠল সেই প্রতিমার, একটু আগে যার চোখে জল ছিল। সে-ই পলকে হিংস্র হয়ে সোজা এক থাপ্পড় মারল তু-তুর গালে। তাকে ঠেলে ফেলে কলঘরে ছুটল।

* * *

তু-তু বাইরের উঠোনে ধ্ুঁকছিল। ঘেন্নায়-কান্নায় মরমে মরে মাটিতে মিশে যেতে চাইছিল। আর ক্ষোভ, আর আক্রোশ। (দেবি, তুমি দেবী নও, প্রতিমা নও, কিছু নও। অনায়াসে তোমরা আমাদেরই মত হয়ে যাও, হতে পারো)।

॥ নয় ॥

গ্যাঁট গ্যাঁট করে যে-লোকটা বিকেলে ঢুকে বাড়ি তোলপাড় করেছিল, সে এখন সন্ধ্যার পরে কেমন টলতে টলতে ফিরছে দেখ। চোরের মত, তু-তুদের মতই বোবা পায়ে।

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলছে সে। কবাট ধরে পা সামলাচ্ছে।

টুপ করে আলো জ্বলে উঠল। ছিটকিনি খুলে দিয়েছিল মেয়েটি, সংগে সংগেই পিছিয়ে গিয়েছিল।

'বেড়াতে যাবে? এখন চলো।' লোকটা বলছিল জড়িত গলায়, ঘোলাটে চোখ মেলে।

স্থির দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটি সেই দৃষ্টির মহড়া নিচ্ছিল।

'যাব না। কোথায় যাব আমি এত রাত্রে। তা-ছাড়া তুমি মদ খেয়ে ফিরেছ।'

'না মাইরি, না।' যতবার বলতে গেল লোকটা, ততবার তার পা টলল। 'ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি, এবার চলো।'

'মাতালের সংগে আমি বেরোই না।'

'কী! কী বললে?' হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে যেই জড়িয়ে ধরতে গেল লোকটি, আর তখনই পাশে দাঁড় করানো আলমারিটার গায়ে পড়ে গেল দড়াম করে। ফের উঠেই মেয়েটিকে সে জাপটে ধরল।

ঠিক তখনই তু-তু বারান্দায় উঠে এসেছিল। দেখল আলুথালু বেশ মেয়েটি ঝটপট পাখি হয়ে লোকটার মুখে, গালে,.বুকে নখের ধার বসিয়ে দিয়েছে।

নেশা টুটে গিয়ে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। গালে হাতের পিঠ ঘষে রক্তের দাগ চোখ দিয়ে পরখ করল, দাঁতে দাঁত ঘষে সরোষে বলল, 'কুকুর পুষে পুষে তুই-ও বিলকুল কুকুর বনে গেছিস। আমার সংগে বেরোতেই হবে তোকে, কুত্তী কাঁহাকা।'

এই না বলে সে মেয়েটিকে সে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

রক্ত বের করে দিয়ে মেয়েটি তখন হাঁপাচ্ছে। শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। পালের বাতাস হঠাৎ যেন পড়ে গেল। কোনমতে ভাঙা গলায় শুধু বলল, "হাতটা ছাড়, কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিই।"

অবাক তু-তু একটু পরে মেয়েটিকে লোকটির পিছু পিছু যেতে দেখল।

"না—না—না।" ব্যথিত তু-তুর মুখে ভাষা থাকলে এই 'না' শব্দটাই তিনবার চিৎকার হয়ে ফুটত।

ওখানেই শেষ হলে তু-তুর কপালে এত লাঞ্ছনা লেখা থাকবে কেন। সে অনুনয় করে বলতে

থাকল "আমি না-হয় কুত্তা, কিন্তু তুমি কুত্তী হয়ো না। আমার এক মানিক, তুমি সত্যিই যে কুত্তী হতে চলেছ।"

ওরা সে-সব শুনল না বা তার ভাষা বুঝল না। ফটকের কাছ পর্যন্ত গেছে, তু-তু তখন ধাওয়া করে গেল।

...এর পর অনেকটাই তু-তুর কিছু মনে নেই। সে তো ছুটে গিয়ে পিছন থেকে মেয়েটির শাড়ির পাড় কামড়ে ধরেছিল, অন্ধকারে ছিটকে পড়ল কখন, কী করে।

ও কি তখন আমায় লাথি মারল? মনে পড়ছে, লোকটা যেন দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল 'ফিরে আসি, এসে টুটি টিপে এটার দফা শেষ করব'—কিন্তু পাথরের প্রতিমা, তুমিও কি তার কথার তালে তালে পা তুলেছিলে?

সেদিন সেই অন্ধকারে ককিয়ে ককিয়ে তু-তু কত যে কাঁদল। সম্বিত ফিরে পেয়েও বাড়ি ফিরল না। ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়াল, ডুবে রইল ঘাসের গভীরে, এই লজ্জা নিয়ে জলের শীতলে একেবারে ডুবে যেতে পারলে?—বেশ হত তা-হলে।

নানা আগাছার গোড়া শুঁকে শুঁকে, শিকড় উপড়ে এনে তু-তু কিছুক্ষণ হয়ত বিষও খুঁজেছিল।

॥ দশ ॥

তাই বলে মনে কোর না, তু-তু নামে সেই কুকুরটা সেদিন সত্যিই মরেছিল। তা হলে বাছারা, এ-গল্প তোমাদের শোনাতে বসতাম না। এবার এ-গল্পের শেষ দৃশ্য দেখ।

সেইখানে, সেই ঠান্ডা অন্ধকার, নিথর, চুপ আকাশের তলায় তু-তু কিছু পরে এক ভীষণ সংকল্প নিয়েছিল। ফিরে সে অবশ্যই যাবে তার আস্তাকুঁড়ে, কিন্তু তার আগে—

ওরা ফিরে এল, তু-তু টের পেয়েছে। তু-তু দেখছে, এখন গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

আলো জ্বলল, জ্বলুক। আলো তো নিববেই—একবার নিবুক। নিবুক না একবার, তখন—

কিন্তু একী হল, লোকটা তবে কি আগেই খেয়ে নিল। একটু পরে নাক ডাকিয়ে তার ঘুমের ডাকিনী-যোগিনী মাসী-পিসীরা এল।

তবে সে কই, সেই মেয়েটি, যে তাকে নিয়ে শুধু মজা করে, মজা পায়, আর নাচায়—এ-ক-টু-ও ভালবাসে না!

আছে, সে-ও আছে, পা ছড়িয়ে এখন খেতে বসেছে মেঝেয়, থরে বিথরে থালা বাটি সাজিয়ে। আড়াল থেকে উপোসী তু-তু দেখছিল আর বলছিল, সময় হয়ে এল, সময় এসেছে।

তু-তু ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর তখনই, এদিক-ওদিক চেয়ে মেয়েটি কাকে যেন খুঁজল, নিজেকেই বলল, তু-তু কই?

থালা বাটি ঠুনঠুন করে বাজিয়ে সুর করে করে ডাকল, "আয়, আয় তু-তু খাবি আয়।"

তু-তু মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'যাব না, যাব না।'

"আয়—আয়—আয়! তু—উ—তু!" মেয়েটি আবার ডাকল রেশ রেখে রেখে সুর টেনে টেনে।

আর, আশ্চর্য, তু-তু এলও। সেই সুরের তালে নেচে নেচে পা ফেলে ফেলে। নখে ধার

ঠিকই আছে—আঁচড়াবে? কামড়াবে? তু-তু লাফিয়ে উঠল, পড়ল মুখ থুবড়ে। মানুষী মান-অভিমানে সংক্রামিত তু-তু মুখ-বুক সব রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে দেবে।

সেই মুখ তুলল যখন, তু-তু নিজেই অবাক হয়ে দেখে, ওর নিজের 'পরে যত ঘেন্না সব বেরিয়ে এসেছে কান্না হয়ে, জিভে যত লালা ছিল, সব পায়ের 'পরে ঢেলে দিয়ে পরমেশ্বরীর পুজো দিয়েছে।

কুকুর যে!

শারদ ভাবনা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শারদ ভাবনা। স্মৃতি বয়স প্রভায় কী সফল
কুমারী হৃদয়ে শোক, অন্তরালে তার দীর্ঘশ্বাস।
সন্তাপের মেঘভার, পলেপলে নির্মম সম্বল
শরতের বিষণ্ণতা, পশলায় ক্লেদের আকাশ।

কালক্রমে বিধিলিপি কুমারীর সতর্ক উদ্ধার।
শৈশব বালিকা-মালা, যৌবনের নীলের খেয়াল;
ঋতুর দহনে বাস হাওয়া নেয়, ঢেউ দেয় তার
ফেনিল উরুর আয়ু, তাই সে-ই ছিন্ন করে পাল।

সেতো শুধু স্বপ্নে শিশু কচি ঠোঁট স্তনেই ছোঁয়ায়।
অমাতৃক স্তনহীনা, অপারগ কবিতার মত;
ব্যর্থ নারী মাংসস্তূপ, কালশেষে তাকেই শোয়ায়ঃ
নামগোত্রহীনা, লোকে দেহমূল্যে চেনায় সতত।

শারদ হৃদয়ে শোক, পাথরের মতো দীর্ঘশ্বাস;
কবিতায় বিষণ্ণতা, সন্তাপের কুমারী আকাশ।

মৃত্যু শুধু তপস্বী ও নারিকেল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার আড়ালে তুমি নির্মমতা করিতেও পারো
হে জ্যোৎস্না মাঠের মাঝে নারিকেল অতিনারিকেল—
আমার আড়ালে তুমি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন
অসংখ্য করিতে পারো, আমি কান পাতি থাকিব না।
তোমার চরণ ধরি বসি আছে মর্মন্তুদ মাটি,
নতুবা যাইতে ভাসি জ্যোৎস্নায় সাগরে অলৌকিক,
বিরল-গঠিত সেই কোলেরিজ-জাহাজের মতো
ভীত, অতিবৃষ্টিহত; চরণ ধরেছে ব'লে আছো।

আমার আড়ালে তুমি সর্বক্ষণ করো পক্ষপাত
একাকী ও দীর্ঘকায় ছায়াহীন ভরসাবিহীন

নারিকেল, তোমা হতে জ্যোৎস্নায় সমৃদ্ধিবান হাসি
সবারে ছুঁইয়া যায় কাননোর পুষ্পগন্ধসম।
লাগে ভালো, বিজড়িত মনে হয়, কভু মরিব না—
মৃত্যু শুধু তপস্বী ও নারিকেলে বহে নিতে আসে!

পূরবী

মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

বুকের মধ্যে বেজে উঠলো ঘড়ি;
সাতটি লণ্ঠন
জ্বালিয়ে কোন দিনান্তের তরী
এখন করে সমুদ্রলঙ্ঘন?

পুরোনো ধূলি উড়িয়ে দিলো হাওয়া
দেয়ালে পর্দায়,
যেখানে ছিলো কত কালের ছায়া,
ধূমল ঝরা পাতার অধ্যায়,

ফুলদানিতে এক মাসের জল,—
সেখানে কোন পবনকুক্কুট
নতুন ফিরে তাকায়; কোলাহল
ছড়ায় পর্ণপুট,

প্রত্যাশায় অধীর পটভূমিঃ
শ্বেতকঠিন গন্ধদ্রব্য তুমি॥

স্থানাভাব

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ছিলনা কোথাও স্থান, বুঝি তাই বুকের ওপর
বসেছো শরীর উল্টে, মুখরেখা দেখা যায়না ভালো।
বুকের ওপর বোলে নিশ্বাসের কষ্ট হয়; যদিও বাতাস
প্রয়োজনবোধে জানি বৃক্ষের সমান ঋজু। শুধু আমি চাই
বাতায়ন ভেঙে হোক একবুক মানুষের হাওয়া। আজ বিনষ্ট পাজরে

যতো আঞ্চলিক আলো বাধা পায়, হৈ হৈ করে ওঠে
ছায়াহীন, তবু রূপহীন নয় তাই দীর্ঘ তেপান্তর ঘিরে
মেঘ হয় বৃষ্টি হয়, নূপুরের শব্দ শোনা যায়
সমগ্র আকাশ কি প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক হয়ে ওঠে—
আমার হৃদয়ে আর কোনোদিন ফিরবেনা তেমন উদ্যমী ভালবাসা।
আমি বিশ্বাসরহিত যেন কিছুই বিস্মিত আর
করেনা, কখনো করবেনা, তাই পথের সঞ্চিত ধুলোবালি
ওড়ে, ঢেকে যায় চোখের প্রাচীন নীল ; স্থানাভাবে সমুদ্র নদীর
ধারাবাহিকতাও যায় অন্ধকারে অন্ধকারে----যায়।

কেন বসে আছো তবু একদিন শোবে বোলে পাশে
কবরে ফুলের লোভে জাগাও চতুর গাছ, জানুর যুগ্মতা রাখো শিকড় অবধি।
বুঝি সাময়িকতায় আর দেখাবেনা মুখ, ফুল কি তোমার
তন্ন তন্ন খুঁজে এক উল্টো করা শরীরের প্রতিটি পল্লবে
এই যে এই যে যেন হঠাৎ চীৎকারে লক্ষ যোজন জাগানো!

ভাবি জানলা ভেঙে যাক অক্লেশে এমন তুমি কে বসেছো দেখি।

নাগরিক নরক

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

জোচ্চোর জুয়াড়ী আমরা জড়ো হয়েছি নরককুণ্ডে।
রাত বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং করে
গির্জের ঘড়িতে।
কে যেন বলল হেঁকে
'আজ রাত্রেই।
মনে থাকে যেন, আজ রাত্রেই সেই মহাপ্রলয় ঘটবে।
শূন্যে মিলিয়ে যাবে তুমি, আমি, সে।'
অমনি হঠাৎ
জেগে উঠল মহানগরী উন্মত্ত চাঞ্চল্যে।
অন্ধকারের গর্ভ থেকে পিলপিল করে এল বেরিয়ে
প্রেতকায় নাগরিক জনতা।
আর তখন হাতের টেক্কা ফেলে দিয়ে
উটের মত চোখ মেলে আমরা
নিঃশব্দে দেখতে লাগলাম রাত্রির নাটক।......

প্রথম অঙ্ক

ব্যাকুল বুভুক্ষু এক
রাজপথের চতুর ভিক্ষুক, অন্ধ সেজে সেজে
খেয়েছে চোখের মাথা।
পরম নির্ভরে তার কোলে
ঘুমোল যেই কচি ফুলয়ালী,
গোলাপের গন্ধ-ছটায় পাগল সে নির্মম হাতে
মুখে তুলে নিল ছিঁড়ে
টুক্‌টুকে পাঁপড়িগুলি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

গলির মোড়ে টিম্‌টিমে এক বাতির তলায়
মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে মা।
ভিখারিণী কিংবা বারাঙ্গনা।
দুঃখে বিবর্ণ বয়সের ছাপ
বিষণ্ণ বিকেলের মত অন্ধকার মুখ
কোটরে বসা স্তিমিত চোখ, সুমুখে এগোন হলদে দাঁত,
যেন অবসন্ন কঙ্কাল.........
ক্ষিধেয় ধুঁকতে ধুঁকতে বাচ্চাটা বোবার মত নীল হয়ে গেছে, আর
খেঁকী কুত্তার চীৎকারে অমনোযোগী তার মা
ল্যাম্পপোস্টের মরা আলোয় পাথরচোখে
বুঁদ হয়ে স্বপ্ন দেখছে সেই সোনালী দিনের
যা আর শত কান্নাতেও ফিরে আসবে না.........

তৃতীয় অঙ্ক

শরাবখানার থেকে
প্রৌঢ় মাতাল করছে তাড়া বৃদ্ধ গণিকাকে।
(জানিস্‌ জানিস্‌ মাতাল কখনো বৃদ্ধ হয় না অথচ দুদিনেই বেশ্যা যায় বুড়িয়ে)
কিন্তু চৌরাস্তাটা পার হতে গিয়ে
অন্ধ কামুক পড়ল চাপা, হায়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান এক নৈশ ট্রাকের তলায়.........

উপসংহার

ওলো সখি ঢাল্‌ ঢাল্‌ আরো জোরে ঢাল্‌
সোনাধরা মনের পেয়ালায় ফুর্তির শরাব।

ঘুম, ঘুম, ঘুম।
গভীর ঘুম।
রাত নিঃঝুম, সব নিশ্চুপ।
কে কার কথা মনে রেখে হা হুতাশ করে।
চুপ, চুপ, খোকামন আমার। অমন করে কাঁদে না,
ভাঙা খেলনা আর জোড়া লাগবে না।

স্বগতোক্তি

আমাকে কেউ নক্ষত্র এনে দিতে পার?
কী করবি?
খেলা করব।

গ্রন্থসমীক্ষা

সাহিত্য, মন ও ব্যক্তিত্ব

প্রাক-আধুনিক যুগের কথা বাদ দেওয়া যাক, যখন সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুখ্যত রাজামহারাজা কিংবা নবাব-বাদশারা। ভিনদেশী বণিকের কাছে দেশটা যখন বিকিয়ে গেলো, তখন অনেক কিছুর মতো দেশের সাহিত্যও রাজামহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়িয়ে একেবারে সাধারণ জনের সামগ্রী হয়ে পড়লো। সে সঙ্গে দরবারী আর লোকসাহিত্যও একাকার হয়ে গেলো। আধুনিক যুগের সেই পত্তনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ভাবে প্রবহমান। মধ্যযুগের অবসানে জীবন ও সমাজের নবমূল্যায়ণ শুরু হতে অনিবার্য-ভাবেই যেন এ-রীতিটি চালিত হয়ে আসছে। বাংলাসাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয়, সুতরাং এখানে তার সত্যতাকে পরীক্ষা করতে দোষ নেই। নতুন চেহারায় এ-সাহিত্য যেদিন জনগণ-মানসে তার স্থানটিকে কায়েম করে নিলো, সেদিন থেকেই দেখা গেছে, অগণিত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সব সময়েই অন্তত একজন কবি কিংবা কথাসাহিত্যিক যুগন্ধর বলে স্বীকৃত হয়ে আসছেন। তার মানে প্রতিটি আধুনিক কালেই একজন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাবশালী। সোয়াশ' বৎসরের তিন যুগে তিনজন— মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। একে অত্যুক্তি বললে, সত্যকে বিকৃত করা হবে। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মতভেদ ঘটলেও অন্য দুজন সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় তাঁরা কেউ-ই তাঁদের সমকালে খাঁটি অর্থে জনপ্রিয় ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় ছিলেন যতটা না তাঁর সাহিত্যের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তাঁর ভাবদর্শের জন্য। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলায় কাহিনী-সাহিত্যের প্রবর্তক, যার আবেদন নিশ্চয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়ায় খুব একটা অসুবিধা ছিলো না। তা সত্ত্বেও অন্য দুজন সাহিত্যিক কবি একান্তভাবে জনপ্রিয় না হলেও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায়, কিংবা সফল রচনার প্রাচুর্যে আর নিগূঢ় মননশীলতায় এমনি একক ছিলেন যে বিদগ্ধ জনমানস কখনই তাঁদের অস্বীকার করতে পারেনি। তার ফলে, বিশেষভাবেই দেখা গেছে, গত তিন যুগে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনাকার যাঁরা সমভাবে নিন্দিত ও বন্দিত হয়েছেন। মধুসূদনের সমসাময়িক কালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শৈশব অবস্থা, সুতরাং তাঁর যুগটিকে বাদ দিয়ে স্বীকার করতে দোষ নেই, স্বকালে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথই সার্থক সাহিত্যশিল্পী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো সার্ধ বিংশশতাব্দীর মানুষ, আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই। আমরা তাঁকেও যেমন জেনেছি, তেমনি তাঁর সমকালের স্মরণযোগ্য লেখকদেরও জানি। অন্যপক্ষে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে এমন অনেক রচনাকার ছিলেন যাঁদের সাহিত্যিক মূল্য ন্যূন ছিলো না। তবু তিন যুগের যুগন্ধর সাহিত্যিক এঁরা তিনজনই। নিঃসন্দেহে তাঁরা আপন মহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাঠকজনসমাজ তাই তাঁদের স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয়েছে।

ইতিমধ্যে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে সমাজের পটভূমি, সুতরাং সমসাময়িক সাহিত্যও। বহুজনবাঞ্ছিত ডেমোক্রেসি কেবল সমাজদেহেই প্রবিষ্ট হয়নি, হয়েছে তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। কিংবা সত্য কথা সহজ করে বলা যায়, এই সার্ধ বিংশ-

শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেও কারো পক্ষে সম্ভব নয় নিজেকে যুগের একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। বোধ হয় বাংলাদেশের পক্ষেই শুধু এ-কাহিনী সত্য নয়, সত্য পৃথিবীর সকল দেশের পক্ষেই। তাই বলে অধুনাকালের বাংলাসাহিত্য অধোগামী হয়েছে এ-কথা বলা উচিত হবে না। কেননা, গভীরতায় বিস্তৃতিতে তার আজকের চেহারা যে অন্তত গত দুই শতাব্দীর তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক, তা আর এখন কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। সুতরাং, আজ সাম্প্রতিক সাহিত্যের আলোচনায় অবধারিতভাবে একটি তুলনামূলক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। যদি এমন হতো, শুধু কলাকৈবল্যে বিশ্বাসী লেখক তাঁর গৃহকোণে একতারা সেধে খুশি থাকতে পারেন, তা হলে ভাবনা ছিল না। অন্তত সমাজ-মানসের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে বিচার করার দুরূহ দায়িত্ব থেকে তিনি সমালোচককে রেহাই দিতে পারতেন। কিন্তু তা আজ অসম্ভব। কেননা, দ্রুত ধাবমান কাল এবং পটভূমিকে এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, এমনকি পরম উদাসীন ব্যক্তিটির পক্ষেও না, যেহেতু সে নিজে আরও দশজনের মতোই সমাজেরই একটি বিশেষ অংশ। তার মানে, একই যথেষ্ট নয়, অন্যের সংগে সম্পর্কিত হয়েই সেই একের একত্ব। নয়ত তার অস্তিত্বের কোনো সার্থকতা নেই। ঠিক এই মুহূর্তের সাহিত্যের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এইটেই।

একক ব্যক্তিত্ব আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু ব্যক্তিত্বে ছড়িয়ে পড়েছে। খতিয়ে দেখতে গেলে তাদের ব্যক্তিগত মান নিকট প্রাক্তন কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মানের তুলনায় নিশ্চিতভাবেই খাটো হবে, কিন্তু তুচ্ছ সে হবে না তাও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এই জন্যে যে আজকের দিনের নায়ক ব্যক্তি-বিশেষ কেউ একজন নয়, আজকের নায়ক প্রবহমান সময়টাই। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের সমষ্টিই বর্তমান শ্রেষ্ঠত্বকে মহিমান্বিত করে তুলছে, এবং সে-স্থানের পরিমাপ করতে গেলে দেখা যাবে আমরা হারিনি। বর্তমান বাংলার (সৎ) সাহিত্য অবশ্যই তার প্রমাণ দিচ্ছে। যাকে আমরা সাহিত্য বলি, উচ্চারণে তা সহজ হলেও, সত্যিকার লেখকের কাছে যেমন, খাঁটি রসজ্ঞের কাছেও তেমনি, সহজ ব্যাপার নয়। যদিও এখনকার বাংলা কাব্য এবং কথাসাহিত্য সংখ্যাতীত লেখকে অধ্যুসিত তবু আমারা জানি তার অনেকাংশই ব্যর্থতার প্রতীক মাত্র—কিংবা অন্তত প্রচেষ্টা শুধু। রবীন্দ্রপরবর্তী কালে, সময়টাকে রবীন্দ্রজীবনের শেষ দু'এক দশক এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ধরা যায়, যে কথা-সাহিত্য আমাদের দেশে তৈরী হয়ে উঠেছে তা নিয়ে আমাদের অহংকারের অন্ত নেই। তার চেয়েও বেশী, পরিধির বিস্তৃতির হিসাব নিয়ে আমরা আরও গর্ব অনুভব করি এই বলে যে, সমাজ ও জীবনের পক্ষে কোনো সম্ভাবনাই আজ আর বাংলা সাহিত্যে অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে নেই। কিন্তু পরীক্ষা এক বস্তু আর সার্থকতা ভিন্নতর কিছু। যে পরীক্ষা সার্থকতার স্তরে গিয়ে পেঁছতে পারলো না, সম্ভাবনাময় হলেও তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ নেই। এ শুধু সাহিত্যের পক্ষেই সত্য নয়, জীবনের পক্ষেও সত্য। সুতরাং এ-মুহূর্তে আমরা সফল শ্রমকেই তার স্বরূপে চিনে নিতে চাইবো।

সুতরাং নিকট-অতীতের ইতিহাসকে কিছু হাতড়ে দেখতে হবে। শরৎপ্রতিভা যখন প্রায় অস্তমিত এবং উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই উপন্যাসমুখীন না হয়ে শুধুই বৈচিত্র্য-বিলাসী ঠিক তখনই বাংলাকথাসাহিত্যে প্রগতিবাদী (সাম্যবাদী নয়) সাহিত্যের আবির্ভাব এবং দ্রুত প্রসার। শব্দটা প্রগতিবাদী হলেও তার চেহারাটা নিছক বস্তুতান্ত্রিক বললে ভুল হবে না। প্রথম প্রেমের মতো উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যটাও, একটু বেশী মাত্রায় থাকা স্বাভাবিক বলেই, ছিলো। সে-সময় আমরা অনেক রচনাকারের নাম জেনেছি, অনেক উপন্যাস পড়ে মোহিত হয়েছি। আজ

স্থির ভাবনায় এ-সিদ্ধান্তে আসতে আর দ্বিধাবোধ করি না যে, সে-সব আধুনিক রচনার মোহ বেশীদিন টিকতে পারতো না। এবং সত্যি তা পারেওনি। ঝোঁকের মাথায় কোনো লেখকেরই আদর্শবাদী, সমাজতান্ত্রিক, ভাববাদী বা মনোমত যা হোক একটা কিছু হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র উপন্যাসকার হিসেবে কোন্ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন সে-প্রশ্ন তুলবো না, কিন্তু এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি, যা ছিলেন তা তাঁরা অন্তরের তাগিদকে মেনে নিয়েই ছিলেন। তা হলেও বলা যায়, তাঁদের কেউই মিথ্যার বেসাতি ছিলেন না। অত্যুগ্র আধুনিকতায় এই ভেজালটা এসে সব হয়তো নষ্ট করে দিতে পারতো, কিন্তু আধুনিকতার মধ্যেই যেটুকু সত্য নিহিত ছিলো সে-ই শেষ পর্যন্ত পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলো। যাঁরা এ-পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাকার তাঁরা শরৎচন্দ্র, এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও পার হয়ে চলে এলেন, এলেন একেবারে বাঙালী অবাঙালী, অর্থাৎ সর্বমানবসমাজের প্রাঙ্গণতলে। ধার করা বিদ্যা নয়, সোজাসুজি দুটি চোখ আর দুটি কানই তাঁদের সম্বল, আর সম্বল তাঁদের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় কয়টি। অভিজ্ঞতার মন্ত্র দিয়ে অভিষিক্ত করলেন তাঁরা বাংলা উপন্যাসসাহিত্যকে। উপন্যাসরচনার প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা না মননধর্মের মূল্য বেশী, না কি উভয়ের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের, সে-তর্ক তুলে লাভ নেই, অবকাশও কম। বাংলার পাঠকজনচিত্তের রায়কে যদি মানতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে অভিজ্ঞতার দামই বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই মোটামুটি এ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়ে আসছে। বাংলার পাঠক শরৎচন্দ্রকে শিরোধার্য করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে বাংলা কথাসাহিত্য এগিয়ে চলেছে এবং চলবে। তার চারিত্র্য এ-পথেই প্রকাশমান। সামান্য ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাংলাসাহিত্যের পাঠক-মানসের চেহারাটাও কথা-সাহিতের গতি প্রকৃতির নিরিখে চিনে নেওয়া অসম্ভব নয়। মননধর্মিতা কেন তার যোগ্য স্থানটিকে আয়ত্ত করতে পারবে না এ-ক্ষোভ রেখে লাভ নেই। কারণ, যে-কোনো দেশের সাহিত্যই তার পথকে খুঁজে পায় তার আপন দেশের অগণিত শিক্ষিত পাঠকসাধারণের গ্রহণেচ্ছার মধ্য দিয়ে। সুতরাং মননধর্মিতার অগ্রসরণকে স্বাগত জানিয়েও স্বীকার করবো, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে যে-সব নরনারী লেখকের রচনায় মিছিল করে আসে, বাংলাদেশের পাঠকরা তাদেরই চিনে নিতে চায় পরম অন্তরঙ্গতায়, আর তারা অভিনন্দন জানায় তাদের আবিষ্কর্তাকে। অবশ্য একই মানুষ একইভাবে এসে ধরা দেয় না, একই লেখকের কাছে, কিংবা একই পটভূমি হয়তো একই কালের দুজন লেখককে সমানভাবে আকর্ষণ করে না। আর তারই ফলে অভিজ্ঞতার রূপ বদলায় আর তার সংগে অবধারিতভাবে বদলে যায় ব্যক্তিগত সাহিত্যকর্মের। দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার অসমতাই সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্য সত্যিই সমাজের নিখুঁত আয়না নয়, আরও কিছু বেশী। চোখকানের প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনাও তাই কেবল অভিজ্ঞতার ছাড়পত্র নিয়ে সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না, হলে সাহিত্য অনেক সহজ ব্যাপার হতো। বস্তুতঃ সাহিত্যে যত কিছু অনাসৃষ্টি তার মূলে আছে এই স্থূল বোঝা। অশ্লীলতা বা বীভৎসরস কোনো কিছুই সাহিত্যের পক্ষে অসংগত নয়, কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা যেখানে সম্বল, সেখানেই—সাহিত্য এসব উপাদানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। অথচ মহৎ রচনা হত্যাকাণ্ডের মতো অমানুষিক কাহিনীকে অবলম্বন করেও গড়ে উঠতে পেরেছে আমরা তা জানি। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, একজন লেখক যখন সত্যি-কারের সৎসাহিত্যিক হয়ে ওঠেন, তখন অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করলেও নিছক বাস্তবতাকে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এমন একটা অবস্থায় তুলে ধরেন, যখন তা আর

নিজের অভিজ্ঞতা বলে তাঁর একার সম্পত্তি হয়ে থাকে না, অগণিত পাঠকসাধারণেরও অভিজ্ঞতায় অবলীলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সাহিত্য যদি এত সহজ বস্তু না-ই হয়, তাহলে সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়াও কষ্টসাধ্য হওয়ার কথা। রবীন্দ্রশরৎ-পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসসাহিত্য যে পরিমাণে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে, তাতে আমার এ-উক্তিকে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইতিহাসের পাতায় উল্লিখিত হওয়ার উপযুক্ত নাম গত কয়েক দশকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খুব বেশী নেই। সমকালের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে এখন বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়জন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের নাম সব চেয়ে স্মরণীয় বলে মেনে নিয়েছি তাঁরা বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অফুরন্ত শক্তির অধিকারী তারাশঙ্কর।

সমসাময়িক কালে আরো কয়েকজন সমান যশস্বী কথাসাহিত্যিকও যে নেই তা নয়। কিন্তু তবু মাত্র এই তিনজন লেখকের নামই এখানে উচ্চারণ করছি এইজন্য যে অনেক দেরী হলেও আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমালোচকরা অন্তত এই তিনজন কৃতবিদ্য লেখকের রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে অগ্রসর হয়েছেন। অন্যান্যদের সাহিত্যিক মন নির্ণয় করবার মতো উপযুক্ত সময় কবে হবে জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে যে এ-কাজে দু' একজন হাত দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের অবশ্যই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি আলোচনাগ্রন্থ আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। যথা—বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—নিতাই বসু এবং তারাশঙ্কর—ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র।

ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন হলেও এঁরা তিনজন সমকালের লেখক এবং মোটামুটি প্রায় একই সময়ে তাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যতই কেন না বিভিন্ন হোন অন্তরসূত্রে কোথাও একটা মিল অবশ্যই তাঁদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। নিঃসন্দেহে তাঁরা একই ঐতিহ্যের ধারাবাহী, একই পারিপার্শ্বিকে লালিত এবং একই সমাজচিন্তায় ভাবিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা রচনাশৈলীতে তো বটেই, ভাবনাধারণায় পর্যন্ত ভিন্নতর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করলেন। এমন কাণ্ড কি করে সম্ভব হতে পারে, আমার মনে হয়, তার সন্ধান নেওয়াই সকলের আগে প্রয়োজন। তা না হলে একজন সাহিত্যিককে তাঁর স্বরূপে চেনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলে আমি মনে করি।

আশ্চর্য, এদিক থেকে একজন গ্রন্থকারও আলোচনা করেননি। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু অব্যবহিত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নানারূপে তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। আজ যাঁরা নিজস্ব ক্ষমতায় আপন স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, শুনতে মধুর না শোনালেও বলতে বাধা নেই, একদা তাঁদের ওপরও শরৎপ্রভাব কিছু কম ছিলো না। লজ্জার ব্যাপার বলে তাকে মনে করাও ভুল। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা শিল্পকর্মে মহত্ত্ব কখনও আপনা-আপনি আয়ত্ত করা যায় না। ঐতিহ্যকে বহন করেই বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করতে হয় এবং প্রত্যক্ষ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। এক সময় রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধচিত্তে বিহারীলালের কাব্যসাধনার পথে হাঁটতে হয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তীকালে সে-কথা স্মরণ করে বিশ্বকবি কখনও লজ্জাবোধ করেছেন, এমন কোনো প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং প্রাক্তন

ঐতিহ্যধারা যে অধুনাকালের রচনাকারদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছিলো তার উল্লেখ না করার অর্থ নিঃশব্দে তাকে অস্বীকার করাই। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তারাশঙ্কর—এ'দের কেউ-ই, কোনোদিনই, নির্বিকল্প বিদেশী ভাবধারায় লালিত হননি। মানিক তাঁর শেষ দিককার রচনায় যে ভাবাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে সোজাসুজি বিদেশী জিনিস বলে চালিয়ে দিলে তাকেই ভুল বোঝা হবে, কেননা এই ভাবাদর্শ নানারূপে তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলোর মধ্যেও স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বর্তমান ছিলোই। সুতরাং আলোচ্য সাহিত্যিক যেই হোন, তাঁর সাহিত্যপথ পরিক্রমার যথার্থ গতিটির সন্ধান নিতে হলে নিকট অতীতের সঙ্গে তাঁর অনিবার্য সম্পর্ক এবং ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কচ্যুতির ইতিহাসকে ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করতে হবে। শরৎপ্রভাব অনিবার্য, সুতরাং তারাশঙ্কর, মানিক এবং বিভূতিভূষণের ওপর সে প্রভাব কতটুকু এবং কিরূপে ছিলো তার হিসাব দিলে দোষ ছিলো না। আজ এ সংবাদ প্রায় অবিসংবাদিত যে এ'রা তিনজনই শরৎচন্দ্রকে ভাব ও বিষয়বস্তুর বিচারে অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু এ অতিক্রম একইভাবে ঘটেনি। বিভূতিভূষণ যদি মানসিকতাকে অর্জন করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তবে তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন অপসৃয়মান সমাজের প্রতি অসাধারণ মমত্বকে—মানিক এই সমাজবোধকেই আয়ত্ত করলেন শরৎ-চিন্তার বিপ্রতীপ দিক থেকে। এবং তিনটি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলো পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান বাংলা কথাসাহিত্য।

শুধু ঐতিহ্য চেতনায় একজন লেখক মহৎ শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন না, এ কথা স্বতঃসিদ্ধের মতই সত্য। সমকাল একজন লেখকের ওপর যে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সমকালে আপন স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে একজন নয় একাধিক লেখক একটি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সুতরাং পারস্পরিক তুলনায় একজন লেখক অবশ্যই তাঁর স্বরূপকে পাঠকের চিন্তার কাছে ধরা দিতে বাধ্য হন। যদি এ-পন্থাকে এড়িয়ে চলি তবে সমন্বিত একটি কালকে হয়তো ধরতে পারবো, কিন্তু যাঁরা নিজস্ব সাধনা দিয়ে সে কালকে বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ করে তুললেন তাঁদের, তাঁদের ব্যক্তিগত সাধনাকে কিছুতেই জানা যাবে না। তারাশঙ্করের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যে রচনারীতি তথা ভাবনাধারণার পার্থক্য, বিভূতিভূষণের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও সে পার্থক্য। মানিক এবং তারাশঙ্করের মধ্যেও তাই। এ অবস্থায় তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র তাঁদের নিজেদের রচনার আলোচনা করলেই সাহিত্য পরিচয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথচ গোপিকানাথ, হরপ্রসাদ তা-ই করেছেন, নিতাই বসু এ-পন্থাটিকে একেবারে অগ্রাহ্য না করলেও তাঁর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেননি। ফলে এই তিনটি আলোচনা-গ্রন্থ থেকে সাময়িক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য লেখকত্রয় যে কেন স্বমহিমায় বিশেষ পাঠক তার সন্ধান পাবেন না। মোট কথা, গোপিকানাথের আলোচনায় বিভূতিভূষণ যেমন একজনমাত্র সাহিত্যিক, তেমনি হরপ্রসাদের কাছে তারাশঙ্কর। নিতাই বসুর সামান্য চেষ্টা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একাই থেকে গেছেন।

বংশানুক্রম এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী। এমন লেখকের সন্ধান কি আমাদের অজানা যাঁর প্রায় সমগ্র রচনাবলীই আত্মজীবনীমূলক? কথিত আছে, টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা তথা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ওয়র এণ্ড পীসের বহু অংশ আত্মজীবনীর ভিত্তিতে তৈরী। যাঁরা টলস্টয়ের জীবন কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তাঁর রেজারেকশনেও এ পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটেনি। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি যা-ই হোক, বাংলাদেশে প্রায় প্রবাদের মতো প্রচারিত হয়ে আছে যে তাঁর সুবৃহৎ রচনা শ্রীকান্ত বস্তুত আত্মজীবনীমূলক

উপন্যাস। সুতরাং তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর ওপর তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন যে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এ-কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। অন্তত তারাশঙ্কর বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন গ্রন্থে এ সত্যকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্য সাধনায় তাঁর বংশানুক্রমেরও যথেষ্ট দান আছে সে সংবাদ জানাতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। বর্তমান সমালোচনা-গ্রন্থের লেখকেরা এদিক থেকে আমাদের একেবারে হতাশ করেননি। করেননি বটে, কিন্তু এদিক থেকে যতটা আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা করেছিলাম, দুঃখের সঙ্গে হলেও জানাচ্ছি, তা পাইনি। বিভূতিভূষণের মন ও শিল্প তাঁর নিজের সন্দেহ কি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তাঁর সাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা জানার অধিকার আমাদের আছে বৈকি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাবুক ছিলেন, প্রকৃতিবিলাসী ছিলেন, যদিও তাঁর একাধিক উপন্যাসেই সে সংবাদ সোচ্চার, তথাপি আমাদের জানতে ইচ্ছে করে এ-চিন্তাভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করলো কেমন করে। ব্যক্তিগত জীবনসাধনা অত্যন্ত কঠোর ঘটনা, তার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে কালিদাস থেকে বিভূতিভূষণ পর্যন্ত সকলেই। কঠোর জীবনের সংঘাতকে অসীম ধৈর্যে প্রতিহত করেছেন বিভূতিভূষণ আমরা তা অনুমান করতে পারি। তার আন্তরিক প্রতিচ্ছবি ছড়িয়ে আছে তাঁরই বিভিন্ন রচনায়, অন্তত অনুবর্তনে তো বটেই। অনুবর্তনের আলোচনা নেই বলেই কি বিভূতিভূষণের পার্থিব জীবনরচনার কাহিনীকে উহ্য রাখতে চাইলেন গোপিকানাথ! নিতাই বসু অনেকটাই বাস্তবধর্মী সমালোচক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ যে ছিলো তা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন, এবং যথাসাধ্য সে সূত্রটিকে আবিষ্কার করারও চেষ্টা করেছেন। বলতে তাঁর বাঁধেনি, ব্যক্তিজীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশাভঙ্গ তাঁর শেষের দিককার অনেক রচনাকেই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এ স্পষ্টবাদের জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই, কিন্তু এ-পরাজয়ের জন্য সত্যিকারের দায়ী কে তার সন্ধান তো তিনি দেননি। তাঁর আলোচনা এ-সম্পর্কে কুয়াশাচ্ছন্ন, না হলে শেষ পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে এমন সহজ আলোচনা তাঁকে করতে হতো না। হরপ্রসাদ মিত্র তারাশঙ্করের বংশানুক্রম এবং ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে নতুন কিছু আলোকপাত করেননি। যদিও লেখকের জীবনকথার উল্লেখ তিনি বারবারই করেছেন, তবুও লক্ষ্য করেছি, তিনি তাঁর কর্তব্যের দায় সেরেছেন তারাশঙ্করেরই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে, তারাশঙ্কর নিজেই যখন তাঁর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, একজনের সমালোচকের পক্ষে তখন সে যোগাযোগের মূল সূত্রটিকে ধরিয়ে দেওয়া কষ্টসাধ্য ছিলো না। হরপ্রসাদ সে চেষ্টামাত্র করেননি। তারাশঙ্করের জীবন এবং সাহিত্য কোন্ শুভ লগ্নে একাকার হয়ে মিশে গেলো তার সন্ধান না পেলেন সমালোচক নিজে না পেলাম আমরা। অথচ একজন সাহিত্যিককে বুঝতে হলে যে যোগাযোগটির ওপর অনেকখানি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন তা আশা করি আজকের দিনের প্রতিটি সচেতন পাঠকই জানেন।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বিভূতিভূষণের মন ও শিল্পের সন্ধানই শুধু নিতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আলোচনার পরিধিকে ইচ্ছে করেই তাঁকে সীমিত করতে হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

> 'আমার মনে হয়েছে, তাঁর প্রতিভার আসল স্বরূপ পরিস্ফুট হবে, যদি তাঁর অন্তর্লোকের কয়েকটি বিশেষ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করি। যে অভিনব নিগূঢ় চেতনা ও দৃষ্টির আলোয় তাঁর সমস্ত সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে আছে, এবং যা বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান—এ গ্রন্থে তাদেরই কথা বলতে চেয়েছি।'

অর্থাৎ পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং আরণ্যক। গ্রন্থকার বিভূতিভূষণের এই তিনটি উপন্যাস নিয়েই বিস্তৃত আলেচনা করেছেন। গোপিকানাথের মনোনয়নে কিছু ভুল হয়নি, মূল রচনাকারের কেন্দ্রীয় মানসিকতাকে তিনি যেভাবে চিনেছেন, তাকে ঠিক সেভাবেই তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন। এ উপন্যাস তিনটি নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় একজন মহৎ শিল্পীকে সীমায়িত করা যায় না। যদিও একই মানুষের মানসিকতা তাঁর সমগ্র রচনায় সঞ্চরমান তথাপি দৃষ্টিশীল লেখকমাত্রেই বৈচিত্র্য সন্ধানী। এবং বিভূতিভূষণের সে বৈচিত্র্য কিছু কম ছিলো বলে আমি মনে করি না। এ-ও মনে করি না, অন্যান্য সৎ উপন্যাসগুলোতে তাঁর এই সদা সঞ্চরণশীল মনটি একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিলো। যা নেই তা নিয়ে আলোচনা করার কোনো অর্থও নেই। সুতরাং গোপিকানাথের যেটুকু আলোচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তা নিয়েই আমাদের খুশি থাকতে হবে। তবে হলফ্ করে বলতে পারি, এ গ্রন্থপাঠে পাঠকরা বঞ্চিত হবেন না। পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত পড়েননি এমন শিক্ষিত বাঙালী বোধ হয় আজ আর একজনও নেই। কিন্তু এ-বইগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, সৎ বিচার, নেই বললেও চলে। সমালোচকের এ-গ্রন্থটি সে অভাব পূরণ করেছে। স্বীকার করবোই যে, বিষয়বস্তু যত ছোটই হোক তার প্রতি যথার্থ সম্মান লেখক এখানে দিয়েছেন।

নিতাই বসুর আলোচনার ক্ষেত্রটি বিস্তৃততর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্পায়ু জীবনে অনেক লিখেছেন। যত ছোট গল্প তত উপন্যাস। যেমন সফল হয়েছেন তেমনি বিফলও হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়েও বড় কথা, জীবিতকালে এমন বিতর্কের সম্মুখীন বোধ হয় তাঁর মতো আধুনিক কালের আর কোনো লেখকই হননি। মানিকবাবুর আদর্শবাদও এক জায়গায় কখনও স্থির হয়ে থাকেনি, ফলে প্রতিটি পথের মোড়ে এসে তাঁর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু বিষয়বস্তু নয়, রচনাভঙ্গিটিও যেন বারে বারে রূপ বদল করতে বাধ্য হয়েছে। তবু এ-তো বাইরের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ষোল আনা সমাজ-সচেতন লেখক ছিলেন, সে সম্বন্ধে আজ কারো মনে সংশয় নেই। এই সমাজের ভালো তিনি দেখেছেন, তার প্রমাণ আছে কিছু কিছু ছোট গল্পে। কিন্তু যে মন্দটুকুকে সাহস করে দেখতে কেউ রাজী ছিলেন না, তাকে তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কখনও যে তাঁর এ সাহস বাড়াবাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তার জন্য শেষের দিককার অনেক লেখাই বিষয়-বস্তুতে ভারাক্রান্ত হয়েও ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিতাই বসু ভুল করেননি। একজন লেখককে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তাকে তিনি সহজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। দোষে-গুণে মানিকসাহিত্য কোন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র তিনি তাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাঁকে অনেক কটু উক্তি করতে হয়েছে, কিন্তু যাঁরা বাংলাসাহিত্যের ইতি-হাস জানেন, সে-সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মনোযোগের সঙ্গেই অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা মানবেন, নিতাই বসুর কটূক্তি স্বেচ্ছাকৃত নয়, আলোচনার পক্ষে অবধারিত।

কিন্তু, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের তারাশঙ্কর সম্বন্ধে কি বলবো? শুধু এইটুকু বলতে পারি তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এই বৃহৎ আলোচনা গ্রন্থটি থেকে সাহিত্যিক তারাশঙ্করকে চেনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—একেবারেই না। এমনকি তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই বেশী। হরপ্রসাদ তারাশঙ্করের বৃহৎ উপন্যাস ও অনেক ছোট গল্পকে প্রচুর পরিশ্রমে নিজের ভাষায় তৈরী করে দিয়েছেন। তাতে আমরা কাহিনী জেনেছি, কিন্তু তারাশঙ্করের রচনার আস্বাদন পাইনি। এ-কথা হরপ্রসাদ মিত্র অবশ্যই স্বীকার করবেন, কাহিনী রচনায় স্বয়ং তারাশঙ্কর তাঁর চেয়ে অনেক

বেশী পারঙ্গম। তবে আমরা মূল রচনা না পড়ে এ-সংক্ষিপ্তসারের আশ্রয় নেবো কেন? দেবদাস যেমন শরৎচন্দ্রের সুন্দর রচনা অথচ শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, আগুন এবং কবিও তেমনি তারাশঙ্করের সুন্দর রচনা কিন্তু শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। অথচ এ গ্রন্থ দুটোতেই যে পরবর্তীকালের একজন যথার্থ শিল্পীর অঙ্গীকার সুপ্ত হয়ে আছে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে হরপ্রসাদ তার ইঙ্গিতমাত্র দেননি। যেমন অভিযান উপন্যাসের আলোচনা (এমনকি কাহিনীও) অনুপস্থিত। অথচ অনেকের মতে অভিযান উপন্যাসটি হাঁসুলীবাঁকের উপকথার মতোই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাত্র ঊনিশ লাইনে হাঁসুলীবাঁকের উপকথার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। সমালোচকের দায়িত্ব নিয়ে এসব পদ্ধতিবিহীন আলোচনা করা যে এই সার্ধ-বিংশ শতাব্দীতেও সম্ভব তার নিদর্শন হয়ে রইলো ডক্টর মিত্রের আলোচনাগ্রন্থ তারা-শঙ্কর!

এ তিনটি গ্রন্থপাঠ করে একটি অভাব বড় স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। একজন লেখকের মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের বিচার অনেকখানি নির্দিষ্ট হয় পরবর্তী লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাবের পরিমাণ মেপে। বিভূতিভূষণ লেখক হিসেবে যেমন একা, প্রভাবের দিক থেকেও তিনি নির্লিপ্ত। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রভাবকে কে অস্বীকার করবে। অন্তত কয়েক দশক আগেও তাঁর দুর্দমনীয় প্রভাবকে এড়াতে পারেননি বর্তমানের অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকও। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় আজও বেঁচে আছেন অনেকেরই লেখনীতে। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেননি একজন গ্রন্থকারও। আমার মনে হয়, এজন্য তাঁদের আলোচনা অসমাপ্ত থেকে গেছে!

তারাশঙ্কর। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র। শতাব্দী গ্রন্থ ভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। আট টাকা।

বিভূতীভূষণ: মন ও শিল্প। শ্রীগোপিকানাথ রায় চৌধুরী। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই বসু। ফসল প্রকাশনী, ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হওড়া। তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

অনিল চক্রবর্তী

সমাজ সংস্কৃতি

চলচ্চিত্রের সাধনা : সত্যজিৎ রায়

অধিকার ভেদে যে-কোনো শিল্পীর কাছেই খুঁজি সত্যের স্বরূপ। সত্য কি এই প্রশ্নই তো যুগে যুগে নিত্যকাল ধরে উচ্চারিত মানুষের মনে। অনেকান্ত বৈভব ও নামরূপের বৈচিত্র্য নিয়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জগৎ আস্বাদনে হৃদয়ের কেন্দ্রে আনন্দ গড়ে, মায়াবী প্রকৃতির ইন্দ্রজালে প্রতিটি অণুপরমাণু লোভন হয়, মমতায় বাধে; যেনো প্রতি মুহূর্তেই ঘোষণা করে তার দাবী নিয়ত সত্যের; অস্থিরতায়, সময়ের প্রবাহিত চাঞ্চল্যে সদা উৎক্ষিপ্ত মূর্তির রকমারি জৌলুষই একমাত্র স্বীকৃত। প্রথম ঊষার কুঁড়ি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়, বর্ণচ্ছটায়, গন্ধে আকর্ষণ করে, কামনার রামধনু ক্ষণিক মেঘের অণুতে বর্ণালী ভাঙে। অথচ সন্ধ্যায় খসে তার পাঁপড়ি, দিবসের আলো কখন অজান্তেই সন্ধ্যার আঁধারে ডোবে, রাতের হৃদয় আবার অগোচরে উন্মথিত হয়েই হয়তো বিন্দু বিন্দু শিশিরে নতুন অঙ্কুর বোনে। অস্থিরের সত্য তখন স্থিরতায় নিবন্ধ হতে চায়, মৃত্যুর পরপারে জ্যোতির্ময় কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর মুখ বা সত্তার অন্বেষণে সত্যের কাহিনী হঠাৎ পালটে যায়। এই যে ছিলো জীবনের চারপাশে চকিত আলোর দীপ্তি, মুহূর্মুহু আলোছায়ার লীলা সে কেমন অজান্তেই মিলিয়ে খোঁজে কোনো কেন্দ্রস্থ স্ফটিক যার প্রতিটি দানায় একই আলো আত্মস্থ হয়ে আছে। অথবা যেনো সেই সাতটি পর্দায় আবৃত কেন্দ্রস্থ আলো যা একটি একটি করে মুহূর্তের দ্বন্দ্বে যতোই উন্মোচিত হয়, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জ্যোতির অনির্বাণ শিখায়। কারণ এই তো সত্য যা এক এবং বহু, যা আসলে চিরস্থির, এক; তিনি নিজেকে আস্বাদন করতে চান বলেই বহু। এই একের নিত্যবিভায় জগৎ সংসার পরিবৃত, বহুজনের অভিজ্ঞানে তিনি বহুধা হন। তিনিই ঊর্ণনাভ, বিচিত্রের লূতায় গ্রথিত তাঁর প্রকাশ, নদী পর্বত বনরাজিনীলা সদাই প্রবাহিত হয়ে আসে তাঁর বিশ্বরূপে; নিরুপাধিক তিনি, উপাধিভূষিত মানুষও তিনি, প্রতিদিনের লীলায় আসক্ত। প্রতি মুহূর্তেই তিনি পূর্ণ অথচ সময়ের দণ্ডপল পূর্ণের বৃত্তেই অপূর্ণতার বোঝা। অপূর্ণতার, অস্থিরতার, বিনাশের যতিভঙ্গেই পেরিয়ে যেতে হয় সত্যলোকে, সত্যের অধিষ্ঠানে। ক্ষণিকের এই মায়া, এই অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় হৃদয় প্রস্তুত হয়; জানতে হয় অর্জুন বিষাদ যোগে অর্জুনের মতো অথবা যেমন জেনেছিলেন ভিনদেশী মহাকবি :

"In that abyss I saw how love held bound
Into one volume all the leaves flight
Is scattered through the universe around;

How substance, accident, and mode unite
Fused, so to speak together, in such wise
That this I tell of is one simple light."

[দান্তে]

শিল্পীকেই এ-কথা জানতে হয় কারণ, শিল্পীই অন্যতম সাধক কারণ তিনিই মহাজগতের মহাশিল্পী।

মানুষেই যখন তাঁর লীলা মানুষের নির্দিষ্ট সত্যরূপ প্রস্তুত নেই শিল্পীর ভাঁড়ারে, কৃষ্ণনগরের মানুষ-মানুষ পুতুলের মতো। বুঝি তুলে এনে বসালেই তার রূপ ঝলসে উঠলো, বুঝি তার মুখের দিকে তাকালেই তার সম্ভাবনার মূর্তিগুলো জানা হয়ে গেল। মহাকালের কোনো একটি নির্দিষ্ট টুকরোতেই তার সত্য খোদিত নেই, বারবার আবরণ উন্মোচন করেই তাকে দেখতে হয় দেখাতে হয়। যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গল্পটি, ধনীগৃহে গৃহকর্মানুরতা ঝিটির কাহিনী। এই গৃহে তার নির্দিষ্ট রূপ, তার নির্বাচিত বিশেষ ছাঁচটি সবার জানা। কর্তার পুত্রকন্যাদের সে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথচ মনটি পড়ে থাকে নিজের গৃহে। সেখানে তার অন্য পরিচয়, অন্যরূপ। মহাকবি শেকস্‌পীয়র যেমন পর্বে পর্বে খুলে খুলে দেখান তাঁর নায়ক-নায়িকাদের মুখ, মুখের মেলা। আদিজ্ঞান যেমন মধ্য ও অন্তে অভিজ্ঞতায় পালটে পালটে সত্যের স্থিররূপ ধরতে চায়। একেই বলি মানুষের বৈচিত্র্য, মানুষের চৈতন্যের সন্ততি ও তার দুর্নিবার যন্ত্রণার পাক।

এই মানুষ ও এই সত্যের খোঁজ করি আমাদের প্রতিভাবান সত্যজিৎ রায়ে। অথচ পাই না। প্রচুর সম্ভার, বিচিত্র উপকরণ তিনি জড়ো করেছেন, পাখির চোখের মতো দেখবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। কিন্তু প্রতিবারই মানুষের বদলে তিনি তুলে আনেন তাঁর হৃদয় থেকে কিছু পুতুল। পথের পাঁচালী থেকে তিনকন্যা ইস্তক প্রতিটি চিত্রেই তিনি অসামান্য কাহিনী বেছেছিলেন; কিন্তু কাহিনীর গভীরে নামবার চেষ্টা তিনি করেন না। কাহিনীর গভীর অর্থাৎ কিনা পাত্রপাত্রীর নির্দিষ্ট প্রদত্ত চরিত্রের খুঁটিনাটির বাইরে যে-মানুষগুলো কখনোই চিরকালের মতো স্থির হয়ে নেই, যা তারা হবে বা হতে চায়, হয়তো হয় না, কিন্তু হবার বাসনা রাখে। গোড়ায় যা নিয়ে তাদের শুরু তা কেবল উপকরণ, কেবল কাঁচামাটি, তার বেশি নয়। এই মাটিতেই শিল্পী তার হাতের ছাপ ফেলেন। যদি তারা হতে না-চায় তবে বলতে হবে শিল্পী তাদের বাছাই করে ভুল করেছেন বা তাদের মনে এমন চেতনার আগুন জ্বালতে পারেন নি যে-আগুনে তাদের খাদ পুড়বে, পরিবর্তনের চাঞ্চল্য আসবে। অর্থাৎ শিল্পী নিজেই নিজের মনে আগুন জেবলে বসেন নি। ধরা যাক 'অপু' চিত্রমালা। প্রথম চিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অপু নিজে; অপু হয় না কিছু বা হবেও না, শুধু ঘটনা ঘটে, ঘটান সত্যজিৎ রায়। চলচ্চিত্রের চোখ নিশ্চয়ই ক্যামেরা যন্ত্রটি কিন্তু সেই চোখের পরিপ্রেক্ষিত তৈরী হয় পরিচালকের মাথা ও হৃদয়ে। বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুরের মন্থর, পৌরাণিক জগতের কেন্দ্র পেয়েছিলেন শিশু অপু থেকে বালক অপুর পরিবর্তনে, কল্পনায় ও অভীপ্সার অন্তর্লীন টানে। অপুর স্বপ্নের জগৎ ও ইন্দির ঠাকরুণের অনাবশ্যক অস্তিত্বের সংঘর্ষে পর্ব থেকে পর্বান্তর আসে; আমরাও নিশ্চলের অন্তরে বেগের আবেগ পাই, বুঝি চঞ্চলের সাড়া যেমন থাকে প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তেমনি আমাদের জীবনের স্তরে স্তরে। প্রকৃতির আপাতরম্যতা বা অকরুণতা আমাদের মধুর স্বপ্নের অথবা মর্মান্তিক পরিবর্জনের। আবার নতুনত্বে স্থিত হবার, প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতির কারুকার্যে বিন্যস্ত করবার বাসনায় স্থির ও অস্থিরের লীলা সদাই জমে উঠছে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ে। অর্থাৎ অপুই প্রকৃতি, অপুই বড়ো হয় বা হয় না, ইন্দির ঠাকরুণ যান, গ্রামটাই সময়ের মুঠোয় হারিয়ে গেলো সর্বজয়ার সংসারের রূপকে। অথচ পরিচালকের নজরে অপু নিছক শিশু, নিছক খেলনা বা উপকরণ মাত্র। অথচ যে জগৎ তিনি গড়েন তাতে খেলনা অপু বাইরে পড়ে থাকে, মেলে না ওই জগতের কাঠামোতে, জগৎটা হারায় তার মৌন উপকরণ। মনে করা যাক মূল কাহিনী বা চিত্রের দুটি প্রধান ও মর্মান্তিক ঘটনা। ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু ও

নিশ্চিন্দিপুরের প্রাচীনপর্বের পরিসমাপ্তি। এই পরিসমাপ্তিতে অপুর বিশ্ব অলক্ষ্যে রূপান্তরের বীজ পায় কারণ নিশ্চিন্দিপুরের নিশ্চিন্ত জগতে প্রায় আদিম বিরাগ, হিংস্রতা ও ঘৃণা হঠাৎ ঝলসে উঠেছে। তার শিখা অপু-দুর্গার অসহায় করুণ মুখটি বেড়াজালে ঘিরে রাখে। চিত্রে নিশ্চয়ই রূঢ় বিদ্বেষ ও বিরোধ রূপ পায় অথচ রূপকথায় মুগ্ধ দুটি শিশুর এতোবড়ো নিষ্ঠুর ঘটনাটি ঘটে গেলো, ঝরাপাতার মতো ইন্দির ঠাকরুণ মুছে গেলেন ওদের অবোধ চোখের বোবাকান্না ও অসহায়তা ছাড়াই। তারপরেই ধরা যাক দুর্গার মৃত্যু। নিপুণ কারুকার্যে মণ্ডিত চিত্রের টুকরোটি। সর্বজয়ার বুকচাপা কান্না, গ্রীষ্মের চাপা গুমোট, মন্টাজের খেলা, বাবার শাড়ি নিয়ে ফিরে আসা, দুর্গা ডাক ও কামেরার দিকে পেছন-ফেরা সর্বজয়ার ভেঙে পড়া আমাদের মাত্রায়, বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে কারণ আমরা কল্পনায় মমতা দিয়ে বেঁধেছিলুম অপু-দুর্গাকে। কিন্তু দুর্গাও খসে গেলো অজান্তে অপুর অভিজ্ঞতার বাইরে। ঝড়জল, দেয়ালের মূর্তির দোলা ইত্যাদি নানা 'বাস্তব' টুকরোর অভিঘাতে দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য নিশ্চয়ই নয়নতৃপ্তিকর বা যথার্থ বলে বিশ্বাস্য তবু তার যুক্তি ও প্রয়োজন শুধুমাত্র আমাদের জন্যে, আমরা যারা 'দর্শক', চিত্রের বাইরে বসে আছি। এ-কথা হয়তো বলা চলে কাহিনীর ত্রুটি পরিচালককে সত্যভ্রষ্ট করেছে। তবু বলা চলে নাকি পরিচালক তো তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের চাপই সৃষ্টি করেন তার উপকরণে? আমরা দেখতে চেয়েছি ওই নিশ্চিন্দিপুরেই মানুষের হয়ে ওঠা, তার দৈনন্দিন জীবনের সহস্র পাক, মন্থনের গরল বা অমৃতে। সত্যজিৎ রায় নিজের সীমাবদ্ধতা থাকতে তো তাই সহজেই অপুকে নিতান্ত শিশু বলে যেমন ধরে নিয়েছিলেন তেমনি কার্যতই একটি শিশুকে নাবালকত্বে উপস্থিত করেন চিত্রে। দুর্গার মৃত্যু কেমন অপুহীন বিশ্বে ঘটে গেলো, ঘটে যেতে পরিচালকের প্রতিবাদ গড়ে উঠ্‌লো না। আমরা সেতুহীনভাবে বসে রইলাম বাইরে, ছবির ভেতরে স্থান পেলাম না।

একই যুক্তিতে 'অপরাজিত' শুধু নয়নাভিরাম হবার বাসনায় প্রথমার্ধ জুড়ে আমাদের ছায়াচিত্রের জগতে ঘুরিয়ে বেড়ালো। ওই সাজানো গোছানো প্রাণহীন বিশ্বনাথের শহর; অথচ যা নাকি অনাদিকাল তার রূপ অবিকৃত রেখেছে, ভারতবর্ষের হৃদয়কে প্রকাশ করছে কর্মচঞ্চলো, ত্যাগে, মুক্তিতে। ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িতে রূপবান শিশু, বদ্দগলিতে ষাঁড় ও চঞ্চল শিশু, অন্তিমযাত্রী পিতার শেষ পাথেয় জোগাতে পাত্রহাতে ব্যস্ত শিশু—এমনি আরো কতো সুন্দর সুন্দর ছবি। সংগে আছে মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টা, লম্বমানলাঙুলশোভিত বাঁদর, ছিলিম উদারকরত ছেলে ও রন্ধনরত আত্মমগ্ন মা। অথচ প্রাণ নেই ছবিতে যেহেতু এই পর্বেও অপু পরিচালকের মনোহর একটি খেলন মাত্র, প্রাণবান শিশু বা কিশোর নয়। সে বড়োজোর মার দুশ্চিন্তার কারণ হয়, বড়োজোর আমাদের চোখ টেনে রাখে তার স্নিগ্ধ রূপে। কিন্তু চিত্রের অস্থির কেন্দ্র হয় না যা হয়তো পরিচালকের বাঁধা ছকটাকে মুহূর্তে গুড়িয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় অংশে যখন সে নাকি হচ্ছে, হচ্ছে কেনো? শুধু বাইরে কেউ কেউ পাঠশালায় যাচ্ছে আর সে চলেছে পূজো করতে, এই জন্যে? এ-কথা সত্য হলেও মানতে দ্বিধা হয়; সত্যজিৎ রায় হঠাৎ কেনো পুতুলে প্রাণের সাড়া আনছেন? কী তাঁর লক্ষ্য, কী তাঁর প্রশ্ন? কিশোর অপুর পরিবর্তনের অভীপ্সা বিষয়ে জিজ্ঞাসা ওঠে। প্রাচীন জগৎ আর আধুনিক জগতের দ্বন্দ্ব? গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব? 'সামন্ততন্ত্র' ও 'নবজাগরণের' দ্বন্দ্ব? কিন্তু দ্বন্দ্ব কেনো? দ্বন্দ্ব কোথায়? কী সূত্রে, কী রূপে? গোটা চিত্রটিতে সমস্ত চিন্তাই অপ্রকাশিত থাকায় অপুর স্টেশন থেকে ফিরে আসার আশ্চর্য অংশটিও সামগ্রিকতায় অর্থ পায় না। হঠাৎ কিছুটা আশার চমক দেয় মাত্র। তৃতীয় পর্বে আবার অপু শূন্যতার জগতে পরিচালিত, যে-শূন্যতা জীবন বা জগতের নয়, শূন্যতা মানসের, যে-মানস

আবার অপুর নয় পরিচালকের কারণ এবারেও শিশু অপু যুবক অপূর্বর পরিণত চরিত্রে রূপান্তরিত নয় যদিও সে কখনো প্রেমিক বা কখনো বিবাগী। অপূর্ব যদিও এবার বাইরের বিশ্বে নেমেছে, যদিও সে দারিদ্র্য-পীড়িত ও নিঃসঙ্গশূন্যতায় মথিত তবু তার সেই জগৎ ও নতুন কামনার বিশ্ব এমন সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে না যে আমাদের অভিজ্ঞতারও ছায়া পড়ে তাতে। আমরা কেবলমাত্র ভাবতে পারি যে একটি দরিদ্রের ভাগ্যে সুন্দরী ধনীকন্যা জুটেছিলো যার অকাল মৃত্যুতে সে ন্যায্যতই বিবাগী হতে পারে। কিন্তু যে বিরোধী অস্তিত্বের জ্বালা নিদারুণ সত্য ছিলো যুবকটির জীবনে আবার যে-জীবন আকস্মিককে স্নিগ্ধতার পাড় বুনলো তার চারপাশে —সবই বড়ো হালকা ভাবে ভাবলেন সত্যজিৎ রায়, ছবি বানালেন সৌখীন চালে, অতি জানা মোটা অনভিজ্ঞ রেখায়। 'দেবী' ও 'তিনকন্যায়' এই শিল্পীর ভেসে আসা আরো চোরাবালির গভীরে দেবী চিত্রের জলেপচা বর্ণহীন কায়াহীন প্রতিমার বাঁশখড়ের কাঠামোর মতো। দেবীর নায়ক নিছক 'বেম্মো'পনায় যেমন সংস্কৃতি-শিক্ষা-ঐতিহ্যর ধারা থেকে বিনা আয়াসে বিচ্যুত তেমনি বোধহীন অন্ধতায় সন্তান-পিতার সম্পর্কের যন্ত্রণায় অবিচলিত, হৃদয়হীন বাঁচাল যুবক মাত্র। 'দেবী'র অন্তর্গূর টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত দুটি খেলো সরল চিত্রে নিঃশেষিতঃ দেয়ালে নখের আঁচড় টেনে মূর্ছিত হওয়া ও যেতে যেতে ফিরে আসা। 'তিনকন্যায়' দেখি পরিচালকের প্রমত্ত কল্পনায় তিনটি বিকৃত প্রতীক ঃ গাঁজার কলকে, ছিপহাতে পাগল ও নায়িকার রতিসুখাভাসসিক্ত স্মৃতি। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মন শুধু তাই কয়েকটি কাগুজে মূর্তি নানা ছাঁদে বসিয়ে যাচ্ছে রূপান্তরের আগুন ছাড়াই অবস্তব প্রকৃতিতে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে নাকি 'পথের পাঁচালী'র পরিবেশ, অপরাজিত বা অপুর সংসারের ছাপাচিত্রের শূন্য জনহীন মাঠপ্রান্তরের গ্রাম?

হয়তো নয় নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে এমন হয় কেনো? হয় যে তার কারণ সত্যজিৎ রায়ের মন সৃষ্টিতে তাঁর দিব্যমুখ দেখে না, দেখে না মানুষ ও প্রকৃতিতে কেমন লীলা জমে আছে সম্পর্কে বিয়োগে। কারণ সত্যজিৎ রায়ের মনে নেই সেই আগুন বা সেই প্রেম যা একটি মানুষ খুঁজতে শিল্পীকে ঠেলে বিশ্বের পথে বা নরকের গভীর অতলে, যন্ত্রণার পাকে। সেই প্রেম যা খুঁজতে মহাকবি নরকের অন্ধকার থেকে আসেন শুদ্ধির আগুনে, শুদ্ধির আগুন থেকে সুন্দরের স্বর্গে যাকে দীর্ঘ পরিক্রমার চৈতন্যে জানেন, 'The love that moves the sun and the other stars'। জানতে হয় দুভাবে ঃ বিষাদ বা যন্ত্রণার এরিস্টটেলীয় আর্তিতে যেমন জানতে বেরিয়েছিলেন গ্রীক নাট্যকাররা, দিব্যকাব্যের দান্তে ও নবজাগরণের শেক্সপীয়র। অথবা নেতিনেতি জ্ঞানে জগৎ সংসারকে মায়ায় বিবর্ত ভেবে ব্রহ্ম বা আনন্দের খোঁজে বা নির্মোহ ত্যাগে ভোগের আস্বাদ নিয়ে বাসনার শেষ পুড়িয়ে নির্লোভ প্রশান্তিতে, যেমন পেরেছিলেন শঙ্করাচার্য বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জানতে হয় একদিকে আছেন রুদ্র তাঁর বিনাশের মারণমন্ত্র নিয়ে আর একদিকে প্রসারিত তাঁর দক্ষিণ পাণি যা আমাদের নিয়ত কল্যাণে, প্রেমে অমোঘ শান্তিতে সত্য স্বরূপে আকর্ষণ করছে অবিদ্যার ফাঁদ থেকে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর অভিজ্ঞতায় এখনো সে-কথা জানেন না বা অবিচলিত মনে পা বাড়াতে সাহসী নন অজ্ঞাত পথের কন্টকে। যেহেতু তাঁর মনে প্রাগুক্ত কোনো সংস্কার নেই য়ুরোপ বা ভারতবর্ষের। ওঁর পথ সরল সমাজতত্ত্বের পথ; যেমনটি মানুষ হয় অবস্থা বিশেষে, যেমন আপাত-স্বাভাবিকতায় তারা গড়পড়তা হিসেবে চলে। কলকাতা এলেই জীবনের একমাত্র সঙ্গী করুণ যন্ত্রণাজর্জর মাকে ত্যাগ করার একরোখা বাসনা হয়, স্ত্রীকে স্নেহশীল প্রৌঢ় পিতা দেবী ভাবলে তাকে পাগল বলতে হয়, যেমন স্বামী সহবাস ঘটলেই স্ত্রীর মনে স্বামীকে আবার পাবার

বাসনা হয়। মানুষের সবটাই ছায়া, সবটাই প্রতিভাসমাত্র ও'র কল্পনায়। অথচ শিল্পী তো তাকান অন্তরে, সমাজতাত্ত্বিক বাইরে।

বর্তমানে সর্বশেষ চিত্র 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' সত্যজিৎ রায়ের রূপান্তরের একটা সম্ভাবনা দেখা গেছে, যদিও সমাজতাত্ত্বিক মোটা ছকটা ও'র মন ছেয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক ইঞ্জিনীয়ার প্রণব ও ইতিহাসের ছাত্র অশোক। প্রণব রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আর অশোক দারিদ্র্য সত্ত্বেও আদর্শবাদী শিক্ষিত রুচিবান। অথচ ইনিয়ে বিনিয়ে ধনী-কন্যাদের বিষয়ে অর্থহীন বক্তৃতা দিলে, নিজেদের সঙ্গে দূরত্বের অভিমান জানালেও তাকে রুচিবান শিক্ষিত মনে করতে আমাদের আপত্তি হয় না। আমি তাই অশোকের চরিত্র বিন্যাসে শুধু লোভের ছায়াই দেখি যা কেবল যে কোন মানুষকেই টানে, তার অতি-জানা সাধারণ মুখটাকেই দেখায়, যেমন টেনে টেনে এনেছে অশোককে মণীষার চারপাশে। যত ছোট দার্জিলিং শহর হোক না কেন, ওর পরিক্রমায় কেমন নির্ভুল হিসেব ফোটে রায়বাহাদুর পরিবারের বৃত্তে। তবু মণীষা প্রণবের দাবি থেকে পালিয়ে সেতু গড়ে অশোকেরই সঙ্গে। মণীষা সেতু গড়তেই পারে, ওর অবলম্বন চাই, কেন্দ্র চাই বলে। সবে তার জীবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, এখনও জীবন তাকে জানায়নি অশোক ও প্রণবে কোন প্রভেদ নাও থাকতে পারে, শেখায়নি যে মনগড়া রোমাঞ্চকর কল্পনার জীবন ও জগতের অতি সাধারণ বাসিন্দা অশোকের চাইতে প্রণব হয়তো মাটিতে অনেক সহজে ও দৃঢ়তায় পা রাখে। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ জানালার কাছে লিখতে বসতেন না জেনেই রুচির পরীক্ষায় পাশমার্কা দেওয়া চলে না, প্রণবের মতো অশোকও হয়তো শুধুই রূপের আগুনে পতঙ্গমাত্র। এই চিত্রে নির্বাচিত খোপে খোপে ফেলা অংশের পাশে অণিমা ও শশাঙ্কর কাহিনীতে নতুনত্বের সম্ভাবনা ছিলো। তারা শেষ বিকেলে পড়ন্ত জাদুকরী রঙে নিজেদের বিরোধ মীমাংসা নিয়ে বিব্রত হয়েছিল। কিন্তু ওদের এই বিরোধ সত্যজিৎ রায় এমন সরল কথায়, ঝড়-ঝাপটা ছাড়াই, মীমাংসার স্থিতিতে আনেন যে অবাক লাগে ভাবতে এতদিনকার-জমানো কথা এমন মর্মান্তিক শূন্যতা কি এতই খেলো! অবশ্য অণিমা কেঁদেছে, অবশ্যই শশাঙ্ক উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়েছে, নাটুকে পায়চারি করেছে। কিন্তু সত্যের নির্মম উপস্থিতিতে নাটুকে কথা, নাটুকে ভঙ্গির অবকাশ কই। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখি মুখের রেখা দুমড়ে ভেঙে যায়নি, ঠোঁটের কোণায় জীবনের শেষ হতাশার বিন্দু নেই, কণ্ঠে অতল গহ্বরের অন্ধকার নেই। এমন একটি বাক্য উচ্চারিত হলো না যাতে চকিতে হৃদয়ের মর্মমূল কাটে। এমন কি মীমাংসার পরে দেখলুম না ওরা অবসাদে, আবার নতুন না জানার বিষাদে মগ্ন। পূর্বেকার সেই ভালোটে-ভালোটে ছা-পোষা মুখ দুটি। শশাঙ্ক বলছে বেশ, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারলেও—যে-বাক্য, যে-কণ্ঠ আলোচনার সূত্রপাতে শুনেছি। বাইরে তখন সত্যজিৎ রায়ের মোহিনী আলো রঙে রঙে বিহ্বল হয়ে আছে।

তবু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ভালো, তবু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নতুন পথের সূচনা দেখায়। ওদের ওই বিচিত্র এলোমেলো জগতে প্রথম যখন দেখলাম শিশু টুকলুকে তার উজ্জ্বল লাল পোশাকে, শুনলাম সে বলছে তার মাকে, বলছে দিদাকে তার চক্রাকারে ঘুরে বেড়ানোর হিসেব, টের পেলাম সত্যজিৎ রায় এবার কেমন করে যেনো হৃদয়ের চাপ তৈরী করেছেন ছবির কেন্দ্রে। ওই শিশু তার শুদ্ধতায়, প্রেমে, মমতায় দিব্য আলো ফেলছে চরিত্রগুলোর মুখে; সে জানে না কেমন ফাটল ধরেছে জীবনে তবু যেন জানে তার ছোট্ট মুঠিতে ধরতে হয় অকরুণ আঁচল চেপে, ঘুরে ঘুরে আত্মজনের বৃত্তে টেনে আনতে হয়, সম্পর্কের বন্ধনে ধরে রাখতে হয় ছলনার শরীর। ওর বাহুবন্ধনের টানেই দেখি ওদের শূন্যতার করাল মুখ, ওর আলোতেই দেখতে পাই ওদের বিচ্ছিন্নতার এক একটি

স্বরূপে। এই শিশুটি দিব্যজীবনের প্রতীক, তাতেই আছে সব পবিত্রতা, সারল্য। এই শিশু টুকলু শুধুই একটি সংস্থাপিত মূর্তি নয়, সে তার আচরণে, বাক্যে সম্পর্কে দীপ্তি ছড়ায়, এই দীপ্তির প্রভায় দেখি অন্য প্রতিটি চরিত্র, যারা নানা অসত্য, অর্ধসত্যের আকর, যারা কেবল মুখোস এঁটে ঘুরে বেড়ায়। টুকলু তো ঘুরে এসেছে দার্জিলিঙ পরিক্রমা করে, ঘুরে এসেছে ইন্দ্রনাথ পরিবারের প্রতিটি চরিত্রের চারপাশে। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরেও সবাইকে টেনে আনছে হৃদয়ের বৃত্তে, ঘনিষ্ঠতার পরিমণ্ডলে। এবার হয় এরা সবাই আসবে কাছাকাছি অথবা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে যাবে অজ্ঞানের ঘূর্ণিতে। যতোবার সে ঘোরে ততোবার পাক পড়ে জীবনের আর যখন সে বলে 'আবার ঘুরবো' তখন বুঝি তার ভালোবাসাতেই সূর্যচন্দ্র, বুঝতে পারি এবার একাকিত্বের আঁধার সে আলোয় উদ্ভাসিত করবে। যখন সে বাবার কোলে চেপে বলে 'মা চলো'—তখন জানি অণিমা-শশাঙ্ক এতোকাল পরে বিচ্ছেদের খাদ বুঝি পেরিয়ে আসে তাদের নতুন সংসারের খোলা উঠোনে। এই হলো হৃদয়ের টান যা-ই জীবন, যা-ই সত্য—পরিব্যাপ্ত অসত্যের পাশে এই সত্যই শিল্পের স্বরূপে মুহূর্তে প্রকাশ করে। আর আছে ওর মাসী মণীষা। সেও টেনে নেয় জীবনের চকিত রহস্যের কেন্দ্রে কারণ তরুণী মনোলোভা, স্বতই তার নয়নে, কণ্ঠে, তার ঠোঁটের রেখায় জীবনের নিগূঢ় বেদনার ছাপ পড়ে, সে যেনো জীবনের মুখোমুখী নিরুদ্ধ মমতায় আত্মদানের স্বপ্নে বেপথু, চঞ্চল এক শিখা। ওই শিশুর মতো মণীষাই সত্য কারণ সে শুদ্ধতার প্রত্যক্ষতা পেতে যাচ্ছে তার আত্মআবিষ্কারের যন্ত্রণায়। যদিও সে তার ভাগ্যের রূপ দেখেনি তবু তার পায়ের তলার মাটিতে টান ধরেছে অন্তর্গূঢ় কম্পনের সাড়ায়, যদিও সে জ্ঞানের কেন্দ্রে স্থিত নয় তবু তার সুত পাকিয়ে আসার ত্রস্ততায় ফোটে অসহায় বিশ্বে আশ্রয় আঁকড়ে ধরার আকুতি আর এই আশ্রয়, আমরা অপেক্ষায় থেকে জানি, আসে শেষ পর্যন্ত নিজেকে আলোকে-আঁধারে জেনে নেওয়াতেই।

এতোকালের ছবি ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' এই তফাৎটুকু সত্যজিৎ রায়ের পরিবর্তনের সূচনা। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তিনি পুরোনো সমাজতন্ত্রের ছকেই হঠাৎ নতুন একটা সাড়া তুলতে পেরেছেন। এই সাড়া মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার প্রস্তুতি। আমাদের চলচ্চিত্রের মুক্তিতে সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বাক্ষর রেখেছিলেন আদিতেই আর সে-কারণেই আশা করবার থাকে যে তিনি তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যকে মেলাতে পারবেন হয়তো শিল্পকৌশলের সঙ্গে যদি সচেতনে আত্মদহনের জ্বালা নিজের জীবনেই সত্য বলে গ্রহণ করেন।

শান্তি বসু

আলোচনা
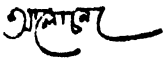
প্রাণদণ্ড : সমাজে ও সাহিত্যে

স্বরাজলাভের জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। অবশেষে স্বরাজ মিলল জেলখানায়। জেলের ওয়ার্ডাররা বিভিন্ন দাবিতে সেদিন সকাল থেকে ধর্মঘট শুরু করল। ফলে এই স্বরাজ—অর্থাৎ জেলের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়ানর অধিকার। সকলেরই লক্ষ্য পদ্মার তীরঘেঁষা জেলের মহাপ্রাচীর-সংলগ্ন 'কনডেম্ন্‌ড্ সেলস্'—যেখানে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের রাখা হয়েছে। ঐ সেলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে অন্দরে নজর করলাম। একজন বৃদ্ধ বর্মী হাতজোড় করে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। পাশের সেলে মৃত্যুদণ্ডিত ব্যক্তি নব্য যুবক। তার দৃষ্টি অবশ্য বিদ্রোহব্যঞ্জক। অনুসন্ধানে জানলাম, এরা দুজন পিতাপুত্র। সামরিক আদালতে যুদ্ধপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এদের আপীলের নিষ্পত্তির পূর্বেই জাপবাহিনীর তাড়নায় ইংরেজকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে হয়। আইনানুগ বৃটিশ সরকার ব্রহ্মদেশ ছাড়বার সময় আইনের মর্যাদা রক্ষাকল্পে এদেরকে এত কষ্ট স্বীকার করে উত্তর বঙ্গের এই সেণ্ট্রাল জেলে বয়ে নিয়ে এসেছে। অথচ জাহাজে ও বিমানে স্থানাভাবের জন্য অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও ফেলে আসতে হয়েছে।

ধর্মঘট মিটে গেল। অতএব তাদের ফাঁসি হল কিনা জানতে পারলাম না। কিন্তু পিতা-পুত্রের একসঙ্গে ফাঁসি দেখতে পেলাম আলিপুর জেলে এসে। তারা অবশ্য বর্মী নয়, তেলেঙ্গানার রামমূর্তি ও তার পুত্র। কিছুদিন পরে শিখ ক্যাপ্টেন সর্দারা শিং-এরও ফাঁসি দেখলাম—নেতাজীর আজাদহিন্দ ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করবার অভিযোগ। ফাঁসি প্রকোষ্ঠে এর পরেই প্রবেশ করলেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীহরিদাস মিত্র ও ডাঃ পবিত্র রায়। তাঁদের আপীল তখন বড়লাটের বিবেচনাধীন। (পরে অবশ্য গান্ধীজির চেষ্টায় শ্রীমিত্র ও ডাঃ রায় মুক্তিলাভ করেছিলেন)। একদিন সকালে আমাদের সেলের দরজা দেরিতে খুলল। সাধারণতঃ শেষরাত্রে কোন ফাঁসি হলেই দারোদ্ঘাটনে এরূপ বিলম্ব ঘটে। শঙ্কিত হয়ে মিসডিমিনার ওয়ার্ড-এর বারন্দায় দাঁড়ালাম এক দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ চারদিকে ঘুরে সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছে। অবশেষে আকাশের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে গদগদকণ্ঠে বলে উঠল—'ভগবান যো কো রাখ্‌তা উঁহি রহতা।' ব্যাপার কি! জানা গেল, ঐ ভগবান-ভক্তের প্রতি ডাকাতিসহ হত্যার অপরাধে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল; সেই দণ্ড আজ সকালে মকুব হয়েছে। প্রশ্ন জাগে এ কেমন দণ্ডাদেশ যেখানে দেশ-ভক্ত অব্যাহতি পায় না, অথচ দস্যু ও হত্যাকারী সহজে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। আইনের মূল কিতাবগুলো পাশেই ছিল—পরীক্ষা পাশের জন্য আনিয়েছিলাম। খুলে দেখলাম ইংরেজ আইনের নীতি, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ডিত হওয়ার চেয়ে পঞ্চাশজন অপরাধী রেহাই পায় সেও ভাল। তাই একবার জনৈক বিচারক বলেছিলেন— 'I see the criminal in the mirror' অর্থাৎ কে অপরাধী সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েও আইনের কূটজালে আবদ্ধ থাকায় দণ্ডাদেশ দিতে অক্ষম।

প্রবীন আইনজীবী ডঃ কৈলাশনাথ কাটজু তাঁর 'লণ্ঠন' শীর্ষক গল্পের ভূমিকায় বলেছেন,

খুনের মামলায় প্রায়ই বিচার-বিপর্যয় ঘটে এবং প্রকৃত আসামী অনির্ণীত থেকে যায়। ফরাসী আইনে অবশ্য আসামীকে খুনী ধরে নিয়েই জেরা করা হয়। সেখানে দোষস্খালনের সমুদয় দায়িত্ব স্বয়ং আসামীর। কিন্তু ইংরেজী আইনে আসামীকে শুধু জিজ্ঞাসা করা হয়—'দোষী না নির্দোষ'। সে যে যথার্থই হত্যাকারী এটা সপ্রমাণের পূর্ণ দায়িত্ব অভিযোগকারী পক্ষের। প্রাথমিক বিচারে দোষী বিবেচিত হলে জুরীদের উপস্থিতিতে দায়রা বিচারের ব্যবস্থা হয়। খুনের আসামী সাধারণতঃ ছাপাই-সাক্ষী (য়্যালিবি) দেয় না। বিচারকের বিবেচ্য মূল ঘটনা সম্পর্কে হত্যাকারী-কথিত ব্যক্তির কাহিনী যুক্তিসহ কিনা। ইংলন্ডের বেইলি আদালতের বিখ্যাত মামলা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এক ব্যক্তি স্ত্রী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়। আসামী তার স্বীকারোক্তিতে বলে যে, একথা সত্য তার বন্দুকের গুলিতেই তার স্ত্রীর প্রাণান্ত হয়েছে। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় এই গুলি ছোড়েনি। দীর্ঘদিন স্ত্রী তার সঙ্গে বসবাস করে না। এ জন্য কতকটা প্রোষিত ও উন্মত্ত অবস্থায় সে ভীতি প্রদর্শনের জন্য স্ত্রীর কাছে গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিল, কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে স্ত্রীর শরীরে বিদ্ধ হয়। বিচারক এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়ে আসামীকে মুক্তি দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও ২৯৯-৩০০ ও ৩০১-২ ধারায় অপরাধজনক নরহত্যা not amounting to murder ও amounting to murder দুভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দণ্ডাদেশ বিহিত হয়েছে। এছাড়া মারাত্মক জখমের (যাতে একুশ দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়) উদ্দেশ্যে আঘাত হত্যায় পরিণত হলেও অন্যরকম দণ্ড-বিধি নির্দিষ্ট আছে। অনেক সময় পুলিসপক্ষ থেকে বলা হয় যে তারা বিশৃঙ্খল জনতার পায়ের দিক লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েনি, হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলিবর্ষণ করেছিল (shot to kill)। এ রকম ঠান্ডা রক্তে সঞ্চিত ক্রোধবশতঃ নরহত্যার ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাদেশ হয়ে থাকে। কিন্তু সে-প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে নরহত্যায়ও অনেকে রেহাই পেয়ে যায়। এক-মাত্র ভারতবর্ষে বছরে দশহাজার নরহত্যা হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক ক্ষেত্রে খুনের আদৌ কোন কিনারা হয় না। শেষপর্যন্ত পুলিসের চেষ্টায় যারা সোপর্দ হয় তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনেরই শাস্তি হয় না, ফাঁসি হয় মুষ্টিমেয়ের।

কলিকাতার প্রাক্তন পুলিস-প্রধান শ্রী ইউ, মুখোপাধ্যায় এক বেতার-ভাষণে বলেন, অধিকাংশ নরহত্যার মূলে নিহিত রয়েছে লিপ্সা বা আক্রোশ (greed or grudge) অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মতে, মনের যে অবস্থায় মানুষ আত্মঘাতী হয়, তদনুরূপ মানসিক অবস্থাতেই নরহত্যাও সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হত্যাকারী সেই সময় অপ্রকৃতিস্থ থাকে। এ-অবস্থায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাদেশ বিধেয় কিনা, প্রশ্ন থেকে যায়।

হত্যাকারীকে রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী হত্যা করা অনেকেরই মতে বর্বর-যুগের প্রথা। মোসেজের আমলে চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এই আদিম প্রতিহিংসা-পরায়ণতার পোষকতা করা হত। যখন রাষ্ট্র ছিল না তখন নিগৃহীত ব্যক্তির প্রতিশোধ-স্পৃহা পুরুষানুক্রমে বর্তাত—হত্যার বদলে হত্যা চলত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বর্তমানে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ইতালি, নরওয়ে, পর্তুগাল ও রুমানিয়ায় মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা হয়েছে। পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, ইসরায়েল, নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটটি অঙ্গরাজ্যে নরহত্যার জন্য প্রাণদণ্ডাদেশের বিধান নেই। রাষ্ট্র-দ্রোহাত্মক অপরাধ বা সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। এ-যুগে স্মরণীয় যে, আইখম্যানের ফাঁসি হয়েছে নবগঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রে—নরহত্যার

জন্য নয়, যুদ্ধপরাধে। ইংলণ্ডে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণদণ্ডাদেশ রদ করার জন্য পার্লামেণ্টে প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল। যেমন ভারতীয় সংসদেও কিছুদিন যাবৎ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এ-সম্পর্কে বিবেচনার জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইংলণ্ডে অবশ্য ১৮৩৮ সালের পর একমাত্র নরহত্যা ব্যতীত শান্তির সময় অন্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। সিংহলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কিছুদিন স্থগিত রাখার পর আবার বলবৎ করা হয়েছে।

দণ্ডাদেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটো নীতি সর্বজনস্বীকৃতঃ সম্ভাব্য অপরাধীর মনে ত্রাস-সঞ্চার দ্বারা অপরাধ নিবারণ ; দ্বিতীয়তঃ, শাস্তির দ্বারা অপরাধীর চরিত্র সংশোধন ও উত্তরকালে সমাজে তাঁর পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা করা। প্রাণদণ্ডাদেশের দ্বারা এ দুই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। পরলোকগত আসামীর চরিত্র সংশোধনের প্রশ্নই ওঠে না। তার চরিত্র সংশোধনযোগ্য নয়— এরূপ মনে করার অর্থ পরাভব স্বীকার করা। যে ক্ষেত্রে আসামী বারংবার সন্দেহাতীতরূপে গর্হিত অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে সেখানে সংশোধনের অতীত মনে করে সমাজরক্ষার্থে তাকে চরমদণ্ড দান হয়ত সঙ্গত। অপর পক্ষে পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রাণদণ্ডাদেশ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে নরহত্যাজনিত অপরাধ বৃদ্ধির দিকে। ভারতে ১৯৫০ সালে ৯৭০০ নরহত্যা সংঘটিত হয়েছিল; ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে—১০,৭৫৭। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির অস্বস্তিকর পরিবেশে জীবনযাত্রাজনিত মানসিক বিকার হয়ত এর জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩৩ ভাগ। আর ঐ সময়ের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে যে সমস্ত দেশে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে নরহত্যার হার বৃদ্ধি পায়নি, অর্থাৎ দণ্ডাদেশ বিলুপ্তির পূর্বকালীন সংখ্যার অনুপাতে বর্তমানে নরহত্যার হার নিম্নাভিমুখী।

উপরোক্ত খতিয়ানের পরিপ্রেক্ষিতে মিস্টার ম্যাকমিলান মন্তব্য করেছেন—মৃত্যুদণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞানের বিচারে অযৌক্তিক এবং সমাজ রক্ষার খাতিরেও অপ্রয়োজনীয়। ("Capital punishment is then unsound criminologically and penologically unnecessary to protect the State and the people.") বিকল্প গুরুদণ্ডের দ্বারাই রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে সুরক্ষিত করা সম্ভবপর।

প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, দণ্ডাদেশ কার্যকর হবার পর পুনর্বিবেচনার কোন অবকাশই থাকে না। ফাঁসি হয়ে যাবার পর আপিলে খালাস সম্ভব নয়। মৃতব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার কৌশল এখনও আয়ত্ত হয়নি। শোনা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে উদয় পাটনী নামে এক ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ মকুব করে জেলে পুনরাদেশ পাঠিয়ে জানা গেল তার চব্বিশ ঘন্টা আগে হতভাগ্য পাটনীর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ-জাতীয় বিলম্বের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এমন বলা যায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তির যে ফাঁসি হয়েছে সে প্রমাণও পরে পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার কলম্বিয়া অঙ্গরাজ্যের নাগরিক চার্লস বার্নস্টাইন-এর মামলাটি উল্লেখযোগ্য। চার্লসের ফাঁসির মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে জানা যায় যে সে নিরপরাধ। কিছুদিন আগে ইতালিতে ভ্রাতৃহত্যার দায়ে দণ্ডিত এক ব্যক্তি ফেরার হয়ে গিয়েছিল, বার বছর পর প্রকৃত আসামী কবুল করায় সে স্বগ্রামে ফিরে আসতে পেরেছে। দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় ফাঁস লাগান হয়েছে এমন সময় দেখা গেল দণ্ডাদেশ-পত্রে (warrant) সামান্য

আইনগত ত্রুটি আছে। পরে জানা গেল সে নিরপরাধ। দৈব অব্যাহতি আর কি! যেখানে বিচারকেরও প্রমাদ ঘটতে পারে—তিনি যতই সতর্ক ও সুনিশ্চিত হন না কেন, যেখানে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীও ন্যূনতম জীব সৃষ্টি করতে পারে না, সেখানে ন্যায়বিচারের মর্যাদায় অন্যের জীবন গ্রহণ সমীচীন কিনা? এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ সম্পর্কিত মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যয়বহুল। কোন সাধারণ আসামীর পক্ষে এই ব্যয়বহন প্রায়ই সাধ্যাতীত। অপেক্ষাকৃত ধনীরা চরম অপরাধ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও প্রচুর অর্থব্যয়ে কৌঁসুলী নিয়োগ করে, এমন কি উৎকোচাদির আশ্রয় নিয়েও বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জনৈক মার্কিন জেল-ওয়ার্ডেন বৈদ্যুতিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনাবসানের ১৫০টি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর নিশ্চিত ধারণা এদের অধিকাংশই দারিদ্র্যের জন্য বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের জনৈক বিশিষ্ট আইনজীবী গর্ব করে বলেন যে, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত তাঁর দুশো আসামীর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র একজনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছে। নরহত্যাজনিত মামলায় যথার্থ বিচারের পথে প্রধান অন্তরায় মৃতব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি-বশতঃ জনসাধারণের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য। জনসাধারণ রব তুলে থাকে, মৃতের আত্মা রাজা হ্যামলেটের প্রেতাত্মার মতই হত্যাকারীর রক্তলোলুপ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতএব অভিযুক্ত ব্যক্তিরই ফাঁসি হওয়া উচিত। তাই মার্কিন বিচারপতি ফেলিক্স মন্তব্য করেছেন—"When life is at hazard in a trial, it sensationalizes the whole thing unwittingly." বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য বিখ্যাত আইনজীবী মিস্টার লেস্‌লি হেল 'হ্যাংগিং ইন দি ব্যালান্স' গ্রন্থে নিরপরাধদের ফাঁসির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, খুনের মামলায় balance of probability অর্থাৎ সম্ভাবনাটা কোন দিকে বেশী তা-ই নিরূপণের চেষ্টা হয়, সত্যের সন্ধান করা সম্ভবপর নয়। বিচারে ভুল হলে তার চারা থাকে না।

দুশো বছর আগেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসিকল টানিয়ে পকেটমার, পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য ফাঁসি দেওয়া হত। এতৎসত্ত্বেও ঐ জাতীয় অপরাধ হ্রাস পেয়েছে কি? বরঞ্চ বিজ্ঞানের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বেড়েই চলেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যত্রতত্র অধিবাসীদের ফাঁসি দিয়ে জনসাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতাস্পৃহা কিন্তু কোনক্রমেই হ্রাস পায়নি। উপরন্তু ভারতের মুক্তির জন্য অগণিত শহিদ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে রুগ্ন মানসিকতা বা জৈবলালসা মুক্ত করেই সাধারণ নরনারীর অপরাধ-প্রবণতা দূরীকরণ সম্ভবপর। স্বেচ্ছায় উন্মার্গগামী বা স্বভাবতঃ গর্হিত পাপাচারীর সংখ্যা সভ্যসমাজে বেশী থাকবার কথা নয়। ইংরেজ প্রাবন্ধিক নিউম্যানের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে, জনৈক পথচারী তাতারদের দেশে দুর্গম অঞ্চলে পথ হারিয়ে হঠাৎ বনের প্রান্তে একটি ফাঁসির কল দেখতে পেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়েছিল। সে নাকি বলেছিল—এতক্ষণে সভ্য অঞ্চলে পদার্পণ করলাম। ফাঁসির কলের অবস্থিতির অর্থই আইনের পরাকাষ্ঠার বিজ্ঞাপন এবং আইন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু সেই আইন যদি অপরাধীর প্রতি সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে ন্যায়নীতির স্পর্ধায় অপরাধীর প্রাণহরণ করে তাহলে নিঃসংশয়েই আদিম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির (retributive) প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণই শাস্তিদানের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; কোন অপরাধী শাস্তি পেল সেটা গৌণ ব্যাপার। খুনের মামলায় নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর নয়। সুতরাং হত্যা-কারীকে ফাঁসি দিয়ে না হয় অপরাধ নিবারণ, না তার পুনঃসংস্থাপন। এ জন্য ভলতেয়ার তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ প্রয়োগ করে বলেছেন, যদি শাস্তির কোন উপযোগিতা থাকে তাহলে ফাঁসি দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে আসামী কোন কাজেরই যোগ্য নয়। ("If punishment of criminals should be of use, that when a man is hanged he is good for nothing.") রামের ফাঁসি হবার পর যদি জানা যায় যে সে নিরপরাধ, তবে রামের কোন স্বর্গে স্থান হবে সেটা জানবার উপায় আছে কি? গ্রীক ট্রাজেডির যুগে হত্যার বদলে হত্যারই দস্তুর ছিল। পত্নী ক্লিটেম্‌নেস্ত্রা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সদ্যযুদ্ধপ্রত্যাগত স্বামী আগামেম্‌নন্‌-কে হত্যা করেছিল। ফলে কন্যা ইলেক্‌ট্রার প্ররোচনায় ভ্রাতা ওরেস্টিজ মাতা ক্লিটেম্‌নেস্ত্রা-কে হত্যা করে। দণ্ডমুণ্ডের ভার রাজায়ত্ত হবার পর মধ্যযুগে প্রাণদণ্ডের জন্য নানাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে. যেমন, শয্যায় অগ্নিসংযোগ করে মারা (stakes), নিরস্ত্র আসামীকে ক্ষুধিত সিংহের সমক্ষে নিক্ষেপ, সর্পদংশনের হত্যা, শূলেবিদ্ধকরণ, ক্রুশবিদ্ধকরণ, লোষ্ট্রনিক্ষেপে হত্যা (lynching), ঘাতকের দ্বারা শিরশ্ছেদন, গিলোটিনের দ্বারা শিরশ্ছেদন, ফাঁসি, বৈদ্যুতিক চেয়ারে জীবনাবসান (electrocution) গ্যাসপূর্ণ কক্ষে নিক্ষেপ, বিষপ্রয়োগে হত্যা এবং সর্বাধুনিক ফায়ারিং স্কোয়াড অর্থাৎ সান্ত্রিমণ্ডলীর যুগপৎ গুলিবর্ষণে অপরাধীর জীবনাবসান। শোনা যায়, এগুলির মধ্যে ফাঁসিই নাকি অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশদায়ক।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়? শহিদ কানাইলাল দত্তের ত ফাঁসির আগে দেহের ওজনই বেড়ে গেল! পাঞ্জাবে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক এবং তার পরেই সামরিক আইনের আমলে অমানুষিক অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত গবর্নর ডায়ারকে ১৯৪০ সালে উধাম সিং নামে জনৈক শিখ-যুবক ইংলণ্ডে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে। প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে উধাম সিং বৃটিশ বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশে আদালত-কক্ষে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেন। সম্প্রতিকালে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়ককে হত্যা করার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সোমানা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ফাঁসির চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে বৌদ্ধ সোমানা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন (জুলাই, ১৯৬২)। ফাঁসির আগের দিন সারারাত্রি ক্রমাগত 'চেইন' করে ধূমপান করে যান। কেউ কেউ স্বীকারোক্তি করে মার্জনা প্রার্থনা করে যায়। নাৎসী বাহিনীর জেনারেল কাইটেল ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে ১০ মিনিট সময় প্রার্থনা করেন। দেখা গেল ঐ সময় তিনি তাঁর ক্ষুদ্র কক্ষটিকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে সামান্য দু'চারটে জিনিস যা ছিল পরিপাটিরূপে সাজিয়ে রাখলেন তারপর সটান ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে জেনারেল গোয়েরিং ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা আগে বিষপানে আত্মহত্যা করে ফাঁসি ফাঁকি দিলেন। অনেকে অন্যের নির্দেশে ফাঁসি যাওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা অধিকতর গৌরবজনক বলে মনে করে। আবার মেদিনীপুর জেলে বার্জ-হত্যা মামলার আসামী নির্মলজীবন ঘোষ (১৭ বৎসর) সহকর্মী রামকৃষ্ণ ও ব্রজরঞ্জনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় এবং সেদিন তাঁর ফাঁসি না হওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে অপরাহ্নে যখন জেলার ফাঁসির হুকুম নিয়ে এল, কেবলমাত্র তখনই তিনি জল গ্রহণ করতে পারলেন! বলাবাহুল্য, ফাঁসির জন্য তরুণ নির্মল অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। ফাঁসির মাত্র দু'ঘণ্টা আগে প্রত্যাহারের আদেশ পেয়েছিল প্লাক্‌নেট সাহেব—কলকাতার এক সার্জেন্ট। আলিপুর জেলে তার সঙ্গে দেখা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্লাকনেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ফাঁসির ঠিক আগে মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল? উত্তরে প্লাকনেট জানিয়েছিল, তার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

কবি-সাহিত্যিকদের ক্রান্তদর্শী বলা হয়। সাহিত্যে ফাঁসির আসামীর মনের অবস্থা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার কিছু চিত্র আছে। শেক্সপীয়রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ফলস্টাফ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ইবার আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অবশ্য তার মৃত্যু ঘটেনি—কোনদিনই ঘটবে না। শেক্সপীয়রের 'Measure for Measure' নাটিকায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক্লডিও-র স্বগতোক্তির মধ্যে একাধারে অতুলনীয় কাব্য ও মৃত্যুভীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। পার্ল বাক বলেছেন, এই মৃত্যু সম্পর্কিত চেতনা (death consciousness) নাকি ইতর-প্রাণীর মধ্যেও সক্রিয়। আধুনিক সমাজের বিচার-পদ্ধতির মধ্যে চরমদণ্ডের বিধান থাকলেও এই পদ্ধতি যে কত ত্রুটিপূর্ণ, এমনকি সময়ে সময়ে প্রহসনে পর্যবসিত সেকথা ভিক্তর হুগো ও টলস্টয় তাঁদের উপন্যাসে এবং গলস্‌ওয়ার্দি তাঁর নাটকে (জাস্টিস ও বোস্টন—বিচারপতি থোয়র এর মারফৎ) তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার গ্যয়টের অমর কাব্য 'ফাউস্ট'-এ অবৈধ শিশুসন্তান বধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা ফাউস্ট-প্রণয়িনী মার্গারেট মুক্তির সুযোগ নিলেন না। প্রত্যুষ সমাগত। ফাউস্ট মার্গারেটকে মুক্ত করার জন্য কারাকক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আর এক পা এগোলেই মুক্তি। 'কিন্তু পার্থিব কারামুক্তি তখন উদভ্রান্ত মার্গারেটের কাছে অনভিপ্সীত। তিনি বললেন, 'Upon the judgment-throne of God, I call.' (বিচারাসনে সমাসীন হে বিধাতা আমায় গ্রহণ কর)। ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' নামক ইতিহাস-আখ্যায়িকার আইনজীবী ও অনুবাদক চার্লস ডার্নি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিডনি কার্টনের সঙ্গে স্থান-পরিবর্তন করেছিল; উভয়ের মধ্যে আশ্চর্যজনক আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় এই পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছিল। গিলোটিনে জীবনাবসানের পূর্বে ডার্নি খ্রীষ্টের কথা স্মরণ করেছিল। প্রাচীন রোমক কাহিনীর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু দামন ও পিথিয়াসের মধ্যে এরূপ বদলির আভাস আছে—যার ফলে উভয়ই মুক্তি পেয়েছিল। টলস্টয়ের রচনা পাঠে এ-ধারণাই হয় যে তিনি প্রাণ-দণ্ডের বিরোধী ছিলেন। টমাস হার্ডির 'টেস্ অব দি ডার্বারভিল্‌স্' নামক অতুলনীয় উপন্যাসের উপসংহারে টেস্‌কে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে বলেছিল—"আমার আনন্দ প্রায় অপরিসীম। আমি প্রস্তুত।" ফাঁসির পর যখন কাল পতাকা উড়ল এবং "ন্যায়নীতি"র জয় ঘোষিত হল তখন হার্ডি তাঁর বিচারে নিষ্পাপ টেস-এর কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, সুরপতি ("President of the Immortals") নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন। নির্বাসিত হাঙ্গেরীয় সাহিত্যিক কোয়েসলার তাঁর বিখ্যাত 'মধ্যাহ্নে আঁধার' ('Darkness at Noon') গ্রন্থের শেষে প্রাণদণ্ড কার্যকর করার জন্য যখন রুবাসিয়েভ-কে প্রহরীরা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন রুবাসিয়েভ শেষ মুহূর্তে সোপানাবলীর উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এখানেই গ্রন্থের যবনিকাপাত। বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' (Saint Joan) নাটিকায় অগ্নিদগ্ধ করে জোয়ান (আর্কের বিদ্রোহী কৃষক তরুণী জোয়ান) কে হত্যা করার বিবরণটি ইতিহাসানুগ বলা যায়। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় বলেছিলেন, 'ঈশ্বর, ওদের ক্ষমা করুন; ওরা জানে না ওরা কি করছে'। অনুরূপভাবে বার্নার্ড শ'র নাটিকার উপসংহারে জোয়ান ক্রুশ বহনকারী কর্মচারী লাড্‌ভেনুকে সতর্ক করে দিয়ে চিতার পাশ থেকে নেমে গিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে বলেছিলেন।

('Ladvenu..When the fire crept round us and she (Joan) saw that if I (Ladvenu) held the cross before her I should be burnt myself, she warned me to get down and save myself.')

শ'-এর 'The Devil's Disciples' নাটকটি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। নায়ক রিচার্ডকে কতকটা বেপরোয়া শয়তান বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এই রিচার্ডই

অন্যের পরিবর্তে ফাঁসির রজ্জু গলায় টেনে নিয়েছিল। তার জন্য প্রার্থনার আয়োজন করলে সে বলে উঠল—

'I see little divinity about them or you. You talk to me of Christianity when you are in the act of hanging your enemies.'

' অর্থাৎ প্রার্থনাকারী এবং দণ্ডদাতা শাসকদের মধ্যে ঐশ্বরিকতার লেশমাত্র নেই। খ্রীষ্ট-ধর্মের দোহাই দিলেও কার্যক্ষেত্রে তারা কিন্তু শত্রুকে ফাঁসিকাঠে ঝোলায়। এটা অবশ্যই ঈশ্বর-বিরোধী আচরণ। রিচার্ড দণ্ডদাতাদের উদ্দেশে অবশেষে বলেছিল—'যদি তোমরা মনে কর যে ফাঁসিতে মৃত্যু আমার অভিপ্রেত তাহলে তোমরা ভুল করছ। আমাকে ভদ্রভাবে ফাঁসি দেবার জন্য তোমাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ,—একথা মনে করলেও তোমরা ভ্রান্ত। আমি সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নৃশংস কুকার্য বলে মনে করি। এই ব্যাপারে আমার একমাত্র সান্ত্বনা, সমস্ত ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হবার পর তোমরা আমার চেয়ে অনেক বেশী হেয় বোধ করবে।'

('I take the whole business in devilish bad part ; and the only satisfaction I have in it is that you'll feel a good deal meaner then I'll look when it's over.')

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' গ্রন্থে নায়ক অবশ্য মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পায় ফাঁসির সেলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগান্তে। 'পরপারে' নাটিকায় এবং রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে উত্তীয়র মানসিক অবস্থার অপরূপ বর্ণনার মধ্যেও প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ নিহিত আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'মৃচ্ছকটিক' নাটিকায় চারুদত্তকে যখন শূলেদণ্ডদানের জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে নিজের কথা কিছুই ভাবল না। তিনি বললেন,—আমার যে গোত্র শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষগণের দ্বারা পবিত্র ও প্রসিদ্ধ হয়েছিল, হতভাগ্য আমারই জন্যে চণ্ডালাদি দ্বারা প্রাণদণ্ড ঘোষণায় তার নামাবলী উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি তাঁর উচ্চবংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন, তাঁদের শুভ্র যশে কালিমা লেপন করলেন বলেই বিচলিত, সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উত্তুঙ্গ আদর্শবাদই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য চারুদত্তকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হয়নি, কেননা, পথিমধ্যেই বসন্তসেনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়; যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে'র শান্তির বেলায় ঘটেছিল।

কবির প্রতিবাদ অবশ্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে চিলির কবি নেরুদা-র 'লেটার্স ফ্রম দি গ্যালোজ' ও ইংরেজ কবি সি ডে লেউইস-এর 'ওভারচার্স টু ডেথ য়্যান্ড আদার পোয়েম্‌স্' কাব্য-গ্রন্থে। কবিদের সম্পর্কে শেলি বলেছেন, অ-স্বীকৃত আইনসভাসদ্ (un-acknowledged legislators) অর্থাৎ কবিরা কাব্যে যে আদর্শ বিধানের আভাস দিয়ে যান, সংসদে সেগুলিই পরে আইনে পরিণত করা হয়। ভারতীয় সংসদেও এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে, আশা করি।

কালপুরুষ ।

প্রথম বর্ষ । দ্বিতীয় খণ্ড । ফাল্গুন-শ্রাবণ । ১৩৬৮-৬৯

সম্পাদক । বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষে পরিমল চন্দ্র কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১৯বি, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত।